চিঠিপত্রে সমাজচিত্র

প্রথম খণ্ড । পূর্বার্ধ

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতী-গবেষণা-গ্রন্থমালা

চিঠিপত্রে সমাজচিত্র । প্রথম খণ্ড । পূর্বার্ধ

প্রকাশ : ৭ পৌষ ১৩৭৫ ॥ ২২ ডিসেম্বর ১৯৬৮

প্রকাশক : শ্রীশৈলেশচন্দ্র সেন
মুদ্রাকর : শ্রীপীযূষকান্তি দাশগুপ্ত
শান্তিনিকেতন প্রেস । শান্তিনিকেতন । বীরভূম

প্রাপ্তিস্থান
মুদ্রণ প্রচার ও প্রকাশন দপ্তর । বিশ্বভারতী । শান্তিনিকেতন
অথবা
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন । কলিকাতা-৭

সূচীপত্র

প্রাক্‌কথন

১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা-পুঁথি-সংগ্রহ হইতে নির্বাচিত পুরাতন চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজের ৬৩২খানি চিঠিপত্র লইয়া এই অভিনব গ্রন্থমালার 'দ্বিতীয় খণ্ড' প্রথম প্রকাশিত হয়। বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা-অনুসারে নির্ধারিত গ্রন্থ অপেক্ষা এই গ্রন্থের আয়তন বাড়িয়া যাওয়ায় ইহা দুই ভাগে প্রকাশ করিবার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছিল। মূল চিঠিপত্র, নির্ঘণ্ট, স্থানসূচী ইত্যাদি দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করা হয়। তখন স্থির হইয়াছিল দ্বিতীয় খণ্ডের এই মুদ্রিত চিঠিপত্রাদি অবলম্বনে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক আলোচনার প্রবেশক-অংশ প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

মূল ও প্রবেশক, অর্থাৎ দ্বিতীয় ও প্রথম, উভয় খণ্ডে সম্পূর্ণ এই বইখানির জন্য তখন আনুমানিক ১২০০ পৃষ্ঠার মতো মুদ্রণের কথা ছিল। অদ্যাবধি দুই খণ্ডে ইহার মোট ৯৩২ পৃষ্ঠা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

১৯৫৩ সালে বিশ্বভারতীর সংগ্রহে দলিল-দস্তাবেজের সংখ্যা ছিল সাকল্যে এক হাজার। পনেরো বৎসর পূর্বে প্রকাশিত মূল দ্বিতীয় খণ্ড গ্রন্থখানির প্রথম খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে অনিবার্য কারণে নানা মৌলিক অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রধান অসুবিধা হইতেছে বিশ্বভারতীর ক্রমবর্ধমান পুঁথি-সংগ্রহ ও অসংখ্য পুরাতন দলিল-দস্তাবেজের আমদানি। এই সকল নূতন দলিল-দস্তাবেজ হইতে নির্বাচিত চিঠিপত্র প্রকাশ করিতে গেলে, মূল চিঠিপত্র-অংশের জন্যই একাধিক খণ্ড প্রকাশের প্রয়োজন অনুভূত হয়। গুরুত্বপূর্ণ নূতন দলিল-দস্তাবেজের কয়েকখানি প্রস্তুত প্রথম খণ্ডের 'অপরার্ধ' অংশের পরিশিষ্টে প্রকাশ করা হইবে। এতৎসম্পর্কে গবেষণামূলক আলোচনার প্রকাশও বহু-সময়-সাপেক্ষ। সুখের বিষয় ইত্যবসরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়ায় ফলে একাধিক গবেষক এখানে এই বিষয়ে গবেষণা করিয়া সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছেন।

এই গ্রন্থমালার ১৯৫৩ সালে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবার পরে, বর্তমান প্রথম খণ্ড প্রকাশে অস্বাভাবিক বিলম্ব হওয়ার ফলে, এই গ্রন্থের প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবেশক অর্থাৎ প্রথম খণ্ডখানিকে 'পূর্বার্ধ' ও 'অপরার্ধ' এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রকাশ করিবার পরিকল্পনা সম্প্রতি গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তুত প্রথম খণ্ড—'পূর্বার্ধ'-অংশে মূল দ্বিতীয় খণ্ডের অনুসরণে কয়েকটি ক্রমিক অধ্যায়ের আলোচনা প্রকাশ করা গেল।

'অপরার্ধ'-খণ্ড বর্তমান গ্রন্থের ৩২৮ পৃষ্ঠার পরে, ৩২৯ পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ হইবে এবং তাহাতে এই অধ্যায়গুলি প্রকাশিত হইবে,—ব্যবসায়-বাণিজ্য অধ্যায়ের খাজানা ও কর্জ-দাদন, বিবাদ-বিসম্বাদ, দলিল-দস্তাবেজ; সাহিত্যিক মূল্যাঙ্কন: পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গবেষণার রূপরেখা, বাঙ্গালা ভাষা ও গদ্য-রচনার ভূমিকা, বাঙ্গালা গদ্য (দ্বিতীয়

খণ্ডে সংকলিত গন্ত-নিদর্শনের কালানুক্রমণ, নির্ঘণ্ট সমেত), ভাষাতত্ত্ব (বানান-উচ্চারণ), পত্রলিখন-প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ডের চিঠিপত্রের পাঠ-সংকলন ; ব্যক্তি-নামকরণ : বাঙ্গালীর পদবী-রহস্ত, সেকালের বাঙ্গালীর পদবী-বিন্যাস ; সেকালের লক্ষণীয় ব্যক্তিবর্গ (১৬৫২-১৮৯২): ১০৫৯ বঙ্গাব্দে সম্পাদিত দলিল ও কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের উত্তরপুরুষগণ, পুরুষোত্তম বিদ্যালঙ্কার, নান্নুরের জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালঙ্কার ও তাঁহার কৃতি ; শ্রীপাট মূলুক ও দক্ষিণ-বীরভূমের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ; শুকলের সরকার-বংশ ও সেকালের দক্ষিণ-বীরভূম-সমাজ ; সেকালের রাঢ়ের ভট্টাচার্য-সমাজ (১৬৫২-১৮৯২) ; আলোচ্য চিঠিপত্রের স্থান-নামের প্রেক্ষাপটে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সংস্থান ; রাঢ়ের ভূগোলে ও ইতিহাসে নব-অধ্যায়ের সংযোজন ; দক্ষিণ-রাঢ়ে পাঠান ও মোগল জনগণের অবশেষ ; আকবরী সন, জমিদারী সন, মেদিনীপুর চাকলার সন ও সনাব্দ ; বারগীর, বঙ্গে বর্গী, বর্গীর কবিতা, 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' ও বর্গী-দর্শন ; বাঙ্গালী-সমাজের আদর্শ-স্বরূপ, তাহার গতি ও পরিণতি ; পরিশিষ্ট : নব-সংগৃহীত দলিল-দস্তাবেজ, পুষ্পিকা, বিবিধ ; তথ্য-নির্দেশিকা, প্রমাণপঞ্জী, সংযোজন-সংশোধন, প্রতিলিপি (পুঁথি, পত্র, দলিল, হস্তাক্ষর, সর্পবন্ধ, নৌকাবন্ধ) ও মানচিত্রাদি ।

পরিশেষে, এই গ্রন্থমালার পরিকল্পক ও প্রধান কার্যনির্বাহকগণের নামোল্লেখ করা কর্তব্য। প্রথমেই স্বর্গত ব্যারিস্টার তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এবং বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য-চতুষ্টয়— স্বর্গত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্গত ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীসুধীরঞ্জন দাস মহাশয়গণের নাম স্মরণ করিতে হয়। আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রধান সহায়ক ছিলেন বিদ্যাভবনের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর ফজলে মহম্মদ আসিরী, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের অন্যতম বংশধর স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কাব্যতীর্থ এবং বঙ্গীয় শব্দকোষ-কার স্বর্গত পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণ। আদ্যোপান্তে উৎসাহ যোগাইয়াছেন মদীয় শিক্ষাগুরু বর্তমানে জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। দ্বিতীয় খণ্ডে মূল চিঠিপত্রগুলি প্রথমে প্রকাশিত হইবার পরে তিনি এই গ্রন্থমালার প্রাণপরিচায়ক একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত সেই 'মুখবন্ধ' দিয়াই বর্তমান খণ্ডের সূচনা করা গেল। পুঁথির প্রাথমিক প্রতিলিপি ও প্রেসকপির প্রস্তুতিতে অক্লান্ত সহায়তা করিয়াছেন যথাক্রমে পুঁথি-বিভাগের কর্মকর শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও সহকারী শ্রীগৌরহরি সাহা। ব্যক্তিগত সংগ্রহ হইতে যাঁহারা দলিল-দস্তাবেজ ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন তাঁহাদের উল্লেখ দ্বিতীয় খণ্ডে করা হইয়াছে।

বিদ্যাভবন। শান্তিনিকেতন — শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

জন্মাষ্টমী। ১৫ অগস্ট ১৯৬৮

এইখানি সম্পূর্ণরূপে একখানি নূতন ধরনের বই হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১৬৫২ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৯২ পর্যন্ত প্রায় আড়াই শত বৎসর ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যতঃ ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরের কতকগুলি জেলায় প্রাপ্ত এইখানি প্রাচীন চিঠিপত্রের সংগ্রহ। ইতিহাসের সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিকোণ এখন অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে। আগে ইতিহাস বলিলে আমরা রাজ-রাজড়ার কথাই বুঝিতাম, সন-তারিখ যুদ্ধ-বিগ্রহ সন্ধি-মিলন প্রভৃতি রাজাদের ব্যাপার লইয়াই ইতিহাস রচিত হইত। কিন্তু এখন আমরা ইতিহাস বলিলে কোনও একটি বিশেষ জনসমাজের সাধারণ মানবের সমষ্টিগত কাহিনীই বুঝি। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী ইয়োরোপে নূতন করিয়া আসিয়াছে, তবে সহজভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রাচীন ভারতের লোকেও মানিয়া লইয়াছিল বলিয়া আমরা সংস্কৃত-সাহিত্যে ইতিহাস বলিতে মহাভারতকে বুঝি, অবশ্য 'ইতিহাস' শব্দের প্রাচীন সংস্কৃত সংজ্ঞার্থ এবং আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনুমোদিত সংজ্ঞার্থ এই দুইয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে, কিন্তু সে পার্থক্য মৌলিক নহে। আমাদের দেশেও ইতিহাসের এই নবীন আদর্শ আসিয়া যাওয়ায় কিছুকাল হইল স্বর্গীয় দুর্গাচন্দ্র সান্যাল ও ফকিরচন্দ্র দত্ত মহাশয় 'বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস' নাম দিয়া বাঙ্গালাদেশের কয়েকটি প্রাচীন অভিজাত বংশের সম্বন্ধে প্রচলিত গালগল্পের সংকলন করিয়া একটি সুপাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন কিন্তু তাহা ঠিকমতো বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস ছিল না। সেদিকে সচেতনভাবে চেষ্টা করিয়াছেন ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায় তাঁহার 'বাঙালীর ইতিহাস'এ। কিন্তু এই বই কতকগুলি সাহিত্যিক ও প্রত্নলিপি সম্বন্ধীয় আধারের উপরে রচিত— ইহাতে ইতিহাস-সংকলকের নিজের পাণ্ডিত্য ও ভূয়োদর্শনের প্রকাশের যথেষ্ট অবকাশ ছিল। এই বই কেবল মুসলমান-পূর্ব যুগ লইয়া, এবং ইহাতে বঙ্গভাষী জাতির উৎপত্তি এবং তাহার প্রাথমিক যুগের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ও ধার্মিক ইতিহাসের সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ আছে।

আলোচ্য পুস্তকের উদ্দেশ্য অন্য ধরনের। ইহা পুরাতন বাঙ্গালার ঘরোয়া পত্রের একটি সংকলন। সংকলয়িতার উদ্দেশ্য— এই পত্রগুলি হইতেই তখনকার সমাজের নানা দিক্ এবং পত্রলেখকগণের মনের কথা আধুনিক বাঙ্গালার পাঠক জানিতে পারিবেন। এই ধরনের পত্রের সংগ্রহ বাঙ্গালাভাষায় ইতিপূর্বে যে হয় নাই তাহা নহে। স্বর্গীয় শিবরতন মিত্র মহাশয় Types of Early Bengali Prose নাম দিয়া কতকগুলি পুরাতন পত্র ও দলিল-দস্তাবেজ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে প্রকাশিত করিয়াছেন (১৯২২)। কিন্তু তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য বাঙ্গালা ভাষার প্রগতি দেখানো। অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় ভারত-সরকারের নথীপত্রের নয়াদিল্লী-স্থিত মহাফেজ-খানার পুরাতন নথীপত্রের সঞ্চালক থাকা-কালীন ঐ স্থানে রক্ষিত বাঙ্গালা ভাষায় লেখা অনেকগুলি চিঠি-পত্র দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদির একটি লক্ষণীয় সংগ্রহ প্রকাশিত করেন। এই সংগ্রহ-প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য— খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর

মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া উত্তর-পূর্ব ভারতের নানা রাজকীয় ঘটনার দিগ্‌দর্শন করা— এই সমস্ত ঘটনার পাত্র ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং পূর্বভারতের বিভিন্ন ছোটো বড়ো রাজ্যের রাজা উজীর প্রভৃতি পরিচালকগণ ; সাধারণ মানুষের কথা ইহাতে নিতান্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই আসিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত চিঠি diplomatic correspondence অর্থাৎ রাজনৈতিক পত্র-ব্যবহার পর্যায়ের, এইগুলি বিশেষ যত্ন করিয়া এবং হিসাব করিয়া লেখা— ঘরোয়া চিঠিপত্রের স্বাভাবিকতা এইরূপ পত্রে থাকা সম্ভবপর নহে। স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' নাম দিয়া বাঙ্গালা ভাষায় সংবাদপত্রের পত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় বাইশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালা সংবাদপত্রে নানা বিষয়ে যে সমস্ত ব্যাপার আলোচিত হইয়াছে সেগুলির একটি অতি মনোজ্ঞ সংকলন প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে সে যুগের সমাজের একটি দিগ্‌দর্শন পাওয়া যাইবে, কিন্তু 'এহ বাহ্য'। প্রস্তুত 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র'র মধ্যে আমরা যে ছবি পাই তাহার মস্ত বড়ো কথা হইতেছে যে, সে ছবি যেন একেবারে ফটোগ্রাফের মতো সত্য অবস্থাকে ধরিয়া তুলিয়াছে। ইয়োরোপীয় সাহিত্যে Letters বা পত্র-লিখন একটি যেন সাহিত্যিক প্রকার-ভেদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক বড়ো বড়ো চিন্তাশীল লেখক 'চিঠি' নাম দিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন সেগুলি প্রবন্ধের মতো এবং প্রথম হইতেই সেগুলি সাহিত্যের পর্যায়েরই বস্তু। লেখক যেন তাঁহার ভবিষ্যৎ পাঠকের দিকে আড়চোখে চাহিয়াই লিখিয়াছেন, কোথাও বা পূর্ণদৃষ্টিতে তাহাদেরই মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে লিখিয়াছেন। কিন্তু যেখানে সে উদ্দেশ্য লইয়া এইরূপ পত্র লিখিত হয় নাই সেখানে সহজাত সারল্যের গুণে এইরূপ পত্র সকলের মনে একটা সাড়া জাগাইয়া তোলে। পঞ্চাননবাবুর সংকলিত চিঠিগুলি এই ধরনের। যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহারা অতি সহজভাবে উপস্থিত তাগিদ মিটাইবার জন্যই লিখিয়াছেন— তাঁহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বা হর্ষ-বিষাদ, ছোটো-খাটো সাময়িক প্রয়োজন বা দীর্ঘস্থায়ী কায়েমী বন্দোবস্ত, এ সমস্তই কোনো রকমে সংকোচ বা গোপন না করিয়া (অর্থাৎ without reservation) তাঁহারা জানাইয়াছেন। জীবনের কত দিকে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করিয়া থাকে! তাহার ঘর স্ত্রী পুত্র কন্যা আত্মীয় এবং অনাত্মীয়, তাহার বাহিরের সমাজ শিক্ষা ধর্ম রাজদ্বার ব্যবসায় জমিজিরাৎ প্রভৃতি, সব কিছুই তাহাকে ঘিরিয়া আছে— তাহার সব চিন্তায় ও কাজে জড়াইয়া আছে। এই-যে নিতান্ত আত্মসমাহিত ব্যক্তি ও একাধারে সামাজিক মানুষ, নিজেকে ধরা দিয়াছে তাহারই এই সব চিঠিপত্রে। তাহারা একে একে নিজের কথা বলিয়াছে কিন্তু তাহাদের পারিপার্শ্বিকের হাওয়া এবং মনের ভিতরের হাওয়াও একসঙ্গেই এই-সব চিঠির মধ্যে বহিতেছে।

সংকলনকার মুখ্যতঃ সেই মানবিকতার এবং সামাজিকতার দিকে লক্ষ রাখিয়া এই চিঠিগুলি একত্র করিয়াছেন এবং এগুলিকে বিষয় ও সময় ধরিয়া সাজাইয়া দিয়াছেন। এই চিঠিগুলি পড়িতে পড়িতে আমাদের মন অনেক সময় এক অদ্ভুত রসে আপ্লুত হয়। মানুষ

তাহার নিজের মনের প্রতিধ্বনি শুনিয়া যেমন খুশী হয় তেমনি অপ্রত্যাশিত অবস্থায় পরিচয় পাইয়াও সে প্রীত বিস্মিত হয়। এইসব চিঠির মধ্যে পুরাতন কালের মানুষকে তাহার স্বরূপে ঠিকমতো এবং অতি নিবিড়ভাবে পাওয়া যায় বলিয়াই এগুলির প্রতি আমাদের আকর্ষণ হইয়া থাকে। পুরাতনের সম্বন্ধে আমাদের একটা স্বাভাবিক মোহ আছে এবং যে দিন চলিয়া গিয়াছে সে দিনের ছোটোখাটো খুঁটিনাটি কথা আমাদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি কবিতায় এ বিষয়ে তাঁহার বিশ্বদরদ মনের দরদ দিয়া আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন— বিশেষ সমীচীনতার সহিত সংকলয়িতা সেই কবিতাটি তাঁহার পুস্তকের প্রারম্ভে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। আজিকার জীবনের যাহা তুচ্ছ যাহা অতি সাধারণ, তাহা কালপ্রভাবে বিশিষ্ট এক রূপ ধারণ করিয়া বসে— সময়ের গুণে সাধারণও অসাধারণত্বের পর্যায়ে গিয়া উঠে। বোধহয় কালের ব্যবধান সহজেই আপনা হইতেই এক প্রকারের সাহিত্যিক রস সৃষ্টি করিয়া থাকে ; রবীন্দ্রনাথের কথায়—

> 'আজি যার জীবনের কথা তুচ্ছতম
> সেদিন শুনাবে তাহা কবিত্বের সম।'

সামান্য একটি উৎসবের ফর্দ কিংবা কোনো বিবাহের জন্ম পত্র কিংবা সামাজিক অভয় বা প্রতিকার -প্রার্থী কোনো ভীত-নিপীড়িত ব্যক্তির কাতরতা, সংসারে নানা অভাব-অভিযোগে মানুষের মনের বিতৃষ্ণা প্রভৃতি কত শত দৈনন্দিন ঘটনা আমাদের এ যুগের মতো তখনকার লোকদিগকেও বিব্রত করিয়াছে, তাহার কথা এই চিঠিপত্রে পাইয়া আমরা যেন চোখের সামনে প্রাচীন জীবনের চলচ্চিত্র দেখিতে পাইতেছি। ইহার মধ্যে যে সাহিত্যরস আস্বাদন করা যায় তাহা জীবনেরই প্রতিফলন বলিয়া উপন্যাস হইতে প্রাপ্ত রসের অনুরূপ।

প্রস্তুত খণ্ডে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বাবু তাঁহার আলোচনার আধারস্বরূপ ছয় শত বত্রিশখানি চিঠি ছাপাইয়া দিয়াছেন। প্রত্যূয়মান প্রথম খণ্ডে (পূর্বার্ধ ও অপরার্ধ) এই-সমস্ত পত্রে উল্লিখিত বিষয়বস্তু ও ব্যক্তির সম্বন্ধে নানা দিক্ হইতে বিচার-বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ হইবে। তখন আমরা এই একনিষ্ঠ সাহিত্য ও ইতিহাসের সাধকের চোখে দেখা আড়াই শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর ব্যক্তিগত এবং সমাজগত জীবনের একটি নিখুঁত চিত্র অথবা বর্ণনা পাইব ; সে বর্ণনাকে সংকলনকার তাঁহার নিজের অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার আলোক দ্বারা পূর্ণভাবে প্রকাশযুক্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিবেন। বইখানির ছাপা এবং বাহ্যসৌষ্ঠব সুন্দর। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে এইরূপ মূল্যবান্ একখানি বই বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিতেছেন বলিয়া তিনি ও বিশ্বভারতী উভয়েই আমাদের ধন্যবাদার্হ।

শান্তিনিকেতন　　　　　　　　　　　　　　　　　শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

২৮ জুলাই ১৯৫৩

চিঠিপত্রে সমাজচিত্র

(১৬৫২-১৮৯২)

॥ শান্তি-বচন ॥

গম্ভীর ধর্ম স্থনিআ বড় তুট্‌ঠো
নিসি অন্ধারী কিম্পি ন দিট্‌ঠো ॥
চিন্তা চিন্ততে পোহাই গেলি রাতী
দীবা জালী বাট চাহন্তি শান্তী ॥

অনুবাদ

গভীর ধর্ম শুনি মূঢ় হয় তুষ্ট
আঁধার নিশীথে কিছু হয় নাকো দৃষ্ট ।
ভাবনা ভাবিতে ভোর হয়ে গেল রাত্রি
প্রদীপ জালিয়া পথ চাহিতেছে শান্তি ।

॥ গ্রন্থনাম ॥

নানা লোকের লেখা ছয় শত বত্রিশখানি পুরাতন চিঠিপত্র এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে[১]। চিত্র আঁকিয়া ধরিবার মত রূপদক্ষতা আমাদের নাই ; আমরা তাহার চেষ্টাও করিব না। অতীতের মনগড়া কোনও চিত্র অঙ্কিত করাও এই গ্রন্থপরিচয়ে অনাবশ্যক। আমাদের আবিষ্কৃত ও নির্বাচিত প্রত্যেক পত্রই অন্যনিরপেক্ষ স্বয়ংভাস্বর চিত্র। তবে চিত্রগুলি নিপুণ শিল্পীর কৃতি নহে ; এইগুলি হইল মানবমনের সাধারণ ভাবের সহজ প্রকাশের শিল্প-প্রদর্শনী। ইহা সজ্জিত উদ্যানের জ্যামিতিক শোভা নহে, বিস্তীর্ণ বনানীর স্বাভাবিক আলেখ্য। মনের গভীরে মানুষের সুখদুঃখের হাসিকান্নার অহরহ যে দোলা লাগিতেছে তাহার স্বতঃস্ফূর্তি আছে এই পত্রধারায়। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি অনেক কথা এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। সেই সব ছোট-বড় মৌলিক তথ্যাবলি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রমাণসহযোগে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ইহা হইতে কোনও সামাজিক সত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর কি না, এই খণ্ডে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

॥ সংগ্রহ ॥

বাঙ্গালা পুঁথি-সংগ্রহ করার হদিশ পূর্বপ্রকাশিত[২] গ্রন্থ পুঁথি-পরিচয় প্রথম খণ্ডে দেওয়া হইয়াছে[৩] এবং প্রস্তূয়মান 'প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে গবেষণার ভূমিকা' গ্রন্থে[৪] বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হইতেছে। অনেকেই এখন সাগ্রহে প্রশ্ন করেন, এই চিঠিপত্রগুলি কিরূপে সংগৃহীত হইল। চাহিতে গেলেই, লোকের ঘরে এইগুলি ফেলনা পাওয়া যায়, কিংবা দাম দিয়া কেনা হয় কি না, ইত্যাদি। এখন আমাদের কথা বলি।

বর্ধমান-সাহিত্যসভার তরফে[৫] ও পরে, বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনে রিসার্চ ফেলো থাকার কালে[৬] বস্তা বস্তা পুঁথি মণ-দরে সংগৃহীত হইয়াছে। বস্তায় আসিয়াছে বাঙ্গালা পুঁথি, সংস্কৃত পুঁথি, ভাল পুঁথি, বাজে পুঁথি এবং তুলট কাগজের উপরে লেখা আরও অনেক টুকিটাকি। এই এলোমেলো পুঁথির স্তূপ হইতে বাছিয়া তুলট কাগজের

---

১. চৈত্র ১৩৫৯ : মার্চ ১৯৫৩

২ আষাঢ় ১৩৫৮

৩ ভূ *১১-*১৩

৪ 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ'-গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হইবে

৫ খৃ ১৯৪০-৪৫

৬ খৃ ১৯৪৬-৪৮

এই টুকিটাকি ফর্দগুলিকে সন্তর্পণে মেলিয়া ধরিলেই দেখা যাইবে, সেটি হয় একখানি চিঠি, নয় হিসাব, না হয় দলিল-দস্তাবেজ বা এইরূপ কিছু।

এখন কথা, এলোমেলো পুঁথির গাদায় চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজ আসে কি করিয়া। পুরাতন পুঁথি সাধারণতঃ পাওয়া যায় টোলের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বা যেকোন বর্ণের বনেদী গৃহস্থবাড়ীতে কিংবা পঁড়িং দেয়াসী দেউলে, এই ধরণের লোকের ঘরে। পুঁথি তখন ইহারা পাঠ ও গানপূজাদিতে নিত্য ব্যবহার করিতেন এবং দরকারী দপ্তরের মত সযত্নে রক্ষা করিতেন। চিঠিপত্র কালেভদ্রে যাহা দেওয়া-নেওয়া চলিত সবই সেই দপ্তরে গোঁজা থাকিত। কালক্রমে পুঁথির ব্যবহার উঠিয়া গেল, দপ্তরের বন্ধন শিথিল হইল, বিভিন্ন পুঁথি গোলাইয়া স্তূপে পরিণত হইল; সেই চিঠিপত্রাদিও স্তূপে মিশিয়া গেল। দরকারী দলিল-দস্তাবেজ যাহা পেটিকাবদ্ধ হয় নাই, তাহাও ইহার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া রহিল।

এখন যদি কপালক্রমে এইরূপ একটি পুঁথির স্তূপ 'হস্তবশ' করা যায়, তাহা হইলে তাহার মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে গবেষকের প্রচুর খোরাক আসিয়া গেল, নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে। তবে সাধারণতঃ এই-জাতীয় দলিলপত্র-সম্পর্কে অজ্ঞতা খুবই ব্যাপক; কেবল অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোক নহে, অনেক ঐতিহাসিকও এই ধরণের দলিল-দস্তাবেজের প্রয়োজনীয়তা-বিষয়ে অনভিজ্ঞ; তাঁহাদের ধারণা, এই সব আবর্জনা ঝরা পাতার স্তূপের মত, ঝাঁটাইয়া দূরে নিক্ষেপ করাই শ্রেয়ঃ। বাঙ্গালা-দেশের সামাজিক ইতিহাসরচনার অনেক মৌলিক উপকরণ এইভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বড় বড় পুঁথিসংগ্রহ-শালায় 'ভালো পুঁথি' বাছিয়া লইয়া বাকিগুলিকে সাধারণতঃ আমল দেওয়া হয় না; ফলে, পাকা জহুরীরাও ঠকিয়া যান। কিন্তু পারাবতবৃত্তিতে শাঁস বিচি খোলার সব-কিছু একসঙ্গেই উদরস্থ করা হইয়াছে; ইহাতে নানা আবর্জনা প্রচুর আসিয়াছে, কিন্তু ছাইএর সহিত সোনাও আসিয়া গিয়াছে, না আসিলে আজ এই বইয়ের কল্পনাও করা যাইত না।

বাঙ্গালা দেশে তুলট কাগজে বা তালপত্রে লেখা পুরাতন চিঠিপত্র কত জনের বাড়ীতে স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত আছে জানি না; তবে বিষয়সম্পত্তি-রক্ষার নিমিত্ত পুরাতন পৈতৃক দলিল-দস্তাবেজ অনেকের ঘরেই আছে; কিন্তু গবেষণার উদ্দেশ্যে সেগুলি দান করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না, চাহিতে যাওয়াও যেন ধৃষ্টতা। সুতরাং পুঁথিসংগ্রহকারীর ও পুঁথির মালিকদেরই শরণ লইতে হয়। এই বইয়ের বেলায় খাস বিশ্বভারতীর সহস্রাধিক এবং অন্যান্য সংগ্রহ এক জায়গায় করিতে এই পন্থাই অবলম্বিত হইয়াছে।

॥ বিন্যাস ॥

দ্বিতীয় খণ্ড 'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' আটটি প্রকরণে ভাগ করা হইয়াছে,—সমাজ শিক্ষা ধর্ম ভাষ ব্যবসায়-বাণিজ্য বিবাদ-বিসম্বাদ দলিল-দস্তাবেজ ও বিবিধ। সমাজ-প্রকরণের ছয়টি উপবিভাগ,—জন্ম বিবাহ প্রণয়পত্র ঘরোয়া-খুঁটিনাটি ব্যাধি ও উৎপাত এবং শ্রাদ্ধ। ভাষ-প্রকরণটিকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে,—সামাজিক ও বৈষয়িক। ব্যবসায়-বাণিজ্য-প্রকরণের চারিটি বিভাগ,—ব্যবসায়-বাণিজ্য কৃষি খাজানা ও কর্জ-দাদন। যে সকল চিঠিপত্র প্রথম সাতটি প্রকরণে পড়ে না বা একাধিক প্রকরণে দেওয়া চলে সেগুলিকে দ্বিতীয় খণ্ডে 'বিবিধ' প্রকরণে সাজান হইয়াছে। এই খণ্ডে 'বিবিধ'-প্রকরণ প্রথম সাতটি প্রকরণে মিলাইয়া দেওয়া গেল। দ্বিতীয় খণ্ডের মূল-অংশ ছাপা হইবার পর যে সকল মূল্যবান্ দলিল-পত্র হাতে আসিয়াছিল 'পরিশিষ্টে' এইরূপ আটটি প্রকরণে ভাগ করিয়াই সেগুলি বিন্যস্ত করা হইয়াছিল। বর্তমান গ্রন্থে দ্বিতীয় খণ্ডের 'পরিশিষ্ট'-অংশ মূলের সহিত মিলাইয়া আলোচনা করা হইল।

বেশীর ভাগ পত্রেই তারিখ নাই; সেইজন্য প্রাপ্ত তারিখগুলি হইতেই পত্রের বিষয়ানুযায়ী দ্বিতীয় খণ্ডে ধৃত প্রকরণগুলিকে পূর্বাপর কালানুক্রমে বিভক্ত করা হইয়াছে। বর্তমান খণ্ডে আলোচনার সময় তথ্যগুলির পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করা হইল। এই গ্রন্থের শেষভাগে মুদ্রিত তথ্যসূচী প্রকরণ-অনুসারে বর্ণানুক্রমে সাজান হইয়াছে। উপরন্তু, ইহাতে দ্বিতীয় খণ্ডের ক্রমিক চিঠিসংখ্যা এবং বর্তমান গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক পাওয়া যাইবে। যে সব চিঠিপত্রে তারিখ নাই, সেই সকল পত্রের তথ্যাবলির আলোচনার জন্য স্থাননির্ণয়ে সামান্য বুদ্ধির আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি নূতন সংগ্রহের[১] চিঠিপত্রগুলির কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যাবলি যাহা হাতে আসিয়াছে, তাহার আলোচনাও যথাস্থানে করা গেল এবং মূল দলিলগুলিও এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। সূচীপত্র হইতে এতদতিরিক্ত খুঁটিনাটির বিস্তৃত বিন্যাসপ্রণালী জানা যাইবে।

স্পষ্টই বলিয়া রাখা ভাল, এই বিন্যাস যে নিখুঁত হইয়াছে তাহা দাবী করিবার কিছুমাত্র ধৃষ্টতা আমাদের নাই; বিন্যাস আরও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে করা যাইত, তবে এই আশায় আরও কালহরণ করা সমীচীন বোধ করি নাই।

॥ পাঠ ॥

পুঁথি-লেখায় গ্রন্থকারের বা লিপিকরের হস্তাক্ষরের একটি বিশেষ ছাঁদ পর পর অনুসৃত হইয়া চলে; এই জন্য যে কোনও প্রকারের হস্তাক্ষরে লিখিত পুঁথি হউক না

১ বিশেষতঃ, পল্লীশ্রী-সংগ্রহ

কেন, তাহার প্রথম দুই এক পৃষ্ঠা আয়ত্ত করিতে পারিলে সমগ্র পুঁথির পাঠ উদ্ধার করার আর কোন অসুবিধা থাকে না; কিন্তু চিঠিপত্রের ক্ষেত্রে পুঁথি-পড়ার এই কৌশল একেবারেই অকেজো, কারণ প্রত্যেকখানি চিঠির লেখক স্বতন্ত্র ব্যক্তি; তাঁহাদের প্রত্যেকের শিক্ষা ও মনোভাব স্বতন্ত্র, সুতরাং হস্তাক্ষর স্বতন্ত্র হইবেই উপরন্তু আছে অক্ষরবিন্যাস; শুদ্ধ অশুদ্ধ নির্বিচারে লেখকের নিজস্ব লেখনরীতির অনুসারে সুবিধামত বে-পরোয়া বানান-লেখা; মূল (সংস্কৃত) ছাড়িয়া 'ভাষায়' অর্থাৎ বাঙ্গালায় পত্ররচনার জন্য প্রাকৃতের নিয়ম অনুসারে, মনে হয়, এই স্খলন দোষের মধ্যে পরিগণিত হইত না। 'শিক্ষা'-প্রকরণে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। জীর্ণ তুলটের আধারে সেই সব জড়ানো অক্ষরবিন্যাস অনেকক্ষেত্রে আমাদের মিলিত বহু চেষ্টাতেও উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। তাহার উপর আছে, বর্তমানে অপ্রচলিত প্রাদেশিক শব্দের ব্যবহার, বাঙ্গালা বাক্যে ও পদবিন্যাস-রীতিতে অজস্র আরবী ফার্সী শব্দের প্রচলন এবং অন্যান্য সমসাময়িক বিদেশী শব্দের অশুদ্ধ প্রয়োগ। এই সব অনিবার্য কারণে গ্রন্থখানি বর্তমানে নিখুঁত হইল না; তবে চেষ্টার ত্রুটী হয় নাই। সান্ত্বনার কথা,—যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।

বিষয়সূচী

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

বিষয়সংক্ষেপ

(খৃ ১৬৫২-১৮৯২)

সমাজ

(সন ১১৩৯-১২৯৫ : খৃ ১৭৩২-১৮৮৮)

॥ জন্ম ॥

(সন ১২০০-১২৪৭ : খৃ ১৭৯৩-১৮৪০)

১ নবজাতকের জন্মের শক মাস তারিখ দণ্ডাদির কড়চা— আশীর্বাদ-প্রার্থনা ২ প্রসবান্তে প্রমাদ— জ্ঞাতি পিতামহ ভ্রাতার গঙ্গালাভ— তাহার ক্ষৌরসংবাদ-জ্ঞাপন ৩ কন্যার জন্মের কড়চা— সন তারিখ মাস পক্ষ বার তিথি প্রহর ওক্ত— প্রসবকালে পূর্ব-দ্বারী ঘর— দুইজন সধবার অবস্থান— পশ্চিমমুখে সন্তানপ্রসব ৪ শ্রী সেখ আমীরন্দীর জন্মের মাস তারিখ সন 'প্রহর— সন ১২০০ সাল ৫ শ্রীযুক্তাভিনবকুমারের জন্ম-সংবাদে বড়ই আহ্লাদে সংবাদ-বাহককে কিঞ্চিৎ দিয়া বিদায় ৬ নবকুমারের লতায় নিমন্ত্রণপত্র ৭ নবকুমারের অন্নপ্রাশনে বচক'নি চেলির জোড় সমেত আসার অনুরোধ— পূজায় মোকরোর করা সত্ত্বেও পাই পয়সা না পাওয়ায় অনুযোগ— ঈশ্বরপ্রাপ্তির সংবাদ— অন্নপ্রাশনের দিনস্থির প্রসঙ্গ ৬৩ কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার পর নষ্ট ৮১ সাধভক্ষণে ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ ৫২৯ সন্তানের ভূজনর লৌকতায় ঋণ— পৌত্রজন্মের সংবাদ লইয়া নাপিতের উপস্থিতি— বিদায়—নাতুরি ধোবীকে সন্তান হওয়ার জন্য ইলাম দেওয়া ৫৩১ কন্যার অন্নপ্রাশনে লৌকতা ৫৬১ পুত্রের জাতাহ— আট পা দক্ষিণদ্বারী ঘর— স্ত্রীলোক ১১ জন— বিধবা ৪ জন— সধবা ৭ জন— দক্ষিণ শিরে পুত্রের জন্ম—কন্যার জন্ম পূর্বদ্বারী ঘরে ৫৬২ বধূঠাকুরানীর কায়িক মঙ্গল— নবকুমার সুশ্রী হইয়াছে— ভাল আছে— নূতন পঞ্জিকা অপ্রাপ্তিতে লগ্ন দেখায় বাধা— ষষ্ঠ দিবসে সূতিকাষষ্ঠী পূজাদির উল্লেখ— ঘটা করিয়া হরিদ্রা-তৈল সংস্কারের অভাবে— গ্রামের বাদ্যকর লইয়া আমোদ-প্রমোদ না হওয়াতেও স্ত্রীলোকদের দুঃখ ৫৬৩ পৌত্রের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ— শুভাগমন ও আশীর্বাদ-প্রার্থনা ৫৬৪ অন্নপ্রাশনের জন্য বিবিধ জিনিষ খরিদের— লৌকতার হিসাব

॥ বিবাহ ॥

(সন ১১৫৮-১২৯৫ : খৃ ১৭৫১-১৮৮৮)

৮ লগ্নপত্র— বিবাহসিদ্ধ-পত্র ৯ অদত্তা কন্যা— সপ্তবর্ষীয়া সুন্দরী—সৌষ্ঠবের সহিত পাত্র-বিদায় ১০ নিমন্ত্রণে গুবাক কড়ির সম্বন্ধে কুলীনদের বিবাদ ১১ কন্যার বিবাহে সবিনয়ে আগমন প্রার্থনা— মুদীর দোকানে বাকী টাকা সিকার কথা ১২ পিতাঠাকুরের অসুস্থতা— কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ ১৩ কন্যার বিবাহে পাষণ্ডার ভট্টাচার্য বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ১৪ উৎসবানন্দ

॥ প্রণয়পত্র ॥

(সন ১২৩৪-১২৮৩ : খৃ ১৮২৭-১৮৭৬)

৩০ জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালঙ্কারের সর্পবন্ধ-পত্র— মহারাজা জগদিন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ মল্লিকের নামে লিখিত ৩১ জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালঙ্কারের লিখিত ১২৪৩ সালের পত্র— ১২০৩ সালে লেখা পত্রের উল্লেখ ৪৮৯ ধৈর্য ধূর্যে স্থৈর্য বাঁধা—তথাহি শুদ্ধাগ্নিনাশং ইত্যাদি উদ্ধৃতিযোগে লিখিত পত্র ৪৯১ 'আম্রে কোকিলা ডাকে কদম্বে ময়ূর'— 'রাধিকা মুখারবিন্দ কোটী ইন্দু লাজে' ইত্যাদি উদ্ধৃতিযুক্ত কড়চা ৫১১ প্রবাসীকে লিখিত আক্ষেপ-পত্র ৫২০ প্রহেলিকা-পত্র—সদানন্দ আনন্দ পাইয়া যার দল ৫২৭ প্রহেলিকা-পত্র—হেদে রে পরাণ নিল জিয়া ৫৩৬ 'ভানু জলেষু পদ্ম' ইত্যাদি উদ্ধৃতিযুক্ত প্রণয়-পত্র ৫৬৬ আদর্শ প্রণয়পত্র— লেখিকা মালতীমঞ্জরী দেবী—সন ১২৫৭ সাল

॥ ঘরোয়া খুঁটিনাটি ॥

(সন ১১৩৯-১২৮২ : খৃ ১৭৩২-১৮৭৫)

৩২ গায়ের বস্ত্র—জামদানি—দোলাই—চন্দ্রকোণা ধুতি প্রেরণের প্রসঙ্গ ৩৩ খরচের অপ্রতুল— সুবিধামত একশত টাকা পাঠাইবার অনুরোধ ৩৪ খরচের অসঙ্গতি—চার পাঁচ শত টাকা পাঠাইবার কথা—যজ্ঞোপবীতের দিবস নির্ণয় ৩৫ খরচের অসঙ্গতি আর কর্মের অপ্রতুল—সাতান্ন টাকা প্রেরণ ৩৬ শ্রীশ্রী৺সেবার কারণ প্রবাস যাইবার জন্য পূজারী ব্রাহ্মণের মাহিনা দুই টাকা ৩৭ ধান্য আদায় প্রসঙ্গ—তমসুকে টাকা ঋণ—গৃহছাদন—লবণ কলাই বড়ি গুড় আদান প্রদান—কাষ্ঠ কাটার জন্য ছুতার—দালান পুকুরের তেঁতুলগাছ কাটানোর প্রশ্ন—ব্যামহ— মাতব্বরিতে তমসুক-লেখা ৩৮ দক্ষিণদেশে প্রবাস গমন—খরচের অনুসার—লবণ তৈলের খরচ চালান ভার—মূলা বেগুন অনায়াসে মিলিলে কিঞ্চিৎ পাঠাইবার অনুরোধ— বাঁশের বরাত প্রসঙ্গ—জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালঙ্কারকে লিখিত পত্র ৩৯ কালেক্টরীতে ষ্ট্যাম্পের দারোগাপদ-প্রাপ্তি— জামীনদার ফৌত—জামিন প্রসঙ্গ ৪০ সংস্কৃতমূলক সাধুভাষায় লিখিত আশীর্বাদ পত্র—অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ৪১ হিসাব—সন ১২১৮ সাল—তার ও হাঁসুলি বন্ধকের টাকা জমা—বেগারের দফায় সরকারে প্রাপ্তি—প্রণামী প্রাপ্তি—শাটী—দাসী চতুর্দ্ধরীণ সই কন্যা—পেঁয়াজ কাহার—মশালের তৈল ইত্যাদির উল্লেখ ৪২ তণ্ডুল আরকাট তিন তঙ্কার— পৌণে এক খুচি জেয়াদা—ধুতি চাদর ও আম্রের প্রসঙ্গ ৪৩ পুরশ্চরণ—রায়ানের দক্ষিণেশ্বর শিবের নিকটে—দুই ওক্ত কাছারি—ক্ষয়ব্যাজে কর্তারা বেজার ৪৪ মুর্শিদাবাদের শুভকর্ম সমাপন—বিদায়-আদায়ের মতান্তর—শ্রীশ্রী৺ ব্যবহার দুই তঙ্কা—জমির খাজানা—শাশুড়ী অসুস্থ ৪৫ ভূর্জপত্র ও কুমকুম প্রেরণ প্রসঙ্গ—হামেসা লিখন পঠন—চর্মরোগ ৪৬ বৈবাহিকের কন্যা আনিতে মনস্থ—শুক্র পশ্চিমে— আষাঢ় মাসে দিননিরূপণ— শ্যামসুন্দর বিদ্যালঙ্কারকে লিখিত ৪৭ কলাপাত ও রম্ভা প্রেরণ—

পৌঁছান ৭০ তণ্ডুল দুই সলি—বহনের ভাড়া দুই সের—টিকা দেওয়ায় ছেলেরা কাহিল ৭১ বামাময়ীকে ফৈজত ও মারধর করিয়া বাড়ী হইতে বহিষ্করণ—কিনারা করার বিশেষ অনুরোধ ৭২ হিসাব—বার্ষিক আদায় জমাখরচ—হুকা তামাক বিলাতী কাপড় ইত্যাদির ৭৩ হিসাব—কাপড় চাউল খড় তৈল সন্দেশ খইল লাউ ডাঁটা মাউতগুড়, বেজ চাকতি সন্দেশ আরাকর-বিদায় ইত্যাদির ৭৪ করারনামা-পত্র—দোকান ঘর ভগ্ন হওয়ায় নূতন তৈয়ারি করিবার আবশ্যকতায় ৭৫ কেচুন্নার মুখোপাধ্যায়দের কালাশৌচ না মানা—পূজা করাইবার অনুরোধ ৭৬ ত্রিবোলের হাটখরচ—সিদ্ধি ব্যঞ্জন্যা সিঁদুর-চুপড়ি কটরা ফাগু চুয়া নথ ইত্যাদির ৭৭ রামশাল চাউল তিন রকমের তিন মাপ তিন সলি পনের সের প্রেরণ ৭৮ কোষ্ঠীলেখন—খাজনা দেওয়া—গরুর মৃত্যু—তদারকের অভাবে—বিশেষ তদারকে গৃহস্থালির রক্ষা—বৃষ্টি হওয়ার প্রশ্ন ৭৯ বাতে শয্যাগত—জীবনশঙ্কা—লেখিকা স্ত্রীলোক বিবেচনায় শীঘ্র আসার অনুরোধ—পোস্ত—বিনামা এক জোড় আনার অনুরোধ ৮০ সংক্রান্তিতে ফলের সমাধানের অভাব—পাঁচ ছটাক গব্য ঘৃতের প্রয়োজন—বৃষ্টি হইয়াছে—গরু নাই—বসন্তের আক্রমণ চলিতেছে—বন তরফের গরু পঁচিশ টাকা জোড়া—টাকার চালান ৮১ বধূমাতার সাধায়—ব্রাহ্মণভোজন—নিমন্ত্রণ—পরিজন কাহিল ৮২ মধ্যম কর্তা মহাশয়ের পরিত্যক্ত বস্তুর তালিকা—পিত্তলের কটকী ঘটী রেকাব জামবাটী দেওয়ানী বাটী বহুগুনা বালেশ্বরী আবখোরা ইত্যাদি—তৈজসাদি দানসামগ্রীর তালিকা—জলেশ্বরের ধুতি—গোয়া ছাতা—কুশাসন ইত্যাদি ৮৩ হিসাব জমাখরচ—ব্রতপ্রতিষ্ঠা—ধান্যবিক্রয়াদি—পাঁক্রিটের লোকবিদায়—তুলা—সংক্রান্তির হাটখরচ—সরিষা—ব্রতের দক্ষিণা—মাহিনা—তৈল লবণ ইত্যাদির ৮৪ ভায়াজীর অসুখ—বাবুজীর তলপ—অতি শীঘ্র বাটী আসিতে অনুরোধ—আসিলে গণ্ডগোল হয়—দিদিঠাকুরানী কাহিল ৮৫ মোকদ্দমা রুবকারের কল্পনা—ভাগিনাকে বর্ধমান প্রেরণ—কিছুদিন নিকটে রাখিয়া জ্ঞানী করিয়া দিবার অনুরোধ ৮৬ চুনী—নোলোকের মুক্তা—নোত গড়ানো—দরযাচাই ৮৭ বাদ্যকরদিগকে মদিরা দেওয়ার ও চোটি না কাটার অনুরোধ ৮৮ একজায় জিনিষ—বড়ঘরের মাচায় থাকে—ঘড়া গাড়ু থাল—ইন্দুমনির জল খাইবার জন্য একটি ছোট ঘড়া লওয়া ৮৯ অসময়ে ধান্যবিক্রয় বিষয়—ধান্য অর্ধেক ফুটিয়া নষ্ট হওয়া—নগদ ধান্য বিক্রয়ে ক্রেতার অভাব—মন্দিরের আরম্ভ—খরচের টাকার অপ্রতুল হওয়ায় অসুবিধা—ঈশ্বর ভরসা—বার্ষিক সিকা এক টাকা প্রেরণ—ধান্যের অজন্মা—পূর্ব পীড়ায় কষ্ট—নিবৃত্ত না হওয়া ১৬২ আম্র প্রেরণ—বহন ব্যক্তিকে বিবেচনা করার অনুরোধ ১৯০ শুভ গৃহারম্ভ ৪৭৯ সাধুরীতিতে আশীর্বাদ পত্র ৪৮৪ হরজাই হিসাব ৪৮৫ ঘরোয়া জিনিষ প্রেরণ ৪৯০ সুরুলের রমানন্দ সরকারের পত্র ৪৯২ সেরান্দী ও করকনা গমন ৪৯৫ তসর ধুতি ও বোনা মশারী চাহিয়া পত্র—টাকার কারণ উৎপাত ৪৯৭ ধান্য কাষ্ঠাদির হিসাব—

রাখার অনুরোধ ৫৭৮ শরীর অপ্রতুল—যাওয়া অসম্ভব— কর্তব্যবোধে পাঁচ তঙ্কা দিয়া লোক বিদায়ের কথা—পরে গিয়া সকল সমাধার আশ্বাস—ইহাতে সন্দেহ না করার অনুরোধ— ১০৬৯ মল্লসাল ৬২৩ পরিজন নির্বাহ করা ভার—তৈজসাদি খরিদ ৬২৪ ঘৃত লইয়া জায়গা ফিরাইয়া দিতে ঠাকুরপুত্রকে অনুরোধ— পাপোস প্রেরণ— পায়ের মাপে মুচিকে দিয়া কাটাইয়া লওয়া— জিনিষ জায়—মিষ্টান্ন

॥ ব্যাধি ও উৎপাত ॥

(সন ১১৪৮ (শক ১৬৬৩)-১২৭২ : খৃ ১৭৪১-১৮৬৫)

৯০ নানা বিভ্রাট—আঙ্গুলের বেদনায় কাহিল— দেবতার ঝড়-জলে ঘরভাঙ্গা ৯১ বিঘ্ন কাটাইয়া গুরুপুত্রের বিবাহ— পদে ক্ষত— ঔষধের বহির নকল ঠাকুরের নিকট আছে—ক্ষতর মহৌষধ কাল্যানতার পাতা— তন্ত্রাষা কবিতা— শুভবিবাহ— ক্ষয়রোগে পর পর কাহিলী বৃদ্ধি—বাছে রাখাইয়া চিকিৎসা— ধারা ভালো নহে ৯২ ডাকাতি—খুটিনাটি ৯৩ মহাপীড়ায় কষ্ট—ভাল চিকিৎসক প্রেরণের অনুরোধ ৯৪ সেজ বউয়ের সাধ্যপীড়া— তৈল ঔষধ শীঘ্র করার আদেশ—সাত টাকার ধান্য বিক্রয়ে দুই টাকা পাইলে ব্যবস্থা— নিরুপায়ে দৈবনির্ভরতা ৯৫ আরোগ্যলাভে স্বাস্থ্যসম্ভোগ— ঘড়ির জেব— প্রণামী এক টাকা প্রেরণ—পত্রবাহকের পথখরচ প্রদান ৯৬ বাটীর সকলের পীড়া— লক্ষ্মীর এ-যাত্রা রক্ষা পাওয়া ভার—কৃষ্ণমোহনের পীড়া কঠিন নয়—দুই এক বার ঘাটে যাওয়া—কর্পূরাদি মোদক গনতি নয় গণ্ডা প্রেরণ—অনুপান বাসি জল আর চিনি দেড় পোয়া— ত্রিশূলী পয়সা প্রেরণ ৯৭ গোয়ালন্দের ঔষধ চতুর্মুখ প্রেরণ— মধুতে ঘষিয়া পিপ্‌পলী-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবনের নির্দেশ ৯৮ স্ত্রীর পীড়া— ৺ভরসা—খোসামদ করিয়া অবস্থান ৯৯ আশীর্বাদে পীড়া শান্তি—জর ইাম পোড়া ঘা হইতে আরোগ্যলাভ ১০০ পালাজ্বর—কাস— কালীঘাটে মানতপূজা— লাট-সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ—লাভ ক্ষতি সম্মানহানি প্রাণব্যাঘাতাদি নানা অনিষ্ট—৺শান্তিকর্তা— নিজ নিজ মঙ্গলের জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিয়া সাবধানে থাকার উপদেশ— কালনা হইতে নৌকায় চুণ আনাইয়া কুঠরী সারাইবার নির্দেশ ১০১ বস্ত্র পাঠাইবার কথা—ভুয়া লাগার জেঠাইমায়ের হস্তে বেদনা— বালকদের পাঠে অমনোযোগ— পৈতা পাঠানোর কথা— পৌষমাসে কর্জ শোধ ১০২ শেষরাত্রে পাইকের তামাক খাওয়ার সুযোগে চৌকি হইতে চোরের পলায়ন—রায় মহাশয় আসিলে বিশেষ উত্তেজনা হইবে ১০৩ দাদামহাশএর পীড়া— গঙ্গাতীরস্থ করানো উচিত—উর্ধানপুর পর্যন্ত যাওয়ার ভাড়া স্থির করিয়া চারজন বেহারা পাঠাইতে অনুরোধ ১০৪ বর্গী সম্পর্কে নূতন ছড়া ১০৫ বর্গীর সংবাদ চৈত্র মাসের আগে

॥ শ্রাদ্ধ ॥

(সন ১১৬০-১২৮০ : খৃ ১৭৫৩-১৮৭৩)

১১৫ দিঘাপতিয়া-রাজের মাতৃশ্রাদ্ধে সংস্কৃতে লিখিত নিমন্ত্রণপত্র ১১৬ হেতমপুর-রাজের মাতৃশ্রাদ্ধে সংস্কৃত নিমন্ত্রণপত্র ১১৭ ঠাকুর মহাশয়ের সাম্বৎসরিক কৃত্য ১১৮ পিতাঠাকুরের শ্রাদ্ধে পুরোহিত ব্রাহ্মণ-প্রসঙ্গ ১১৯ শ্রাদ্ধের জলদান ১২০ ক্রিয়ায় খেদমতে খরচ প্রেরণ—চালান মাফিক দাখিল করিয়া লইতে অনুরোধ—দানের দফা প্রেরণ ১২১ খেউর—শ্রাদ্ধ—নিমন্ত্রণপত্র ১২২ মাতাঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধের আয় ১২৩ মাতাঠাকুরাণীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ-ভোজনে নিমন্ত্রণপত্র—বঙ্গভূষণ ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে—আলতি আনার অনুরোধ ১২৪ মাতৃশ্রাদ্ধে ব্যবহার করিতে না আসায়— খাটেতুলা বস্ত্র না দেওয়ায়— বৃদ্ধ ও দরিদ্র আত্মীয়ের দুঃখ ১২৮ শ্রাদ্ধে নৌকাবন্ধ ও পদ্মবন্ধ কবিতা রচনা ১৯৩ শ্রাদ্ধে সংস্কৃত নিমন্ত্রণপত্র ৪৯৭ পিতামহীর শ্রাদ্ধ—সন ১১৬০ সাল ৫০৯ শ্রাদ্ধে বিদায়ী জিনিষ-আয় ৫৩১ শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণভোজন জন্য চাল খরিদ ৫৫১ মিষ্টার জন পিয়ার্স সাহেবের কবরে কীর্তি—সন ১১৯৫ সাল ৫৫৯ পিতার সপিণ্ডীকরণ ৫৬০ সম্পত্তি দখলের জন্য পিণ্ডে কর্তা নিরূপণ ৫৮৩ ঠাকুরের কৃত্যে মধ্যাহ্নে জলপানের নিমন্ত্রণ ৫৮৪ কর্তার—কর্তাঠাকুরাণীর একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে শুভাগমন করিয়া ক্রিয়া সম্পাদনের নিমন্ত্রণপত্র ৫৮৫ ঠাকুরাণীর আদ্যকৃত্যে উপস্থিতির নিমন্ত্রণ

শিক্ষা

(সন ১১৩৭-১২৮৯ : খৃ ১৭৩০-১৮৮২)

১২৫ পৈতৃক পুস্তকের অংশ—অষ্ট খণ্ড পুস্তকের পুস্পমূল্য ৩৩ তঙ্কা ১২৬ টোলের ছাত্র দুই জন—একটি বঙ্গদেশীয় ১২৭ ব্যাকরণ লেখার আরম্ভ ১২৮ রাইপুরের সুধাকৃষ্ণ সিংহের পিতৃশ্রাদ্ধে নাপুরের জগদ্দুর্লভ ন্যায়বাগীশ কর্তৃক নৌকাবন্ধ ও পদ্মবন্ধ কবিতা রচনা ১২৯ স্কুলে কথকতার জমাখরচ ১৩০ দৈব উৎপাত নিবৃত্ত হইলে উত্তম দিবসে কথকতার আরম্ভ ১৩১ অলঙ্কার পুঁথি-প্রেরণ ১৩২ ঢাকা হইতে পরীক্ষার কাগজ আনার প্রসঙ্গ—তিথি উদ্বাহ সমাপনান্তে প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব আরম্ভ— দুর্গোৎসবতত্ত্ব অধ্যয়ন ১৩৩ পত্র লিখিবার পদ্ধতি ১৩৪ বনপর্ব লিখন ১৩৫ রামায়ণ কীর্তন পাঠ— লঙ্কাকাণ্ড পুঁথির অপ্রাপ্তি ১৩৬ গৌরবামণি বৈষ্ণবীকে ভাগবতচূর্ণককথা দিবার অনুরোধ— ছড়া সম্পূর্ণ পাঠাইবার কথা— অর্জুন মিশ্রের চূর্ণক অগ্রাহ্য ১৩৭ অধ্যাপক নিমন্ত্রণের হিসাব তালিকা—গুরুর ঠাকুরবাটী হইতে ১৩৮ পত্র লিখনের পাঠাপাঠ ১৩৯ পৈতৃক পুস্তকের হিসাব তালিকা

১৪০ পুস্তকের হিসাব— ১১৬৪ সাল ১৪১ পুঁথিলেখার আরম্ভ ১৪২ বাঙগ্না পুস্তকের তালিকা ১৪৩ দ্বিতীয় কথক আসার সংবাদ ১৪৪ পুস্তক খরিদ বিক্রয়—মৃতজনের পুঁথি বলিয়া লইতে নিষেধ ১৪৫ ভাগবতের পুঁথি সম্পর্কে একরার-পত্র ১৪৬ ছাত্রদিগকে বিদ্যা অধ্যয়ন করাইবার প্রশ্ন—সন ১২৭১ সাল ১৪৭ মুসলমানের প্রকরণ—খত লিখিবার সেরেস্তা ১৪৮ গ্রাম লিখিবার ধারা—পত্রলিখন-পদ্ধতি ১৪৯ গুরুশিষ্য ও আত্মীয়বর্গকে পত্র লিখিবার ধারা ১৫০ জ্ঞানকৌমুদী গ্রন্থোদ্ধৃত পত্রলিখন-পদ্ধতি ১৫১ শেওয়ায় জয়সিংহ মহারাজের সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্যের লিখিত স্বকীয়া-পরকীয়া বাদ সম্পর্কে ইস্তফা-পত্র ও জয়পত্র—রাধামোহন ঠাকুরের নিকট লিখিত—১১৩৭-৩৮ সাল ১৫২ ন্যায়শাস্ত্রের ছাত্রগণের নাম ১৫৩ কলিকাতায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা লিখন পঠন ১৫৪ প্রহেলিকা-পত্র ১৫৫ পুঁথিলেখা বিষয়ে বরাহভূমের রাজা ব্রজকিশোর সিংহ দর্পনাহা দেবের পত্র ১৫৬ চৌপাড়ি পরিদর্শন সম্পর্কে পত্র ১৫৭ বর্ধমানের রাজা প্রতাপচন্দ্র রায়কে লিখিত অম্বিকা গ্রামের রামলোচন দেবশর্মার আরজ-পত্র—সন ১২৪৩ সাল— চৌপাড়ির তত্ত্বাবধান নিমিত্ত ১৫৮ চালান পুস্তকের ফর্দ ১৫৯ সাতগাছিয়ার নূতন স্কুলঘর তৈয়ারীর জমাখরচের হিসাব ১৬০ পুঁথির তালিকা ১৬১ পুস্তকের হিসাব তালিকা ৪৯৬ চৌপাড়ি নির্মাণের জন্য জমি প্রার্থনায় গ্রহযজ্ঞ দক্ষিণান্তে নিবেদন—ছাত্রদের কষ্ট নিবারণের জন্য টোলঘর করান—জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালঙ্কারের লিখিত ৫০২ পাঠক কথক সদস্য ধারক শ্রোতা পুস্তকপূজা পুষ্পমাল্য ইত্যাদি জন্য নগদ জিনিষের হিসাব— ১৭০৮ শকাব্দ ৫৫৫ টোল গোয়াল প্রস্তুত হইবার সংবাদ—ছাত্র আট জন—পাঠ ব্যাপ্তিপঞ্চক পক্ষতা —সামান্য নিরুক্তি ভট্টাচার্য—মাথুটী ৫৮৬ পড়ুয়ার তালিকা— গুরুমহাশয়ের ঘরোয়া জমা-খরচ—১১৯৮ সাল ৫৮৭ ফলালিখন—সংকীর্ণবর্গ পাঠ ৫৮৮ নবদ্বীপ শান্তিপুর কুমারহট্ট ত্রিবেণী ইত্যাদি স্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের তালিকা—১২৩৫ সাল ৬২৬ ছেলেদের লেখাপড়ার তদ্বির ৬২৮ সর্বদা লেখাপড়া করার আদেশ

ধর্ম

(সন ১১৫৪ (শক ১৬৬৯)-১২৮৭ : খৃ ১৭৪৭-১৮৮০)

১৬২ রাইপুরের বাবুদের বাড়ীতে পুরাণ কথকতা—আম্র প্রেরণ—বাহককে বিবেচনা করিতে অনুরোধ ১৬৩ হোম— পূজার দিন সংক্ষেপ— দুর্গাপ্রতিমার কোটার সাজ—মহিষ ও বাতাবি নেবু খরিদ ১৬৪ দুর্গাপূজার একজায় খরচের হিসাব— সন ১১৬৩ সাল ১৬৫ পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠা— সংক্রান্তিতে দিনস্থির— বচন— পূজার পকার— উপকরণের তালিকা ১৬৬ বুধাষ্টমী ব্রত— মুহূর্ত ভঙ্গ— পূজা প্রধান কিংবা পরিসংখ্যানরূপ ভোজন

ভাষ

(সন ১১২৯-১২৮৫ : খৃ ১৭২২-১৮৭৮)

॥ সামাজিক ॥

(সন ১১২৯-১২৮৫ : খৃ ১৭২২-১৮৭৮)

২২১ পতিত উদ্ধার বিষয়ে পঞ্চগ্রামীর বিচার ২২২ গঙ্গায় স্নান তর্পণ করার সময় গুরুর জ্ঞাতির কথিত আদেশ বিস্মৃত হওয়ায় প্রায়শ্চিত্তবিধান-প্রার্থনা ২২৩ ধনমনি বেওা ও খুদিরাম সৌ পতিত— একত্র বাস— ধনমনির পরলোকপ্রাপ্তি— সৎকার করার পর শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা প্রার্থনা ২২৪ বজ্রাঘাতে গরু মরিলে প্রায়শ্চিত্ত নাই ২২৫ অল্পবয়স্কা পরবিনী দেবী তাহার মায়ের সহিত ঝগড়া করিয়া বাড়ীর একজন অন্ত্যজ কৃষাণের সঙ্গে স্থানান্তরে গমন করায় পাপস্পর্শের জনরবে সন্দিগ্ধ হইয়া পিতার প্রায়শ্চিত্ত জন্য হকিকত-পত্র ২২৬ রাম-মোহন ঘোষের স্থানান্তরে থাকার জন্য নীচ জনরব প্রযুক্ত ধর্মসম্মত ব্যবস্থা প্রার্থনা করিয়া লিখিত হকিকত ২২৭ হিন্দু স্ত্রীর যবনায় স্বীকার—পতিত পিতার সওয়ালবন্ধ-পত্র— ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রদত্ত ভাষ ২২৮ ভ্রাতৃবধূর ভৌতিক ব্যাপারে প্রমাদমৃত্যু—শাস্ত্রব্যবস্থা ২২৯ স্ত্রী বাড়ী হইতে পুনঃপুনঃ বাহির হইয়া যাওয়ায় তাহাকে পরিত্যাগের জন্য স্বামীর শাস্ত্রব্যবস্থা-প্রার্থনা— সভাপণ্ডিত পরামানিকগণের নিকট লিখিত পত্র ২৩০ দণ্ডাঘাতে বকনা বাছুরের মৃত্যুর জন্য হকিকত-পত্র ২৩১ গোয়ালে বন্ধনদশায় পীড়িত গরুর মৃত্যুর জন্য শাস্ত্রব্যবস্থা-প্রার্থনা ২৩২ গোয়ালে বন্ধনদশায় গরুর মৃত্যুতে হকিকত-পত্র ২৩৩ কুকুরের কামড়ে বকনা বাছুরের মৃত্যুর জন্য শাস্ত্রানুসারে দারিদ্র্য মতে প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা-প্রার্থনা ২৩৪ ছালা বহনের সময় গরুর পায়ে ঠেকানোয় ঘা ও পোকা হইয়া গরুর মৃত্যু সম্পর্কে হকিকত-পত্র —সন ১১২৯ সাল ২৩৫ পুকুরের শিউলী বনে গরু দকে পড়িয়া জখম—আগড়ে করিয়া আনিয়া দাগাইয়া দেওয়া—তাখিত সত্ত্বেও মৃত্যু ২৩৬ মুসলমানকে বিক্রীত দামড়া গরু নষ্ট করায় প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা-প্রার্থনা ২৩৭ জলে পড়িয়া গরুর মৃত্যু হওয়ায় মালিকের প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা ২৩৮ বৈষয়িক ভাষ—সন ১২০০ সাল ২৩৯ গোলাল ভাঙ্গিয়া গরুর মৃত্যু হওয়ায় কাছারীতে ষোল আনার উপস্থিতিতে হকিকত ২৪০ বিধবা ভ্রাতৃবধূর সহিত দুষ্ট জনরব— তদারকে প্রমাণ না হওয়া—বিধবা বধূকে আপন ঘর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া— জনরবদুষ্ট বাক্যের প্রায়শ্চিত্তবিধি প্রার্থনা করিয়া লিখিত হকিকত-পত্র ২৪১ বিধবা কন্যা জয়মনির সনাতন মোদকের সহিত জনরব—সনাতনের বাটীতে আহার ব্যবহার বেআন্দাজ করায় জয়মনিকে ত্যাগ করিয়া নিজের প্রায়শ্চিত্ত করিতে সভাপণ্ডিতের নিকট পিতার হকিকত-পত্র

২৪২ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাপত্র : ব্যবস্থাপক মহাশয় পত্র দেওয়ায় পুরোহিতের ক্রিয়া করা ও ফলহার ২৪৩ অজ্ঞাতসারে বাড়ী হইতে গিয়া নীচ জনরব হওয়ায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উত্থিত হইবার জন্ম ব্যবস্থা প্রার্থনা ২৪৪ বামুন মাতালের মদিরা খাওয়া— স্বর্ণকারের অন্ন গ্রহণ— গুরুশিষ্যে প্রতিজ্ঞা— গুরুদণ্ডী রাজদণ্ডী ও জাতিদণ্ডী কবুল করিয়া লিখিত একরার-পত্র ২৪৫ বেণীমাধব মণ্ডলের মূচানী অপবাদ— পঞ্চগ্রামী ও সপ্তগ্রামী ব্রাহ্মণ ঠাকুর ও স্বজাতি আদি থাকিয়া বিচারে রহিত— পঞ্চগ্রামী ব্রাহ্মণ ও বেদের অমান্ত করিয়া পাপী ব্যক্তির বাটীতে ব্রাহ্মণদের ফলাহার—এই ব্রাহ্মণদের সহিত আহার ব্যবহার করার বিষয় বিবেচনা ২৪৬ ভাবপত্র—অকালে শ্রীশ্রী৺গয়া গমনের প্রতিবন্ধক সম্পর্কে শাস্ত্রব্যবস্থা-প্রার্থনা—ব্যবস্থাপত্র ২৪৭ ভগ্নী যুগী-সংসর্গ করিয়া কাছ হইতে যাওয়ায় হকিকত লিখিয়া ব্যবস্থাপত্র প্রার্থনা ২৪৮ আসাত সংঘটন— সাকী বেওয়ার— নাপিত পুরোহিত গাতমেলা আটক— ভেক লইয়া খাড়ূহস্তে ঘর দুয়ার করার দৃষ্ট প্রমাণ—বৈষ্ণবকে দায়ী না করিয়া ব্যবস্থা দিতে সভাপণ্ডিত মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হকিকত-পত্র ২৪৯ ধানের জমিতে ইন্দুরের কামড়ে অসুস্থতা— আঙুল লোপ পাওয়া—কুষ্ঠব্যাধি অনুমানে প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য শাস্ত্রব্যবস্থা-প্রার্থনা ২৫০ জ্যেষ্ঠ পুত্র জেরজরে কাবেল হওয়ায় হকিকত-পত্র ২৫১ এঁড়ে গরু খরিদের বায়না দিয়া বাতিল করার জন্ম হকিকত-পত্র ২৫২ মুসলমানকে বিক্রীত গাভী হত্যা করার জন্ম পাপের প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা-প্রার্থনা ২৫৩ মুগুর ফেকায় গরুর মৃত্যু হওয়ায় হকিকত-পত্র ২৫৪ অপালনে দামড়া গরুর মৃত্যু হওয়ায় তৈলবট দিয়া প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা-প্রার্থনা ২৫৫ রামকান্ত নন্দীর গলা খুস খুস করে—কাসের পীড়ার জন্ম প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা চাহিয়া নিবেদন-পত্র ২৫৬ বৃদ্ধ অনড্বান বন্ধনে মরার জন্ম প্রায়শ্চিত্তবিধান-প্রার্থনা ২৫৭ শাশুড়ীর অম্বলশূল— বাইসোত জন্ম দরিদ্রমতে প্রায়শ্চিত্তবিধান-প্রার্থনা ২৫৮ গুহ্যদ্বারে ঘা—শরীরে ধবল—নাভিস্থানে ঘা— প্রায়শ্চিত্তবিধান প্রার্থনা করিয়া লিখিত হকিকত-পত্র ২৫৯ বন্ধন অবস্থায় গরুর মৃত্যু হওয়ায় ব্যবস্থা প্রার্থনা— পাণ্ডলি প্রেরণ ২৬০ পিতৃমরণাশৌচ ত্রিরাত্রি—জ্ঞাতি মরণে দশ রাত্রি—জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রের প্রায়শ্চিত্তাধিকারাদি বিষয়ক ৫৯৫ বাড়ীর একজন স্ত্রীলোক 'গো' শব্দ উচ্চারণ করায় পাপের প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা-প্রার্থনা ৫৯৬ মাতার কলঙ্কে পতিত পুত্রের প্রায়শ্চিত্তব্যবস্থা প্রার্থনা করিয়া হকিকত-পত্র ৫৯৭ স্বর্ণঘরের আকারে বিবাহব্যবস্থা বিষয়ক ভাব ৫৯৮ দোগা-গলায় গরুর মৃত্যুতে জবানবন্দী ও ভাব-প্রার্থনা ৫৯৯ ঢেলার আঘাতে রক্ত বমনে বকনা গরুর মৃত্যু হওয়ায় গ্রাম ষোল আনার উপস্থিতিতে শাস্ত্রব্যবস্থা প্রার্থনা করিয়া লিখিত হকিকত-পত্র ৬০০ বেলা আড়াই প্রহরেও গাভী দোহন না হওয়ায় স্ত্রীর উপর রাগ করিয়া বাছুরকে আঘাত করায় বাছুরের অপঘাত মৃত্যুতে দারিদ্র্যমতে কৃষকের প্রায়শ্চিত্তবিধান-প্রার্থনা

॥ বৈষয়িক ॥

(সন ১১৮৯-১২৭৩ : খৃ ১৭৮২-১৮৬৬)

২৩৮ ঐশ্বর্যরহিত পিতার পুত্রের স্বোপার্জিত দৌলতে কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র হরিশ-নায়েক হইয়া অংশ দাবী করায় শাস্ত্রব্যবস্থা-প্রার্থনা ২৬১ পিতামহ-ভ্রাতৃ-সন্তানেরা ধনে বিবাদী হওয়ায় হকিকত— শাস্ত্রব্যবস্থা ২৬২ পিতৃবৈমাত্রেয় ভ্রাতৃপৌত্রান্ত স্থাবরাদি ধনে পিতামহদৌহিত্র ভাগিনেয়ের অধিকার—ভগিনী প্রভৃতির নয়—হকিকত-পত্র— শাস্ত্রব্যবস্থা ২৬৩ প্রপৌত্র পর্যন্ত রহিত মৃতের স্থাবরাদি ধনে পত্নীর অধিকার— তাহার ভ্রাতা ভ্রাতৃপত্নী বা ভ্রাতৃদুহিতার অনধিকার বিষয়ে প্রশ্ন-পত্র ও শাস্ত্রব্যবস্থা ২৬৪ জাতাধিকারে পত্নী পতির উপকার বিনা স্থাবরাদি ধন দান বিক্রয়ে অনধিকারী— দায়ভাগাদি মতে শাস্ত্রব্যবস্থা ২৬৫ অর্জিত স্থাবর অস্থাবর সাধারণ ধন ব্যাপারে ভ্রাতৃগণের একজনের মৃত্যুতে মৃতের পুত্র পিতৃব্যদের সহিত সমান অংশের অধিকারী— গৌড়দেশ প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রব্যবস্থা ২৬৬ প্রায়শ্চিত্তবিমুখ পতিত পুত্র পিতৃ ও মাতৃধনে অনধিকারী— পরামর্শ ২৬৭ পৈতৃক স্থাবরাদি ধনে মাতামহীর মৃত্যুতে প্রত্যেক দৌহিত্রের সমান অধিকার— পিতামহ ধনের পিতৃক্রমে পৌত্রের অধিকার— মাতৃক্রমে দৌহিত্র অনধিকারী—শাস্ত্র-আজ্ঞা ২৬৮ যজমান ও বৃত্তিবিরোধের সনন্দ-পত্র— সন ১১৮৯ সাল ২৬৯ বৃত্তির ধান্য ও টাকার অংশকরণ ২৭০ রমাপ্রসাদ রায় সদর উকিলকে লিখিত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পৃথক ভাগ-দখল সম্পর্কে শাস্ত্র-আজ্ঞা প্রার্থনা ২৭১ পিতৃব্যদের ও মৃতা ভ্রাতষ্পুত্রীর স্বামীর মধ্যে ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্পত্তিবিভাগ-পত্র ২৭২ ভদ্রাসন বাটীর বিভাগ সম্পর্কিত একরার ২৭৩ মূল ধনীর প্রথম পক্ষের পৌত্রী— দ্বিতীয় পক্ষের কন্যা ও এক পুত্রবধূর মধ্যে বিষয়বণ্টন ২৭৪ এক গাছ ভারা ফিরাফিরি হইলে জরিমানা ২৭৫ পুত্রদের মধ্যে স্বেচ্ছাকৃত বিভক্ত ধনে নিজের স্বত্বাভাব হেতু পিতা পরে তাহার অন্যথা করিতে অসমর্থ ২৭৬ ছয় সেবার দরুণ জমির স্বত্ব ও বৃত্তিবিরোধক হকিকত-পত্র ২৭৭ বর্ধমানের দেওয়ানী আদালতের ভট্টাচার্যের রায় : পতি হইতে প্রাপ্ত স্থাবরাদি সম্পত্তি পত্নী গুরুকে দান করিলে তাহাতে গুরুরই অধিকার— পত্নীর শাশুড়ী সে দান প্রতিগ্রহ করিতে অনধিকারী ২৭৮ ধনীর মাতুল ভগ্নী কিংবা জ্ঞাতি ইহাদের মধ্যে ধনাধিকারী কে হইতে পারে ২৭৯ এক ব্যক্তির তিন কন্যা— জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের পর পিতার মৃত্যু— দুই অবিবাহিতা কন্যা ও ধনীর স্ত্রী জীবিত— অবিবাহিতা কন্যাদ্বয়ের মধ্যে এক কন্যার বিবাহের পর পত্নীর মৃত্যু—কনিষ্ঠা অবিবাহিতা— অবিবাহিতা কন্যাই মাতাপিতার মৃত্যুর পর সমস্ত ধনের অধিকারী কিনা—অবিবাহিতা কনিষ্ঠা ধনাধিকারী হইলে তাহার বিবাহের পর বিবাহ খরচ বাদে সম্পত্তি তিন অংশ হইবে

অথবা সমস্ত সম্পত্তি কনিষ্ঠা পাইবে ২৮০ হকিকত-পত্র : পিতামহেরা তিন সহোদর— এক ভাই পিতামহের কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পৃথক হইয়াছিলেন— টাকা গহনা ও তৈজসাদি অবিভক্ত ছিল— পিতামহের কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী নিঃসন্তান—বৃত্তির অংশ হইতে বেদখল— পরস্পর বিবাদ হেতু হকিকত লিখিয়া শাস্ত্রব্যবস্থা-প্রার্থনা ৩৫৭ নবদ্বীপ হইতে ব্যবস্থা আনয়ন—হিস্তাভাগ—রায়াজি চিঠি লিখন ৩৯৮ হিস্তা মাফিক যজমান বিভাগ করিয়া দিতে তর্কবাগীশ ভট্টাচার্যকে লিখিত অবিচল-পত্র ৬০১ হকিকত পত্র : প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের সন্তানগণ এক অন্নে এক কারবারে থাকিয়া এক পুত্রের গঙ্গাপ্রাপ্তি— মৃত পুত্রের কন্যার বিবাহ— ভ্রাতৃবিরোধ— শাস্ত্রানুসারে অংশ ধার্য করিতে ব্যবস্থা-প্রার্থনা।

ব্যবসায়-বাণিজ্য

(সন ১১০১-১২৮১ : খৃ ১৬৯৪-১৮৭৪)

॥ ব্যবসায়-বাণিজ্য ॥

(সন ১১০১-১২৬০ : খৃ ১৬৯৪-১৮৫৩)

৯৬ ত্রিশূলী পয়সা প্রেরণ ২৮১ মুনি সাহেবের শস্তের প্রয়োজন—কাষ্ঠগোলায় আমদানী—সোকর ও টুন কাষ্ঠের অনুসন্ধান ২৮২ তালতোড় গ্রামে প্রাপ্ত পারমিট্—তাস আমদানীর জন্য —আকবর ও এলিজাবেথের উল্লেখযুক্ত ২৮৩ ইংরেজের সহিত কাপড়ের ব্যবসায়—[অজয়] নদীতে নৌকাযোগে সত্বর কাটোয়ায় কাপড় পাঠাইবার অনুরোধ—ব্যবসা সম্পর্কে উপদেশ—১১৯৮ সাল ২৮৪ কাঞ্চন থালের ওজন ও দাম ২৮৫ জন চীপ সাহেবের নিকট লিখিত গ্রাম ষোল আনার কাপড় কড়ার-পত্র ২৮৬ আতস কারখানার স্মারকলিপি— ভাগের হিসাব ২৮৭ তালগাছের দাম ২৮৮ চীপ সাহেবের ব্যবসায়ের হিসাবের খাতা—সোনামুখী মোকামের ব্যবসায়ের জমাখরচ ২৮৯ চিনি ও বলদ পোতদার কর্তৃক আটক ২৯৬ শিষ্যবাড়ী বেড়াইয়া সঙ্গতি করিবার বাসনা ৩৫৪ জমা রূপেয়া আমদানী আয়—সন ১১৯০ সাল—দীক্ষা— মঠ প্রতিষ্ঠার দক্ষিণাদি ৪৮৬ বেনেতি মশলার মূল্য— ১১৭২ সাল ৪৮৭ শিষ্যবাটীর আদায়ের জমাখরচ ৪৯৪ শিষ্যবণ্টননামার তালিকা—১১২৮ সাল ৪৯৮ জমাখরচের হিসাব—কড়ির লেনদেন—১১৬০ সাল ৫০৩ ঐ ৫০৫ কুঠির সাহেবের সংবাদ ৫১০ আতস তৈয়ারীর স্মারকলিপি ৫১১ ধনোপার্জনে বিদেশ গমন ৫১২ সন ১১০১ সালের হিসাব ৫১৪ হিসাব—১৬৭১ শকাব্দের ৫১৯ সন ১০৯৫ মল্ল সালের একরার-পত্র— শিষ্য সেবকের হিস্তা ৫২৩

বেতনের টাকার হিসাব— সন ১১৮৩ সাল ৫২৬ কামারশালের টাকা আদায়— বাকী পরিশোধের উপদেশ— লোহা করিতে আদেশ ৫২৮ হিসাব—১১৬০ সালের ৫২৯ নীলকুঠির দাদন— সন ১২৪৮ সাল ৫৩৩ কাপড় বুনানোর হিসাব ৫৪৫ হিসাব— ১৬৬৯ শকাব্দের ৫৫৫ ধানের ওজন ও মূল্য ৫৫৬ জমাখরচের হিসাব— সন ১২৭৬ সাল ৬০২ পড়ার হিসাব— ১১৫৫ সালের— ১১৫২ সালের বকেয়ার ৬১৯ সন ১০৬৩ মগ সালের সেবকের হিসাব-তালিকা ৬২৮ ধান্য খরিদের কথা

॥ কৃষি ॥

(সন ১১৫৩-১২৬৯ : খৃ ১৭৪৬-১৮৬২)

২৯০ মোটা রামশালি ভাজার জন্য চাউল তিন রকমের— মাপ সলি ও সেরের ওজনে প্রেরণ ২৯১ মূলা রোপণ করিবার ইচ্ছা—এক সের ভালো বীজ পাঠাইতে অনুরোধ ১৯২ একজন ক্ষেতমজুরের খাটুনীর হিসাব ২৯৩ ব্রহ্মোত্তর ভূমির ধান্যের হিসাব— সন ১১৫৩ সাল ২৯৪ জমা জমির বিষয় হইতে এড়াইয়া যাওয়া উচিত নহে— নাগমইতা কৃষাণ রাখার জন্য পরামর্শ ২৯৫ দেশে শুখা হইয়া খরচপত্রের অনটন—মাসিক পাঁচ টাকার মুহুরীগিরি লইয়া ঋণ পরিশোধের অক্ষমতা ২৯৬ কাপাস বুনাইবার অনুরোধ—ধানচাষ—মাঠে মাছ ধরিয়া ধান নষ্ট না করা— কৃষকদের পরিধেয় বস্ত্র কিনিয়া দেওয়ার নির্দেশ ২৯৭ মাহিনা দাদনের কড়চা—সন ১১৬৮ সাল ২৯৮ ভাড়াটিয়া বলদে চাউল প্রেরণ— দফাওয়ারী—চাউলের হিসাব ২৯৯ আজমতসাহী পরগণার শীকদার ও তহশীলদারকে লিখিত আজ্ঞাপত্র— পুরুষোত্তম বিদ্যালঙ্কারদের নালিশ অনুসারে—নিজ জোতী জমীর ফসলের ভাগ— অন্যথায় সদর তলবের হার মাফিক কড়ি—অথবা জোতদার জোতিলে ফসলের ভাগ আদায়ের আদেশ—জমি পতিত থাকিলে খাজানা স্থির করিয়া গোমস্তার দস্তখত সমেত প্রেরণ করা— বৃত্তিভোগীকে তলব না করার আদেশ— ১১৭০ সাল ৩০০ জোত-ইস্তফাপত্র— জমা সরবরাহ করিতে না পারায় জমি ইস্তফা— দানীশদিগের জুলুম— জমি আবাদ করাইতে হইলে দানীশমণ্ডলদিগকে তলব করিয়া একবার লিখাইয়া বন্ধ করার জন্য পরামর্শ প্রার্থনা ৪৮৮ মূলার শিকর ও কলামোচা প্রেরণ— ঘরগোহালীর ধান্যের টাকার তাগাদা— আতব চাউল বরাতী— চাউল আনিলে টাকা পাঠাইবার প্রতিশ্রুতি ৪৯৭ ধান্যের দফায় জমাখরচ—সন ১১৬০ সাল ৫২৫ ধান্য বিক্রয়ের হিসাব— সন ১১৬০ সাল ৫২৬ গরু বাছুর সাবধানে রাখিবার আদেশ ৫৩০ ইক্ষুচাষ সম্পর্কে— শণ সম্পর্কে ৫৩১ চাউল খরিদ—বিড়ি কলাই—ইক্ষুচাষ সম্পর্কে ৫৩৪ ভাজান চাউল—ভাজা ধান্য— চাউল— বিবাহ খরচের জন্য ৫৪২ পূড়াতে সঞ্চিত তণ্ডুল

দ্বারা কার্যনির্বাহ—কার্পাস খরিদ ৫৫৫ নিজ চাষের ও ভাগরা ধান্য মড়াইজাত—খোরাক বাদ —চাউলের মূল্য—চাউল সঞ্চয় ৫৫৬ আতব বিক্রয়—বাঁশ বেগুন কলাই ৫৫৭ বৃষ্টি হইলে ভূমি আবাদসাধ্য— নতুবা অসম্ভব ৫৫৮ শস্যাদির অবস্থা মন্দ—জলাভাবে সমস্ত শুখাইয়া যাইতেছে —রবিখন্দও হইবে না— জল ব্যতীত কোন ফসল হয় না ৫৬৯ ধান্য কাটান— দুর্যোগে পালই ছাদন— মোটা চাউল প্রেরণ ৫৮৯ সন ১১৬০ সালে চাউলের মূল্য ৫৯৯ কর্প ফসল ৬০০ মাঠে লাঙ্গল ৬০৩ ব্রহ্মোত্তর জমির ধান্য ৬২৩ ব্রহ্মোত্তর ভূমির ধান্য হয় নাই ৬২৭ ধান্যের জমাখরচ চাওয়া ৬২৮ সাজার জমির ধান্য— আদায় জন্য ধান্য খড় আটক

॥ খাজানা ॥

(সন ১১৬০-১২৮১ : খৃ ১৭৫৩-১৮৭৪)

৩০১ জমিদারী কাছারির শুভ পুণ্যাহ—বেবাক তলবের খাজানা ও দধি মৎস্য মাস্য প্রণামী সমেত পৌঁছানোর আজ্ঞাপত্র ৩০২ আদায়ী খাজানা প্রেরণ—মায় সুদ কিস্তিবন্দির টাকা চালান ৩০৩ আসামী তলব করিয়া দেখা— বাকী হালপত্তন না করিলে সরবরাহ না হওয়া—গড়া কাপড় প্রেরণ—গৌরবাজারের গোমস্তার কাজিয়া—জমির খাজানা প্রসঙ্গে ৩০৪ ব্রহ্মোত্তর বসতবাটীর খাজানা তলব—না দেওয়ায় গ্রামের খান্দার লইয়া বাটী ক্রোক—জজসাহেবের নিকট তদ্বির করিতে দরখাস্ত ৩০৫ তালুকে খাজানা আদায়ের পূর্বে লোকচরিত্র অনুধাবন—ফৌজদারী কাজ সুন্দরমতে নিষ্পন্নকরণ—হরেক দ্রব্য প্রেরণ—পৌত্রের জন্য হাসুলী—খেড়ুয়া তৈয়ার—মীর সাহেব শরাব খাইয়া মত্ত—লোকনিন্দা—চা প্রেরণ—সন ১২১৭ সাল—বিবির বহুৎ বন্দগী জ্ঞাপন ৩০৬ আমদানী খাজানা প্রেরণ—মায় সুদ কিস্তিবন্দির টাকা চালান ৩০৭ আদায়ী খাজানা প্রেরণ—চালান দৃষ্ট দাখিলা দিতে অনুরোধ ৩০৮ রায়তীর ধান্য বাকী—রাজস্বের দফায় ফারখতী— চৌপাটীর আপত্তি নাই—সুদ দরুণ বাকী—খাজানার জন্য অনুযোগ—ইক্ষু পেষণ—উড়িষ্যার সর্ষপ—বোরা ধান্যের নাবি আবাদ—সংসারে অপ্রতুল—গুরুদেব ভরসা—চাকরদের মাহিনা না পাওয়া ৩০৯ নবকুমারের জন্ম-সংবাদে লক্ষ আনন্দ—অর্থের অনটন—ধান চাউলের দর স্থির নহে—খাজানা পরিশোধ বড়ই ভার—ডাহকার—তোড়কোণায় টাকা বহু কষ্টে আদায়—অগ্রহায়ণ মাসে আদায় সম্ভব— আড়িনের ধান্য কর্জ না পাওয়া— সকড়াইয়ের টাকা অনাদায়ী ৩১০ বার্ষিকের টাকা বর্ধমান হইতে দেওয়া—ছাগল পাঠানো ৩১১ গঙ্গারাম-পুরের মজুত খাজানা প্রেরণ—চালান দেখিয়া দাখিলা দিতে অনুরোধ ৩১২ আলাপ সিংহের খাজানা—ধান্যের উপর টাকা—সুদ—ধান্য পৌষমাসে দিবার অঙ্গীকার—ইহার প্রমাণ

গ্রামের কালামাণিক ধর্মঠাকুর ৩১৩ খাজানা চৈত্রে সুমার হওয়া—প্রেরণ—চালান দেখিয়া দাখিলা দিতে অনুরোধ—কিস্তির বাকী চৈত্রের মধ্যে আদায়ের তদ্বির—কন্যার বিবাহ—সন ১১৮৮ সাল ৩১৪ একজায় ভাগীদার বৃত্তি আদায় ৩১৫ রসিদ-পত্র—জিলা বর্দ্ধমানের জেলখানায় বিবাদী তলব—খাজাঞ্চীর তহবিল হইতে টাকা পাইয়া রসিদ প্রদান—বাঙ্গলা সন ১২০৫ সাল ৩১৬ খাজানা প্রেরণ—চালানদিহি করিয়া খাজানা দাখিল করিতে অনুরোধ ৩১৭ জঙ্গলমহলের শিষ্যের জায় ৩১৮ তহবিলের টাকা ঘাটতি—সাহায্য করিতে অনুরোধ—ক্ষতি বিষয়ে ধৃত টাকা আদায় দিতে প্রতিশ্রুতি ৩১৯ ব্রহ্মোত্তর জমির ফসল ছাড়িয়া দিতে—খাজানা দেওয়াইতে আদেশ—মথুর পাল জোত করিবে—সন ১১৯৮ সাল ৩২০ হাওড়া—কোপাপুঞ্জায় আদায়ী জমা ৩২১ পত্তনি তালুকের বয়নামা-পত্র ৩২২ কুশদ্বীপ গ্রাম কড়ারি—সাঁজোয়ালের তহশীলকরণ—খাজানা না দিলে মুজুরা না পাওয়া—খাজানা ক্রোক—সন ১১০৩ মল্ল সাল ৩২৩ পত্তনি তালুক হইতে ইরসাল—মনস্থবা করিয়া আরজি মুন্সীদিগকে প্রেরণের কথা—মুসাবিদা মাফিক আরজি ঘৃত গুড় খাজাৎ পাঠাইতে অনুরোধ—মেয়নার দফা—বিলাত বাকী—বেনামী সাজোয়ালী সনন্দ ৩২৪ ব্রহ্মোত্তর ভূমির খাজানা—পিতৃব্যের দৌরাত্ম্য—নবদ্বীপে অধ্যয়ন ৩২৫ খাজানার হিসাব—সন ১২০৬ সাল ৩৬৬ বেলডা—ব্রহ্মোত্তর ভূমির খাজানা—ধারান্দ—মাথুটী ইত্যাদি ৪৯১ গর্জনসিংহের আমলা জায়—মহেশপুর সামিল ভাগলপুর—সন ১১৯৬ সাল ৪৯৩ হিসাব—১২২৮ সাল ৫০৪ হিসাব—সন ১২০১ সাল ৫১৯ একরার-পত্র—শিষ্যসেবকের হিস্যা—বার্ষিক আদায় সংক্রান্ত—সন ১০৯৫ মল্ল সাল ৫২৫ সন ১১৬০ সাল—জমাখরচ—ব্রহ্মোত্তরের খাজানা ও ধান্যবিক্রয় ৫২৯ ব্রহ্মোত্তর খাজানা আদায়—ডাকের মাশুল ৫৩১ সন ১২৩০ সাল—রূপেয়া খাজানা জমা—নিমন্ত্রণের প্রণামী—জমি পাট্টা জমা—বিবাহের দণ্ডবতী জমা ৫৩৫ বৈষ্ণবভাবক মহাল—কীর্তনমহাল জমা ধার্য করিয়া পাট্টা প্রদান—বাড়ীর বাঁধা আসরে কীর্তন গান করিবার জন্য—গুরুচরণ দাস বৈরাগ্যকে কীর্তনের জিম্মা ৫৪৬ মেনিয়ার কুঠির চিঠি—কড়ারি খাজানা—গালা দাখিল করিতে আদেশ—পত্রদেনা মাধবপুর কুঠি ৬০৩ শেহারার মাথটার টাকা প্রেরণ—ব্রহ্মোত্তর জমির ধান্য মজুত—সন ১১৮০ সাল—জলদান ৬০৪ পরগণে সেনভূম—জগমোহন সিংহ—লাট তিলোড়—ইলামবাজারের মেস্তর জান এর্স্কীণ সাহেবকে মফস্বলী পত্তনি তালুক প্রদান—সাহেবের নিকট রুজু হইয়া আবাদ মালগুজারী সরবরাহ করিবার আদেশ—সন ১২৩৬ সাল ৬০৫ পরগণে বারহাজারী—সন ১২৩০ সাল—শ্রীশ্রীরেবতীরমণচরণচারিণী গঙ্গামুনী দেবী—লাট ডিহিপাড়া—পঞ্চক খাজানা সরবরাহ ৬১৯ সেবক জায়—১০৬৪ মল্ল সাল—১০৭৫ মল্ল সাল ৬২০ হুদা খুর্দপুরের পত্তনিদার প্রতি—রঙ্গিনী দাসী গররিনী দাসী—১২৫৬ সাল—মৌরুষ ৺বাবু বিশ্বম্ভর সিংহ মহাশয়— মোকামী শ্রীযুত মেং হেনরী কোণ্টর এর্স্কীণ সাহেবের

এ্যাটর্ণী—খাজানা আদায় উসুল—প্রশংসিত সাহেবের ইংলণ্ড গমন—ভারপ্রাপ্ত এ্যাটর্ণী শ্রীযুত মেস্তর ডবলীউ ডবলীউ ফারগীহর্শন সাহেব ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার কৃতসংকল্প—এ্যাটর্ণী সাহেবের প্রতি ভারার্পিত কর্ম পরিত্যাগসূচক মুক্তিপত্র—খাজানা রাইপুরের জমিদারীতে দাখিল করিবার আদেশ—টাকা উসুলে আপত্তি না করার নোটীশ—১২৮৯ সাল ৬২৩ প্রণামী প্রাপ্তিস্বীকার—ব্রহ্মোত্তর ভূমির ধান্য না হওয়া—শিষ্যবাটীর আদায় বার্ষিকী জমা-খরচ ৬২৫ শ্রীপাট বৈনানে প্রণামী চালান—সন ১২০০ সাল ৬২৬ ফসল ক্রোকের তদ্বির—সাতা দীঘির খাজানা সদমাই না হয় ৬২৭ সতা দীঘির খাজানার ইরসাল ৬২৮ সাতা দীঘির খাজানার আগাম

॥ কর্জ-দাদন ॥

(সন ১১৫৫-১২৭৪ : খৃ ১৭৪৮-১৮৬৭)

১০১ পৌষে— চৈত্রে— বৈশাখে কর্জ শোধের প্রসঙ্গ ৩২৬ কর্জখত-পত্র— টাকায় মাসিক আইন-হার সুদ— পৌষমাসে উচ্চমূল্যে ধান্য দিয়া কর্জ পরিশোধের অঙ্গীকার ৩২৭ কর্জপত্র— সিক্কাপ্রতি চার আনা সুদ ৩২৮ ঐ— সন ১১৬৮ সাল— টাকা প্রতি মাসিক অর্ধআনা সুদ— অনাদায়ে পৌষে উচ্চমূল্যে ধান্য দিবার প্রতিশ্রুতি— শ্রীশ্রী৺প্রমাণ ৩২৯ ঐ— সুদ মাসিক টাকায় দেড় পয়সা— পৌষমাসে সম্যক সুদ—ধান্য— অন্যথায় ফাল্গুন চৈত্রে গুড় দিয়া পরিশোধ করার অঙ্গীকার ৩৩০ ঐ— সুদ টাকায় অর্ধআনা—পৌষমাসে পঞ্চজন মহাজনী দরে ধান্য দিয়া পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি— অন্যথায় ফাল্গুন মাসে গুড় দিয়া পরিশোধ করার কথা ৩৩১ একরার-পত্র— বাউটীর জন্য রূপা—নমুনা মাফিক বাউটী দিবার কথা— অন্যথায় বাউটী লইয়া টাকা ফেরৎ ৩৩২ কর্জপত্র— শ্রাবণ মাসে সুদ সমেত বেবাক টাকা পরিশোধ করার অঙ্গীকার ৩৩৩ মৃৎপাত্রের দাখিলা— সন ১১৫৯ সাল ৩৩৪ কর্জখত-পত্র—টাকায় সুদ এক পয়সা হিসাবে— বৈশাখ মাসে সুদ সমেত বেবাক টাকা আঠারো আনি হিসাবে ধান্য দিয়া পরিশোধ—অন্যথায় সুদের আউরি দিবার প্রতিশ্রুতি ৩৩৫ কর্জের একজায় হিসাব— সন ১২০৫-৬ সাল ৩৩৬ মহাজন খাতকের জমাখরচ— ফাল্গুন মাসে ধান্য বিক্রয়—সুদের দরুণ বরাত— লভ্য ৩৩৭ টাকা দিতে অসম্মতি— জাতির কিনারা—সমাজস্থানে লজ্জা—টাকা না দিয়া কন্যা লইয়া যাওয়া অসম্ভব— সকল লোক উত্যক্ত—সিন্দুকে গচ্ছিত জিনিষের হিসাব ৩৩৮ গাছবন্ধক-পত্র— আম্র ও কাঠাল গাছ—তিন টাকা পাঁচ আনায় বন্ধক— কার্ত্তিক মাসে টাকা শোধ দিতে না পারিলে তিন টাকা পাঁচ আনা পণে বিক্রয় করা ৩৩৯ ধান্যের কিস্তিবন্দি-পত্র— তমসুক দিয়া ধান্য বাড়ি— ১ বিশি

১৪ মান ধান্য দেনা ৩৪০ দেড়া বাড়ি—ধান্যের তমসুক-পত্র ৩৪১ ধান্যের হাওলাতনামা-পত্র—পৌষমাসে গোলা পৌছ করিয়া বেবাক ধান্য পরিশোধ করার অঙ্গীকার ৩৪২ বন্ধের জমি রাখিয়া টাকা কর্জ— ১২ বিঘা জমি বন্ধকে ৪০ টাকা লওয়া ৩৪৩ কিস্তিবন্দি-পত্র—কড়ির হিসাব— সন ১২৪১ সাল ৩৪৪ কর্জপত্র— ধান্য আড়াই আড়া কর্জ লওয়া ৩৪৫ কর্জখত-পত্র— গয়াতীর্থে পিতৃকার্য করিয়া দক্ষিণা দান সমেত ২০ টাকার খত— সন ১২০৭ সাল ৩৪৬ দুই তঙ্কা কর্জ— গাড়ু বিক্রয় করিয়া খরচ—ভূমের অংশ চৌতে দেওয়া—ভূমি ভাগজোত— ভূমি না পড়ে— বীজ ভাল করিয়া পাঠাইবে— আউশ খানিক অতিরিক্ত করিবে ৩৪৭ কর্জপত্র— মালজামিন দিয়া বোল আরকট টাকা কর্জ— টাকায় সুদ মাসিক এক আনা— পৌষমাসে মূল সমেত টাকা পরিশোধ করার অঙ্গীকার— সন ১১৮২ সাল ৩৪৮ কর্জপত্র— ১১৬৬ সাল— ১১ টাকা কর্জ— টাকায় অর্ধ আনা সুদ— আসল টাকা পরিশোধ না করিলে সুদের দেড়া দিয়া টাকা দিবার অঙ্গীকার— সাক্ষী শ্রীশ্রীধর্মদেবতা ৩৪৯ কর্জপত্র—দুই টাকা কর্জ— সুদ টাকায় মাসিক তিন পাই— আসল টাকা শোধ করিতে না পারিলে পৌষমাসে উচ্চ দরে ধান্য দিবার অঙ্গীকার—১১৬৫ সাল— সাক্ষী শ্রীশ্রীধর্মদেবতা ৩৫০ কর্জ-পত্র—তিন টাকা কর্জ—ধান্যের উপর কর্জ—সুদ টাকা প্রতি দুই আনা ৩৫১ ঐ—দুই টাকা—সুদ মাসিক টাকায় আইন অনুসারে দিতে অঙ্গীকার—আষাঢ় পর্যন্ত শোধ না করিলে কুইলা রঙের দুই রাশ গরু দিবার কথা ৩৫২ ঐ—১১৯০ সাল— দশ টাকা কর্জ—সুদ টাকায় আধ আনা— না দিতে পারিলে পৌষের উচ্চমূল্যে সুদ সমেত ধান্য দিয়া পরিশোধ— মাল জামিন ৩৫৩ ধান্যবিক্রয়-ফর্দ—দুই ছড়া তাবিজ—পৈচা—পাতজোড়—বাটকী বন্ধক ৩৫৪ জমা রূপেয়া আমদানী জায়— সন ১১৯০ সাল ৩৫৫ হাওলাতী কর্জপত্র—কর্জ ত্রিশ টাকা ৩৫৬ সন ১১৯৭ সাল— মহাজন ও খাতকের জমাখরচ— নির্দিষ্ট সুদ— মাল জামিন ৩৫৭ কর্জ এক শত টাকা—হিস্তা— নবদ্বীপ হইতে ব্যবস্থা আনয়ন ৪৮১ শৌদিগের নিকট টাকা লওয়া ৫০১ সন ১১৮৯ সাল— হিসাব— কর্জ জমা— কর্জ শোধ ৫১৫ সন ১১৫৮ সাল— টাকা কর্জ-কর্দনের তালিকা—নিজ বিবাহ জন্য—বনভোজন ই.—সন ১১৫৫ সালের হিসাব ৫১৬ সন ১০৬৭ মল্ল সাল—কর্জ প্রসঙ্গ—হাঁসুলি বন্ধক—টুক্না বন্ধক—সোনা বন্ধক—সুদ টাকায় মাসিক অর্ধ আনা— পুনশ্চ কার্ত্তিক মাসে কর্জ— বট ই. ৫১৭ জমাখরচ—সুদ— সন ১০৭০ মল্ল সাল ৫২৯ সন ১২৪৮ সাল— নীলের পাত্তির উপর দাদন বাং গোমস্তা নীলের কুঠি— নীলের খাতায় বাকী শোধ— দিশী কাপড় খরিদের উপর দাদন ইত্যাদি ৫৩১ প্রাচীরের ঠিকা দাদন দেওয়া প্রসাদ ডোমকে— তৈলের উঠানা দাদন ব্রজ গড়াইকে ৫৩২ সন ১২২৯ সাল—কর্জা জমাখরচ ৫৪২ দুই টাকা হাওলাত করিয়া কার্পাস খরিদ ৫৪৪ শকাব্দা ১৬৬৯—কর্জ-কর্দন সিক্কা আরকট ৬০৬ হিসাব—১১৮৪ সাল—রঘুনাথ চুনারী—আসল—ওয়াশীল তঙ্কা আরকট

৬০৭ হিসাব—মহাজন জগদ্দুর্লভ ভট্টাচার্য— মোওতাওয়ারিশ গঙ্গানারায়ণ সরকার—ওয়াশীল বাকী—সন ১২৩০ সাল— দাদন তস্বা— তলব স্থদ বাকী আসল ৬০৮ কর্জপত্র—তাঁতি দে—বৈনান— স্থদ টাকায় আধ আনা— ১২১২ সাল ৬০৯ কর্জপত্র— পাল তাঁতী— স্থদ টাকায় আধ আনা— সন ১২১২ সাল— বৈনান

বিবাদ-বিসম্বাদ

(সন ১১৬২-১২৮২ : খৃ ১৭৫৫-১৮৭৫)

১৭৪ পুষ্করিণী খনন সম্পর্কে আপত্তি ২৭৪ ডারা ফিরাফিরি—না-মঞ্জুর—জরিমানা ৩৫৮ অমাত্যগণের সহিত বসিয়া নিষ্পত্তি— ভট্টাচার্য মহাশয়ের দ্বিধা ৩৫৯ বোলপুরের পূর্ব তরফে পৈতৃক লাখেরাজ আম্রবাগিচা—মজুত আম্রগাছ পাঁচ হাজার—পগারে তালগাছ পাঁচ শো—মালের আপত্তিতে দরখাস্ত ৩৬০ সমাচার জানিয়া জীবন্মৃত— ঈশ্বরের ইচ্ছা—নজরআনা—আসল খালাস না করা—১৬৮৫ শকাব্দ ৩৬১ ফয়সালা আদালতে দেওয়ানী জেলা জঙ্গলমহল এজলাসের মেস্তর হেনরী বেগুসাহেব রেজষ্টর—১৮১৯ সাল—ফৈ—রামতনু রায়—আং কৃষ্ণানন্দ অধিকারী—আরজি—রাধাকান্তপুর—বাটীর মধ্যে পুষ্করিণী—স্ত্রীলোকদের স্নান—আসামীর রেবতী পুষ্করিণীর পাহাড় উচ্চ করিবার বাসনা—মকদ্দমা ডিসমিস—ফরিয়াদীর বাটী বেপরদা—বিবাদের ভিত্তি অসঙ্গত নহে—ফয়সালা—খরচ জায় ৩৬২ জমি জবরদখল করিয়া লাঙ্গল চালাইয়া ধান্য রোপিয়া বেদখল—দখল পাইতে ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইনের বিলের ধারা মতে নালিশ ৩৬৩ সপ্তম কানুনের পেয়াদার নামে এত্তেলা—আসামী পলাতক বলিয়া দাখিল—রোহিত ও তুপীস্য মৎস্য প্রেরণ—মকদ্দমার অচল অবস্থা ৩৬৪ আপোষ নিষ্পত্তি—মীমাংসা না হওয়া—বরণ বিদায় দক্ষিণা দান—ক্রোক ৩৬৫ মকদ্দমা ফয়সালা—দুই ভাই বিরোধ না করা—পরামর্শ করিয়া কর্মকার্য করা উচিত—অন্যমত করিলে মাটী হইবে—বৃত্তির সনন্দপত্র লইয়া বর্ধমান আসা ৩৬৬ সনন্দ মিছিল মোহর না হওয়া—বিলাবন্দীর গোলমাল—কৃতসাধ্য পণে কসুর না করা—জিনিষ জায়—সন ১১৯৪ সাল ৩৬৭ বাটীর ভায়াচারী বিরোধ—অতি বিব্রত—অস্থির—মহাশয়ের কন্যাকে লইয়া যাওয়া—ভাল দিবস—ডুলি ও বেহারা ৩৬৮ জেলা হুগলী চৌকি আমতার মনসফী বিচারালয়—দলবদ্ধ হইয়া ধর্মঘট—লিপ্ত হইতে অসম্মত হওয়ায় আক্রোশে অনিষ্ট—গাছধান্য বলপূর্বক কাটিয়া লওয়া—তছরূপী ধান্য ও বিচালীর মূল্য পাইবার প্রার্থনায় পাট্টা সম্বলিত নালিশ—খৃ ১৮৭৫ সাল ৩৬৯ এত্তেলানামা—আদালতে দেওয়ানী—জেলা বীরভূম মতালকে কাছারী মৌলবী—হুকুমনামা গরজারি—

মিছিল সামিল—মকদ্দমার তদ্বির—অন্যথায় উপযুক্ত হুকুম হইবে—সন ১৮২৯ সাল ৩৭০ ডিক্রীর হুকুম—একান্তাহ্লাদিত—লভ্য ত্বরা হস্তস্থ হইবে—তৎকারণ আশীর্বাদ প্রবর্ত—বস্ত্র ভাব স্থিতি বিষয়েও প্রতুল—তদর্থে আশীর্বাদ ৩৭১ কাশী হইতে নৌকাযোগে রাহী—হরধামের রাজধানী—সদর আপীলের দরখাস্ত—জামিনী নাজেরকে প্রয়োগে মঞ্জুর করাইলে রেজিষ্টারী—কোর্ট আপীলের সাহেবান আদালতে বসিলে বাদীওগয়রহ উকিল কহিলা—জামিন মঞ্জুর হয় না—প্রধান বখস্তাদি সাহেব কহিলেন জমিদারী যে আছে কোম্পানীতে তাহার মালগুজারি—৺ইচ্ছায় জামিন নামঞ্জুর—কোর্ট আপীলের ডিক্রী সমেত জেলায় দরখাস্ত—মেসী সাহেব জজ—চৌরাশী টাকা হুণ্ডীওয়ালাদের না দেওয়া —ঘরোয়া ব্যয়—গায়ত্রীর প্রণবত্রয়ের বিষয় গায়ত্রীতন্ত্রে স্ফুট লিখিত—বচন প্রেরণ—ধারণের ঔষধ ৩৭২ পুষ্করিণীর দখল প্রার্থনায় ৪ কানুনের মোতাবেক নালিশ—বদলোকের সলাতে বাদিনীর মিথ্যা নালিশ—দরখাস্ত মিছিল সামিল করিয়া বিচার প্রার্থনা—দরখাস্তকারী খোদ বটে—চিনি ও জানি ৩৭৩ খামকা মারপিট—বিশিষ্ট লোকের অপমান করা কোনমতে ভাল নহে—সরকার মজকুরকে রাজী করিয়া শীঘ্র রাজীনামা প্রেরণ—অন্যমত না হওয়া ৩৭৪ সন ১০৭৩ [মল্ল] সাল— রাধাকান্ত মুখুর্জ্যার সঙ্গে ঝগড়া করিবার জন্য শ্রীসর্বেশ্বর মুখুর্জ্যার দরবার— খরচ-জায় ৩৭৫ সন ১০৬১-৬৪ [মল্ল] সাল— পৈতৃক শ্রীশ্রীসেবা— সেবক— বৃত্তির জন্য বিরোধ— রাধাকান্ত মুখুর্জ্যাদিগর সঙ্গে—খরচ-জায়—কমল ছত্রপতি—পট্টমহিষী প্রভৃতি ৩৭৬ সন ১১৬৬ সাল—মোকাম পানাগড়—রাধাকান্ত মুখুর্জ্যাদিগরের সহিত ঝগড়া—খরচ-জায়—বর্ধমানে কাজীর পেয়াদা-খরচ মাহ কার্ত্তিক অবধি মাঘ সুদ্ধা ইস্তকে এক অরংসাই টাকা—মাওড়ি কাজীকে—খোনকার সাহেবকে ইত্যাদি ৩৭৭ ফৈসলা আদালতে দেওয়ানী জেলা জঙ্গলমহাল মিস্তর হেন্‌রী বয়লেট সাহেব এঃ রাজষ্টর জেলা মজকুরের বৈঠকে সন ১৮১১। ৯ ডিসেম্বর—বাদী নীলমোহন মহাপাত্র—প্রতিবাদী চিরঞ্জীব সিংহ চৌধুরী—৩০৭ টাকার মকদ্দমায় খোরপোষের বিষয় নালিশ দরপেশ—কুর্শীনামা—এলামনামা—রদজবাব—নিশান—শ্রবণা—মিস্তর অলইম সাহেব—খান্দান—জ্যেষ্ঠপুত্র জমিদার হয়— দ্বিতীয় পুত্রগণ বেদাগ খোরপোষ পায়—সিমলাপাল—পান তামাক ও চাকরের বেতনের জন্য জমি ই.—পরগণা মানভূমের জমিদার রাজা প্রতাপনারায়ণ—বীরনারায়ণ হেকিম—বেগুনকোদর পরগণার বাবুসকলের খোরপোষের দাবীতে জেলা বীরভূমের আদালতে নালিশ—প্রত্যহ দুই আনার হিসাবে খোরপোষ—অত্র জঙ্গলাদেশে প্রত্যেক ব্যক্তির খান্দান প্রত্যেক জনের খান্দানের সহিত অনৈক্য ইত্যাদি ৩৭৮ দরখাস্ত কানুন চাহারণ—থানা সোনামুখী সামিল পখর্ণা—গ্রামের মধ্যস্থলে বাহিরগড়্যা পুষ্করিণীর জল দরিয়াদে শুখাইয়া যাওয়াতে কোড়ার লাগাইয়া পাকমাটী তুলিয়া লইয়া

যাওয়ায় গালিগালাজ—খামখা জবরদস্তি ঘাড়ধাক্কা কিল গোড়ারি আদির দ্বারায় মারপিট—কোদাল টাঙনা ঝুড়ি আদি কাড়িয়া লইয়া উঠাইয়া দেওয়া—দাবিবাজ মনুষ্যের জুলুমে গ্রামে থাকা ভার—এমতে নাচার হইয়া হুজুরে অছিত দরখাস্ত—১৮৪০ সালের ৪ আইনের মর্ম্মমতে—তপশীল চৌহদ্দী ৩৭৯ আরজি আদালতে দেওয়ানী জেলা জঙ্গল-মহল—১২২৮ সাল—ফরিয়াদী লোকনাথ গোস্বামী—আসামী—সুভদ্রা বেয়া—বয়ান—শ্রীবৃন্দাবন ধাম দর্শনে গমন—ঘরের জিনিষপত্র সমুদয় বিক্রয় করিয়া ইরসাল করিয়া যাওয়ার কালে ছাপায় টাকা জিম্মা—ফিরিয়া আসিয়া তলব করায় ওজর—টাকা দেয় না—আসামীকে তজবিজ ফরমাইয়া হক দেলাইতে হুকুম প্রার্থনা ৩৮০ চন্দ্রা চাষানী—ঔষধি বাটিয়া সেবন করাইতে হামেল নষ্ট না হওয়া—জড়ি তিন পান—হরিতকী দুইটি—বাখরগুলি ও চূণের জল দেওয়াতে হামেল নষ্ট—চন্দ্রা ফোত করিলে লাস জোড়ের ধারে পুতিয়া দেয়—চন্দ্রার মাতা ভগবতী চাষীনের একরার—আশনাই—গর্ভ—ঔষধীর তদ্বির করহ—নতুবা ভেক দিবার হুমকি— ছামনের ঔষধী—মূল্য একটী পয়সা ৩৮১ খৃ১৮৪৬ সালের ১ আইনের ৪ ধারার বিধি অনুসারে ওকালতী কর্ম্মে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের পরীক্ষা বিষয়ে সদর আদালতের সাধারণ লিপি ৩৮২ একরার-পত্র—দাঙ্গা না করা—করিলে জরিমানা দেওয়ার—না দিলে আইন আমলে আসিবার অঙ্গীকার ৩৮৩ থানার দারোগাসাহেব প্রবলপ্রতাপেষু—থাল ঘটি লইয়া যাওয়ায় সাতিশয় কাতর—আপনি বিচারকর্তা ৩৮৪ একরার-পত্র—কনকমণি কন্ত—পুত্রহীন—ছয় কন্যা—মধ্যম কন্যা সম্প্রদান করিয়া ঘরজামাতা—হেবা করিয়াছেন—মাল-আমোয়ালের মোক্তার— খোরপোষ পুণ্যাদি কার্য— উর্দ্ধক্রিয়া শ্রাদ্ধাদি সকল করিবার অঙ্গীকার—শ্রীশ্রীগয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ—খরচপত্র দিয়া বিদায়—বাটী আসিয়া পূর্ব্বমত থাকিব—পাঁচ কন্যা ও জামাতা দৌহিত্র সকলের মাল-আমোয়ালের এলাকা নাই ৩৮৫ প্রভুদের ঘরে ঘরে বিবাদ করিয়া শিষ্যগণকে পীড়া দেওয়া উচিত নহে—প্রভুদিগের এ-কথা লোকদ্বারে বিখ্যাত হইবে—অনুগ্রহপত্রীর অপেক্ষা—চিত্তবাদ কেন হইবে—ব্রাহ্মণশিষ্য কলঙ্কী হইলে অন্য লোক কি কহিবে— চিত্তপ্রসন্ন হইবেন— যেন আমরা খালাস হই—না করিলে প্রাক্তন খেয়াইব—'মরমক বেদন মরমহি জানত' ৩৮৬ চৌকি শিকদার শ্রীসেখ আকবর আলী দারোগা—বারহাজারী পরগণা—জেলার রেজষ্টর সাহেবের পাঠানতে জানা গেল—হাবেলীর উত্তর দেওয়ালের নিকট আখেজ করিয়া মাটী ফেলা—যাবৎ দেওয়ানী আদালতে মকদ্দমা নিষ্পত্তি না হয় মাটী এক পাজা ফেলাইতে মহকুব রাখিতে আদেশ ৩৮৭ তণ্ডুল ভাজান—বণিককে ভাড়া—তণ্ডুল শোধ—বার্ষিক চার আনা ও বেল প্রেরণ—মকদ্দমা কলকাত্তায় তদবস্থায় আছে— মকদ্দমা দাদিনী আম্বরণ হইলেও নিষ্পত্তি হয় নাই ৩৮৮ মালগুজারীর খাজানা বাকী বাবদ নালিশ—

মকদ্দমার সওয়াল জবাব কারণ উকিল মোকরোর— ওকালতনামা-পত্র ৩৮৯ স্ত্রীকে সাক্ষী দেওয়ানো ভাল নহে— বড় সরম হয় ৩৯০ দরখাস্ত—গিরলাপাল জগন্নাথ চৌধুরী— চারি সন্তানের কিছু জায়গা পান খাইতে— চাকরের দরমাহা কারণ ঘরের দস্তুর মতাবক খোরপোষ মোকরোর কারণ নালিশ—শ্রীযুত রেজষ্টর সাহেবের হুজুরে দরপেশ—সাঁজোয়াল মনোযোগ করিলে না— সাঁজোয়ালের নামে হুকুম হয় যে খোরপোষ জায়গা কোন আপত্তি না করেন— ঐক্যক— মহাক্ষেত্র— মূলবৎ—সেরেস্তাদার ৩৯১ ইজাদার— সওয়াল জবাব— মুকুন্দপুর— বীরসিংহ— মথুরাকাটা—শিলাই নদী—জলেশ্বর মৌজা— নীলমোহন সিংহের চাকর বা মুনিষের সওয়াল জবাব ৩৯২ চারি জনার উপর তবী— তবী মহকুব হইবার এজেহার— চুরি হয় নাই— সকলকে চালান— আমাকে ছুটী— বালি লইয়া যাওয়া— খোলসা করিতে না পারা—মহাশয় অতি অপ্রকাশে থাকিবেন—গোয়েন্দা বাজবন্দী হয়েন নাই— যদি তলপ করে—বাটী সন্ধ্যার সময় আসিবে— কেহ যেন না জানে ৩৯৩ ছোটবৈনান গ্রামের গৌরহরি মণ্ডলের নিবেদন—জয়দেব পণ্ডিত নলিয়া গ্রামের গয়ারাম দের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে— সেরেস্তার উকিল হাজিরজামিনী-খত লিখিয়া আপন মাতব্বরিতে সেরেস্তায় দাখিল করে— খত দস্তখত না করায় মণ্ডলকে উকিল ও পণ্ডিত আসামীর হাজির কারণ নাজিরের নিকট ধরিয়া গারদে কয়েদ করাইয়াছে— খালাস দিতে হুকুমের অনুরোধ ৩৯৪ ফরিয়াদী দরখাস্ত— পরগণা রায়না—জমিজমার চাষ করিয়া বসবাস— অন্যায় মাথুট চাওয়া— অস্বীকারে আসামী মণ্ডল-দিগের ও গোমস্তাদের জুলুম দৌরাত্ম্য দ্বারা মাথুট আদায় করিতে উদ্যত হওয়ায় নালিশ—দেওয়ানগঞ্জের দারোগার নামে পরোয়ানা জাহিরের প্রার্থনা—ছাত্রলালের এজেহার ৩৯৫ টাকা কাপাস ও তিল প্রেরণ—জমির কাজিয়া—বড়ই উৎপাত—শ্রীশ্রী৺সিংহবাহিনী ঠাকুরাণীর নিকট পূজা করিতে অনুরোধ—প্রতুল জন্য—কেবল শ্রীচরণ ভরসা ৩৯৬ জমির ফসল ছাড়িয়া দিতে পাইককে নির্দেশ ৩৯৭ নদীয়ার জজ রাক সাহেবের দেওয়ান—মুন্সীর নামে লিখন—শান্তিপুরের শিবচরণ বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্যের ভায়াদদের নষ্টাম করিয়া নিরংশীকরণ—কারসাজী লিখন— লিখন ফাড়িয়া অংশ দেওয়ার নির্দেশ—আপনাইয়ের লোককে—ইনি অংশ পাইলে বহুত খুসী হইবার কথা ৩৯৮ পৈতৃক যজমান—দুই হিস্যা—অংশ বিভাগে চাতুরী ও বিবাদ—জমিদারদের নায়েবের লিখনে সালিশী— বিচার্য তদ্বির করিয়া জবাব দিলে মঞ্জুর— রামদুলাল তর্কবাগীশ ভট্টাচার্যকে লিখিত অবিচল-পত্র ৩৯৯ বণিকদের নালিশ—উদ্বেগ—শত্যাদি না হওয়া—কর্জ ৺ইচ্ছায় পরিশোধ করিবার ভরসা ৪০০ আদালতের ভার ৪০১ চিঠি তলপ—আসামী কাছারী কমিশনী হাউস আদালতে দেওয়ানী জেলা নদীয়া—কর্জা বাবদী কাছারীতে নালিশ—সাত রোজ মেয়াদ মধ্যে কাছারী পৌছিয়া খোদ কিংবা উকিলের দ্বারা জবাব

শিবরামপুর চৌকি সামিল ছোটবৈনানের মধ্যে মের্জাপুর সাকিমের ভট্টাচার্যগণের প্রতি— ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রকরণ অনুসারে ৬১২ পাঁচটি মকদ্দমা হুগলী মোকামে উপস্থিত— শ্রীচরণে দরখাস্ত— রক্ষা পাওয়ার জন্য— লোক মার্ফৎ গ্রন্থ পাঠাইবার অনুরোধ— পাপোষ প্রেরণ প্রসঙ্গ— কলিকাতা হইতে— মৎস্য যেমন আছে তাহার কিঞ্চিৎ পাঠানো ৬১৭ খাঁ পুষ্করিণী বেদখল বাবদ মকদ্দমা নালিশের জবাব—ছোটবৈনান— সন ১২১৯ সাল ৬২৬ রাঘব মণ্ডলের নামে নালিশ—ফসল ক্রোকের তদ্বির ৬২৯ ডাক-নীলাম—ক্রোকী জায়দাদ আদালতে দেওয়ানী জেলা বর্ধমান—বিক্রয়—সন ১২৩৪ সাল— ঘর—গরু— কুটিয়ালী ইত্যাদি ৬৩১ সিমলাপাল— নীলমোহন সিংহ মহাপাত্র—খোরপোষ বাবদ মকদ্দমায় রাজা চিরঞ্জীব সিংহ চৌধুরী লিখিত— বজ্জবাব-পত্র— সন ১৮০০ সালের ১০ আইন—দশশালা বন্দোবস্ত—জ্যেষ্ঠপুত্র জমিদার— অপর পুত্রেরা খোরপোষ— চাতুরী ও প্রবঞ্চনা— নালিশ— দেবসেবা পিতৃকীর্তি অতিথিসেবা অচল—পৈতৃক দৌলত গাঁতাঘর জবরদস্তীতে লইয়া যাওয়া—খেলাপ নালিশ—উকিল রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়— রামপ্রসাদ ঘোষ ৬৩২ মোকাম বর্ধমানের কমিশনার সাহেবের নিকট দরখাস্ত— খোরপোষ বাবদ প্রাপ্ত মৌজায় দখলকার কায়েম রাখিতে হুকুম প্রার্থনা—ভবানী সিংহ হিকিম—সিমলাপাল—জেলা জঙ্গলমহল—সন ১৮৩১ সাল—রাজা চিরঞ্জীব সিংহ চৌধুরী সম্পর্কে—মুলবৎ—বেণীমাধব রায় সেরেস্তাদার—ঐক্যক—নবগোপাল রায় মহাফেজ

দলিল-দস্তাবেজ

(সন ১০৫৯-১২৮৯ : খৃ ১৬৫২-১৮৮২)

১৯৬ জড়খরিদগী-পত্র—পুষ্করিণী খনন—শ্রীশ্রী৺প্রীতে উৎসর্গ—সন ১২০৩ সাল ১৯৭ পুষ্করিণী খনন—দান—উৎসর্গ কারণ পত্র— সন ১২০৩ সাল ১৯৮ পুষ্করিণী খনন দান উৎসর্গপত্র—সন ১২০৪ সাল ১৯৯ ব্রহ্মোত্তর বসতবাটী জমি বাগাত পুষ্করিণী স্বামীর ও নিজ স্বর্গার্থ ঠাকুরপুত্রকে দানপত্র ৪০৭ কবুলতি-পত্র— ইজার মধ্যে গোমস্তাগিরির খিজমত— খতরা করিলে তৎক্ষণাৎ মাহিনা বাজেয়াপ্ত— মালজামিনের খত দস্তখত দাখিল— সন ১২১৫ সাল ৪০৮ কবুলতি-পত্র—ব্রহ্মোত্তর ধানী জমির ঠিকা মুকরা পত্তন—সন ১২১৫ সাল ৪০৯ ভোলপাট্টা জমিজমা মৌজে সিদ্ধিপুর পরগণে মুড়াগাছা— খাজানা সহিসিকা মালগুজারি করিয়া ভোগ ৪১০ জমি- পট্টকপত্র— ঠিকা জমির পাট্টা— সন ১২২৯ সাল ৪১১ গাছবিক্রয় জড়খরিদগী-পত্র—১২১৬ সাল ৪১২ দেবোত্তর কওালা খোসখরিদগী-পত্র— পরগণে :বিরাহিমপুর সরকার ওড়ম্বর মুতালকে চাকলে মুর্শিদাবাদ— মহাল খালিসা—

১১৯৯ সাল ৪১৩ লাখেরাজ জড়খরিদগী কোয়ালার কবজ-পত্র— ১২০১ সাল— পরগণে সেরপুর— ব্রহ্মোত্তর পৈতৃক বাস্তবাটী ৪১৪ স্বহস্তরোপিত বাঁশঝাড় বিক্রয় জড়খরিদগী কওালা-পত্র— ১২১৭ সাল ৪১৫ লাখেরাজ জড়খরিদগী কওালা-পত্র— সাকিন শ্রীহট্টী পরগণে স্বরূপসিংহ— ১২৪৩ সাল— আম্রবাগিচাদি বিক্রয় ৪১৬ লাখেরাজ খনিত পুষ্করিণী জড়খরিদগী বিক্রয় কওালা-পত্র—১২৪৭ সাল—জেলা বীরভূম—পরগণে খারিজা কীর্তিহাট—মৌজা যুগসরা ৪১৭ লাখেরাজ জড়খরিদগী কওালা-পত্র— ১২২৮ সাল—জেলা বীরভূম—পরগণে কাঠগড়— চেঙ্গমারার মাঠ ৪১৮ জড়খরিদগী— বাগিচা জমি কওালা-পত্র— ১২০১ সাল— যুগসরা ৪১৯ জমাখরচ— সন ১১৮৬ সাল— ফারখতি-পত্র— কার্য ব্যাপার—দেনা-লেনা সমুঝিয়া পাইয়া ফারক— ১১৮৮ সাল ৪২০ ফিরিস্তি তালিক কওালা—সন ১২২৭ সাল ৪২১ অশ্বত্থবৃক্ষ বিক্রয় কওালা-পত্র—১২৩৪ সাল—পরগণে কাঠগড়—মৌজা যুগসরা— কনকমুনি সেনী দাস্যা ৪২২ ধান্যের কিস্তিবন্দি-পত্র— পরগণে অরজানগর— জেলা মেদনীপুর— ১২৭০ সাল—ওড়িয়া সহি ৪২৩ বার মাহার মজুরের কোবলত-পত্র— ফি মাহা খোরাকী ১৸০—খোরাকী ১৷০—আগামী দাদন ২০টাকা—সন ১২৭৯ সাল ৪২৪ ধান্যের কিস্তিবন্দি-পত্র— প্রসাদ গিরি বরাবরেষু— ১২৬৯ সাল ৪২৫ মেওাদী ২৫বৎসরের ইজারা পট্টক-পত্র—৺বড়খান সাহেব—সেবাইত জুলু শাহা প্রভৃতি—১২৭৪ সাল—তমলুক ৪২৬ ঘরযোগের পাইকগিরি কর্মের কবুলিয়ত-পত্র— ১২৫৮ সাল— বার্ষিক বেতন ১৮ টাকা—অগ্রিম ১৩ টাকা ৪২৭ রোজনামা মাসত জমি— পরগণে ভুকুণ্ডা সরকার শ্রীযুত দেওয়ান সাহেবজী—সন ১২৩২ সাল—দিলায় জব্দ জমি—করিমনবাটী—ধর্মতলা ৪২৮ পোষ্যপুত্র-পত্র—পরগণে আজমতশাহী—মৌজা খুজুটিপাড়া—১২২৩ সাল ৪২৯ খাড়া মাঠ আটক কারণ চাকর রাখার কবুলতি-পত্র— খামার মাহিয়ানা দরমাহা ১॥০—নিজ হিস্যা দরমাহা ।৵ —১২০৯ সাল ৪৩০ পোষ্যপুত্র রাখিবার দরখাস্ত-পত্র— সন ১২০৮ সাল— তপশীল জিনিষ ৪৩১ সাহাপুর গ্রামের দক্ষিণে বাজার বসানো— বাজারের নাম শ্রীযুত মধ্যম বাবু মহাশয়ের নামে গোপালগঞ্জ— বাজার খুব গুলজার ৪৩২ হাজিরজামিনতি-পত্র—সন ১২১৩ সাল—পরগণে মুজাফরশাহী—সাং ইটণ্ডা ৪৩৩ নওকড়ির জামিনী খত কবুলতি-পত্র—১২১৬ সাল—পরগণে মুজাফরশাহী—ইটণ্ডা ৪৩৪ পৈতৃক খনিত পুষ্করিণীর জড়খরিদগী বিক্রয়কবালা-পত্র—১২১৩ সাল—শ্রী৺ধর্মতালার পূর্ব—জগহরির উত্তর পুষ্করিণী ৪৩৫ বর্ধমানের শ্রীযুত জজ সাহেবের বরাবরে লিখিত হাজিরজামিনতি-পত্র— পরগণে মনোহরশাহী—সাং পাণ্ডুগ্রাম—বীরভূম—ভগবতী দেবীর পক্ষে সখিচরণ দে লিখিত ৪৩৬ পাট্টা পাটের সরওয়া— বেট সাহেব বরাবরে—শ্রীবাস মিত্রের লিখিত—কর্ম করিবার একরার-পত্র ৪৩৭ বর্ধমানের জজসাহেব বরাবরে লিখিত তদারকী কবুলতি-পত্র ৪৩৮ শ্রীশ্রীপঞ্চানন্দ ধর্মরাজ পুজার কারণ আতবের

সিংহ— আমান সিংহ প্রভৃতিকে সনন্দ-পত্র— সন ১২০২ সাল— ডিক্রীতে হুকুম—মতালক খোরপোষ— আমল ভোগ— তফসিল—সন ১২০৫ সাল বাঙ্গালা—সন ১১০৪ সাল জমিদারি— একটিন তহবিলদার ৪৬২ বিষ্ণুপুর— তরফ সাস্তোড়— মৌজে সোনাটাপল—মিস্তর ভাদন সাহেবের ছাড় ব্রহ্মোত্তর—দেবোত্তর—গুজরা—পয়োত্রা ভোগপ্রমাণ—জমির আয় মাফিক ফসল ছাড়িয়া দিবার দরখাস্ত— সন ১১৯৬— জমিদারী সন ১০৯৫ সাল—ইং সন ১৭৮৯ সাল ৪৬৩ এক বিঘা জমি বার্ষিক এক পায়া গুড়ে পাট্টা-কবুলতি—সন ১২৭৮ সাল ৪৬৪ দাখিলা খালাসী— সন ১২৬৮ সাল ৪৬৫ ব্রহ্মোত্তর জমি— বেদাওা-পত্র— সন ১০৬৭ [মল্ল] সাল ৪৬৬ ব্রহ্মোত্তর জমির পট্টক—সন ১০১৭ [মল্ল] সাল ৪৬৭ খালাসী পত্র—সন ১২৬৮ সাল ৪৬৮ সন ১১৯৭ সাল— হাবেলী পরগণার কোটশিমুল গ্রামের রঘুনাথ দেবশর্মার লিখিত ওকালতনামা-পত্র— কারকিতার মকদ্দমা ৪৬৯ পুষ্করিণী খাদ কারণ নিষ্কর জমির দরখাস্ত মাফিক দান—পরগণে হাবেলী—মৌজা রাজারামপুর ৪৭০ মোহর কালেক্টরী জেলা বীরভূম— সন ১২৩৫— দাখিলা রূপেয়া— রামানন্দ মিত্র ৪৭১ দাখিলা রূপেয়া কাছারি কালেক্টরি—জেলা বীরভূম— তালুকদার রামানন্দ মিত্রী— সন ১২৩৫ সাল—সন ১৮২৮ সাল ৪৭২ শিবরাম চক্রবর্তীকে প্রদত্ত মুর্জাপুর আয়মা আমলনামা- পত্র— ২১ ফাল্গুন— সন ১০৫৯ সাল— শ্রীএনীথ্রি— শ্রীসাহন সাহ ৪৭৩ কবুলতি-পট্ট— পরগণে সমরশাহী—আহের পুষ্করিণীর অগ্নিকোণে শালি জমি—তিরোল—সন ১২৪১ সাল ৪৭৪ একরার-পত্র—ছোটবৈনান—৪ বিঘা জমি বন্ধকে ২৫ টাকা—১২৩১ সাল ৪৭৫ কটকি নাদাবী— ব্রহ্মোত্তর জমির—দখলী সনন্দ দান ৪৭৬ ভাগপাট্টা লইয়া কবুলতি-পত্র—সন ১২২৮ সাল—সাতগাছিয়া ৪৭৭ সন ১২২৮ সাল—জব্দ জমি—তপনারায়ণ সামন্ত—মনসা ঠাকুরাণী— বৃন্দাবন দেয়াশী—শিবঠাকুর— হারাধন জুগী— সামা কোটাল— বাখড়েশ্বর ঠাকুর— ধর্মদাস মিস্ত্রী ৪৭৮ কবুলতি-পত্র— পরগণে মনোহরশাহী— আমগড়—তালুকগিরি খেদমতের কবুলতি-পত্র—১২৫৩ সাল ৫৩৫ বৈষ্ণবভাবক মহাল— ৺কীর্তন মহাল— গুরুচরণ দাস বৈরাগ্যকে জমা ধার্য করিয়া পাট্টা প্রদান— যখন যে কাজ হইবে তাহাতে কীর্তন গান করার জন্য—কীর্তনের জিম্মা—চাকলে গণপুর ৬১৩ লাখেরাজ ব্রহ্মোত্তর জমির জড়খরিদগী বিক্রয় কবালা-পত্র—ক্রেতা গোলামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যা—দিননাথপুর— গোপভূমি—বর্ধমান—বিক্রেতা শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য দীপমণি দেবী— সুরুল—বারবকসিংহ— জেলা সিউরি ৬১৪ উইল-পত্র—যুগলকিশোর আঢ্য লিখিত— স্ত্রী ও পুত্র এস্টেটের জয়েণ্ট একজিকিউটার্স—১১৮৮ বাঙ্গালা সন—ইংরাজী সন ১৭৮১ সাল ৬১৫ সন ১২৫৩ সাল—পুষ্করিণীভাগ -পট্টকপত্র— ছয় সন মেয়াদী ৬১৬ শুভ পট্টকপত্র— ছোটবৈনান— বড়িয়া খেয়াজি জমিজমা মধ্যে খিল নামক শালি জমি— পাঁচ সন মেয়াদে জোতপাট্টা— কবুলতি গ্রহণ—হরপ্রসাদ সিংহ—সন

১২৭১ সাল ৬১৭ সন ১২১৯ সাল— ছোটবৈনান— খাঁ পুষ্করিণী বেদখল বাবদ মকদ্দমা নালিশের জবাব ৬১৮ সন ১২১০ সাল— কবুলতি-পত্র— সমরশাহী পরগণার মধ্যে পৈতৃক সভাপণ্ডিতী অধিকার— শ্রাদ্ধ— বৃক্ষ গৃহ ব্রত ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি যজমানের নিকট পাওনার মধ্যে দশ আনার বখরা— জলদান পাট্টাদাতা রামদুলাল ভট্টাচার্যদিগের প্রাপ্য—সওয়া ছয় আনা কবুলতিদাতা ত্রিলোচন ভট্টাচার্যদিগের —তৈলবট ও চৌত প্রসঙ্গ ৬৩০ পত্তনি তালুক বিক্রয় খোসকবালাপত্র—বীরভূম—বৌলপুর—লাট তিলোড় হুদা ক্ষুদ্রপুরের জমিদার জগমোহন সিংহ বাবু— পূর্ব মালিক ৺জন এর্স্কীণ সাহেব— সন ১২৩৬ সাল— ক্রেতা কন্দর্প রায় কালিকাপুর— চন্দ্রনারায়ণ রায়— তারিণীপ্রসাদ রায় মৌখিরা— সদ্‌গোপ— তালুকদার—পরগণে গোপভূমি—জেলা ও কালেক্টরী ডিষ্ট্রীক্‌ট রেজেষ্টারী বর্ধমান— সাব-রেজেষ্টারী মানকর—চৌকি বুদবুদ— থানা আউসগ্রাম— লিখিতং শ্রীমেং হেনরি কউন্টর এর্স্কীণ সাহেব ও শ্রীমেশেজ হেমলটন বেণ হেবেন গীলনের পক্ষে ট্রষ্টী জেমশ এষ্টারলীং ফারকীউহর্শন ও রবট গীলন সাহেবের পক্ষে আমমোক্তার শ্রীমেং ডবলীউ ২ ফারকীউহর্শন সাহেব পিতা ৺বেলাজাক ফারকীউহর্শন সাহেব— মোকাম ইলামবাজার—হাল মোকাম সহর কলিকাতা ২০ নম্বর ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট—সন ১৮৮২ সাল—বাং সন ১২৮৯ সাল—তপশীল মৌজা হুদা গউরবাজার ডাকনাম ইলামবাজার

[পুনশ্চ,— ঘরোয়া-খুটিনাটি : ১২৭ ময়ূরের ছানা পাঠাইতে অনুরোধ। ব্যাধি ও উৎপাত : ৪৯৫ টাকার কারণ উৎপাত ৫৪০ শ্রীযুত সাহেবের রাস্তা যাওয়ায় ভাবিত— নিরুপায়—১০৮৯ [মল্ল] সাল। ধর্ম: ৫৯০ দুর্গাপূজায় তৈজসাদি খরিদের হিসাব— আরকট মুদ্রা—সন ১১৬০ সাল। ব্যবসায়-বাণিজ্য : ৪৮২ উৎপন্ন জমা—সন ১১৯১ সাল ৫৪৮ কাপড়ের হিসাব—সন ১২৩৫ সাল]

তুমি জীবনের পাতায় পাতায় অদৃশ্য লিপি দিয়া
পিতামহদের কাহিনী লিখিছ মজ্জায় মিশাইয়া।
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোলো নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে বও।
ভাষা দাও তা'রে, হে মুনি অতীত, কথা কও, কথা কও॥

১৩২১ —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচনা

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি প্রায় আড়াই শত বৎসরের রাঢ়-অঞ্চলের সাধারণ-লোকের জীবনধারার বহুবিধ পরিচয় ও তাহার ধারাবাহিক বিচারবিশ্লেষণ এই গ্রন্থের দুই খণ্ডে বিন্যস্ত হইল। জনসাধারণের স্বরচিত চিঠিপত্রের এই সংকলন হইতে সেকালের পল্লীসমাজের স্বল্পজ্ঞাত বিভিন্ন মহলায় প্রবেশলাভ সম্ভব হইয়াছে। জন্ম-বিবাহাদি ষড়ঙ্গে বিস্তৃত 'সমাজ'-অধ্যায়ে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর (খৃ ১৭৩২-১৮৯২) গ্রামীণ গৃহস্থালীর সুখদুঃখের নানা কথায় রসঘন অনেক বাস্তব ঘটনা বিবৃত ও তাহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইল। প্রায় সমকালীন (খৃ ১৭৩০-১৮৮২) 'শিক্ষা'-ব্যবস্থার বিশ্লেষণও বিশদ ভাবে করা হইয়াছে। টোলের সংস্কৃত-শিক্ষা, বাঙ্গালা পাঠশালার প্রসঙ্গ, ইসলামি সেরেস্তা ও পুঁথিলেখাদি ব্যবহারিক শিক্ষাপ্রসঙ্গে অনেক নূতন কথা ইহাতে পাওয়া যাইবে। 'ধর্ম'-প্রকরণে (খৃ ১৭৪৭-১৮৮০) শাস্ত্রীয় ও লৌকিক ধর্মাচরণের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা মিলিবে। সমাজে চারিত্রিক স্খলন-পতন সব সময়েই আছে। সেই ত্রুটিবিচ্যুতির বিচারব্যবস্থা গ্রামের পঞ্চায়েত, স্মার্ত ভট্টাচার্য এবং পরামানিকেরা করিতেন। ব্যবস্থাপক ভট্টাচার্যগণই করিতেন বিবাদী বিষয়সম্পত্তির সুষ্ঠু বাঁটোয়ারা। সামাজিক অপরাধ ও বৈষয়িক গোলযোগভেদে 'ভাষ'-(বা ব্যবস্থাপত্র) প্রকরণদ্বয়ে (খৃ ১৭২২-১৮৭৮) সমাজবিপর্যয়কারী কতকগুলি গুরুতর ঘটনার বিবরণ রহিয়াছে। ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষি, খাজানা ও কর্জ-দাদন এই চতুরঙ্গযুক্ত 'ব্যবসায়-বাণিজ্য' সম্পর্কে বহু সংবাদ সংকলিত হইল। ইহাদের সময়সীমা ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। অর্থনৈতিক পরিস্থিতির নির্ভুল বিচারের জন্য এই কড়চাগুলি অপরিহার্য উপকরণ। খৃ ১৭৫৫-১৮৭৫, এই সময়ের 'বিবাদ-বিসম্বাদ'-পর্যায়ের কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে। কাজীর দরবারের, বিষ্ণুপুর-দরবারের, জেলা জঙ্গলমহলের ও ইংরাজদের সেকালের দেওয়ানী আদালতের এবং ঘরোয়া ঝগড়াসংক্রান্ত কৌতূহলোদ্দীপক প্রমাণপঞ্জীগুলির আলোচনা যথাস্থানে করা গেল। পরিশেষে বিশ্লেষিত হইয়াছে 'দলিল-দস্তাবেজ'; বিভিন্ন প্রকারের দলিলদস্ত মিলিয়াছে (১৬৫২-১৮৮২)।

ইহা ছাড়া, 'সাহিত্যিক মূল্যাঙ্কন' পর্যায়ে বিভিন্ন শীর্ষকের আলোচনার সহিত বাঙ্গালা-গদ্যের রীতি, স্তর ও রূপবিভাগ দেখানো হইল। বিভিন্ন ভূমিকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরিচয়ও প্রাপ্ত তথ্য হইতে সংকলিত হইয়াছে। রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক মূল্যবান্ তথ্যাবলীর আলোচনাও প্রমাণ-সহযোগে

যথাসম্ভব করা গেল। সর্বোপরি আসে সিদ্ধান্তের কথা।—সমাজের ক্রমবিবর্তনের মর্মানুসরণেই মিলিবে এই গ্রন্থের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

২

(পুরাতনের চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া অনেকে আধুনিক-রুচিসুলভ উপকরণের দিকে ঝুঁকিয়া থাকেন,—অরুচিকর অস্পষ্ট পুরাতনকে প্রায়শঃই চলেন এড়াইয়া; কিন্তু বিগত দিনের সার্থক চিত্র পাইতে চাহিলে, নূতন ও পুরাতন উভয়বিধ উপকরণকেই তুলনায় যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে হয়।)—সেই কথা স্মরণে রাখিয়াই এই গ্রন্থে সেকালের বাঙ্গালার চলমান জীবনচিত্র একালের সামনে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করা হইল।

কোনও দেশের অতীত যুগ সম্পর্কে যথাসাধ্য সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহা একত্র পরিবেশন করিলেই সমাজবিজ্ঞানীর কর্তব্য শেষ হয় না। কার্যকারণ-নির্ণয়সূত্রে আলোচ্য সমাজসম্পর্কে কিছু কিছু সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া স্বাভাবিক এবং সমাজ-ইতিহাসের গতির বিষয় বিভিন্ন ধারণাও এই পথে সহজভাবেই আসিয়া পড়িতে চাহে। কিন্তু জ্ঞাত ও পরীক্ষিত তথ্যাবলীর কষ্টিপাথরে সেই সব ধারণাকে সর্বদাই কষিয়া দেখা আবশ্যক এবং অবশ্যকর্তব্য হইতেছে সংগৃহীত তথ্যের এবং তথ্যনির্ভর সাধারণ-সূত্রের সামগ্রিক ও ধারাবাহিক বিচার। বিজ্ঞানসম্মত পথে বাস্তব সত্যের এইরূপ সন্ধান যদি অসম্পূর্ণও হয় তবু তাহা আদরণীয়। সংস্কারমুক্ত মনে ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারপূর্বক এইরূপ নির্বাচন ও সংশোধনের মধ্য দিয়া আগাইয়া চলিলে বিষম বিভ্রান্তিকর বিমিশ্রিত স্থলগুলিতেও সময়বিশেষে যথেষ্ট আলোকপাত হইয়া থাকে।

ঐতিহাসিক গবেষণার মূলমন্ত্র হইল সত্য; সত্যের সুষম সংস্থাপনাতে প্রকাশ পায় প্রাণময় কবিত্ব। এইভাবে ইতিহাসের মধ্যে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ঘটিয়াছে সমন্বয়। ঐতিহাসিকের নিকট কিছুই কালবারিত নহে। যতই অভিনিবেশ করা যাইবে, প্রাণাত্যয়িত ও শিলীভূত অতীত ততই রূপ ও রঙ্গে, আনন্দ ও আতঙ্কে জীবন্ত হইয়া ঝলকিয়া উঠিবে।

(আলোচ্য পত্রধারায় পাওয়া যাইবে সর্বোপরি সেই জীবনেরই স্বাভাবিক স্পন্দন; মার্জিত সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া ইহা মূর্ত হয় নাই; হইয়াছে সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় তাগিদের স্বতঃস্ফূর্তিতে; কিন্তু সাহিত্য-সামগ্রীর অপ্রত্যাশিত সমাবেশে বহুস্থলেই তাহা প্রোজ্জ্বল।)

৩

(এই আলোচনা রাজনৈতিক ইতিহাস নহে যে রাজা, মন্ত্রীসভা ও যুদ্ধবিগ্রহের বাঁধা বর্ণনা দিলেই কাজ চলিবে; অবশ্য সমাজবিবর্তনে রাজনীতির প্রভাবও আছে

তুচ্ছ করিবার নহে। কেননা দেখা যায়, এ দেশে চলিয়া আসিয়াছে সার্বভৌম সমাজতন্ত্রের নামে কার্যতঃ গোষ্ঠীবিশেষের অনুশাসনেরই প্রাধান্য,—ইহার সামাজিক ও রাজনৈতিক উভয় মূল্যই আছে।

সমাজপতিরূপে এদেশের ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ রাজন্যবর্গ তখন দেশীয় প্রচলিত সমাজবিধান প্রায়শঃই সযত্নে রক্ষা করিয়া চলিতেন; বিশেষতঃ রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজে কোনরূপ গুরুতর পরিবর্তন ঘটানো প্রায় ছিল অসম্ভব। রাজ্য-সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনে সাধারণ জনসমাজের আগ্রহ বা বিস্ময়ও দীর্ঘদিন জাগাইয়া রাখিতে পারে নাই; রাঢ়ীয় পল্লীসমাজের নাড়ীর স্পন্দন বহির্জগতের আতঙ্ক ও দুর্দৈবের উত্তাপে বিশেষ দ্রুততর হয় নাই এবং আজও উড়োজাহাজের পাখার দাপটে গরুর গাড়ীর গতিবেগ কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় নাই।

প্রচলিত এই ধারণা আপাতদৃষ্টিতে যথার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, নিরিখে দেখা যাইতেছে,—রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সমস্তই পারস্পরিক প্রভাবে ভালো-মন্দের দিকে দেশীয় সমাজকে কালে কালে টানিয়া লইয়া চলিতেছে। ফলে, আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আসিয়া, রাষ্ট্র ও বিজ্ঞানের আশ্চর্য উৎকর্ষের দিনে, কেবল রাঢ়ীয় নহে, সমগ্র পৃথিবীব্যাপী গরুরগাড়ীবাহন সমাজের ও জনপদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার প্রয়োজন আছে কি না— সেই মৌলিক প্রশ্নই দেখা দিতেছে।

৪

এ হেন জটিল পরিবেশে প্রশ্ন হইতে পারে, সাধারণ নরনারীর জীবন-কাহিনী লইয়া ইতিহাস রচনার কি সার্থকতা আছে। গোড়াতেই তাই জানা দরকার যে, এই গ্রন্থ হইতেছে মূলতঃ একটি জীবনজিজ্ঞাসাবিশেষ; বিশেষ যুগের নির্দিষ্ট কেন্দ্রে বসিয়া, ব্যক্তি ও সমাজে প্রবহমান সেই জীবনের সর্বমুখী প্রয়াসের অনুসরণ করাই ইহার উদ্দেশ্য।

পাশ্চাত্য মনীষীরা বলেন,— নক্ষত্র-গণনায়, মহাসমুদ্রে ও মহাশূন্যে জাহাজ চালনায়, এমনকি পরাণুর গড়ন বদল করাতেও এখনকার স্পুটনিক-যুগে আর বিস্ময় নাই। বিস্ময় হইল, দূর অতীতের সাধারণ ঘটনাবলীতে এবং আমাদের পূর্বে এখানে যে সব নরনারী বিচরণ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের পরিচয় জানায়,— তাঁহাদের ঘরবাড়ী পাড়া-প্রতিবেশী ক্ষেত-খামার গরু-বাছুর চাষ-বাস সব-কিছু লইয়া তুচ্ছতম ব্যাপারে সুখ-দুঃখ স্নেহ-প্রেম বিজড়িত বিচিত্র দিনগুলিকে গাঁথিয়া গাঁথিয়া, হারানো সামাজিক তথ্যের সংহিতা-সংকলনে। বিস্ময় হইল, তাঁহাদের ঘরোয়া ও গ্রাম সম্পর্কের কথায়, সমাজে বিভিন্ন থাকের মধ্যে প্রয়োজনীয় যোগাযোগের বিবরণে, পরিবার ও পারিবারিক রীতিভেদে, কর্মে নিরতি ও বিরতির সংবাদে, প্রাকৃতিক ঋতু-পর্যায়ের প্রতি মানুষের ভয়-ভাবনার

স্বরূপনির্ধারণে। সমাজের এই সব খুঁটিনাটির ভিতর দিয়া প্রত্যেক যুগের সাংস্কৃতিক-সংস্থিতি, ধর্ম সাহিত্য সংগীত শিল্প শিক্ষা জ্ঞান ও ধ্যানের মধ্যে কিভাবে ক্রমবিবর্তিত হইতেছে—অনুধাবন করায় মিলিবে চরম বিস্ময়।

কিন্তু এইরূপ অনুশীলন সমাজের রহস্যরম্য অতীতের দিগ্‌দর্শনমাত্র; ইহার আবেদন শাস্তরসসমৃদ্ধ, তাহাতেও সন্দেহ নাই। তবুও বলিতে হয়, এতৎসম্পর্কে আরও 'আগে' কহিবার আছে।—সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় সমাজবন্ধনের অন্যতম সূত্র ছিল—'গুণকর্মবিভাগ'; এই মূল নীতিতেই এদেশে ঘটিয়া গিয়াছে পরম বিস্ময়কর এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

গুণ ও কর্মজাত শিক্ষা ও বৃত্তির উপরে নির্ভর করিয়া চলে সকল দেশের সকল মানুষের সমূহ জীবনযাত্রা। সেকালের ভারতে শিক্ষা ও বৃত্তিভেদের ব্যবস্থা ছিল জন্মগত; মানুষের অধিকার ছিল শ্রেণীবিশেষে সীমিত। প্রবল বিদেশী অধিকারের পত্তন হইতেই এদেশের সে-প্রাকার স্বল্পাধিক নাড়া খাইয়াছে। শিক্ষা ও বৃত্তি নির্বাচনে নূতন পরিবেশ আপামর-সাধারণের নিকট উন্মুক্ত করিয়া চলিয়াছে অবাধ অধিকারের রাজপথ। জাতিধর্মনির্বিশেষে এই অধিকারলাভের সূত্রপাতেই দেশীয় সমাজের চোরা-জীর্ণ অচলায়তনে চিড় ধরিয়াছিল। ফলে, সনাতন সমাজকাঠামোর যে পরিবর্তন শুরু হইয়াছে তাহা মৌলিক এবং ক্ষেত্রবিশেষে আকস্মিকও। ইহার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার রহস্য সাধারণের সহজ দৃষ্টিতে অস্পষ্ট থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার ফলাফল হইয়া চলিয়াছে সুদূরপ্রসারী। কেননা, ভুলিলে চলিবে না, ভারতের ধারাবাহিক দুর্গতির হেতুরূপে আবহমানকাল সর্পিল গতিতে চলিয়া আসিয়াছে শক্তির শ্রেণীবিন্যাসজনিত এক সুদীর্ঘ পারবশ্যতা। সেমিটিক ও পাশ্চাত্য বিদেশী অসম রাষ্ট্রাধিকারে পরাধীনতার নগ্ন তাণ্ডব মধ্যযুগের আগুন্তে সুপ্রকট হইয়া উঠিলেও, স্বদেশী সমাজব্যবস্থার স্বর্ণপিঞ্জরের কাহিনীও কম মর্মান্তিক নহে। এই স্বদেশী-বিদেশী বিভিন্ন ধারার ঘাত-সংঘাতেই আখেরে আপৎকালীন সমীকরণ-প্রচেষ্টায় গড়িয়া উঠিতেছে মিলনতীর্থ ভারত-বর্ষের সকরুণ ভাগ্য-ইতিহাস! ইহারই অনিবার্য পরিণামবাহী ভালো-মন্দের বিবর্তনে 'গুণ' ও 'কর্মের' গুরুতর পটপরিবর্তনকারী অদৃশ্য অথচ অমোঘ হস্ত রহিয়াছে সদাসক্রিয়।

সপ্তকাণ্ডে গ্রথিত এই গ্রন্থের পর্বে পর্বে প্রকীর্ণ হইয়া আছে অঙ্কে-অঙ্কে আগাইয়া-চলা অলক্ষ্য ভাগ্যবিপ্লবের সেই নাটকীয় পরিণতি। এই পরিণতি কোনো বিশেষ অধ্যায়ের বিষয় হয় নাই; কিন্তু সমগ্র গ্রন্থব্যাপী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্রমপরিণত অলিখিত এই দিক্‌টির দিকেও সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে আশা করি। এই নাটকীয় বিস্ময় কেবল বিদ্যানুশীলনের বিষয় নহে; ইহা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত হইয়া সকল বিস্ময়ের উপরে চলে।

৫

প্রাগাধুনিককালে এই বিপর্যয়ের জেরটানা একটি অধ্যায় হইতেছে,—আমাদের পিতৃ-পিতামহগণের এই আলোচ্য জীবনকাহিনী। আপাততঃ ইহা খণ্ডিতরূপে গ্রথিত করা হইল; ইহা ছাড়া বর্তমানে উপায়ান্তর নাই। কারণ, কোনও দেশের প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক মানুষের জীবনধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া কখনই সম্ভব নহে। সুতরাং, সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া আলোচ্য প্রকরণগুলিতে ব্যক্তি ও সমাজগত কতকগুলি বিশেষ দৃষ্টান্তের দিকেই দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট রাখিতে হইয়াছে,—যদিও তাহা জটিল সম্পূর্ণ সত্যের সমগ্র রূপ নহে—রূপরেখামাত্র। তবে, ইহা হইতেই সাধারণভাবে সেকালের সমাজের একটা মোটামুটি হদিশ পাওয়া যাইবে।

বর্তমানে আমাদের সমাজচক্রের যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটিয়া যাইতেছে এই অবস্থায় ইহার মূল্য কম নহে। যাঁহারা পল্লী ও সহরের সহিত যোগযুক্ত তাঁহারা জীবনযাত্রার এত দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছেন যে, বিশ-পঁচিশ বৎসর আগের জীবন ও সমাজ-সম্পর্কে বর্তমান সহরবাসীর স্পষ্ট ধারণা হওয়া প্রায় অসম্ভব; দেড় শত বা দুই শত বৎসর আগে অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার কল্পনা করা এখনই দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। যতই দিন যাইবে ততই আরও কঠিন হইয়া পড়িবে; তখন সাধারণ-পত্রলেখকের আত্মপরিচয়-সম্বলিত এইরূপ পত্রসংকলন হইতে সমাহৃত তথ্যসম্ভারই জাতীয়-ইতিহাস রচনার মহামূল্য উপকরণ বলিয়া গুরুত্ব লাভ করিতে থাকিবে।

উপরন্তু, যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার- ও উন্নতিসাধনে- সৃষ্ট মানুষের নূতন পরিবেশ যেভাবে তাহার জীবনপ্রবাহকে আন্তর্জাতিক ভাবনায় প্রভাবিত করিতেছে তাহার ভিত্তিতে বাঙ্গালীর ইতিহাস ধাপে ধাপে কোথায় গিয়া পৌঁছিবে কে জানে! কিন্তু যেখানেই পৌঁছাক, ভবিষ্যতের সেই অনির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতেও এই পত্রধারার মূল্য অপরিসীম বলিয়া স্বীকৃত হইবে। কারণ, অতীত-জীবনের ঐতিহ্যসম্মত অভিজ্ঞতার নিকষে বর্তমানকে যাচাই করিয়া অনাগতকে সমৃদ্ধতর করার নির্দেশপ্রাপ্তি,—এইরূপ অনুশীলনের এক পরম লাভ।

৬

মনীষীরা বলেন,—প্রকৃত সভ্যতার অন্তরের কথাটি হইতেছে ধীশক্তির অনাসক্ত ঔৎসুক্য; সমাজ-ইতিহাস রচনায় সে ঔৎসুক্যকে উত্তীর্ণ হইতে হয় অগ্নিপরীক্ষায়। সামাজিক ইতিহাস জনসমূহের ইতিহাস। ব্যষ্টি, গোষ্ঠী বা অভিজাত সম্প্রদায়ের কথা বিচ্ছিন্নভাবে জড়ো করিলে সে-ইতিহাস হয় না; কারণ, কেবল ইহাদের লইয়াই দেশ নহে, ইহারা প্রত্যেকে দেশের একাংশমাত্র। জনসাধারণের জীবনযাত্রার বিবরণযুক্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিকাদি

নিখুঁত নানাতথ্য সমাবেশ না করিতে পারিলে কোন জাতিকে তাহার মর্মস্বরূপে জানিতে পারা যায় না।

সুতরাং রাগদ্বেষবিবর্জিত হইয়া জাতীয়-সংস্কৃতির উৎসমূলে আমাদের পৌছিতে হইবে। সুদূরকালাগত ঐতিহ্যসমূহের অন্ধভাবে সংরক্ষণকারী গ্রামসমূহের মর্মদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিমল আলোকধারা-সম্পাতে অনুসন্ধান চালাইতে হইবে। আধুনিক জীবনরথের বিরস চক্রনিনাদ-সত্ত্বেও গ্রামের জীর্ণ পুঁথি, সুবিশাল দীর্ঘিকা, ভাঙ্গা মন্দির, দেউলহীন দেবতা, দেবতাপেক্ষা প্রণম্য প্রবীণ-প্রবীণা—প্রত্যেকের অন্তরের কথা আমাদের কান পাতিয়া শুনিতে হইবে। ইহাদের কথা উপেক্ষা করিয়া দেশের সামাজিক ইতিহাস রচনা করিতে যাওয়া হাস্যকর ব্যর্থ প্রয়াসমাত্র।

সত্যকার সামাজিক ইতিহাস উপন্যাস অপেক্ষা চিত্তগ্রাহী। যুগের পর যুগ চলিয়া যাইতেছে,—সেই ক্ষেতের কৃষাণ, ঘরে তাহার সারাদিন ব্যস্ত বধূ সন্ধ্যার প্রতীক্ষায়, চৈত্রের অলস দুপুরে নির্জন প্রান্তরে রাখালের সুললিত বেণুধ্বনি, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের পঙ্কাবশেষ পুকুরে মাছধরার সমারোহ, আষাঢ়ের জলভরা ধানক্ষেতে বহুহস্তের কর্মচঞ্চলতা, পৌষের মিষ্ট রৌদ্রে চাষীর খামারে ধান্য-আহরণের দিনভর সশব্দ ঘাতপ্রতিঘাত, সন্ধ্যায় মড়াই বেড়িয়া কুললক্ষ্মীগণের আলোর 'গণ্ডী' রচনা—চঞ্চলা লক্ষ্মীকে অচলা করিবার প্রত্যাশায়, ফাল্গুনে নূতন গুড়ের গন্ধে-ভরা অন্ধকার দীর্ণ করিয়া ক্ষীণ আলোকে আখশালের কলগুঞ্জন, সন্ধ্যায় সম্পন্ন গৃহস্থবাড়ীতে পুরাণ কীর্তন কথকতার আসরে সমাবিষ্ট সংযত নরনারী,— সমস্ত মিলিয়া সবই যেন শান্ত সমাহিত ভদ্র অনাড়ম্বর এবং অভ্যস্ত তাঁহাদের অতি সাধারণ জীবনযাত্রায়; সদাপরিবর্তনশীল রাজনীতি, সমাজনিয়ম ও আচার-বিচারের জটিল লূতাতন্তুতে বিজড়িত ও শাসিত হইয়াও তাহারা সহজ।

কিন্তু দৃশ্যতঃ সেই সহজ মানুষের চিত্র ধরিয়া দিয়াই আমরা নিরস্ত হইতে পারি নাই, মর্ম-বিশ্লেষণও করিতে হইয়াছে; কারণ, সমাজ-ইতিহাসে এই সহজ-জীবনরসের অতিরিক্ত কথাও আছে এবং সেই অভাবিতের অনুক্ত ব্যঞ্জনাটি পরিস্ফুট হইলে তবেই অবচিত তথ্যসম্ভারের আলোচনা যথার্থ হইতে পারে। পতন-অভ্যুদয়ের মধ্য হইতে ভারতীয় মানবতা যুগে যুগে ব্যষ্টি, কখনও বা গোষ্ঠীজীবনে নিগড়ভাঙ্গা মুক্তিপ্রবণতায় বিভিন্ন দিকেই আপন পূর্ণতর মহিমা বিচ্ছুরিত করিয়া চলিয়াছে। প্রাচীন সংস্কারমুক্ত, স্বাধীন চিন্তাসমন্বিত ও বিচারবুদ্ধিদীপ্ত চিরন্তন দুর্লভ-মানুষের সেই অন্তরতর ব্যক্তিত্বের তাৎপর্যের মধ্যেই যুগসন্ধিকালের ঐতিহাসিক ইঙ্গিত আত্মগোপন করিয়া থাকে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত সমাজের বাতিলের দলও আছে; সমাজের চোখে মরিয়া তাহারা তলাইয়া গেলেও ইতিহাসের কাছে তাহারা মরিয়াও বাঁচিয়াই আছে; সুতরাং তাহাদেরও কথা আছে এবং উপেক্ষিত হইলেও তাহা উপেক্ষণীয় নহে।

বর্ত্তমান গ্রন্থে আমরা সংগৃহীত তথ্যাবলীর যথোচিত বিচারের প্রসঙ্গে, বিশেষ করিয়া বিভিন্ন যুগসন্ধিকালের নিগূঢ় ইঙ্গিতের প্রতিও দৃষ্টি রাখিয়াছি। সেই প্রয়াস নিষ্ফল হইয়াছে, এমন বলিতে পারি না, কারণ, ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে গিয়া স্থলে স্থলে আচম্বিতে এমন বস্তুরও সন্ধান মিলিয়াছে যাহা বাঁধা সড়কে সুলভ নহে। তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তও অবধারিত হইয়া পড়ে যে, মানুষ বাহিরের কোনও অন্ধ শক্তির ক্রীড়নক নহে; বাস্তব জীবনবোধের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া নিজের ইতিহাস সে নিজেই রচনা করে; আবার বাস্তব অবস্থার চাপ হইতেও গড়িয়া উঠে সমাজজীবনের সঠিক ইতিহাস।

আলোচ্য খণ্ডে সেইজন্য চেষ্টা করা গেল,—যুগের সেই চলতি জীবনযাত্রাকে তাহার সরল, জটিল ও বাতিল—সকল মহলায় যথাসম্ভব সম্পূর্ণরূপে দেখাইতে এবং অধিকন্তু, দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত পত্রধারায় প্রাণসঞ্চার করিয়া আছে,—সবার উপরে যে 'মানুষের সত্য',—তাহারই যাথার্থ্য সন্ধানের ॥

সমাজ-দর্শন

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী জনসমাজকে লইয়া ভারতবর্ষের এই পূর্ব সীমান্তে ভারতীয় সভ্যতা একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করিতেছিল। ভারতীয় সমাজবিধির বুনিয়াদের উপরেই স্থূলতঃ এই বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালী সমাজ প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় সমাজ মূলতঃ ছিল সমাজতন্ত্রভিত্তিক; ইহার বৈশিষ্ট্য মোটামুটি এইরূপ,—১. 'লোকরঞ্জক' সমাজরক্ষক রাজতান্ত্রিকতা এবং কৃষিপ্রধান স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লীসমাজের প্রয়োজনীয় বিন্যাস; ২. সমাজগঠনের দিক্ হইতে বর্ণাশ্রমব্যবস্থা, (আদৌ, গুণ ও কর্মগত, পরে) জন্মগত জাতিভেদ ও ব্রাহ্মণ্যানুশাসন এবং ৩. ভাবাদর্শের দিক্ হইতে 'ধর্ম'বোধ ও 'কর্ম'বাদ। এই ভারতীয় উত্তরাধিকারের সহিত জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাব এবং আর্যেতর বাঙ্গালীর পূর্বপ্রচলিত নিজস্ব লৌকিক ধর্ম, বিশ্বাস-অবিশ্বাস ও আচার-বিচারের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। পরবর্তীকালের ইসলামি ভাবা ও সংস্কৃতির এবং বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবও বাঙ্গালীসমাজে পড়িয়াছে ওতপ্রোত হইয়া। অতঃপর পাশ্চাত্য-অধিকারে ঘটিয়াছে তাহার সর্বতোমুখী প্রত্যক্ষ পরিবর্তন।

১৬৫২ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ বাঙ্গালাদেশে শাহ শুজার সুবেদারীর সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যাহ্নভাগে ইংরেজ-আগমনের সূত্রপাত হইতে— ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ, অর্থাৎ লর্ড ল্যান্সডাউনের শাসনকালে ইংরেজ-অভ্যুদয়ের মধ্যাহ্নকাল-পর্যন্ত, এই আলোচ্য সময়—ইহার প্রথম দিকে মোগলের শাসন-শোষণ, দেশের অভ্যন্তরে পাঠান-উপনিবেশ এবং মোগলদের সহিত তাহাদের খণ্ড বিরোধ ও ক্রমান্বয়ে পাঠান-মোগলশক্তির বঙ্গসমাজভুক্তি; আর শেষ,—ইংরেজ রাজত্বের ঋদ্ধিকাল অবধি, কিঞ্চিন্ন্যূন আড়াই শত বৎসর।—'চিঠিপত্রে সমাজচিত্র' গ্রন্থ এই কালেরই একটি নির্ভরযোগ্য রেকর্ড-বিশেষ বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। মধ্যযুগের বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী সমাজের দুষ্প্রাপ্য ইতিহাসের পরিশিষ্টাংশের অভাব ইহা পূরণ করিবে, সন্দেহ নাই।

২

এই সময়ের বাঙ্গালীসমাজের দিকে তাকাইলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, এখানে ব্রাহ্মণ গুরু পুরোহিতের একাধিপত্য এবং বিধি-নিষেধের বাহুল্য। এদেশে তুর্কী-আক্রমণের উপোদ্‌ঘাতেই সর্বজন মানসের জড়তা প্রকট হইয়া উঠে। তদবধি দীর্ঘ শতাব্দীসমূহের বিদেশী বিধর্মী অধিকারের আওতায় এ দেশের জনসাধারণ বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল; উপরন্তু, প্রায়-একটানা পাঁচ শত বৎসরের সমষ্টিগত নিশ্চেষ্টতায় জাতির মেরুদণ্ড আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মানুষ নিজে অসমর্থ হইলে এবং আত্মবিশ্বাস হারাইলে তখন অদৃষ্ট দৈব দেবদেবী গুরু-পুরোহিত তন্ত্রমন্ত্র তুকতাক ইত্যাদির আশ্রয় লইয়াই তাহারা বাঁচিতে চাহে; ইহকালে

ব্যর্থ হইয়া পরকালের দিকে তখন লক্ষ্য নিবদ্ধ করিতে চায়। সুতরাং বাঙ্গালীসমাজের বিগত শতাব্দীসমূহের ইতিহাস হইল তাহার গতানুগতিক জীবনের ইতিহাস,—কূর্মবৃত্তির ইতিহাস এবং এই ইতিহাস শুধু হিন্দুসমাজের নহে, আবহাওয়ার গুণে এদেশের মুসলমান জনসাধারণেরও এই একই দশা ঘটিতেছিল।

ভারতবর্ষের বেদ-বেদান্তের অনুশীলন তখন বাঙ্গালীরা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছে; গীতা-ভাগবতের ভক্তিবাদ তাহাদের অন্তর স্পর্শ করিতেছে না। তন্ত্রমন্ত্র যাহা শতাব্দী-পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল তাহা এবং ভাষায়-সৃষ্ট মন্ত্রে গোপনীয়তা আরোপ করিয়া অটল বিশ্বাসে অন্ধভাবে লোকে ব্যবহার করিতেছিল। বাঙ্গালা মন্ত্রের উৎপত্তিতে আমরা এই সূত্রের সন্ধান পাইতেছি। আর্যের ও আর্যেতরগণের অতিবিকৃত পুরাণ ও উপপুরাণে এবং হিন্দু-বৌদ্ধ তন্ত্রে নিহিত ধর্মবিশ্বাসে মিলিয়া তখনকার সমাজে এক কিম্ভূত অবস্থা সংঘটিত হইয়াছিল। এই ধারায় রচিত মন্ত্রতন্ত্রাদির গ্রন্থ অজস্রধারে পাওয়া যাইতেছে।)

৩

(ষোড়শ শতকে মহামনীষী রঘুনন্দন স্মৃত-বিস্মৃত অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ ও সংকলন করিলেন। আর্য-আর্যেতর ধর্ম ও লৌকিক নানা ধর্মের ঐতিহ্য, আচার-অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলা-সংস্থাপক কালোপযোগী সংস্করণে রূপ লইয়াছিল তাঁহার 'অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব'। নব্যন্যায়ের চর্চাতেও নবদ্বীপের তখন ভারতব্যাপী সুনাম। ইহার ধারাও প্রায় আট শত বৎসরের প্রাচীন।) পক্ষান্তরে, বালক, জিকন, যোগ্লোক, জিতেন্দ্রিয় হইতে শুরু করিয়া ভবদেব-ভট্ট জীমূতবাহন অনিরুদ্ধ-ভট্ট বল্লালসেন হলায়ুধ-ভট্ট শূলপাণি বৃহস্পতি শ্রীনাথ রঘুনন্দন গোবিন্দানন্দ প্রভৃতি বাঙ্গালী ধর্মশাস্ত্রকারগণের নাম হাজার বৎসর ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং আধুনিককালেও ভারতের সর্বত্রই এই শ্রেণীর বিভিন্ন নিবন্ধকারের মতামতের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাঁহাদের ও পরবর্তী যুগের নবদ্বীপের স্মার্ত পণ্ডিতগণের অনুকরণে এ দেশে ছোট-বড় অসংখ্য স্মৃতিকার পণ্ডিতের ও তাঁহাদের বিহিত বিধি-বিধানের আর কোনও দিনই অভাব ঘটে নাই।' (বৈচিত্র্যপূর্ণ বাঙ্গালীসমাজের স্থিতিস্থাপকতার জন্য একদা ইহার প্রয়োজন ছিল নিশ্চয়ই; কিন্তু বিধি-বিধান যখন প্রাণহীন প্রথারূপে জনমানসের বুদ্ধিভ্রংশতা ঘটাইতে থাকে তখন যে তাহা ইতিহাসের অভিশাপ, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে, 'দিগ্‌বিজয়-বিচারে' ন্যায়ের ফাঁকি খুঁজিতেও বাঙ্গালী যে পরিমাণ উদ্যম অপচয় করিয়াছে তাহারও মূল্য ও জেরও কম নহে।)

(সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ন্যায় স্মৃতি জ্যোতিষ বৈদ্যক গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ এদেশে এখনও খুঁজিলে রাশি-রাশি পাওয়া যায়। 'যাত্রানির্ণয়' 'ক্রিয়াসিদ্ধ' 'জ্যোতিষবিদ্যা'

'জ্যোতিষতত্ত্ব' 'স্বরোদয়-ভাষা' 'কপালচরিত্র' ইত্যাদি এই ধরণের রচনা—জ্ঞাত ও অজ্ঞাত রচকদের—তখনকার সমাজের চাহিদা মিটাইয়াছে। 'কপালচরিত্র' গ্রন্থে শাহ্ শুজার আদর্শ কপালপোড়ার উল্লেখ আছে। এদিকে গুরু-পুরোহিত, 'ব্যবস্থাপক' বা 'সভাকর' ভট্টাচার্যের মাধ্যমে সমাজে 'ভাষ'-এর পর 'ভাষ' দিনের পর দিন গতানুগতিকতায় সঙ্কলিত করা হইয়াছে। 'পুষ্পমাল্য'-ভ্রমে সেই সব প্রায়শঃই অর্থহীন বিধি-নিষেধের নাগপাশে পরিবেষ্টিত ও পিষ্ট জরাজীর্ণ সমাজ ভ্রষ্টবুদ্ধি ও নিঃসাড় হইয়া গিয়াছে। এখনও দেখা যাইবে, এদেশের নিভৃত প্রত্যন্ত পরিবেশে সেই ক্ষীয়মাণ পল্লীসমাজ এই পুরাতন ধারারই জের টানিয়া চলিয়াছে।)

প্রসঙ্গতঃ 'বল্লাল সেন্যা' কৌলিন্যপ্রথা ও মেলবন্ধনাদির আলোচনাও করিতে হয়। ইহার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উভয় দিক্ই দেখিবার আছে। এই সকল বন্ধন আড়ষ্ট উচ্চতর সমাজকে ধর্মান্তর গ্রহণের দুর্ঘটনা হইতে একদিকে যেমন ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে, পক্ষান্তরে, সমাজকে সেই দুর্ঘটনার দিকেই ঠেলিয়া দিবারও কারণ হইয়াছে।

৪

(ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে এদেশে চৈতন্য জাগিয়াছিল নিশ্চয়ই, তবে সে চৈতন্য কালক্রমে সাধারণ জনসমাজে 'দীনহীন দাস'-সুলভ মনোবৃত্তিই গড়িয়া তুলিয়াছিল। অবশ্য তিনি 'আপ্ত'বর্গের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও ধর্মচেতনার সঞ্চার করিয়া ভগবান্‌কে আপনজন ভাবিয়া একাধারে পঞ্চরসে উপাসনা করিতে শিখাইয়াছিলেন; রাগানুগা ভক্তিতে ভগবান্‌কে এত কাছে আনার কথা প্রাক্-চৈতন্য ঐতিহ্যে ঠিক এইভাবে ছিল না। ঈশ্বরের প্রতি এই উদ্দাম প্রেমভক্তি—এই জীবন-দর্শন সম্পূর্ণরূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের দান এবং এই প্রেমধর্ম প্রচারেই বাঙ্গালীর আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু দাসসুলভ মূঢ়জনমানসে এই ধর্মবোধে বিষক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। ঐহিকের প্রতি ঔদাসীন্য ও ভবসিন্ধুতারণ 'গুরু গোঁসাই'-এ আত্যন্তিক নির্ভরতা হেতু 'সুনীচ' ও 'সহিষ্ণু' জনসমাজ নিরুদ্যম ও যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট হইয়া দুর্দশার শেষ ধাপে নামিয়া গিয়াছিল। তাই, পরবর্তীকালে আমরা দেখি, 'মুনি' সাহেব যখন কাঠগোলায় হিসাব রাখিতে তৎপর, 'চীপ' সাহেব যখন 'গড়া' কাপড়ের কলাও ব্যবসায়ে ফাঁপিয়া উঠিয়াছেন, তখন গোঁসাইদাস বাবাজী শ্রীঅঙ্গে কৌপীন ধারণ করিয়া 'গুরু জা করেন' ভরসায় ইষ্টমন্ত্রের অনুধ্যানেই বিভোর হইয়া দিন গুজরাইতেছেন। আবার সম্রান্ত 'গৃহস্থ' মোহন্ত-মহারাজেরা স্থানে স্থানে বিশেষ-বিশেষ দেববিগ্রহের সেবাধিকার পাইয়া একদিকে যেমন 'প্রাণহীন আড়ম্বরের ও মেদমেদুর বিলাসব্যসনের অনুকারী' হইলেন, অপরপক্ষে, আউল-

বাউল-বৈরাগী ইত্যাদি ব্রাত্যপ্রধান-সমাজ মানুষের একটি সম্-আসরের অধিকার লাভ করিয়া, ধর্মে সহজ অনুষ্ঠানের পথে মুক্তির আশ্বাস পাইয়া, বিচিত্র ভাবানন্দে ভোর হইয়া পারের প্রতীক্ষায় 'দশা' প্রাপ্ত হইতেছিলেন। ফলে, একদিকে যে তাঁহারা 'চরম' দশা প্রাপ্ত হওয়ার দিকেও আগাইয়া যাইতেছিলেন এবং ঘরে ঘরে 'নাম' বিলাইয়া গোটা দেশটাকেও ওপারের পথে আগাইয়া দিতেছিলেন তাহা হইতে রক্ষার উপায় কেহ তাঁহাদের বাৎলাইয়া দেয় নাই।

আদিকাল হইতে অতি-আধুনিক কাল পর্যন্ত দেখা যায়,— দেশ-বিদেশে ভারত এই বাণীই বহন করিয়া ফিরিতেছে—'হরি, পার কর আমারে'। এই এপার-ওপারের চৈতন্যের সমীকরণ ষোড়শ শতকে কাহারও ভাবনায় জাগে নাই। চারি শত বৎসর পরে আজ আণবিকযুগের মার হইতে ত্রাণ পাইবার নিমিত্ত যে আপদ্ধর্মের অনুসন্ধান করা হইতেছে তাহাতে এই একচক্ষু অধ্যাত্মবোধ কতখানি সহায় হইতে পারে, তাহাও দেখিবার বিষয়।

মহাপ্রভুর বাণী ও সংগঠনের আধিভৌতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আর একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতেও প্রণিধান করিতে হয়। সেদিনকার ভাবাদর্শে চৈতন্যদেব হরিভক্তি-পরায়ণ ব্রাহ্মণ চণ্ডাল অভিন্ন,— ঘোষণা করিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদের কঠোরতা অংশতঃ শিথিল করিয়াছিলেন এবং এই সুযোগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে স্থান লাভ করিয়া ধর্মান্তর গ্রহণ হইতে সমাজচ্যুত বহু নরনারী রক্ষা পাইয়াছিল। মুসলমানসম্প্রদায়ও অবশেষে তাঁহার ভাবধারা হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে পারে নাই।

(অবশ্য এ সত্যও অস্বীকার করা যায় না যে, মহাপ্রভু স্বয়ং সামাজিক জাতিভেদের কোন নিয়ম লঙ্ঘন করেন নাই, তাঁহার ভক্তদিগকেও লঙ্ঘন করিতে উৎসাহ দেন নাই। মহাপ্রভুর পারিষদ এবং অন্যান্য ভক্ত বা তাঁহাদের বংশধরদের কাহারও বিবাহাদিতে বর্ণাশ্রম-চ্যুতির প্রমাণ নাই।) বৃন্দাবনদাসের উক্তিতে দেখি,— 'বিপ্রপাদোদকের' দৈব 'মহিমার' উপর অবিচলিত বিশ্বাস অথবা 'কুম্ভীপাকের' 'জ্বালায়' পাষণ্ডীকে পোড়াইবার প্রবণতা এবং 'সকল ভুবন' 'নির্বংশ' করিবার বাসনা মহাপ্রভুরও জাগিয়াছিল। 'শিরে' 'লাথি' মারিয়া নিত্যানন্দপ্রভুর বৌদ্ধ-দলন প্রসঙ্গও সুবিদিত।— এই সকল বর্ণনা অলৌকিক লীলার হইলেও অর্থহীন নহে।

(উচ্চবর্ণের কঠোরতা, ইসলামের প্রলোভন ও অন্য নানা কারণে যখন সমাজের হিসাবছাড়া নিম্নশ্রেণীর জনসমূহ ধর্মান্তর গ্রহণ করিতেছিল তখন তাহাদের প্রতি মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ সহানুভূতির ও কর্মোদ্যমের কোন নিদর্শন মিলে নাই; পক্ষান্তরে, ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোকেরাও তখন 'আপনেই গিয়া হয় ইচ্ছায় যবন' এবং প্রতিক্রিয়ার দেখা যায়, হিন্দুসমাজ প্রাক্তন 'কর্মের' দোহাই দিয়া দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াই সম্পূর্ণ

নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট; 'আপনে যে মৈল' তাহাকে উদ্ধারের প্রয়োজনই দেখা দেয় নাই। এবং বলা বাহুল্য, এইরূপ 'উদ্ধার' না-পাওয়া 'বৈষ্ণবনিন্দক' 'দুরাচারের' অপ্রতুলতা এদেশে কোনও কালেই ছিল না। উপরন্তু আমরা দেখি, চাতুর্বর্ণ্যের স্থলে জন্মগত জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা সে সময়ের ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই বিদ্যমান ছিল এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গালাদেশে ধর্মান্তরগ্রহণের অনুপাত সর্বাপেক্ষা বেশী।)

৫

শ্রীচৈতন্যের যে অন্তরঙ্গ ভক্তিরসসাধনা তাহা কখনই অধিকারিনির্বিচারে আচরণের জন্য নহে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই সেই গূঢ় সাধনা জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হওয়ায় দেশে বলহীনতা আসিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। (মোগল-শাসনেও বাঙ্গালাদেশের অবনতি ঘটিতেছিল দ্রুতভালে,—বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে। বাঙ্গালার ধনসম্পৎ চলিয়া যাইতেছিল বাঙ্গালাদেশের বাহিরে; ফলে, সুযোগসন্ধানী ব্যক্তিবিশেষের কপাল খুলিলেও সাধারণ বাঙ্গালীসমাজের দেহে মনে তখন স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল দারিদ্র্যের ছাপ। আলোর নীচে অন্ধকারের মতো ঐশ্বর্যের পাশেই দেখা যায় 'অকিঞ্চনতা'। অহিংস ও বিমিশ্র বৈষ্ণব-ধর্মের প্রসার, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের শিথিলতা এবং অক্ষমের অদৃষ্টবাদ ইহার জন্য অংশতঃ দায়ী ঠিকই; কিন্তু বিশেষ কারণ, মোগল-সাম্রাজ্যের ছত্রচ্ছায়ায় দেশের ক্ষাত্রশক্তির নির্ভরপ্রসুপ্তি, রাজস্বাদির খাতে মোগলের মাত্রাতিরিক্ত শোষণ ও তাহারই ফলে অপ্রতিরোধ্য অন্তঃসারশূন্যতা। ইংরাজবণিক্-পর্বেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যবিস্তার এবং আর্থিক নিষ্কাশন ও চিরস্থায়ী ভূমিব্যবস্থা বাঙ্গালাদেশকে যে বিপর্যস্ত পরিস্থিতির মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিল তাহার বিষময় ফল সমাজ এখনও ভোগ করিতেছে।

যাহাই হউক, কোন্ কোন্ নীতিচক্র দেশের ভাগ্যরথকে কখন, কিভাবে, কি পরিমাণে, কোথায় লইয়া চলিয়াছে তাহার পরিচয়-নিরূপণ অত্যাবশ্যক।

৬

(ভারতীয় সভ্যতার ভাবাদর্শের সুচিরকালের বৈশিষ্ট্য হইতেছে—'ধর্ম'বোধ ও 'কর্ম'বাদ। কিন্তু আলোচ্য যুগের হীনবীর্য বাঙ্গালীসমাজে এই কর্মবাদের অপহ্নবে, ক্লৈব্য ঘটাইয়া তাহাকে লক্ষ্মীছাড়া করিয়াছিল,—তাহাও ঐতিহাসিক সত্য। নিয়তিনির্ভর প্রাক্তন কর্মবাদ বাঙ্গালীকে অনেকক্ষেত্রে আলস্য হইতে নিষ্ঠুর ও নিশ্চেষ্ট কাপুরুষতার খাদে নামাইয়াছে নিঃসন্দেহ; তবে বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব যে আজও কিছু অবশিষ্ট রহিয়াছে, সে মনে

হয়, তাহার জান বাঁচাইতে আপৎ-'ধর্ম'বোধের ফলেই। ইসলামি অভিযানের উপক্রমেই যবনরূপী ধর্মঠাকুর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—

বামনে ডাকিয়া প্রভু কহেন কৌতুক তিন ভাগ জাজপুর করিব তুড়ুক।
বেদবিদ্যা ঘুচাইয়া পড়াব কোরাণ নিশ্চয় কহিল তোরে ইথে নহে আন[১]।

এইভাবেই এদেশে দীর্ঘ শতাব্দী ধরিয়া অল্পবিস্তর চলিতে লাগিল তুর্কানা পদ্ধতির অভিযান,—'গোহাড়ের ঘায়ে' দেশের মর্মপীঠ 'দেউল দেহারা' ও 'পাষাণ প্রতিমা' চূর্ণীকরণ যাহার প্রত্যক্ষ পরিণাম, গ্রাম হইতে কৃষ্টির ধারক 'ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সেয়াসি' বিতাড়ন এবং লুণ্ঠতরাজ ও বলপূর্বক 'জাতিনাশ',—

নাড়ু মন্না : না করে আন :
ভাল হিন্দুর ছেল্যাকে থুক দিয়া করে মুছলমান[২]।

এই সকল ধর্মান্তরিত হিন্দুসন্তান হইয়া উঠিল প্রতিক্রিয়াশীল কঠোর মুসলমান, ব্যবহারে তাহারা অতি ভয়ানক,—

সেই হিন্দুর ছেল্যা আল্ল না পাই :
এক এক জনা খ্যাতে চায় তিন তিন গোটা পাই[২]।

উপরন্তু, সপ্তদশ শতকের কড়চাকারের মতে, এই কার্যে ধর্মের দোসর জুটিল 'হাওা বিবির' গর্ভজাত 'জগাই মাধাই' এবং ইহাদের সাকরেদীর ফলেই বেপরোয়া,—

বামনে জবন করে দুনিয়ার নাথ[৩]।

রাঢ়ের সেকালের প্রাণকেন্দ্র ত্রিবেণী পাণ্ডুয়া সপ্তগ্রাম ও শান্তিপুরাদিতে তুর্কী অভিযানের আদিপর্ব আলোচনা করিবার অনেক তথ্য সম্প্রতি আমাদের হাতে আসিয়াছে। ইহার বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র[৪] করিয়াছি। ইসলামি অভিযানে প্রথমে তুর্কানা পদ্ধতি, পরে, সুফিয়ানা পদ্ধতিতে এদেশে পুরুষানুক্রমে ইসলাম প্রচার চলিয়াছিল। তুর্কানা পদ্ধতিতে প্রযুক্ত হইয়াছিল গায়ের জোর এবং সুফিয়ানা পদ্ধতিতে মানসপরিবর্তনের প্রয়াস। হিন্দুর ধর্মবোধজাত 'সমন্বয়' চিন্তায় এই দ্বিতীয় পথ হইয়াছিল বিশেষ কার্যকর। আমরা দেখি,

১ পুঁ-প ১খ, পৃ ৭৯ (সমগ্র 'জাজপুর' পালা, ঐ পৃ ৭৭-৮১, প্রসঙ্গতঃ পঠনীয়)

২ ধ-পু-প (ব-পুঁথি, পৃ ৮৭খ)। প্রসঙ্গতঃ, ব্রাহ্মণ মুর্শীদকুলির নাতি-জামাই রাজীখাঁ-নির্মিত ভূগর্ভস্থ নারকীয় 'বৈকুণ্ঠ' স্মরণীয়। বাকী খাজানার দায়ে বাঙ্গালী জমিদার বা আমিলদের তিনি এইরূপ অপূর্ব 'বৈকুণ্ঠ'-বাস করাইতেন (*H. B. Vol 11, p 411*)

৩ পুঁ-প ১খ, পৃ ৭৯

৪ পুঁ-প ২খ, ভূ পৃ ৫-১১

'হিন্দু মুছ্‌লমান দুন ভাই' বিচার করিয়া[১] নিহত 'সুরভি' গাভীকে বাঁচাইতে একত্র বসিয়া গিয়াছে। অবশেষে, হিন্দুমনে তুর্কানা পদ্ধতি স্বীকৃত হইল 'প্রজার পাপের ফল'[২] বলিয়া এবং তাহার বিশ্বগ্রাসী অশরীরী অধ্যাত্ম চিন্তা[৩] বিধর্মী বিজয়ী তুর্কী-বীর 'পীর'-'গাজী'দেরও আত্মকবলিত করিয়া তথা শাসক ও শাসিতের ভেদ লোপ করিয়া বলিতেছে,—

যবনরূপে দিল্লীয়ে কৈলে পাশ্চাই ঠাকুরালি[৩]।

পক্ষান্তরে, বাঙ্গালী মুসলমানের মুখেও শোনা যায় 'সমন্বয়ের' কথা,—

হিন্দুকুলে বলাইল্য স্বরূপনারাণ[৪] যবনকুলে বলাও নাম শক্তি শূলপান[৪]

এইরূপ সুফিয়ানা যখন 'আউল্যাজি' সত্যপীরের রূপ ধরিয়া রক্ষণশীল, দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সমাজকে অভিভূত করিতে চাহিল তখন জাতিমাত্রসম্বল[৫] ব্রাহ্মণের জাতি বাঁচাইবার জন্য সে কি নিষ্ফল আকুতি। অবশেষে, সে প্রবাহরোধে অসমর্থ হিন্দুমানস বাছিয়া লইল 'সমীকরণের' পথ। সেকালের আপদ্ধর্মাবলম্বী হিন্দুসমাজের উক্তি,—

যেই রাম সোই রহিম দোনোই এক[৬]।

মুসলমানের মনেও দেখি, অপ্রত্যাশিত ভাবনা,—'আল্লার' উপরেও হিন্দু দেবতার স্থান এবং সে স্থান অধিকার করিয়াছেন 'গজেন্দ্রবদন' গণেশ[৭]। মুসলমানের কণ্ঠে শোনা যায় কৃষ্ণলীলাগান[৮] অজস্রধারে[৯] এবং সুফী কলন্দরী যোগসঙ্গীত,—

হায় রে মরি মালা গাথিয় যতনে রে,
মনের মানিক গাথিয় যতনে।[১০]

১ 'হিন্দু-মুছ্‌লমান দুন ভাই বিচার করে' (ন-পুঁথি, পৃ ৮৭ক)

২ ক-চ, পৃ ৬ ৩ সা-প্র ৩খ, পৃ ৭। আওরঙ্গজেবের সমকালীন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেতর হিন্দু কবির উক্তি

৪ পুঁ-প ২খ, পৃ ৩১৯, ভূ পৃ ৯। বাঙ্গালীর ধর্মঠাকুর ('স্বরূপনারায়ণ' ইত্যাদি নামের) এমন এক শক্তিশালী দেবতা যাঁহার মাধ্যমে বৈদিক তান্ত্রিক জৈন বৌদ্ধ ইসলাম বৈষ্ণবাদি সমস্ত ধর্মই বাঙ্গালীসমাজে সমীকৃত হইয়া গিয়াছে।

৫ 'সব জাইয়া কেবল আছেন মাত্র জাতি, তাও পারা মজাবে এমন দেখি ভাতি'—পুঁ-প ১খ, পৃ ৪৪

৬ পুঁ-প ১খ, পৃ ঐ

৭ পুঁ-প ২খ, পৃ ৩২০ 'প্রথমে বন্দিমু দেব গজেন্দ্রবদন, আল্লার কদম বন্দো হয়ো একমন'। '৭ শ্রীশ্রীদুর্গা। আল্লা করতা। এলাহি'— এই সিদ্ধি পাঠে পুঁথির আরম্ভ। ইহার রচয়িতাও নিঃসন্দেহ জয়রদ্দি

৮ ঐ পৃ ৩১৩, গুপ্পর ফকিরের ভনিতায় গান দ্র.

৯ বৈষ্ণবভাবাপন্ন অসংখ্য মুসলমান কবির রচনা, বিশেষতঃ, সালে বেগের রচিত নূতন পদ দ্র. (পুঁ-প ২খ, পৃ ৩২৩)

১০ পুঁ-প ২খ, পৃ ৩১৪, রচয়িতা গুপ্পর ফকির

বাঙালাদেশের স্নিগ্ধ নিকুঞ্জে বসিয়া ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি এমনকি ধৈর্য তাদিগেও এই মিলনমালা হিন্দু-মুসলমানে মিলিয়া দিনের পর দিন অতি যত্নেই গাঁথিয়া তুলিতেছিল, তাহার অনেক নিদর্শন আমাদের আলোচ্য চিঠিপত্রেও পাওয়া যাইবে। কিন্তু পরবর্তী দুই শত বৎসরের কূটনৈতিক কৌশলে এই 'মাণিক মালা' ছিঁড়িয়া গিয়াছে! হিন্দু-মুসলমানে উন্মত্তের মতো পরস্পরকে আঘাত করিয়া পরস্পরের কাছ হইতে অনেক দূরে ছিটকাইয়া পড়িতেছে। 'সমন্বয়সাধক' সমাজের ভিতও নড়িয়া উঠিয়াছে ভূগর্ভস্থ অসমীকৃত অগ্ন্যুত্তাপে। ক্রান্তিকালীন এই রূপান্তরের স্বরূপ-পর্যালোচনা আমাদের বৃত্তের বাহিরে।)

৭

(কেবল ইসলামি আক্রমণ নহে, বারগীর নৃশংস অত্যাচারও বাঙালীমানসে কালে কালে অধ্যাত্ম চিন্তার রূপ লইয়াছিল। কালবৈশাখী প্রশান্ত হইয়া বসন্ত বাতাসে যেন সমাজ-মানসকে স্নিগ্ধ করিতেছিল। ৫৮২-ক্রমিক সংখ্যায় 'জীবন দত্তের' পত্রখানি[১] পড়িলেই একথা বোঝা যাইবে। রূপকে লেখা এই পত্র 'জীবন দত্তের' ছদ্মনামে, আকস্মিক 'জরাতিসার' পীড়ায় 'জীবানন্দের' মৃত্যু সম্পর্কে।—'দেহতপুরের' 'জীবানন্দ' সেকালের নিরীহ নির্বিবাদী চাষী গৃহস্থ। অজ্ঞাতপরিচয় 'সওার' অকস্মাৎ আপতিত হইয়া খামকা তাহার সোনার সংসার লুঠ করিয়া আগুন জ্বালাইয়া 'জীবানন্দকে' জবরদস্তিতে বাঁধিয়া লইয়া গেল অজানা দেশে। কিন্তু ইহা ঘোরতর অবিচার। সুতরাং প্রতিকারার্থ আবেদন করিতে হয় 'ভারত নগরের' কর্তার নিকটে খাস 'সরকার ঈশ্বরাবাদে,'— ভারতীয় সনাতন সৃষ্টি, সনাতন কৃষ্টি সংরক্ষণকল্পে এবং আখেরে মারীর মূর্ত প্রতীক সে 'জরাতিসার সওারকে' সহ্য করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে। বলা বাহুল্য, ইহাও এদেশের সেই স্বাঙ্গীকরণ প্রচেষ্টা,—বিরূপ বহুরূপকে স্বরূপে আত্মসাৎ করিতে!)

৮

প্রসঙ্গতঃ আসে ফিরিঙ্গী-বণিক্ সম্প্রদায়ের উৎপাতের কথা। বাঙালীর সমাজ-পরিস্থিতির পর্যালোচনায় সে যেন কয়েক শতাব্দীর এক অনবচ্ছিন্ন দুঃস্বপ্ন। একদিকে, মগ-ফিরিঙ্গীর বহুকালব্যাপী লুটতরাজে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ জনমানবশূন্য নিবিড় অরণ্যানীতে পর্যবসিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে, বাণিজ্য ও রাজস্ব ব্যপদেশে বিপর্যয়ে ও শোষণে, দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছিল ইংরেজ-শাসনের প্রায়-নিরুপদ্রব নিষ্পেষণ যন্ত্র। মানুষের

১ চি-প-স ২৭, পৃ ৪৫৯। বিস্তৃত আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য

বাঁচিবার অধিকার তাহাতে ছিল বস্তুতঃ অস্বীকৃত। তাহার কুটিল রাজনীতি উত্তাপের ইন্ধন যোগাইয়াই হিন্দু-মুসলমান 'দুন ভাইকে' পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে মর্মান্তিকভাবে।

মুসলমান-অধিকারে[১] আমরা দেশের রাষ্ট্রীয় অকল্যাণের পাশাপাশি প্রজাপুঞ্জের কল্যাণের সংবাদও পাইয়া থাকি। চাষী গৃহস্থ জনগণের অনাড়ম্বর জীবন তখন কখনও সচ্ছল, কখনও অসচ্ছল। সুখে দুঃখে দিন চলে তাহাদের। কেবল উদরপূরণের জন্ম পথের কুকুরের অনুরূপ আচরণ মানুষে করিয়াছে, এদেশের ইতিহাসে এইরূপ কোনও নিদর্শন নাই।

কৃষিনির্ভর সমাজকে বাঁচাইতে আলমগীর বাদশাহেরও[২] ত্রুটি ছিল না। বহুনিন্দিত নিষ্ঠুর সম্রাট্ এদেশের দুর্ভিক্ষ নিরোধকল্পে আপৎকালে তাঁহার সাধ্যায়ত্ত যে সদাশয় নীতি[৩] গ্রহণ করিয়াছিলেন, 'সুসভ্য' ইংরেজরাজত্বে তাহাও বিভ্রান্ত ও বিধ্বস্ত বাঙ্গালীসমাজের বরাতে মিলে নাই।

কিন্তু তবুও বাঙ্গালী অকৃতজ্ঞ নহে! ইয়োরোপের সাহিত্য ও সংস্কৃতি এদেশের সাহিত্য ও স্বরাজ-সাধনায় এমন কি দৈনন্দিন জীবনেও যে যুগান্তর আনিয়াছে তাহার সুদূরপ্রসারী ফলাফল দীর্ঘকাল সে স্মরণে রাখিবে এবং পল্লীবাঙ্গালার চোখে ইংরাজ 'ঈশ্বর সাহেব শ্রীযুত'[৪] এবং 'সাহেবরূপী' দেবতা অবতার[৫]!

২

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে গুরুতর পরিবর্তনের শুরু হইয়াছে। ইহার পূর্বে দীর্ঘ শতাব্দী যাবৎ এদেশে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন নানা কারণে প্রায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। জাতিভেদের কঠোরতা অস্পৃশ্যতার লৌহকপাটে মূলতঃ রুদ্ধ করিয়াছিল সকল শ্রেণীর চলার পথ। গুরু-পুরোহিতের অপব্যাখ্যায় অধ্যাত্ম

---

১ হোসেন শাহের আমলে শ্রীচৈতন্যের 'ভাবক-কীর্তন' প্রচারে দেশের অবৈষ্ণব 'মধ্যস্থ-সমাজ' তীব্র অসন্তোষে মাত্র আশঙ্কা করিয়াছিল, দৈবদুর্বিপাকে ধানের দাম চড়ায় 'দুর্ভিক্ষ-প্রকাশ' হইতে পারে (চৈ-ভা, ১-১৬, পৃ ৩১৪-৬৫)। শাহ্ শুজার সুবেদারীর সময়ে পাই, -'রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল শুজা, পরম কল্যাণে ত আছিল সব প্রজা'—রূ-থ ১খ, ১ম সং, পৃ ২১

২ দ্রষ্টব্য ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম প্রভৃতিকে প্রদত্ত ফারমান-সমূহের নির্দেশ (দ্র. ব-রা, উপ পৃ ৫ ই.)

৩ বা-অ-ই, পৃ ১৪৫; এইরূপ নীতির নিমিত্তই তিনি 'পাতসা অরংসাহা ভিজি-ঈশ্বর' (বা-সা-ই ১খ, ২সং, পৃ ১০৪৫)—এইভাবে হিন্দু কবির দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকিবেন

৪ চি প-স ২খ, পৃ ৫৬৪। 'সাহেবরাম' (ঐ পৃ ১১২), 'সাহেব পঞ্চানন' (ঐ পৃ ১১৪)—বাঙ্গালী কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের এইরূপ নামও মিলিবে ৫ বা-সা-ই ১খ, ২সং, পৃ ৪৯৬

অনুপম অনাসক্ত 'কর্ম'-বাদ কূর্মবাদে অর্থাৎ বিকৃত অদৃষ্টবাদে পরিণত হইয়া ব্যক্তিগত উদ্যমের রস নিঃশেষে শোষণ করিয়া লইয়াছিল। 'বেদের' দোহাই সত্ত্বেও দৈব বিপৎপাতের অঘটন আশঙ্কায় আত্মরক্ষার্থ সর্বত্র এবং সদা-সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব। শিথিল সমাজে 'ধর্ম'বোধেরও দেখা যায়, অন্ধসংস্কারে এক গতানুগতিক পরিণতি।

শতাব্দীকাল পূর্বে এদেশের পাশ্চাত্য আলোকপ্রাপ্ত মনীষিগণের বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টায় মিল মিলটন কোঁতে দাঁতে বার্ক বেকন সেক্‌সপিয়ারের প্রেরণায় পাশেপাশেই চলিতেছে টোল-চৌপাড়ীতে 'মলমাসতত্ত্ব' 'আপদুদ্ধার' 'আশ্রয়নির্ণয়' অধ্যয়ন, অন্দরমহলে খুল্লনা-ফুল্লরার 'বারমাস্যা' পঠন, চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গাপূজায় 'গোবিন্দদাসের কীর্তন' আস্বাদন, রাজসভায় 'অঙ্গদ-কুম্ভকর্ণের রায়বার' আলোচন, যজমানের হিতার্থে 'শ্বেত হরিণ' লইয়া আভিচারিক যাজনা, আপৎকালে 'কালামুখীর প্রকরণ শান্তি', আরোগ্যকামনায় 'স্বস্ত্যয়ন', 'তুলসী চড়ানো' ইত্যাদি।

সমাজের সদর-মফস্বলের এই অসামঞ্জস্যে জাতীয় প্রগতি সম্ভব নহে। সর্বাঙ্গীণ-সুস্থ সংযোগে উভয় পক্ষেরই হয় বিশেষ বলসঞ্চার; ফলে, দেশের ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্পের ঘটিয়া থাকে রেণাসাঁ বা নবজন্ম।

ষোড়শ শতকের চৈতন্যযুগের মতো উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর রামমোহন-রবীন্দ্র-প্রভাবিত বাঙ্গালীসমাজের উপরতলায় যুগান্তকারী এক আশ্চর্য অভ্যুত্থান সম্ভব হইয়াছিল ঠিকই; কিন্তু অলস জড় নিস্পন্দ সমাজের অভ্যন্তরে শিরা-উপশিরায় তাহা শক্তিসঞ্চার করিতে সমর্থ হয় নাই। শুষ্ক বালুস্তরের অন্তস্তল দিয়া সনাতন জীবনধারা আপন অস্তিত্ব কোনও ক্রমে বাঁচাইয়া চলিতেছিল মাত্র।

পক্ষান্তরে, শরীরের কোষ-বিশেষের পরিপুষ্টি স্বাস্থ্যের লক্ষণ নহে। যুগন্ধর সর্বোত্তম মনীষার স্ফুরণ দেখিয়া সমকালীন সমাজজীবনের পরিমাপ করা যায় না। সেকালে জনসংযোগের অভাবে বাঙ্গালীর সেই শতমুখী সাধনা—সে অভ্যুত্থান আজও সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় প্রেরণা লাভ করিতে পারে নাই। শ্রীচৈতন্যের কেন্দ্রাভিগ প্রেমধর্ম এবং পাশ্চাত্যের কেন্দ্রাতিগ জ্ঞানধর্ম—উভয়ত্রই দেখা যায়, সর্বস্তরের জনসংযোগের দ্বারা এদেশে সর্বাঙ্গীণ সার্থকতায় সুপরিণত হয় নাই। 'সভ্যতার সংকটের' সূত্রপাত এই 'অ-সহযোগ' হইতেই।

✓সুতরাং বাঙ্গালীসমাজের প্রকৃত পরিমাপ করিতে চাহিলে, বাঙ্গালীসভ্যতার অভ্যুত্থানের আলোচনাই যথেষ্ট হইবে না। তাহার অনালোকিত অচলায়তনস্থ অনড় অসাড় অংশের নাড়ীর স্পন্দনও অনুভব করিতে হইবে। এবং বলা বাহুল্য, আলোচ্য গ্রন্থ সেকালের অন্ধ আচার-বিচারের লূতাতন্তুতে পাক-খাওয়া পঙ্কিল সেই বাঙ্গালীসমাজের সুদীর্ঘ ইতিহাসের অস্পষ্ট পৃষ্ঠাগুলিতে আলোকসম্পাতে সমর্থ হইবে।

১০

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা মনে রাখা দরকার।—সুপ্রাচীন বিশাল অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের মতো ধ্বংসপ্রায় কোনও পুরাতন সমাজের অনুসন্ধান চালাইতে অতি সন্তর্পণে আগাইবার প্রয়োজন আছে। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কোনো মহলায় জীবনলক্ষণের আভাস পাইলে, সাদরে তাহা বরণ করিয়া কাজে লাগাইতে হইবে; কোনো মহলায় যুগোপযোগী সংস্কারের আবশ্যক হইতে পারে; কালের সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে কোনটি আবার আগাগোড়া নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে; সম্পূর্ণ বর্জনের প্রয়োজনও দেখা দিতে পারে অকেজো বিধ্বস্ত মহলাগুলির।

সুতরাং পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগে, চিরস্থায়ী বিধিবিধান ও আপ্তবাক্য বড়ো কথা নহে; কারণ দেখা যাইবে, স্থলবিশেষে সমাজকাঠামোর রূপেই পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। এবং 'গুণ' ও 'কর্মের' ভাষ্য বদল করিতে করিতে সমাজে সমাজে মনু-মহারাজ মরিয়া মরিয়া সংবিধানের ভোল ফিরাইতেছেন। এই পরিবর্তনে নূতন জীবন ও নূতন চিন্তার বিভিন্ন স্তরে মৌলিক অথবা ঐতিহ্যসম্মত প্রেরণার যোগান দিতে পারিলেই এইরূপ অনুসন্ধিৎসার সার্থকতা।

এই সন্ধানের পথে বহুপ্রচলিত তথাকথিত সুদৃঢ় সিদ্ধান্তসমূহ নস্যাৎ করার লোভ বা প্রয়োজনও দেখা দিতে পারে। পক্ষান্তরে, নূতন মতের প্রতিষ্ঠা করাও কম বিপজ্জনক নহে; কারণ সযত্নলালিত নূতন মতেও হয়তো-বা বিনষ্টির বীজ লুকাইয়াই আছে। সত্যের দর্শনলাভের দাবী করা অথবা বিতর্কিত বিষয়ে শেষ-কথা বলার চেষ্টাও ধৃষ্টতা। নূতন সত্যকে স্বাগত করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকাই বলিষ্ঠ বুদ্ধির লক্ষণ; আপন ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের সমাধিরচনাতেও সে-বুদ্ধি বিচলিত নহে; কারণ সে জানে, চোরাগলিতে পথ দেখাইবার ভাণ করিলে বিপথে প্রেরণেরই আশঙ্কা বেশী। 'টীকার বিচার কর, না বল উচিত'— এই প্রশ্নের জন্য বনেদী 'দনাই ওস্তাদের' চিরকাল প্রস্তুত থাকাই সমীচীন। হয়তো-বা প্রচলিত ইতিহাসের খোল-নলিচা বদলাইবার প্রয়োজনই দেখা দিবে!

আলোচ্য গ্রন্থের উদ্দেশ্য,—বিশেষ কালে, বিশেষ সমাজে, বিশেষ সভ্যতার ধারাবাহিক বিবরণ প্রদান ও কার্য-কারণের সাধারণ-সূত্রাবলীর অনুসন্ধান; নিয়মমানা ও নিয়মভাঙা বিচিত্র মানবচরিত্রের নিরীক্ষা-পরীক্ষায় তাহার গতি ও পরিণতি প্রদর্শন; জৈববুদ্ধি ও শুভবুদ্ধির দ্বন্দ্বে যুগ-যুগান্তরের মানুষের জীবন-ইতিহাসের পটভূমিতে তাহার প্রত্যেকটি প্রচেষ্টার যথাযোগ্য মূল্যনিরূপণ।

বৃথা অভিমান ও ব্যর্থ গৌরববোধে মুগ্ধ না হইলে, দেখা যাইবে, দেশের সনাতন ঐতিহ্য ও সমকালীন বিশেষ যুগধর্মের সংমিশ্রণেই ঘটিয়া থাকে সমাজের গতি ও পরিণতি। এই

আহ্নিক ও বার্ষিক গতির কক্ষপথেই চলে সমগ্র সমাজের সৌরপরিক্রমা। অবিচ্ছিন্ন এই অবিরাম পরিক্রমায় জড় হইতে চৈতন্যের স্বরূপ-প্রকাশের রহস্যও ঘনাইয়া উঠে আকস্মিক-ভাবে। যাহাই হউক, মননশীল মানবের যাত্রাপথের অলিখিত নেবিচিহ্নের তাৎপর্যাবলীর পর্যবেক্ষণ করা যাইতেছে বিচারবুদ্ধিকে যথাসাধ্য অতন্দ্রিত রাখিয়া।

১১

আলোচ্য যুগের নিষ্ফল পরিণতি, বাঙ্গালীর প্রাচীন ও মধ্য যুগের প্রচলিত ইতিহাসের যে কোনো কাটা-ছককে বহুবিধ প্রশ্নের মুখোমুখী দাঁড়াইতে বাধ্য করে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার বিভিন্ন ধারার মধ্যে প্রত্যেকটিরই স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু কোনও কালে তাহার সমষ্টিগত সুষ্ঠু প্রয়োগে, সর্বাঙ্গীণ সার্থকতায় সমগ্র দেশ স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছিল—এইরূপ অনুমান অতিরঞ্জনের কোঠায় গিয়া পড়িবে। মহাদেশোপম বহুবিচিত্রজাতি-অধ্যুষিত ভারতবর্ষে বিশেষ স্থানকালপাত্র-ভেদে বিভিন্ন অবস্থায় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে, অত্যুচ্চ আদর্শাবলী একটানা আপন বিশুদ্ধি রক্ষা করিতেও সমর্থ হয় নাই। উপরন্তু, অধিকারীর ছদ্মবেশে অনধিকারীর ধৃষ্টতার ফলে, বহুক্ষেত্রেই দেখা যাইবে,—'হীরার ধার'-ও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, নদী তাহার ধারা হারাইয়াছে মরুপথে।

ভারতীয় সমাজে ঠাকুর-দেবতার ও অবতারগণের প্রভাবও ব্যাপকভাবে সক্রিয় হইয়া আসিয়াছে, লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহাসিক যুগের বিভিন্ন অবতার বা অবতারকল্প মহাপুরুষেরা প্রায় সকলেই গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করিয়া অ-সম স্তর হইতে তাঁহাদের বাণী প্রচার করিয়াছেন। সামাজিক বিচারের কালে এই স্তরবৈষম্য ও তাহার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথাটি আমাদের সবিশেষ মনে রাখিয়া চলা প্রয়োজন। তাঁহাদের সাধনালব্ধ অধ্যাত্মবোধে আধিভৌতিক কল্যাণক্রিয়া—গৌণ অভিব্যক্তিমাত্র। স্ব স্ব ভাবাদর্শে তাঁহাদের বোধি বিশেষ যুগে বিশেষ চেতনার সঞ্চার করিয়া থাকিলেও, তাহা কখনও সর্বাঙ্গীণ উপযোগিতায় স্ফূর্ত ও মঙ্গলে মূর্ত হইয়াছে কি না, গভীরভাবে অনুধাবনের বিষয়।

দেশের বিশাল জনসমাজও এই এক এক বিপুল শক্তির আকর্ষণ-'ধর্মের' প্রভাবে পড়িয়া বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অভিভূত হইয়া সাড়া দিতে গিয়া, কোথায় কিভাবে কতখানি লাভবান্ হইয়াছে, কিংবা প্রচলিত সমাজবিধান-প্রতিপালনে শিথিলদায়িত্ব হইয়া কালে কালে অনর্থ ঘটাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আসিতেছে তাহাও অবশ্যাবচার্য। কেননা, প্রায়শঃই দেখা যায়, অকূলে ঝাঁপ দিয়া অনধিকারীর দল কূল হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই আপাতদৃষ্ট প্রবল ও দুর্বল, দুই শক্তির যোগপরিণতিতে শেষাবধি দেখা যাইতেছে বঞ্চিত নিয়াশ নরনারী প্রকাশ্যে

ধর্মের বেড়া আঁকড়াইয়া থাকিলেও, ঘাটে-ঘরে স্থানচ্যুত হইয়া প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে ও সমাজে বিপর্যয় ঘটাইয়াছে।

কিন্তু এই দুর্গতি অনপেক্ষিত নহে। কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা যায়, সমাজ এমন একটি ঠাঁই যেখানে কেবল কীর্তিত বা কেবল 'অকীর্তিতের' স্থান নাই; ইহা গঠিত উভয়েরই সমাবেশে; এখানে সুষ্ঠু সংস্থানের সার্থকতাই বড়ো কথা। সর্বাঙ্গীণ সমাজগঠনে অ-সম বিষয়সমূহের সুষম সমন্বয়ব্যবস্থাই অত্যাবশ্যক। যে-বস্তু এই যোগে বা সফলতায় উত্তীর্ণ না-হইয়া স্বতন্ত্র থাকিবে তাহা যতই উত্তুঙ্গ হউক, সামাজিক নিরিখে তাহার মূল্যও বিশেষ সীমায় আবদ্ধ। স্বতন্ত্রভাবে স্বশক্তিতে 'স্বধর্মে' সে অভ্রভেদী হইয়াও থাকিতে পারে, কিন্তু কালক্রমে অকেজো বা প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া আত্মপক্ষে এবং সমাজের পক্ষে অনিবার্য মৃত্যু ডাকিয়া আনিয়াছে, তাহাও দুর্লক্ষ্য নহে।

যেহেতু প্রদীপের ধর্ম আলোকবিকীরণ, পতঙ্গের ধর্ম সেই দীপশিখায় আত্মবিসর্জন; কিন্তু ছোটবড়-নির্বিচারে উভয়েই 'স্বধর্ম'-অনুসারী। অথচ একের মহিমার ঔজ্জ্বল্য অপরের নিধনের হেতু; কিন্তু স্বীকার করি আর না করি, ঔজ্জ্বল্যের আকর্ষণ-'ধর্মের' দায়টুকুও বোধ হয় কম নহে। এক্ষেত্রে সুষ্ঠু সংযোগ ঘটাইয়া শক্তির অপচয় নিবারণ করিতে কোনও পক্ষেরই স্বধর্ম কার্যকর হইয়া নাই; বরং দৃষ্টিভেদে বিচার করিলে বোঝা যায়, 'ধর্মই' অ-ধর্মের কারণ সৃষ্টি করিতেছে। অথচ এই দৃষ্টান্তেই দেখা যাইবে, বস্তুর সমাবেশব্যবস্থা উপযোগী হইয়া উঠিলে উভয়পক্ষের ক্রিয়াই অব্যাহত থাকে ও বলাধানও হইতে পারে। সেই সংযোজকবুদ্ধির যোগান দিতে পারে—বিজ্ঞান। অবতারপুরুষের জীবন ও বাণী এবং প্রতিভাবানের স্ব স্ব সৃষ্টিকর্মের সহিত জনসাধারণের যোগাযোগের ব্যবস্থাটি স্থানকালপাত্র-বিচারে বিজলী বাতির আবরক-কম্বের (*bulb*) মতো যুগপৎ আবরক ও নিরোধক হওয়া আবশ্যক। এই বুদ্ধিযোগের অভাবে যুগে যুগে আমরা বিরাট্ শক্তির অধিকার লাভ করিয়াও তাহার অপব্যবহার করিয়াছি ও অপমৃত্যু ঘটাইয়াছি। অমৃত আমাদের ভাগ্যে বিষ হইয়া সমাজের স্তরে স্তরে সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে। অথচ সংঘটনব্যবস্থা সুষ্ঠু হইলে বিষই কাজ করিয়া থাকে অমৃতের।—এইরূপ বিচারে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, যোবাযোগের পথে গিয়া অযথা গ্রন্থির উপর গ্রন্থি কষিয়া সমস্যা ঘোরালো করা অনাবশ্যক; কেননা, তাহা আত্মঘাতেরই সামিল। সার্বভৌম ভাবাদর্শকে কাজে লাগাইতে এইখানেই মোহমুক্ত আধুনিক বিজ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা বস্তুবিন্যাসের কথা আসে।

বিজ্ঞান জানায়,—সূর্যালোকের অবাধ ঘনিষ্ঠ সংযোগ মনুষ্যলোকে মারাত্মক। কিন্তু দূরত্বের ব্যবধান ও নানা প্রাকৃতিক স্তরের মাধ্যমে সে-সংযোগ চলিত থাকায়, আমরা কেবল বাঁচিয়া যাই তাহাই নহে, সৌরকিরণ আমাদের জীবনীশক্তির অপরিহার্য উপাদানরূপে

সঞ্জীবনী যোগাইয়া থাকে। তেমনি সন্ন্যাসাশ্রয়ী অবতারের আদর্শ গার্হস্থসমাজের উপকারে লাগাইতে গেলে, ঐরূপ আবরক-নিরোধকের মধ্য দিয়া নিয়ন্ত্রিত করিয়া আনিয়া ব্যবহারোপযোগী করা দরকার এবং ভারতীয় 'ধর্ম'বোধের ব্যবহারেও আজ সেই দুর্লভ 'যোজক'-বুদ্ধিরই প্রয়োজন। এতাবৎকাল ইহারই অভাবে অ-চৈতন্যের দাস হইয়া শক্তিসমূহ পরস্পর প্রতিক্রিয়াশীলরূপে ধ্বংসলীলায় নজীর রাখিয়া চলিতেছে,—ইহাই দেখা যাইবে।

১২

ভারতীয় সমাজের নাড়ীর গতিনিয়ামক অন্যতম আর-একটি রহস্যের দিকেও অবহিত হওয়া আবশ্যক। অদৃষ্ট ও পুরুষকারের ক্রিয়াও প্রসঙ্গতঃ কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হয়। মানুষের নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ পুরুষকার এবং প্রত্যক্ষ ঘটনায় অ-প্রত্যক্ষ কারণ অর্থাৎ অ-দৃষ্ট বা দৈব—এই দুই চেতনায় কার্যকারিতা স্বীকার করিয়া ভারতীয় সমাজবিবর্তনে সদাসক্রিয় এই উভয় ধারায় সামঞ্জস্যবিধানের সূত্রটিও একান্ত অপরিহার্যরূপেই সকল সমীক্ষা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্য অনুসরণীয়। ইহলোক বা পৃথিবী হইতেছে বাস্তব ব্যবহারের ক্ষেত্র। এখানে বস্তুপরিচয়ের এলাকায় আলো ও ছায়ার বিরোধিতা স্থানকালপাত্র-পরিবর্তনে স্বতোবিরুদ্ধ পরিচয়ও ব্যক্ত করিয়া থাকে। তাহাদের দোষ গুণ আপেক্ষিক হইয়া দেখা দেয় পরিবেশ বা প্রয়োজনের তাগিদে। মানুষ বিজ্ঞানযোগে পৌরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া নিরবয়ব আলো-ছায়া উভয়কেই কাজে লাগাইতে সক্ষম হয়।

বৈদিক ঋষিরা বলেন,—একই 'ঋত'-শক্তির ক্রিয়া চলিয়াছে জানা ও অজানা ইহলোক ও পরলোক জুড়িয়া। লাভালাভ, জয়াজয়ের অবশেষে সুখদুঃখের বিকার হইতে মনকে মুক্ত রাখিতে বিবেকী মানুষ ইঁহার আশ্রয় খুঁজিয়া থাকে; অপরিহার্যকে অমোঘ বিধান মানিয়া ফলাফলের বোঝা তাঁহারই দুয়ারে নামাইয়া অনাসক্ত ঔৎসুক্যে সে আবার আগাইয়া চলিতে যায়; জানা জগতের কার্যকারণ-নীতির অনুসরণে পৌরুষের সহায়তায় আবার সে সহজ হইয়া কাজে ঝাঁপ দেয়।—এই দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, অদৃষ্টবাদ বা ঈশ্বরবাদ নৈরাশ্যের বা দুঃখের আধার অথবা দুর্বলের আশ্রয় নহে; বরং তাহা ভারকে সুসহ করে, বলই যোগায়।

কিন্তু পরমাশ্রয়ের এই ধারণাকে শ্রেয়ঃপথ ভ্রষ্ট করিয়া দিয়াছে মানুষেরই ভাবের বিকারে। ঈশ্বর-ব্যতিরিক্ত নিছক নীতির অনুসরণে বৈজ্ঞানিক মনের অনুরাগ থাকিলেও সাধারণ মানুষের প্রবণতায় নিরালম্ব শূন্যতাবোধ আসিয়া পড়ে স্বতঃই; ইহা আনিয়া দিতে চায় মরুভূমির শুষ্কতা। কিন্তু ঈশ্বরবাদ এইস্থলেই যোগাইয়া থাকে অস্তিত্বের রসাবেশ, সৃষ্টির যাহা মহৎ উপাদান। মানবের এই স্বাভাবিক মনোবৃত্তির অবকাশে আমরা একটি অতিমানস মহিমার

স্বতন্ত্রতায় স্বর্গস্পর্শী শুচিতা আরোপ করিয়াছি।—কিন্তু ইহারই প্রতিক্রিয়ায় স্থূলতঃ আবার দেখা যায়, মানুষের নিজের জগতেও উচ্চাবচ মনোবিকারের সৃষ্টি হইয়াছে এবং পাথর হইয়াছে প্রতিমা, মানুষ হইয়াছে 'অবতার'; মানুষে মানুষে সহজ-মিলনের পথ হইয়াছে অবরুদ্ধ, সহজ-দৃষ্টি হইয়াছে স্বপ্নাতুর।—এইভাবে আমরা আমাদের সকল শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাকেও অদৃষ্ট ও দৃষ্ট দেবতার করুণা ও খেয়াল-খুসীর বিষয় করিয়া মানুষের পরম মূল্যকে চরম অপমানের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছি। এবং এইজন্যই 'যত্র জীব তত্র শিব' যত্রতত্র আওড়াইয়াও জীবের চোখে এখন শিব আর মিলাইতে পারিতেছি না। পক্ষান্তরে, জীবের 'শিবত্ব' ঘটাইতে আণবিক মারের আশ্রয় লইয়াও আজ উত্তমের শেষ হইতেছে না।

অবশেষে মানুষ আধিভৌতিকের দুরূহ প্রচেষ্টার আবশ্যক স্থলে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া ঈশ্বর বা অদৃষ্টের আধিদৈবিক দরগায় বা দরজায় 'হত্যা' দেওয়ার সহজতর পথেই 'উদ্ধার' পাওয়ার নামে আত্মহত্যার পথ প্রশস্ত করিতে একান্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে। 'কর্মাণ্য', 'অদৃষ্ট', 'সাক্ষাৎ শিবাবতার', 'দেবানুগ্রহ মনুষ্য' ইত্যাদির উপর অবিচলিত নিষ্ঠার আকারে এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ মিলিবে। ক্রিয়া যখন প্রতিক্রিয়ার ভার নিরুদ্ধ না করিয়া আগাইতে থাকে তখন তাহারই চাপের ফলে, তাহার বিলকুলই প্রায় কুক্রিয়ার সামিল হইয়া দাঁড়ায়। আলোচ্য পর্বেও দেখা যাইবে, ভাবের পরিণতি বুদ্ধিযোগের অভাবে বিপর্যস্ত হইয়া দুর্ভাবনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়ার দিক্‌টি প্রতিরোধ করিতে সর্বদা সচেষ্ট থাকাই একান্ত আবশ্যক। তাহা হইলেই অনেক মহৎ আদর্শ যাহা কাজে লাগিতে গিয়া অকাজও সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আজও কাজেই লাগিবে। নতুবা ভারতীয় 'গুরু'বাদকে ত্যাগ করিতে গিয়া, 'গুরুতর' নানা নূতন বেড়ার সৃষ্টি করিতে থাকিলে, ঈশ্বর, অদৃষ্ট, অবতার অথবা বিজ্ঞান কেহই আমাদের মারকে ঠেকাইতে পারিবে না।

১৩

উপায় ও অপায় চিন্তা করিয়া কাজ করাই নীতিশাস্ত্রের বিধি; অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা বাৎলানো বৈদ্যকশাস্ত্রীয় বিধান। এক যুগের আদর্শ অন্য যুগে কাজে লাগাইতেও তাহা উপযোগী করিয়া লইতে হয়। অতীতে ধর্ম হইতে আসিয়াছে 'দেবত্ব'; বর্তমানে বিজ্ঞানের প্রতিক্রিয়ায় আনিতেছে 'আভিজাত্য'। দেবত্ব ও আভিজাত্য দুইই অ-সম মনোবৃত্তি এবং শ্রেণীসংঘাতের অন্যতম কারণ। ধর্মকে পণ্যরূপে ব্যবসায়ের বিষয় করা হইয়াছে যুগে যুগে। সংস্কৃতি ও শান্তির নামে অধুনা যাহা চলিতেছে তাহারও অন্তস্তলে প্রবাহিত আভিজাত্যেরই আসক্তিলিপ্ত এই লীলা। শ্রীচৈতন্যযুগের ব্রাহ্মণ্যবাদে ও উদারতর 'প্রভুপাদ'-বাদেও সংস্কৃতিগত আভিজাত্য

ও ধর্মগত দেবত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। ইহারই বেদিকার যূপে বলি পড়িয়াছে সেকালের সাধারণ জনসমাজ। আজও দেবত্বের ও আভিজাত্যের বেদীর ক্রিয়াকাণ্ড চোখ মেলিলেই দেখা যায়। উভয় ক্ষেত্রেই জনগণ অপাঙ্‌ক্তেয়। কেবল অর্ঘ্যের ডালি যোগাইবার ভূমিকাই তাহাদের।

প্রাগুক্ত শাশ্বত বিজ্ঞানযোগের সহায়—অনাসক্ত ঔৎসুক্য। দৃষ্টির স্বচ্ছতা ও স্নিগ্ধতা আনে ইহাতেই। এই নির্ভীক দৃষ্টি কাজ চালায়, অকাজ বাড়ায় না। ভারতবর্ষে এইরূপ বোধের বাণীও শোনা গিয়াছে 'অনাসক্তি যোগের' মধ্যে। কিন্তু ইহার অর্থ খুঁজিতে গিয়া ঝুঁকিয়াছে লোকে পরমার্থের দিকেই। তবে আধ্যাত্মিক বা আধিভৌতিক বলিয়া কথা নহে। অভিমানের পাক-সৃষ্টি করে যে ছোট বড় বোধে, তাহা দেবত্বাভিজাত্য-নির্বিচারে সর্বক্ষেত্রে সর্বপ্রকারে বিষবৎ পরিত্যাজ্য। মানুষে মানুষে সহজভাবে মিলিয়া মিশিয়া কেবল ধৈর্য ও যত্নে বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগের সুষ্ঠু পরিণতির দিকে আগাইয়া চলার প্রক্রিয়াই হইতেছে—অনাসক্ত ঔৎসুক্য।—মানব-'ধর্মের' এই নিরিখে আমাদের এই অদৃষ্টবাদী জাতির একটি অনুত্তীর্ণ যুগের 'শরশয্যার' ইতিহাস তাহার পর্বে পর্বে এই মহৌষধীরই সন্ধান দিতেছে।

১৪

আলোচ্য যুগে প্রাপ্ত চিঠিপত্রের মধ্যে ধর্ম ও শিক্ষা ভিন্ন দেশের সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টির পরিচয় খুব বেশী আমরা পাই নাই। কিন্তু এই দিকের পরিচয় এখনকার কালে সাগ্রহে প্রত্যাশার বিষয়। যুগের জীবনপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজ-তটের পলিমাটীতে স্ফুরিত হইতে থাকে যুগসাহিত্য ও তাহার সমান্তরালে সঙ্গীত নৃত্য চিত্র স্থাপত্যাদি নানা চারু ও কারুশিল্প। জাতীয় প্রতিভার পরিচয় সুস্পষ্ট চিহ্নিত হয় এই সকল সাংস্কৃতিক বিকাশে।

ভারতবর্ষের সংস্কৃতি চিরকালই ধর্মের অনুগামী। তুর্কানা ধাক্কায় মথিত মধ্যযুগের আর্য ও আর্যেতর বিকৃত মনোভাব বাঘ-ভালুক-কুমীরদেবতারূপে মানুষ খাইয়া এবং কুটিল মনসামঙ্গলচণ্ডীর মূর্তি ধরিয়া বাঙ্গালীর সমাজে ও সাহিত্যে সেকালে যখন-তখন যেখানে-সেখানে 'ডিঙ্গা' ডুবাইয়া ফিরিতেছিল। 'নৃত্যগীতবাদিত্রোপচারে' অর্থাৎ নাচ গান বাজনার উপচার দিয়া 'বহিত্রোত্তোলন' করার বা নৌকা ভাসাইবার সংকল্পে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিয়া 'তৌর্যত্রিক বিধিতে' অর্থাৎ নাচিয়া গাহিয়া ও ঢোল পিটাইয়া চণ্ডীর মাহাত্ম্যাখ্যাপক 'শ্রীমঙ্গলগীত' প্রচার করিয়াও সেকালের বাণিজ্যযাত্রায় সমাজের ভাগ্যতরী 'ঘুরণিয়া ঝড়ে ডিঙ্গা ঘন দেয় পাক'। এই 'ঝড়ো' পরিবেশে সূক্ষ্মতর সাংস্কৃতিক চেতনা—ঔদার্য শান্তি শ্রদ্ধা আত্মসংযম ও মৈত্রীভাবে বিজড়িত কল্যাণবোধ কোন কালেই জাগিতে পারে না। এবং 'চিত্তের সুখেই গীত' অর্থাৎ মনের প্রশান্তি না থাকিলে শিল্পকলায় ইহার রূপপরিগ্রহ সম্ভব নহে।

শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত নব আধ্যাত্মিকতায় 'বর্তমান কাল' ও 'জীবিত মানব' এদেশে প্রথম

স্বীকৃত হইয়াছিল ; আমাদের দৃষ্টি অতীতের উজান হইতে বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত হইল ; বাঙ্গালী-জাতির সমাজে ও সাহিত্যে সর্বাঙ্গীণ জাগরণের উন্মেষও দেখা গেল। কিন্তু ইহাও ঠিক যে, মোগলশাসনে দেশীয় লোকসংস্কৃতির স্বাধীন অনুশীলনের পথ ক্রমশঃ রুদ্ধ হইয়া যাইতেছিল ; এই অবস্থায় সমাজে ও সংস্কৃতিতে গতানুগতিকতার অনুবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। তবে ধর্মের বাঁধা ছকও এই স্ফূর্তিতে কম বাধার সৃষ্টি করে নাই। সপ্তদশ শতকে রূপরামের মতো প্রথম শ্রেণীর কবিকেও তাঁহার জীবনশিল্পের প্রেরণালাভের জন্ত 'ধর্ম'-ঠাকুর তাঁহাকে দিশাহারা করিয়া পলাশন গ্রামের খালে-বিলে ঘুরিয়া ফিরিতে বাধ্য করিয়াছেন। আলোচ্য সমাজে আমরা দেখি,—সাধারণের মধ্যে সাহিত্যের অনুশীলন ও সৃষ্টিতে 'চূর্ণক', 'টীকা-টিপ্পনী', দেবদেবীমাহাত্ম্য-প্রচারই মুখ্য এবং কারুশিল্পে 'শিবঠাকুর নির্মাণ' বন্ধ আছে 'বাচক' অর্থাৎ শাস্ত্রীয় মূর্তিগঠনপদ্ধতির ব্যাখ্যাতা না আসাতে ; লোকসঙ্গীতের প্রসঙ্গে 'চৈত্রী গাজনে' যে শিবের গীত সে হরমঙ্গল ও ধর্মপুরাণের মঙ্গলগীতি-পদ্ধতিরই একঘেয়েমি ; প্রচলিত 'গোবিন্দদাস কীর্তনের' রূপ-সৃষ্টি তখন প্রায় শত বৎসর পূর্বের বৈষ্ণবরসশাস্ত্রেরই মার্গানুসারী। আলোচ্য যুগে পঙ্গু সমাজজীবনের বিবর্তন বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, সংস্কৃতির ধারাবলী পরীক্ষা করিলেও দেখা যায়, অযত্নে ও অনাদরে পূর্বপ্রচলিত পুরাতন খাতেই ঘূর্ণিপাকে তাহা ক্ষীণস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে।

১৫

ভারতীয় সভ্যতার ধারায় কতকগুলি অধ্যাত্ম মৌলিক আদর্শও নিঃসন্দেহ কালজয়ী হইয়া শাশ্বত সত্যের রূপ লাভ করিয়াছে ; মহতী শক্তি ও অনুপম সৌন্দর্য লইয়া দেশকালপাত্রভেদে নানা পরিবর্তনের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া সেই সকল অধ্যাত্ম তত্ত্ব আমাদের জাতীয় ভিত্তির অটলতা সেই পরিমাণেই সম্পন্ন করিয়া চলিয়াছে। ভারতীয় অধ্যাত্ম-বোধের পীঠভূমিতে অদ্যাপি সংরক্ষিত, সুচিরাগত সভ্যতার সেই প্রাণশক্তি, তাহার স্বধর্ম যুগে যুগে সুখে দুঃখে বিস্ফারিত বাঙ্গালীপ্রাণকে ঠিক পথেই চালাইতে থাকিবে। বাঙ্গালীর শুভবুদ্ধিও তাহার আপৎকালীন সাময়িক কূর্মবৃত্তির, তাহার আপাত-অগৌরবের আবরণে, তাহার সনাতন সত্য রূপকে সযত্নে বর্মাবৃত করিয়া মানুষের নব্য সুস্থ বিশ্বমানবতার সহজ সাধনার পথ আপনিই পরিক্রমা করিয়া চলিবে।

একদিকে এইরূপ সার্থকতার আশা যেমন অভ্রান্ত, তেমনি এই মহতী সাধনার ও সৌন্দর্যের মুখোস পড়িয়া অনেক মেকী আপ্তবাক্য, আচার-বিচার ও সূত্রাবলী, 'রক্ষার' ভাণ করিয়া, চলার প্রকৃত পথ, অপথে পরিণত করিয়া আছে। সমাজকে বাঁচাইতে গিয়া ক্ষেত্রবিশেষে সমাজপতিরা গূঢ় অভিসন্ধিতে পরোক্ষভাবে মরণের পথেই হয়তো তাহাকে আগাইয়া

দিয়াছেন। আমাদের অতীত ইতিহাসে এইরূপ নজীরেরও অভাব নাই। তাহা হইতে এই বিষয়ে আমাদের শিক্ষণীয় আছে অনেক-কিছু। যাহাই হউক, দক্ষিণ-বাম, অনুকূল-প্রতিকূল উভয় প্রকার নজীর যাচাই করিয়া আমাদের উপকরণ সংগ্রহ আবশ্যক, সমীকরণের প্রশস্ত পথ তাহা দ্বারাই দৃঢ়তর করিয়া তুলিতে।

অভিজাত 'উচিত'বাদী 'বিধিকর্তা ঠাকুর' মহাশয়দের কঠোর শাসনে বা উপেক্ষায় সমাজের ন্যায্য বা অন্যায্য অধিকারভ্রষ্টের দল প্রতিক্রিয়ার চোরাপথে সমাজে কালের মার যুগে যুগে স্বাগত করিয়া আনিয়া, সোৎসাহে ব্যর্থ করিয়াছে সামাজিক সনাতন ভাবাদর্শ। 'বিচার'বিমুখ সমাজপতিরা তাহাদের উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু মানুষের ইতিহাস এই সকল মর্মান্তিক বিয়োগান্ত কাহিনী হইতেও, সমাজবিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ-সূত্রাবলী আবিষ্কার করিতে সক্ষম। অনুসন্ধানে দেখা যাইবে, এইরূপ ঘটনাবলী ঘটাইয়া সমাজনীতি যথেষ্ট ইন্ধন যোগাইয়াছে রাজনীতিতে ; আবার, রাজনীতিও প্রবলতর হইয়া চাকা ঘুরাইয়া চলিয়াছে সমাজনীতির। কেবল তাহাই নহে, বাঙ্গালীর ধর্মনীতি অর্থনীতি শিল্পরীতি সাহিত্যসৃষ্টি কালে কালে এই পথে একই 'কালিদয়ে' বারে বারে ভরাডুবি করিয়াছে। এবং বহুরূপী এই জৈববুদ্ধির পথেই আমদানী হইয়াছে পরাধীনতা দারিদ্র্য অশিক্ষা সংকীর্ণ স্বার্থপরতা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও কুটিল হিংসাবিদ্বেষাদির আনুষঙ্গিক অতলমুখী 'কালোবাজারী' অভিশাপ।

মন্দকে ভালো করিয়া তুলিয়া লইয়া যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার কাহিনী আমরা স্বদেশী সমাজের ইতিহাসে খুব বেশী পাই নাই। 'পঙ্কগ্রামী' বিচারে পুরুষ বরং উদ্ধার পাইয়াছে তুচ্ছ 'এক ঘটী জলে', কিন্তু স্ত্রীলোকের বেলায় কিছুতেই রেহাই নাই। 'ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত' মহাশয়েরা 'সার্ধ সপ্ত ধেনু মূল্য' পাইয়া সমাজের কলঙ্ক-অপনয়নের জন্য মানুষকে অকাতরে 'বাহির' করিয়া দিয়াছেন।

সেকালের সমাজব্যবস্থায় ভ্রষ্টকে প্রতিষ্ঠিত করিবার দায়িত্ব সমাজপতিরা নানা কারণেই স্বীকার করিতে চাহেন নাই। কিন্তু দেখা যায়, তাঁহাদের শ্রেয়োবিচারে ক্রিয়ার দিক্ সামলাইতে গিয়া প্রতিক্রিয়ার দিক্ ফসকাইয়া গিয়াছে এবং বহুক্ষেত্রেই কুশলে যেন 'মুষলই' প্রসব করিয়া বসিয়াছে; অস্বীকৃতজন্মা কর্ণ যেন কবচ-কুণ্ডল লাভ করিয়া আপন সহোদর পাণ্ডবের প্রবল প্রতিপক্ষরূপে রণাঙ্গনে দণ্ডায়মান!

যাহাই হউক, মস্তিষ্কের অসাড়তাজাত অদৃষ্টবাদের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া সমাজ এই সকল দৃশ্যতঃ আকস্মিক, আসলে অনিবার্য উৎপাতের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিলেও, শনি প্রবেশ করিয়াছে এই রন্ধ্রপথেই। আমরা দেখিব, এই পথেও চলিতেছে সমাজের ভাঙাগড়ার অজ্ঞাত অপ্রত্যাশিত ইতিহাস।

১৬

মধ্যযুগের ভারতে দেখা যায়, ইসলামী 'ঐক্য' ও 'সমন্বয়'কামী সুফিয়ানার আদর্শে ভারতীয় লৌকিক 'ভক্তি'বাদ মিশিয়া অনভিজাত কবীরাদির সন্তধর্ম, ব্রাহ্মণ্যশাসনজাত সামাজিক জাতিধর্মের কঠোর গোঁড়ামি কতকপরিমাণে শিথিল করিয়া এদেশে আধুনিক মনোভাব আসিতে অংশতঃ সাহায্য করিয়াছিল। সমকালীন বাঙ্গালাদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের অনুষ্ঠানভারবিহীন 'কলিযুগ'-অভিনন্দনকারী প্রেমধর্ম-প্রচারও এই কাজই করিতেছিল।

কিন্তু অভিজাত ব্রাহ্মণকুলে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম হওয়ায়, বর্ণাশ্রম অস্বীকার করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তবে ইহাও ঠিক যে, এদেশের প্রায়লুপ্ত বৌদ্ধ মৈত্রীবাদকে জাগাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে মহাপ্রভুরই প্রচারিত প্রেমধর্মের আশ্রয়ে থাকিয়া সমাজের নিম্নস্তরের সহজিয়া বাউল-বৈরাগীরা। সুফী সৌভ্রাত্রের আদর্শও নিঃসন্দেহ এই পথে প্রেরণা যোগাইয়া থাকিবে। পক্ষান্তরে ইহাও দেখি যে,—ব্রাহ্মণেতর শ্রেণীর লোকেরাই 'ধর্মঠাকুরের' রূপে 'ভক্তি'ভরে ইসলামকে স্বাগত করিয়াছিল 'ব্রাহ্মণের জাতিধ্বংস' করিবার উৎসাহে এবং পরিশেষে, ভাগ্যের পরিহাসে ব্রাহ্মণও আবার এই ব্রাহ্মণেতরের সহিত হাত মিলাইয়াছে!

একথা সুনিশ্চিত যে, ভারতীয় সনাতন ভাবাদর্শ 'কর্ম'বাদ ও 'ধর্ম'বোধে ঘূণ ধরিয়াছিল বহু পূর্ব হইতেই। যেন তাহারই নিখুঁত প্রতিচ্ছবিরূপে আলোচ্য যুগের বাঙ্গালায় দেখা যায়, সুদূরকালব্যাপী মহাজীবন-যজ্ঞের এক ভস্মময় শোচনীয় অবশেষ। স্তূপীকৃত জড়ের জঞ্জালে আকীর্ণ শিলীভূত সমাজদেহে বিবর্তন সুরু।

এই অবস্থায় সমাজের হিসাবভুক্ত সনাতন 'হাঁ'-এর গঙ্গাধারা এবং হিসাবছাড়া 'না'-এর যমুনাধারা মিলাইয়া দেখিলে, ঘাটে ঘাটে দেখা যাইবে অপূর্ব ত্রিবেণী-মণিকর্ণিকার ছড়াছড়ি। মৃত অতীতের তাল-বেতাল সত্যসত্যই তখন কথা কহিয়া উঠিবে এবং যোগাইতে থাকিবে মৃত্যুর ইতিহাস দিয়াই জীবনসাধনার পঞ্চোপকরণ; অন্ধকারকেও সাজাইয়া দিবে দীপাবলীর মহোৎসবে।—যাহাই হউক, 'হাঁ'-'না'-এর সম্মিলিত যাত্রাপথের সেই সকল উপকরণ দ্বারাই রচনা করিতে হইবে নবকলেবরে মানুষের অচিন্তিত ইতিহাস।

তবে মানব-ইতিহাসে এই ভাঙ্গাগড়ার কার্যকারণ-সূত্র নিঃশেষে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া চলে কি না বলা শক্ত; কেননা, বস্তুনির্দেশই যাহার ধর্ম স্বয়ং সেই আধুনিক বিজ্ঞানও দেখা যাইতেছে, এক এক প্রান্তে পৌছিয়া আজ অবশেষে 'নিয়তি'-মানা 'মায়াবাদে' অভিভূত। অবশ্য মানুষের অধ্যবসায় একদা এই অ-জানা অ-দৃষ্টের সকল জটিল সূত্রও হয়তো আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু তাহার অপেক্ষায় আমাদের উদ্যম হারানো অনাবশ্যক।

রাষ্ট্রনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত ও আর্থিক নিগ্রহ এবং ধর্মে কর্মে ভ্রান্ত নীতির গুরুভার কালে কালে বাঙ্গালীকে যতই আড়ষ্ট করিয়া ফেলুক, তৎসত্ত্বেও সতত আত্মসমীক্ষা, কালোপযোগী গ্রহণ-বর্জন ও সমীকরণই হইবে তাহার জীবনসাধনায় উত্তীর্ণ হইবার আশাবাহী অবলম্বন। বলা বাহুল্য, ভারত-পন্থের যে সকল শাশ্বত ঐশ্বর্য উত্তরাধিকারসূত্রে আমাদের হাতে আসিয়াছে, তাহার সহিত যুগের যোজনা দ্বারা 'নবযুগ' গঠিত হইবে নিশ্চয়ই।

জগৎপারাবারের তীরে বালির সে ঘরও হয়তো-বা ধ্বসিয়া পড়িবে। কিন্তু বিধাতার বিধানে, তাহার জন্য বৃথা কাঁদনীর স্থান নাই।— আমাদের সমীক্ষিত যুগে, সুপ্রাচীন জগজ্জয়ী ভারতীয় সভ্যতার অপঘাতের পর, নিদারুণ ব্যথায় আর এক জীবনের সূচনা দেখিয়া আমাদের মনে হইতেছে,—ইহাই যেন বিশ্ব-ইতিহাসের চিরন্তন শিক্ষা॥

সমাজ

(সন ১১৩৯-১২৯৫ : খৃ ১৭৩২-১৮৮৮)

আনুষ্ঠানিক আচার বংশানুক্রমে চলতে চলতে তার অভ্যাসটা পাকা ও দম্ভটা প্রবল হতে পারে, কিন্তু তার আসল জিনিসটি মরে যাওয়াতে আচারগুলি অর্থহীন বোঝা হয়ে উঠে জীবনপথের বিঘ্ন ঘটায়। উপনয়ন-প্রথা এক সময়ে আর্যদ্বিজদের পক্ষে সত্য পদার্থ ছিল; তার শিক্ষা, দীক্ষা, ব্রহ্মচর্য, গুরুগৃহবাস, সমস্তই তখনকার কালের ভারতবর্ষীয় আর্যদের মধ্যে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলিকে গ্রহণ করবার পক্ষে উপযোগী ছিল। কিন্তু যে-সকল উচ্চ আদর্শ আধ্যাত্মিক, যার জন্যে নিয়তজাগরূক চিৎশক্তির দরকার, সে তো মৃত পদার্থের মতো কঠিন আচারের পৈতৃক সিন্ধুকের মধ্যে বন্ধ করে রাখবার নয়; সেইজন্যেই স্বভাবতই উপনয়নপ্রথা এখন প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার কারণ, উপনয়ন যে আদর্শের বাহন ও চিহ্ন সেই আদর্শই গেছে সরে। ক্ষত্রিয়েরও সেই দশা; কোথায় যে সে তাকে খুঁজে পাওয়া শক্ত। যারা ক্ষত্রিয়বর্ণ ব'লে পরিচিত, জাতকর্ম বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সময়েই তারা ক্ষত্রিয়ের কতকগুলি পুরাতন আচার পালন করে মাত্র।

১৩৩২ —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ জাতকর্ম ॥

(সন ১২০০-১২৪৭ : খৃ ১৭৯৩-১৮৪০)

খৃ ১৭৯৩-১৮৪০ অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ পর্যন্ত সময়ের 'জাতকর্ম'-বিষয়ে চিঠিপত্র পাওয়া গিয়াছে। চিঠিপত্রে প্রাপ্ত নিম্নোক্ত কৃত্যগুলির প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হয়,—গর্ভিণীর সাধভক্ষণ,[১] সন্তানের জাতকর্ম,[২] সূতিকাষষ্ঠীপূজা,[৩] তৈল-হরিদ্রা,[৪] লতা[৫] ও অন্নপ্রাশন[৬]। সেকালের সমাজে আচরিত জাতকর্মের আলোচনায় এই তথ্য অসম্পূর্ণ সন্দেহ নাই এবং এতদ্‌দিতিরিক্ত কোনও আচার সেকালের সমাজে ছিল না, তাহাও নহে। এই বিষয়ে বিবরণ সম্পূর্ণ করিতে গেলে সেই সময়ের অন্য এবং প্রাচীনতর উৎস হইতেও তথ্যসমাবেশ ও তাহার সামগ্রিক ও ধারাবাহিক আলোচনা করিতে হয়। ঐ সময়ের হিন্দুসমাজ কোন্ কার্যকারণের কোন্ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় এই সকল আচার-বিচার যথাযথ বা পল্লবিতরূপে পূরাদমে পরিপালন করিয়া চলিতেছে, তাহাও খুঁটিয়া দেখা আবশ্যক। বাঙ্গালী মুসলমানসমাজও অংশতঃ এই আওতার বাহিরে থাকে নাই[৭]।

২

বর্ণাশ্রমিসমাজে দশ সংস্কার[৮]-বিধি ধর্মের অঙ্গরূপে অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত ছিল,[৯] কিন্তু কোনও যুগে কোনও সমাজে এই সকল সংস্কার একই সঙ্গে পরিপালিত হইত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাঙ্গালাদেশে আর্য-উপনিবেশের ফলে, আর্যদের ভাষা, ধর্ম, সামাজিক প্রথা ও সভ্যতার অন্য অঙ্গ এদেশে প্রচলিত হইয়াছিল[১০]। তবে আর্যপূর্ব ও আর্যেতর ভাষা, ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই ; নূতনের মধ্য দিয়া পরিবর্তিত আকারে তাহা আত্মপ্রকাশ করিয়া জীবিত আছে।

কোনো কোনো ধর্মসূত্রে ও স্মৃতিসংহিতায় চল্লিশটি সংস্কারের উল্লেখ আছে, কিন্তু মনু যাজ্ঞবল্ক্য পরাশর প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থে দশটি সংস্কারেরই উল্লেখ দেখা যায়। গৃহ্যসূত্র ও মনুস্মৃতির সহিত মহাভারতের সমাজের কোনও বিরোধ নাই[১১]। বাঙ্গালীর আদি ধর্মশাস্ত্রলেখক জিতেন্দ্রিয় ও বালোক। তাঁহাদের অনুবর্তী জীমূতবাহন, শূলপাণি, রঘুনন্দন[১২]

---

১ চি-প-স ২, প-সং ৮১   ২ ঐ, ঐ ১-৫, ৬৩, ৫২৯, ৫৬১-৬২   ৩ ঐ, ঐ ৫৬২   ৪ ঐ, ঐ, ঐ

৫ ঐ, ঐ ৬   ৬ ঐ, ঐ ৭, ৫২৯, ৫৩১, ৫৬৩ ৬৪   ৭ ঐ, ঐ ৪

৮ গর্ভাধান পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন জাতকর্ম নামকরণ নিষ্ক্রমণ অন্নপ্রাশন চূড়াকর্ম উপনয়ন এবং বিবাহ

৯ ম-স, পৃ ৪৪   ১০ বা-জে-ই, পৃ ১৩   ১১ ম-স, পৃ ৭৪

১২ *J-A-S-B, Vol. XI, pp. 851-57 ; H-D, Vol. I-V* বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য

তাঁহাদের স্মৃতি ও শাসনে পুরাতনের জের টানিয়া যুগোপযোগী পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন। এই ধারা প্রায় হাজার বৎসর ধরিয়া চলিতেছে।

কিন্তু যে সমাজে এই ধারা প্রচলিত ছিল সে সমাজ এখন শিথিলবন্ধন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সমাজশাসন বৈশ্য ও শূদ্র গ্রাস করিতেছে। বর্ণাশ্রমবদ্ধ চাতুর্বর্ণ্যের কাঠামোর বাহিরে অসংখ্য বর্ণ ও গণ প্রতিক্রিয়ায় বিশুদ্ধির বেড়া শুরু হইতেই ভাঙিয়া আসিতেছে। ফলে, পুরাতন নিয়ম ভাঙিয়াছে; নূতন নিয়মে নূতন অনুষ্ঠান গতানুগতিকভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে।

৩

ক. সাধভক্ষণ : জাতকর্মের পূর্বে তিনটি সংস্কারের কোনও উল্লেখ আলোচ্য চিঠিপত্রে পাই না। তৎস্থলে পাওয়া যায়,—পঞ্চম মাসে 'পঞ্চামৃত,'[১] সপ্তম মাসে 'সাতামৃত'[২] এবং পঞ্চম, সপ্তম বা নবম মাসে 'সাধান্ন'[৩] খাওয়ার উল্লেখ। গর্ভিণীর এই সাধভক্ষণের প্রসঙ্গ পঞ্চদশ হইতে ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকেও পাওয়া যাইতেছে প্রধান কবিগণের রচনায়[৪]। সংস্কৃত কাব্যাদিতেও 'দোহদভক্ষণের' রূপে[৫] ইহা অজ্ঞাত নহে। আলোচ্য সময়ে আমরা দেখিতে পাই, বাঁকুড়া জেলার 'সনারেখ' গ্রামের 'বাঁড়ুজ্যা'-বাড়িতে শুভ সাধান্ন ভক্ষণে 'ব্রাহ্মণভোজন' করানো হইতেছে[৬]। অধুনা গর্ভিণীর 'সাধ' অনুষ্ঠিত হয় দুই বার— যথাক্রমে সপ্তম[৭] ও নবম[৮] মাসে। পঞ্চম মাসের 'পঞ্চামৃত' এখনও প্রচলিত আছে কোথাও যথাযথরূপে, কোথাও বা রূপান্তরিত হইয়া[৯]।

---

১ রূ-ধ, পৃ ১২৩; ধা-ধ, পৃ ৬৪

২ কৃ-শা-অ, পৃ ২৯৩। মালাবারেও গর্ভিণী নারীর সপ্তম মাসে 'সপ্তামৃত' খাওয়ার বিধান আছে (*C-T-S-I, Vol. V, pp. 349-50*) ৩ চি-প-স ২, প-সং ৮১

৪ বি-ম (খৃ ১৪৯৫-৯৬), পৃ ১৫০ 'নয় মাসে ভক্ষ্য দ্রব্য দেই ত হরিষে'

ক-চ (খৃ ১৫৯৪-১৬০১), পৃ ৪৩ 'নয় মাসে নিদয়ারে সাধ দেয় ব্যাধ', পৃ ১১৩ 'সপ্ত মাসে বন্ধুজনা দিল নানা সাধ'

রূ-ধ (খৃ ১৬৪৯-৫০), পৃ ১২৩ '...সাতে পরবেশ, নানা সাধ খায় রানী অপূর্ব সন্দেশ'

ঘা-ধ (খৃ ১৬৯৪), পৃ ৬৫-৬৮ 'সপ্ত মাসেতে সাধ খাইলেন রানী' (রানী মদনার 'ইচ্ছাময় সাধ' খাইবার সুবিস্তৃত বাস্তব বর্ণনা আছে)।

হ-রা (খৃ ১৭২৩), পৃ ১৬১-৬২ 'এইরূপে পঞ্চ মাস গর্ভ হৈল তার সাদ খাইবারে তার মনে বড় সার', 'পঞ্চ মাসে সাদ খায় নৃপতিবনিতা' ই. ৫ ব্র. প-ত, ৪-১৩-১৭; র-বং, ৮-৬২, ই. ৬ চি-প-স ২, প-সং ৮১

৭ সাত প্রকার কলাইভাজা, গুড়পিঠা ও হলুদমুড়ির উপচারে ষষ্ঠীপূজা ও এয়ো-অভ্যর্থনা করিয়া গর্ভিণীকে দোহদদান করা হয়। ৮ ঐ

৯ দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু ও শর্করা— এই পঞ্চ অমৃতের সংমিশ্রণে 'পঞ্চামৃত' খাওয়ার বিধান এখনও ২৪ পরগণার কোনো কোনো স্থানে প্রচলিত আছে; পাঁচ-কলাই ও হলুদমুড়ির সহযোগে 'ভাজা' খাওয়ার প্রথা আছে দক্ষিণ রাঢ়ে।

খ. জাতকর্ম: সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বিধিমতো বৈদিক সংস্কারের নাম 'জাতকর্ম'। মহাভারতের সমাজে 'জাতকর্ম' অনুষ্ঠিত হইত। পুত্র ও কন্যা উভয়ের বিধানে কোনও ভেদ ছিল না। নবজাত পুত্র কন্যার কল্যাণকামনায় নানাবিধ দানদক্ষিণার বিধান ছিল। গৃহ হইতে আনন্দমুখর, রিক্তহস্তে ফিরিত না কেহই। উপস্থিত আত্মীয়স্বজন শিশুর মুখ দেখিতে ধনরত্ন 'আশীর্বাদী' দিতেন[১]। এই রীতি আলোচ্য সমাজে দেখা যাইবে[২] অব্যাহতই আছে এবং ইহা এখনও চলিতেছে।

জাতক্ষণ: হিন্দুর ঘরে শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্রের অধিকার। রামায়ণে পাওয়া যায় রামের জন্মপত্রিকার প্রসঙ্গ[৩]। গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ ও শাকুনবিদ্যাদি নানা বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায় মহাভারতের সমাজেও। জাত শিশুর জন্মকালে গ্রহাদির সংস্থান অথবা জাতপত্রিকা তৎকালেও লিখিয়া রাখা হইত[৪]। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে কার্তান্তিক, নৈমিত্তিক ও মৌহূর্তিক অর্থাৎ দৈবজ্ঞ, শুভাশুভ শকুনজ্ঞাতা ও ত্রিকালজ্ঞ জ্যোতিষিকের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়[৫]। জ্যোতিষী বরাহের নামে প্রচলিত সন্তানপরীক্ষার পুঁথি আছে[৬]। সতের শত বৎসর পূর্বে রচিত 'শার্দূলকর্ণাবদান' গ্রন্থে[৭] 'জন্মনক্ষত্রগুণ' বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। স্বয়ং কালিদাসও সম্ভবতঃ জ্যোতিষের চর্চা করিতেন[৮]। বহির্বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে নবজাতকের রাশিভেদাদি[৯] সবিস্তর মানা হইয়া থাকে। 'হোরা মকরন্দ' 'লঘুজাতক,' 'যবন জাতক', 'বৃহজ্জাতক,' 'স্বল্পজাতক', 'জাতকতিলক,' 'জাতকোত্তম,' 'বৃদ্ধযবন,' গর্গ, বরাহ, সারাবলী, 'হোরাপ্রকাশ,' 'জাতকসার' ইত্যাদি জ্যোতিষের বিবিধ গ্রন্থ হইতে সংকলিত জাতকর্মের জ্যোতিষিক বিধি-বিধানের বিস্তৃতি প্রায় ভারতবর্ষব্যাপী। হরিবংশের বিষ্ণুপর্ব[১০] ও নির্ণয়মালার সূত্র[১১] হইতে আমরা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'[১২] কৃষ্ণের জন্মক্ষণের হদিশ পাই। শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও[১৩] ইহার উল্লেখ আছে। পঞ্চদশ শতকে রচিত বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ে[১৪] জাতকর্মের প্রাচীনতর সুবিস্তৃত বর্ণনা রহিয়াছে দেখা যায়।

---

১ ম-স, পৃ ৪৮-৯ ২ চি-প-স ২, প-সং ১ ৩ *I-A, p. I, p 120*

৪ ম-স, পৃ ৪২৪-২৬। কিন্তু ভাগ্যগণনাকারীদিগকে সামুদ্রিক ব্যবসায়ী, চোর, ধূর্ত ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে (ঐ, পৃ ৪২৭ পা-টী)। অথচ এই ব্যবসায়ই হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এদেশে অব্যাহতগতিতে চলিয়া আসিতেছে! ৫ কৌ-অ ১৭, পৃ ২৬

৬ বি-ভা-পুঁ, সং ২০১৯। ইহার আরম্ভ,—'হুত মাসের গর্ভ নারীর নাম জ অক্ষর' ই.। ইহা সম্ভবতঃ 'বৃহৎসংহিতার' অংশবিশেষের অনুবাদ গ্রন্থ। ৭ বি-ভা-সংপ. পৃ ১৮২ ই.

৮ *J-B-R-A-S, Vol. VI, p 25*; 'জ্যোতির্বিদাভরণ' নামক এই গ্রন্থখানিকে কালিদাসের নামের সহিত যুক্ত করায়, কেহ কেহ এই গ্রন্থ জাল বলিয়া মনে করেন। ৯ জ্যো-বি ৮৫, পৃ ২৭১ ই.

১০ ৪-১৭ 'অভিজিন্নাম নক্ষত্রং…প্রভুঃ। ১১ 'ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী…প্রবেশিকা।

১২ পৃ ২, 'বিজয় নাম বেলাতে ভাদর মাসে' ই. ১৩ পৃ ১৪, 'ভাদ্র চতুর্থীর চন্দ্র' ই. ১৪ পৃ ১৪১-৪২

ষোড়শ শতকের কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে,[১] সপ্তদশ শতকে রূপরামের ধর্মমঙ্গলে[২] এবং যাদুনাথের ধর্মপুরাণে[৩] জাতককৃত্যের বর্ণনা প্রায় অনুরূপভাবেই পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের জাতকর্ম-বর্ণনায় অনেক বাস্তব সংবাদ[৪] দিয়াছেন বৃন্দাবনদাস। সনাতনী হিন্দুসমাজে অধুনাও[৫] এই ধারারই জের অব্যাহত রহিয়াছে।

সংরক্ষণশীল বনেদী ঘরে সন্তানের জন্মে শকাব্দ মাস পক্ষ বার তিথি দিন রাত্রি প্রহর দণ্ড পল তখন লিখিয়া রাখা[৬] হইত; এখনও হয়। কোন্ দ্বারী ঘরে,[৭] কোন্ শিরা হইয়া শিশু ভূমিষ্ঠ হইল,[৮] প্রসবের সময় প্রসূতির নিকটে কি পাড়ের কাপড় পরিয়া[৯] সধবা বা বিধবা মহিলা কত জন উপস্থিত ছিলেন[১০] ইত্যাদি জ্যোতিষের[১১] নানাপ্রকার খুঁটিনাটি সেকালের মতো এখনও মানা হইয়া থাকে।

এই সকল চিঠিপত্র কড়চাদিতে উল্লিখিত সময়ে জন্মক্ষণসম্পর্কে এইরূপ বিস্তৃত তথ্যসংগ্রহ জাতকের যথাযথভাবে লগ্ননিরূপণের জন্য আবশ্যক হইত। কিন্তু রামলোচন বসুর চতুর্থ কন্যার জন্ম পূর্বদ্বারী ঘরে, সেই ঘরে দুই জনা সধবা 'মেয়্যা' ছিল, পশ্চিমমুখে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল[১২] বা মথুরামোহন ঘোষের প্রথম পুত্রের জাতাহ ৭ শ্রাবণ আন্দাজী বেলা এক প্রহর থাকিতে ৮ পা দক্ষিণদ্বারী ঘর, স্ত্রীলোক ছিল ১১ জনা—বিধবা ৪ জনা—সধবা ৭ জনা, দক্ষিণশিরা পুত্রজনন হইয়াছিল[১৩]— এইরূপ কড়চা এই যুগে অদ্ভুত বোধ হয়।— এই প্রকার

১ ক-চ, পৃ ৪৪-৫, ১১৩, ২১০-১১

২ রূ-ধ ১খ, ১ম সং, পৃ ১২৪-২৬

৩ সা-প্র ৩খ, পৃ ৬৮-৭০। ঐ ভূ. পৃ ৩০-১। (জ্যোতিষীর প্রতারক রূপ এই গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে দেখানো হইয়াছে)।

৪ চৈ-ভা, পৃ ৮৯, ৯৩, ৯৬, ১০১-২, ১০৪-৫

৫ পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাঢ়ীয় হিন্দুসমাজে জন্ম-বিবাহাদিসংস্কার সম্পর্কে লিখিত 'শতাব্দীত্রয়ে সমাজপরিক্রমা' নামক গ্রন্থে শ্রীমান্ জীবনচন্দ্র গাঙ্গুলী সেকালের বাঙ্গালা সাহিত্য ও বহির্বঙ্গীয় সাহিত্যের আধারে তুলনামূলক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ে জাতকর্ম ও বিবাহসংস্কারের অধুনাতন পরিণতি-বিষয়ে অনুসন্ধানফল সংযোজন করিয়া আমার অধীনে ১৯৫৫ সালে বিশ্বভারতীর স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করিয়াছেন।

৬ চি-প-স ২খ, প-সং ১, ৩, ৪, ৫৬১

৭ ঐ, ঐ ২, ৫৬১। পৃ ৪৮৭ দ্র. 'আট পা দক্ষিণদ্বারী ঘর'

৮ ঐ, ঐ ৫৬১

৯ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামবংশজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও শ্রীযুক্ত সুখময় শাস্ত্রী মহাশয়ের বিবৃতি হইতে

১০ চি-প-স ২খ, প-সং ৩, ৫৬১

১১ ঐ, পৃ ৫৫৪ দ্র. 'সধবা মেয়্যা ছিল'

১২ ঐ, প-সং ৩ ১৩ ঐ, ঐ ৫৬১

টুকিটাকি সবিস্তর কড়চা হইতেই তখন কোষ্ঠী তৈয়ার করা হইত। অভ্রান্ত[১] লগ্ন নির্ণয়ের জন্য এইরূপ বিচিত্র তথ্যসংগ্রহ সেকালে প্রয়োজন ছিল এবং সংগৃহীত প্রত্যেকটি তথ্যের ফল একত্র করিয়া পরীক্ষা করা হইত, জাতক প্রকৃতপক্ষে কোন্ লগ্নে জন্মগ্রহণ করিল। শিশুর জন্মের পর পঞ্জিকা মিলাইয়া লগ্ন দেখা[২] ও জন্মনক্ষত্রাশ্রিত রাশিনাম[৩] রাখা হইত। গ্রহাচার্যেরা কোষ্ঠী, জন্মপত্রী বা ঠিকুজি[৪] প্রস্তুত করিতেন ঘটা করিয়া। মেয়েদের ঠিকুজি লইয়া ভবিষ্যতে বিবাহের বাজারে প্রতারণাও[৫] চলিত বেশ।

সন্তান হওয়ার সংবাদ আত্মীয়বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিত নাপিতে[৬]। সংবাদ শুনিয়া যত আহ্লাদই হউক, অন্য জাতীয় বাহকের বরাতে বকশিশ মিলিত 'কিঞ্চিত'[৭]। ধোপা[৮] নাপিতের ভাগে এই অঙ্কটি কোথাও কোথাও বেশ মোটা[৯] পড়িতেছে দেখা যায়। শিশুর

---

১ প্রসঙ্গতঃ দেখা যায়, মুকুন্দরাম যে সকল সামাজিক বিধিব্যবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন তাহা দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলে এখনও প্রচলিত আছে। শ্রীমন্তের কর্ণবেধের সময় নিখুঁতভাবে কালনিরূপণ ও কৃত্যসমাপনের জন্য 'তামি' পাতা (ক-চ ২, ক-বি সং৭ পৃ ১১৬) হইয়াছিল। সেকালে শুভকর্ম যথাসময়ে সম্পন্ন করিতে শুভতিথি ও শুভ লগ্নক্ষণ গণিবার জন্য গণকেরা 'তামি' পাতিতেন। এখনও দক্ষিণ রাঢ়ে বনেদী গৃহস্থের ধর্মকৃত্যে গ্রহাচার্যেরা এবং কৃষিকৃত্যে কৃষকেরা 'তামি' পাতিয়া থাকেন। সন্ধিপূজাদি কার্যে কোন কোনও বনেদী গৃহস্থবাড়িতে ঘড়ি না মানিয়া এখনও 'তামি পাতার' ব্যবস্থা আছে। প্রণালী এইরূপ,—একটি বড়ো গামলা (পিতলের বড়ো পাত্র) জলপূর্ণ করিয়া, ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত একটি তামার বটী সেই জলে ভাসানো হয়। সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে বটীর মধ্যে ক্রমে জল-প্রবেশের ফলে, বটীটি জলে ডুবিয়া গেলে, তাহা হইতে একটি বিশেষ সময় নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। সূর্যের উদয়-অস্ত দেখিয়া সাধারণতঃ গ্রহাচার্যেরা এই 'তামি' পাতিয়া থাকেন।

কৃষিকৃত্যে 'তামি' হাঁড়ি ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ রাঢ়ে একাধিক 'সিমনীতে' একজোটে শস্যক্ষেত্রে 'সাঙড়া' জল সেচনের সময় (তু. পুঁ-প ১খ, পৃ ৪৪ 'হাম দরোজে সাঙড়া জোড়ে সিউনি পিছাপিছি') কৃষকদের পর্যায়ক্রমে পরস্পরের খাটুনির সমতা রক্ষার নিমিত্ত জলপূর্ণ একটি সচ্ছিদ্র মাটির হাঁড়ি ঝুলাইয়া রাখা হয়। হাঁড়ী জলশূন্য হইতে যে পরিমাণ সময় লাগে, সেই পরিমাণ সময়, উভয় দলকে সমানতালে ছিঁচিয়া চলিতে হয়। মাটির তৈয়ারী হইলেও এই হাঁড়ি-ঘড়ির নাম 'তামি'। শস্যক্ষেত্রে জলসেচনের ব্যাপারে যন্ত্রের প্রচলন হওয়ায় সম্প্রতি এই 'তামির' ব্যবস্থা উঠিয়া যাইতেছে।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার 'শংকুনির্মাণ' নামক গ্রন্থে প্রাচীনকালে 'নানাবিধ সূর্যঘড়ী নির্মাণ বিষয়ক উপদেশ' ১৮৩০ শকাব্দে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উপরন্তু, তাঁহার প্রবন্ধ দ্র. বং-শ, পৃ ১১৫৬।

২ চি-প-স ২, প-সং ৫৬২ ৩ ঐ, ঐ ৫৩৯, ১৮০ ৪ ঐ, ঐ ৫৩

৫ ঐ, ঐ, ঐ। উপরন্তু, এই ফলিত জ্যোতিষের সহিত দৈব বিশ্বাস মিলিয়া, হিন্দুর সমাজজীবনকে জড় ও অসহায় করিয়া রাখিয়াছিল। ৬ চি-প-স ২, প-সং ৫২৯। তু. রা-খ ১খ, ১সং৭ পৃ ১২৬

৭ চি-প-স ২, প-সং ৫ ৮ তু, রা-খ ১খ, ১ম সং৭, পৃ ১২৬

৯ চি-প-স ২, প-সং ৫২৯। (মালাবারের জাতক-আচারেও দেখা যায়, ধোপা নাপিতের বিশেষ কৃত্য) (*C-T-S-I, Vol. V, pp. 346, 377*).

জন্মসংবাদ প্রেরণ করিয়া তাহার জন্ম আশীর্বাদপ্রার্থনা ও কোনও আত্মীয়ের মৃত্যুসংবাদ— এই শুভাশুভ ঘটনা তখন একই পত্রে লিখিয়া জানাইতে কোনও বাধা ছিল না। আমরা দেখি, 'কন্যা হওয়াছে' ও 'গঙ্গালাভ নওয়াছে'—এই উভয় শুভাশুভ সংবাদ একই পত্রে[১] জানানো হইতেছে। এখন সাধারণতঃ এইভাবে লেখা হয় না। কিন্তু সংসারের গতি বিচিত্র। ক্রমাগত আশীর্বাদ ভিক্ষা করিলেও শিশুর অদৃষ্টে 'প্রমাদ' আসিত[২] এবং আসিয়া থাকে বিধির বিপাকে।

আলোচ্য সময়ে ভারতীয় মুসলমানসমাজ, বিশেষতঃ অভিজাত মুসলমানেরা জ্যোতিষের চর্চা করিতেন[৩]। বনেদী প্রতি মুসলমানঘরেই তাঁহাদের বাঁধা জ্যোতিষী থাকিত। 'সইত' (Sa 'it)[৩] না মানিয়া তাঁহারা শুভকাজে পা বাড়াইতেন না। সপ্তদশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানসমাজ, বিশেষতঃ অভিজাত মুসলমানেরা জ্যোতিষের বিধিনিষেধ মানিতেন[৪]। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের একটি কড়চাতে আমরা দেখি, শ্রীসেখ আমিরদ্দীর লগ্ন কষা হইয়াছে 'শ্রীদুর্গা' ও 'শ্রীহরি' স্মরণ করিয়া[৫]।

গ. সূতিকাষষ্ঠীপূজা: প্রাপ্ত চিঠিপত্রে[৬] আমরা দেখি, সন্তানভূমিষ্ঠের ষষ্ঠ দিবসে সূতিকাষষ্ঠীপূজার অনুষ্ঠান। মঙ্গলকাব্যকারগণের রচনায় জাতককৃত্যে ষষ্ঠীপূজার উল্লেখ বিভিন্ন দিবসে বিশেষভাবে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে প্রাচীনতর সূত্রের অনুসন্ধান তুলনামূলক আলোচনায়[৭] করা গেল।

---

১ চি-প-স ২ প-সং ২। (সেকালে কাগজ সরবরাহের অপ্রাচুর্যহেতু এই নীতি দূষণীয় বলিয়া গণ্য হয় নাই, মনে হয় অর্থনৈতিক কারণেই)। ২ চি-প-স ২, প-সং ২

৩ *S-H-I-I, p. 93*। অর্থাৎ শুভক্ষণ ৪ ইতি. ২, চৈত্র ১৩৫৮, পৃ ১৬৩

৫ চি-প-স ২, প-সং ৪। (এই লগ্ন কষিয়াছেন গ্রহবিপ্র অথবা স্মার্ত ভট্টাচার্য। যথাক্রমে বার্ণিয়ে ও পরবর্তীকালের বিদেশী পর্যটক গোতিয়ে থউটেনের বর্ণনা হইতে অনুমান হয়, বাঙ্গালী মুসলমানেরা কতকাংশে স্মার্ত রঘুনন্দনের আওতায় আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

বসিরহাট অঞ্চলে মুসলমানসমাজে এখনও 'ছেমন্তন' নামে একটি সংস্কার আছে। ইহা সীমন্তোন্নয়নের অপভ্রংশ হওয়া অসম্ভব নহে (শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবৃতি হইতে—৯-১-১৯৫৯)।

৬ চি-প-স ২, প-সং ৫৬২

৭ মধ্যযুগের বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব সকল প্রধান কবিই জাতকর্মে 'ষষ্ঠীস্থান' 'সেট্যারা' বা ষষ্ঠীপূজার নানাবিধ বর্ণনা করিয়াছেন স্বল্প অথবা বিশদভাবে। জ্ঞাত ও অজ্ঞাতপূর্ব ষষ্ঠীমঙ্গলকাব্য ব্যতীত, 'কাস্তি' 'কাস্তি' দাসী ও চৌষট্টি বিড়ালবাহিনী সমেত দেবী ষষ্ঠীর মধুপুর গ্রামের আঁটকুড়া রাজাকে কৃপা করিতে যাওয়ার কাহিনীর সূত্র রঘুনন্দনের ভনিতায় সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে (দ্র. পুঁ-প ২, পৃ ২৪৮-৯)। ইহাতে ইহাঁর পূজাপদ্ধতি এইরূপ,—'পাষাণে বান্ধাবে পিড়ি ফুলগাছ বেড়া অজা মেষ মহিষ দিবেক জোড়া জোড়া'। শিশুরক্ষায় ষষ্ঠীদেবীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ইহাঁর পূজাবিধিও বিভিন্ন প্রকার। সর্বাপেক্ষা কৌতূহলজনক,—গোমুণ্ডে ষষ্ঠীপূজা। এই প্রথা রাঢ় অঞ্চলে এখনও

ঘ. তৈল-হরিদ্রা : আলোচ্য সময়ে দেখা যায়, জাতকৃত্যে 'হরিদ্রা-তৈল' করিয়া একটা ঘটা না করাতে বাড়ির স্ত্রীলোকেরা দুঃখিত আছেন। গ্রামের বাদ্যকর লইয়া সেই সময়

নানাস্থানে প্রচলিত। বিপ্রদাস, মুকুন্দরাম ও রূপরাম ইহার বিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন (ক-চ, পৃ ৪৫, ১১৩; রূ-ধ, পৃ ৬১২)।

শাস্ত্রীয় সূতিকাষষ্ঠীপূজাপদ্ধতি এইরূপ,—ততো গৃহদ্বারং প্রবিশ্য দ্বারপালান্ পূজয়েৎ। ষষ্ঠী-দ্বার-দক্ষিণপার্শ্বে ক্ষেত্র-পালাদিভ্যঃ পাদ্যাদিকং দত্ত্বা ওঁ ক্ষেত্রপালাদয়ঃ কেচিদ্ যে তীক্ষ্ণ খড়্গধারিণঃ বালস্য হি হিতার্থায় বলিং গৃহ্নন্তু তুষ্টয়ে। রঘুনন্দনধৃত 'কৃত্যচিন্তামণি' গ্রন্থে জাতকর্মে ষষ্ঠীপূজায় ষষ্ঠীকে 'মন্থানদণ্ড'-রূপে পূজা করিবার বিধি আছে (অষ্টা, পৃ ২২৯)। দক্ষিণ রাঢ়ে মন্থানষষ্ঠী বা 'মাথানী ষষ্ঠীর' পূজা হয় ভাদ্রমাসে। কোনও সরোবরে, সাধারণতঃ গৃহস্থের 'জলহরি'তে দধিমন্থনী পুঁতিয়া তাহার শীর্ষদেশে দেবীকে আবাহন ও পূজা করা হয়। এই পূজার প্রধান উপকরণ হইল বাঁশপাতা, ঝিঙ্গা আর অঙ্কুরিত আট কলাই। (বাঁশপাতা স্ত্রীরোগবিশেষের প্রতিষেধক। ঝিঙ্গা পুংজননেন্দ্রিয়ের প্রতীক (দ্র. পূঁ-প ২, পৃ ৩১৯)। অঙ্কুরিত আট কলাই, ভীষ্মাদি অষ্টবসুর ন্যায় সর্বগুণান্বিত অষ্টপুত্র কামনার ব্যঞ্জক। মাথানীষষ্ঠীর পূজার দিনে ঝিঙ্গা বা কলাই রাঁধিয়া খাইতে নাই (তু. রূ-ধ ১৭, ১ সংখ্যা তু. পৃ ।১০ লাউ খাওয়া সম্পর্কে বিধি-নিষেধ)।

মহাভারতের বনপর্বে (২২০ অ.) ষষ্ঠী দেবসেনা, সভাপর্বে শ্মশানচারিণী শিশুখাদিকা জরারাক্ষসীরূপে পরিচিতা। দেবীভাগবতে (৯-৪৪) ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ষষ্ঠীদেবীর পরিচয় আছে,—শ্মশানে নিক্ষিপ্ত মৃত শিশুকে তুলিয়া লইয়া প্রস্থানোদ্যতা রথারূঢ়া দেবীরূপে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ষষ্ঠীকে 'জাতহারিণী সুঘোরা পিশিতাশনা' বলা হইয়াছে। সেইজন্য বিষ্ণুধর্মোত্তরে রাত্রি জাগিয়া ষষ্ঠীপূজার বিধান; এবং সম্ভবতঃ 'দস্যুকে উঁচুপিঁড়ি'—এই প্রবচন-অনুসারে 'কৃত্যচিন্তামণি'-মতে মহাষষ্ঠীকে শিশুর ধাত্রী বলিয়া তাঁহার নিকট তাহার রক্ষার, দীর্ঘজীবনের ও সর্বকামনা-পরিপূরণের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। যাহাই হউক, 'কার্ত্তিকধাত্রী' ষষ্ঠীদেবীর এই সকল পরিচয় হইতে গোমুণ্ডে ইঁহার আসন-রচনার ব্যাপার ব্যাখ্যা করা গেল না; অথচ এই প্রথা এখনও বর্তমান।

মৃত গরুর সহিত দেবী ষষ্ঠীর (ইঁহার গুহ্য মন্ত্র সংখ্যা 'ছয়' বলিয়া মনে করি—তু. ব শ, পৃ ২১৭২) সম্পর্ক কোনও সুপ্রাচীন বিস্মৃত যোগসূত্রের অবশেষ হইতে পারে। ইজিপ্টে হঠোর (*Hathor* ∠*সং বট্) নামে এক সুপ্রসিদ্ধ দেবী ছিলেন খৃ. পূ. ১৪০০-এর দিকে। ইঁহার বিশেষ মহিমা ঘোষণা করা হইয়াছে পপিরাসে। ঊর্ধ্বাঙ্গে নারী এবং নিম্নাঙ্গে গাভী—এই রূপেই ইঁহাকে দেখা যায় ইহাতে। ইঁহার কাজ মৃতকে পরলোকের পথে পুনর্জন্মের পূর্বে রসদ যোগানো। নামসাদৃশ্যে ও ক্রিয়াকলাপে ইঁহাকে আমাদের ষষ্ঠীদেবীর অনুকল্প অনুমান করা যাইতে পারে। ইন্দো-মিশরীয় সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ইহা আর একটি প্রাচীনতম নিদর্শন হওয়া অসম্ভব নহে (দ্র. সা-প্র ৪, তু.)। মুকুন্দরাম ও রূপরামের উল্লিখিত ষষ্ঠীর গোমুণ্ডাসন মনে হয় ইহারই ক্ষীণ স্মৃতি বহন করিতেছে। নজরদোষ লাগিয়া বাড় কমিয়া যাইবার আশঙ্কায় বিভিন্ন রবিশস্যের, বিশেষ করিয়া 'কাপাস বাড়িতে' (বা বর্তমানের কাপাসে জমিতে অর্থাৎ দো-ফসলের ক্ষেত্রে) গোমুণ্ড টাঙ্গাইবার রীতি এখনও রাঢ়ে ও বহুস্থলেই প্রচলিত। তাহার সহিত প্রেতযোনির অনুকল্প আকৃতি অনেকস্থলে স্থাপিত হয়। অর্ধ-নারী ও অর্ধ-গাভীরূপী দেবতা 'হঠোরের' প্রতিমূর্তি (দ্র. '*Hathor*' *B-M-G, etc.*) আমাদের ষষ্ঠীদেবীর স্বরূপ আলোচনায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

কবিকঙ্কণ ও রূপরামের উদ্দিষ্ট অঞ্চলে এখনও আঁতুরঘরে গোমুণ্ড আনা হইয়া থাকে। একুশ দিনে ষষ্ঠীপূজার পর গাভী আনিয়া গোময় গোমূত্র ত্যাগ করাইলে আঁতুড়ঘর পরিশুদ্ধ হয় (তু. হ-পী-শা, পৃ ২২৯ 'স্বর্গে কপিলা

আমোদপ্রমোদ না হইলে তাঁহাদের ক্ষোভের সীমা থাকিত না[১]। ইহা ছিল পুরাপুরি স্ত্রী-আচারবিশেষ অর্থাৎ সম্ভবতঃ আর্যেতর[২] ব্যবহার।

ঙ. নতা : ইহা নবজাত সন্তানের নবম দিনের কৃত্য নহে। একটি পত্রে[৩] দেখা যায়, সন্তানজন্মের ছত্রিশ দিন পরে 'নতা' হইবে বলিয়া নিমন্ত্রণ প্রেরণ করা হইতেছে। এই আচারের কোনো শাস্ত্রীয় মূল পাই নাই। ইহা স্ত্রী-আচারও নহে। ইহা মনে হয়, আর্যেতর অথবা সাধারণ লোকাচারের প্রভাব হইতে ব্রাহ্মণসমাজে গৃহীত হইয়াছিল। 'নপ্তা' এখনও সাঁওতালেরা পালন করে[৪] জাতকৃত্যে। নামসাদৃশ্যে পুরাতন একাধিক কবি এই

ডাকি দিলেক পবন জাহার গুমূত্রে মূত্তে শুদ্ধ হয় স্থান')। বর্তমানে এই কৃত্যের নাম 'গোহালগঙ্গা'। (অথর্ববেদের বিরাজসূক্তে (৮-৫-৫-১-১০) অসুরগণ, পিতৃগণ ও মানবাদির পোষণের নিমিত্ত ঈশ্বরের 'মায়া' রূপকে দোহনের কল্পনা আছে। এই কল্পনা 'কপিলা'-কল্পনার মূল বলিয়া মনে করি। আঁতুড়ঘরে গাভী-আনয়ন, নবজাত শিশুর পোষণের নিমিত্ত কপিলা-আনয়নেরই প্রতীক নিঃসন্দেহ)। গভীর পরিবর্তে সূতিকাগৃহের দ্বারে কড়ির চোখবসানো গোময়নির্মিত দুইটি পুতুল—'গোয়ালা'-'গোয়ালিনী' নামে স্থাপন করার প্রথা অনেক স্থলে প্রচলিত আছে। 'গোয়ালিনী ডাক'-প্রথা প্রচলিত আছে দক্ষিণ রাঢ়ে। যাহাই হউক, ইহা বিশেষ লক্ষণীয় যে, জাতকর্মে এই আচার সম্পূর্ণ লৌকিক।

এই বিষয়ে বৈদিক কৃত্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল (দ্র. *C-A-I, pp. 78-80, 85*)। বৈদিকযুগে জাতকর্মাদি সংস্কারের মধ্যে গরুর স্থান না-থাকিলেও 'গোদান' নামে একটি বৈদিক ক্রিয়া ছিল; কেশচ্ছেদন তাহার মুখ্য অঙ্গ। 'গো' শব্দের অর্থ কেশ এবং 'দান' শব্দের এক অর্থ ছেদন (তু. গোদানানি বিবাহশ্চ—অনু. ৯৫-২৫)। মহাভারতের সমাজেও এই আচার অজ্ঞাত ছিল না (দ্র. ম-স, পৃ ৪৯)। মনুসংহিতায় (২-৬৮) এবং রঘুবংশেও (৩-৩৩) এই আচারের উল্লেখ আছে। পরবর্তীযুগে 'গো' শব্দের 'কেশ' অর্থ ভুলিয়া 'গরু'—এই অর্থ গৃহীত হইয়া থাকিবে। (বিবাহকালে নাপিতের 'গৌরবচন' (পরে আলোচনা দ্র.) আবৃত্তি, প্রসঙ্গতঃ আলোচ্য)। এবং এই অবকাশে তুক তাক্ মন্ত্র তন্ত্রের মাধ্যমে ষষ্ঠীপূজার জন্য প্রকৃত 'গোমুণ্ড' আনার আভিচারিক ক্রিয়ায় ইহার রূপান্তর হওয়া অসম্ভব নহে। অথবা ইহাও হইতে পারে, বৈদিককালে জাতকৃত্যে 'গোদান' প্রকৃত গরুদানের অথবা গো-বধেরই কোনও সংস্কার ছিল এবং এই সংস্কার পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হইয়া দেবী ষষ্ঠীর যূপে বা আসনে পরিণত হইয়াছে।

চি-প-স ২, প-সং ৫৬২

২ বা-দে-ই, পৃ ১১। মহিলাগণ স্বভাবে সংরক্ষণশীল। সেইজন্য এই পুরাতন আর্যেতর আচার আর্যসমাজে গৃহীত হইবার পর হইতেই বোধ করি সংস্কাররূপে ইহা স্ত্রীলোকেরাই সযত্নে লালন করিয়া আসিতেছেন। আর্যেতর স্ত্রীদের মাধ্যমে আগত আর্যসমাজে শাস্ত্রকারেরা পরে 'যোষিতের যথা ক্রিয়া যে যেমন জানে' (মা-ধ, পৃ ৩৮) বলিয়া এই সব প্রথাকেই নীতিসম্মত করিয়া লইয়াছেন (তু. যৎ স্ত্রিয় আহস্তৎকুর্বন্তি'—আপ, ধর্ম, ২, ৬, ১৫, ৯; 'আবৃতশ্চা স্ত্রীভ্যঃ প্রতীয়েরন্'—আপ, গৃহ্য ২, ১৫)। ৩ চি-প-স ২, প-সং ৬, ঐ পৃ ৫৪৮

৪ *C-R, 1951, Bank, pp. xciii-xciv*। ইহা পুত্রসন্তান জন্মিলে পাঁচ দিনে এবং কন্যাসন্তান হইলে তিন দিনে ক্ষৌরকর্মাদির কৃত্য। (নপ্তা∠নাপ্তি=*নাপিত—এইরূপ সম্ভাবিত ব্যুৎপত্তি, তৎসম 'নক্তম্'-মূল—এই কল্পনা হইতে অধিকতর সমীচীন, মনে করি)।

আচার নবম দিবসের কৃত্যের সহিত জুড়িয়া থাকিবেন[১]। হরিদেবের ও মানিক গাঙুলির মতে, এই 'লোকাচার' পঞ্চম দিবসের কৃত্য[২]। যাহাই হউক, ইহা নিশ্চিত যে, এই আচার আর্যেতর জনগণের।

চ. অন্নপ্রাশন : ইহা দশ সংস্কারের সপ্তম সংস্কার। মহাভারতীয় সমাজে 'অন্নপ্রাশন' সংস্কার ছিল বলিয়া অনুমিত[৩] হয়। রঘুনন্দনে ইহার বিস্তৃত বিধান আছে[৪]। মধ্যযুগের বাঙ্গালী কবিগণের রচনায় ইহার সুবহু উল্লেখ দেখা যায়[৫]।

অন্নপ্রাশনে[৬] বচকানি চেলির জোড়[৭] ও হাশুলি খেড়ুয়া বাওটা বাক[৮] দিয়া সাজানো হইত শিশুকে। এই 'ভুজনতে' আশীর্বাদী ও লৌকতা[৯] আসিত আত্মীয়স্বজনের বাড়ি হইতে। ব্রাহ্মণ গুরুর বাড়িতে লৌকতা[১০] আসিত গুঁই লাহা ঘোষ মালাকার মণ্ডল ইত্যাদি ব্রাহ্মণেতর শিষ্যদের নিকট হইতে। ১২৪৭ বঙ্গাব্দে ছয় টাকা সাড়ে নয় আনার মত খরচ করিলে[১১] সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ বাড়িতে ধুমধামে 'অন্নপ্রাশন'-উৎসব সমাধা হইত।

৪

আলোচ্য চিঠিপত্রের সমাজে আচরিত প্রথাসমূহ সমসাময়িক ও অব্যবহিত পূর্ববর্তী কবিগণের রচনায় উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বৃন্দাবনদাস ও মুকুন্দরামের পূর্ণ শাস্ত্রজ্ঞান ও প্রখর বাস্তববুদ্ধি থাকায় সমকালীন খুঁটিনাটি সামাজিক প্রায় কোন আচারই তাঁহাদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। আলোচ্য সমাজে পঠিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে দেখা যায়, মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের বিশেষ সমাদর ছিল। সুতরাং তাঁহার বর্ণিত প্রথাসমূহেরও প্রচলন ছিল অনুমান করা যায়। এইরূপ একটি রীতির নাম করা যায়,—'প্রসবসন্ধান'। প্রসবসন্ধানের নব নব উপায় আমরা চিঠিপত্রের[১২] মধ্যে দেখিতে পাই। প্রসঙ্গতঃ আমরা একটি নূতন সূত্র হইতে

১ দ্র. বি-ম, পৃ ১৫১ 'নত্তা'; ক-চ, পৃ ৪৫ 'নবনত্তা', ১১৩ 'নত্তা'; মা-ধ, পৃ ৪২ 'লত্তা' ই.
২ দ্র. হ-রা, পৃ ১৬৩ 'পঞ্চম দিবসে মনের হরিষে কৈল লোকাচার 'নর্ত্তা''
৩ দ্র. ম-স, পৃ ৪৯ ৪ দ্র. অষ্টা, পৃ ২৩০
৫ দ্র. বি-ম, পৃ ১৫২; ক-চ, পৃ ৪৫, ১১৩, মা-ধ, পৃ ৭০, ই.
৬ চি-প-স ২, প-সং ৭, ৫৬৩-৬৪
৭ ঐ, ঐ ৭
৮ ঐ, ঐ ৩০৫, ৫৬৪
৯ ঐ, ঐ ৫২৯, ৫৩১
১০ ঐ, ঐ ৫৬৪
১১ ঐ, ঐ, ঐ
১২ ঐ, ঐ ৩৮০, পৃ ৫০৬ 'হাবনের ঔষধি' দ্রষ্টব্য। মানিক গাঙুলিও ইহার ইঙ্গিত দিয়াছেন,—('একার করিল কত প্রসব কারণে'—মা-ধ, পৃ ৩৮)

কতকগুলি বিষয় তুলনা করিয়া দেখাইতেছি। মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন,—'ধর্মশূল'[১] বা 'মন্ত্রিত জল'[২] দ্বারা সেকালে সুপ্রসবের ব্যবস্থা করা হইত। রূপরামেরও বিশ্বাস ছিল,—'মন্ত্রের অধীন বলে সকল দেবতা'[৩]। বৃন্দাবনদাস বলেন,[৪]—শিশু চৈতন্যদেবের বিপন্নাশার্থ ও রক্ষণার্থ 'রক্ষা'-মন্ত্র-আবৃত্তিতে 'বিষ্ণু-রক্ষা,' 'দেবী-রক্ষা'-পাঠে মন্ত্র পড়িয়া ঘর চতুর্দিকে বেষ্টন করা হইয়াছিল। শ্রীনৃসিংহ ও চণ্ডীস্তব বা অপরাজিতার স্তোত্র[৫] পাঠ করিয়া নানা মন্ত্রে শচীগৃহের দশ দিক্ বন্ধন করা হইয়াছিল। মন্ত্রবিৎ ওঝারও সেখানে বিশিষ্ট আসন নির্দিষ্ট দেখা যায়, ছায়ারূপী অপদেবতাকে শাসন করিবার জন্য। দৈবজ্ঞ জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্‌বাণী তখন যেন দৈববাণীরই রূপান্তর। সুতরাং সেকালের জনসাধারণেরও জাতকর্মে এইরূপ মন্ত্রতন্ত্র তুকতাকের আশ্রয় লওয়াই স্বাভাবিক। সুপ্রসব মন্ত্রের কৌতুকাবহ কতকগুলি নূতন পুঁথি[৬] সংগৃহীত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ ইহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আমরা এই অধ্যায় সমাপ্ত করিতেছি।

সেকালের এই মন্ত্রগুলি পড়িলেই দেখা যাইবে, এইগুলি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিভিন্ন শাস্ত্রের ও সাহিত্যের একত্র-সংগৃহীত ও সংগ্রথিত বিচ্ছিন্ন অবশেষমাত্র। এই বাঙ্গালা মন্ত্রসমূহের প্রত্যেক 'পাপড়িতে'[৭] অতীত যুগের ভাবধারা যেন তাহার পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র[৮] করিয়াছি। বাঙ্গালার সুপ্রচলিত লৌকিক কায়দর্শন (দেহতত্ত্ব) রামায়ণ মহাভারত মনসা-ধর্ম-চণ্ডীমঙ্গল, গোর্খ-বিজয়াদি নানা চলিত সাহিত্যের স্রোত বাহিয়া আসিয়াছে। তাহাদের বিচ্ছিন্ন বিশিষ্ট গুহ্য অংশগুলি গ্রথিত করিয়া এই মন্ত্রগুলিতে যেন পেটিকাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। প্রাচীন সমাজের মর্মস্থানে সমকালীন সাহিত্যের প্রভাব কিরূপ গভীরভাবে পড়িয়াছিল তাহা এই মন্ত্রাবলী[৯] হইতে বিশেষভাবে

---

১ ক-চ (ক-বি সংগ) ১ভা, পৃ ১২৯। 'প্রসব-সন্ধানের' জন্য ধর্মঠাকুরের প্রতীক কামাতেরক শাল। ভাষায় ও ভাবে কায়তত্ত্বের পরিভাষা লক্ষণীয়।

২ ক-চ, পৃ ঐ। অর্থাৎ জলপড়া।

৩ রূ-ধ ১খ, ১ম সং, পৃ১৩১ ৪ চৈ-ভা, পৃ ১০১-২

৫ তু. চি-প-স-২, প-সং ১৯৫

৬ পুঁ-প ১খ, পৃ ১৫৩, ১৯৬, ১৯৯, ২০১

৭ কায়তত্ত্বের পরিভাষা। মন্ত্ররূপ বিকশিত কমলের দল। 'পাপড়ি'—দ-রা

৮ পুঁ-প ১খ, তু. পৃ *১৫, *২৬; ঐ ২খ, তু. পৃ ১৯-২০

৯ অনুমান হয়, সংস্কৃত মন্ত্রের জন্মও এইভাবে হইয়াছে। বিস্মৃতপ্রায় সুপ্রাচীন ভাষার টুকরাগুলিতে গুহ্য ভাব ও পবিত্রতা আরোপ করায়, এই মন্ত্রগুলির উৎপত্তি হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে তুলনামূলক বিশেষ অধ্যয়ন ও আলোচনা আবশ্যক।

ধারণা করা যাইবে। বংশপরম্পরায় অথবা গুরুপরম্পরায় ইহার জের এখনও অব্যাহতরূপে চলিয়া আসিতেছে তাহা গ্রামাঞ্চলে ওঝা বা 'গুণিন্'-দের নিকট সন্ধান করিলেই জানিতে পারা যায়।

প্রসবমন্ত্রের পুঁথি অনেক পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত পুঁথির প্রাচুর্য সেই বিষয়ের বহুল প্রচলনই সপ্রমাণ করে। বৈদ্যক ও দৈবজ্ঞের মিলিত প্রয়াসে তুকতাকও সেকালে কম করা হইত না। কিছু নমুনা[১] দিতেছি।

। সুখপ্রসবের একটি তুক[২] ।

ক. সুখপ্রসবায় রজনীগন্ধার ঈশানকোণে মূল সুতা পাচ সাত নয় খীতে বা বান্ধিয়া চক্ষুর নিকট পর্যন্ত পড়ে ইহাতে তৎক্ষণাৎ ছিড়িবে মঙ্গলবারে তুলিলে এক পক্ষ গুণ দেয়॥

খ. । তুক ও মন্ত্র[৩] ।

পিঁড়ার উপরে কাট-খড়িতে লিখিয়া বাম হাত্যে কোণে তিন চাপড় দিবে সেই পীড়া প্রসূতি গতায়াতে তিনবার ডেঙ্গাবে দেয়ালে ঠেসাইয়া রাখেয়া নজর করিবে॥

বন্দ মাতা কামরক্ষা[৪] শ্বেত করবীর ফুল[৫]
ধুতুরার বিচ[৫] পানের সিকুটি[৫] তাহে দিবে সমতুল।
আহ লঙ্কায়[৬] শ্রীরামের দোহাই হনুমান মহাবীর
কামরক্ষা রাড়ে কালিকা মা[৭] হন হন মথ মথ পড়
অমুকার বস্তির নাড় ছিড়ে পড়॥

গ । প্রসবমন্ত্র : শিবগায়িত্রী[৮] ।

সোনাক ইস্ত্রী[৯] রূপাক ধার ধর্ত্রী[১০] মাতা নমস্কার
প্রসাব কারণে কো জাগা দেও॥

১ পুঁ-প ১খ, পৃ ১৫৩, ১৯৬, ১৯৯, ২০১ ২ ঐ, পৃ ১৫৩

৩ পুঁ-প ১খ, পৃ ১৯৬। 'তুক' শব্দটিকে প্রত্যাশিত শুদ্ধ প্রাকৃতরূপ 'তুক্'—এই বানানেও পাই।

৪ অর্থাৎ দেবী কামাখ্যা। সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক দেবী। তন্ত্রমন্ত্র তুকতাকের অধিষ্ঠাত্রীদেবীরূপে ইনি প্রথমেই বন্দিত হইয়াছেন।

৫ এই তিনটি অনুপানই বিরেচক। সিকুটি=শিকড়

৬ তু. 'আহ লঙ্কা' (ক-চ, পৃ ১৯৬); 'পলংকা' (গো-বি, ভূ. পৃ ৬ ৬)

৭ কালীঘাটের কালী (দ্র. গো-বি, পৃ ২১) ৮ পুঁ-প ১খ, পৃ ১৯৯

৯ অর্থাৎ 'অস্ত্র'। মন্ত্রকে জোড়ালো করিতে হিন্দীভাষার প্রয়োগ অথবা মন্ত্রের ইহা সর্বভারতীয়ত্বের দ্যোতক—তাহার সন্ধান আবশ্যক। ১০ ধরিত্রী

ওঁ গচ্ছন্তে সর্বদেবানাং ভূত পিশাচ রক্ষতা মলমূত্র প্রবরাণাং মমাদা ধ্বাঞী[১] দিতে ওঁ তৎপুরুষায় ধীয়মায় বিদ্মহে। মহাদেবায় ধীমহি তন্নোরুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥

খ. ।প্রসবমন্ত্র[২]।

ওন্না মা বস্তে হনুমান মামা বসে নরসিং[৩] পিছে অজয়পাল[৪]

কালিয়া[৫] ব্রাহ্মণ বস্তে আসরে বস্তে আজ্ঞা বীর বয়তাল[৬]।

চারি বীর মেরে অঙ্গকে সঙ্গ

চারি বীর মেরে অঙ্গকা রক্ষা[৭] করে

রক্ষা[৭] করে ঘট[৮] প্রাণছে রক্ষা[৭] করে।

জেহুয়ে মেরো ঘট[৮] প্রাণ সওয়ানা[৯] মাননো হোক।

১ ধ্বনি। বাঙ্গালা মন্ত্রের আবৃত্তিতে উচ্চারিত বিশেষ পারিভাষিক শব্দ ২ পুঁ-প ১খ, পৃ ২০১

৩ নরসিং কীল অর্থাৎ নৃসিংহ কীলক। এই মন্ত্রের পুঁথি বিশ্বভারতী-সংগ্রহে আছে। এই নৃসিংহস্তব পাঠ করিয়া সূতিকাগৃহে শিশু চৈতন্যদেবের 'রক্ষার' ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

৪ ইনি 'যোগী জয়পাল' হইতে পারেন। বর্ধমান সংরে ইঁহার মন্দির আছে (দ্র.ব-সা-সন ১৩২২, ইতিহাস শাখা, পৃ ৭৩) ৫ কালিয়া দানা

৬ বাঁকুড়া জেলার 'বক্রিতল' গ্রামের শক্তিশালী 'রাউতরূপী' কোনও গ্রামদেবতা ছিলেন বলিয়া মনে করি। পরে, 'বকড়াই চণ্ডী' (দ্র. রা-ধ ১খ, ১ সং, পৃ ১৪) তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া থাকিবেন।

৭ চৈতন্যভাগবতে 'রক্ষা'-মন্ত্র আবৃত্তির ও 'দিক্ বন্ধনাদির' কথা আমরা বলিয়াছি। মুকুন্দরাম লিখিয়াছেন (পৃ ২১১);—আঁতুর ঘরের দ্বারে 'জাল' 'বেত' ও 'উপানদ' বাঁধা হইত সন্তানের রক্ষার নিমিত্ত। এই উদ্দেশ্যে ডান ডাইনীর 'বাণকাটার' একটি বাঙ্গালা মন্ত্রের (দ্র. পুঁ-প ১খ, পৃ ১১৯-২১) আরম্ভ এইরূপ;— 'দুর্গা মা কাটেন সুতা মহাদেব বুনেন জাল'। এই জাল বোনা হয় 'বক্ষের' জন্য। দুর্গা মায়ের নবজাত সন্তানকে 'চোর চঁাট বাগ ভালুক বাদি, মুদুই' প্রভৃতির উৎপাত হইতে রক্ষাই ইহার উদ্দেশ্য। দক্ষিণ রাঢ়ে এই দেবতা মহাদেব ধর্মঠাকুরের সহিত মিশিয়া 'পকানন ধর্ম' বা 'পেঁচো ঠাকুর' বলিয়াছেন (দ্র. পুঁ-প ১খ, পৃ ২২৫; ঐ ২খ, পৃ ৫৩-৫৫; চি-প-স ২, প-সং ৪৩৮)। সন্তানরক্ষায় ইনিও একজন প্রধান দেবতা। 'জাল' সম্ভবতঃ জটাধারী (তু. জটাজাল) শিবেরই প্রতীক।

পক্ষান্তরে, আঁতুরঘরে জালবাঁধা আর্যেতর কোনও আচারও হইতে পারে। মধ্যভারতের ঘটোলরা আঁতুর-ঘরে জাল জড়াইয়া দেয় (দ্র. *G. pp. 70 ff. etc.*)। বর্তমানে দক্ষিণ রাঢ়ে আঁতুর ঘরের দ্বারে, শিশুর হাতের লোহার ও কাজললতায় এবং বালিশে জাল জড়াইয়া দিবার প্রথা বিদ্যমান। হাওড়া অঞ্চলে জালের অনুকরণ লাল সুতার বেষ্টনী দিবার রীতি আছে।

ধর্মপূজাপদ্ধতিতে 'বেত্রজন্মের' বিস্তৃত বিবরণ আছে। ধর্মঠাকুর ও শিবঠাকুরের গাজনে সন্ন্যাসীদের 'বেত্রধারণ' একটি অপরিহার্য কৃত্য। ঘরভরা (গৃহভরণ) গাজন পুত্রেষ্টি যজ্ঞবিশেষ। সুতরাং মনে হয়, সন্তানের হিতার্থে বেত্র-ব্যবহার এই সূত্রেই প্রচলিত হইয়াছে। 'বেত্র' এখানে সম্ভবতঃ ধর্মঠাকুরের প্রতীক।

'উপানদ'-প্রসঙ্গ পরে দ্রষ্টব্য।

৮ দেহ বা কায়ার যৌগিক পরিভাষা। ঘট=পিণ্ড। ৯ অর্থাৎ পাঁচ পয়সা

বজ্রকী কোঠরি[১] ব্রহ্মা তালা বিষণ কুঁচি[২]
রক্ষা করে দেবদত্ত গোরক্ষনাথ[৩] যতী ॥
জলপড়া[৪] তিন বার[৫] পড়িবে গর্ভবান্ধা ঘুচে।

এই বাঙ্গালা মন্ত্রগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে বৈদিক, তান্ত্রিক,[৬] আর্য, আর্যেতর ও লৌকিক নানা আচার-বিচারের অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে দেখা যাইবে। এবং ইহাও ঠিক যে, সুযোগ ও স্বচ্ছ দৃষ্টির অভাবে, সেকালের সমাজের জনগণের আড়ষ্ট জীবনধারা, এই সব তথাকথিত ধর্মসংস্কার ও তুক্তাক্ মন্ত্রাদি দ্বারা বহুলপরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।

৫

হিন্দুসংস্কারে জাতকর্ম[৭] : ভারতীয় বেদমার্গী আর্য-সমাজে 'জাতকর্ম'-সংস্কার অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এবং অসংকোচে বলা যায়, তুক্তাক্ মন্ত্র-তন্ত্রাদিই এই সংস্কারের প্রধান অবলম্বন। এতন্মধ্যে 'বৈশ্বানরেষ্টি'[৮] অন্যতম ও প্রাচীনতম। পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিলে দ্বাদশ মৃৎপাত্রে ('কপালে') পিষ্টকের নৈবেদ্য বৈশ্বানরকে নিবেদন করিতে হয়। এই 'ইষ্টি'-অনুষ্ঠানে সন্তান পুণ্যবান্, যশস্বী, শস্যসমৃদ্ধ, বলবান্ ও গোধন-

১ কায়যোগের পরিভাষা (দ্র. গো-বি, পৃ ২৪৫) ২ সং কুঞ্চিকা

৩ ইনি স্পষ্টতঃই এখানে গর্ভমোচনের দেবতা। গো-রক্ষনাথ উত্তরবঙ্গে গরু-'রক্ষার' দেবতা। রাঢ়ে 'গর্ভবান্ধা' অর্থাৎ গর্ভবন্ধন মুক্ত করিবার নিমিত্ত 'জলপড়া'-মন্ত্রের ইনি অধিদেবতা। সুখপ্রসবের মন্ত্রেরও ইনি প্রধান দেবতা (বি-ভা-পুঁ, সং ১৩৩৩, 'রক্তের কুলকুলি' ই.)। গো-রক্ষনাথের পায়ের 'সিদ্ধ পানাই' (∠উপানৎ) খুব করিতকর্মা। গগনচারী কানফা যোগীর 'খড় সব' গতি নিরুদ্ধ করিয়া এই 'পানাই' তাঁহাকে সবলে বাঁধিয়া নামাইয়াছিল (গো-বি, পৃ ২৪, ২৫, ২৭)। কামরত্নতন্ত্রে (বি-ভা-পুঁ, সং ৪০) আছে,—'গচ্ছ গচ্ছ দ্রুতং গচ্ছ পাদুকে বরবর্ণিনী, মৎপাদস্পর্শমাত্রেন গচ্ছ ত্বং শতযোজনম্'।—এইরূপ যৌগিক শক্তিসম্পন্ন 'পানাই' বা 'উপানৎ' লোকবিশ্বাসে স্বচ্ছন্দে গো-রক্ষনাথের প্রতীক হইতে পারে। পক্ষান্তরে, জুতা ঈরানীয় বুটপরিহিত সূর্যদেবতার (তু. 'হাসা ঘোড়া থাসা জোড়া পায়ে দিয়ে মোজা' ই.—ন্ন-ধ ১খ, ১ম সং, ভূ. পৃ ৮০ ; ধ-পু-বি, পৃ ২১৫) প্রতীক হওয়াও অসম্ভব নহে—রামের পাদুকা বা খড়মের ন্যায়। সর্ববিধ আরোগ্যকামনায় সূর্যদেবতার পূজাবিধি ('সূর্যার্ঘ্য') অদ্যাপি সুপ্রচলিত। 'সূর্যপদে উপানৎ'-এর পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সূত্রেরও অনুসন্ধান হইয়াছে (দ্র. সা-প-প ১৩১৬-৩ দ্রষ্টব্য)।

৪ মুকুন্দরামের ভাষায় 'মন্ত্রিত জল'। এই মন্ত্রে জলপড়া বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ (তু. সা-প্র ৩, প্রবে, পৃ ৪)

৫ ত্র্যক্ষরাত্মক প্রণবমন্ত্রের অনুসরণে গুহ্য মন্ত্রের আবৃত্তির সংখ্যা 'তিন' ৬ তু. তা. গু., পৃ ২৭৩

৭ দ্র. History of Dharmaśāstra, Vol. II, Part I, P. V. Kane, pp 228-238

৮ ঐ ধৃত তৈ. সং ২, ২.৫.৩-৪

সমন্বিত হইয়া থাকে। জৈমিনির মতে,[১] এই 'ইষ্টি' অনুষ্ঠিত হইত মাত্র পুত্রের হিতার্থে। শাবরভাষ্যে[২] দেখা যায়, এই অনুষ্ঠান জাতকর্ম-কৃত্যের পরে অনুষ্ঠিত হইত; জন্মমুহূর্তে নহে। জন্মের দশ দিন পর পূর্ণিমা বা প্রতিপদ তিথিতে এই অনুষ্ঠান বিধেয়। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন,[৩] নাভিচ্ছেদের পূর্বে কিছু কৃত্য আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে[৪] আছে, পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র তাহাকে ঘৃত লেহন করাইতে হয়; অতঃপর মাতৃস্তন্য দিতে হয়। ইহার শেষের দিকে[৫] জাতকর্মের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এই কৃত্যে সরস্বতী[৬]-মন্ত্রপাঠ করিবার বিশেষ বিধান দেখা যায়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের মন্ত্রাবলী বিশ্লেষণ করিলে জাতকর্ম-কৃত্যের এইসকল অনুষ্ঠান সেকালের সমাজে—অন্ততঃ উচ্চতর সমাজে প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমান হয়:—১ মন্ত্র ও ঘৃত সহযোগে দধিহোম ২ শিশুর দক্ষিণ কর্ণে 'বাক্' শব্দটি তিনবার উচ্চারণ করা ৩ স্বর্ণ-অঙ্গুরীয় বা চামচ দ্বারা শিশুকে দধি, মধু ও ঘৃত লেহন করানো ৪ শিশুকে তাহার গুপ্ত-নামে (নামকরণ) আহ্বান করা ৫ শিশুকে মাতৃস্তনের নিকট স্থাপন করা এবং ৬ মাতাকে মন্ত্রসহযোগে আবাহন করা। শতপথ ব্রাহ্মণ প্রসঙ্গতঃ আর একটি কৃত্যের উল্লেখ করিয়াছেন: পাঁচজন ব্রাহ্মণ পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর এবং একজন শিশুর ঠিক্ উপর হইতে শ্বাস গ্রহণ করিবেন; অথবা, শিশুর পিতাও ইহা করিতে পারেন। এই বিষয়ে বিভিন্ন গৃহ্যসূত্রের মত-বিভেদ আছে।

গৃহ্যসূত্র-মতে, কয়েকটি জাতকৃত্যানুষ্ঠানের উল্লেখ[৭] করা যাইতেছে।—১ হোম ২ মেধাজনন ৩ আয়ুষ্য ৪ অংসাভিমর্শন ৫ মাত্রভিমন্ত্রণ ৬ পঞ্চ-ব্রাহ্মণস্থাপন ৭ স্তন-প্রতিধান বা স্তনপ্রদান ৮ দেশাভিমন্ত্রণ ৯ নামকরণ এবং ১০ ভূত-বিতাড়ন। ভূত-বিতাড়নের বিষয়ে আশ্বলায়ন এবং সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্র সম্পূর্ণ নীরব; পক্ষান্তরে, অন্য সূত্রগুলি যাদুমন্ত্রের বিবরণ-প্রদানে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। আপস্তম্ব-স্মৃতির বিধানমতে,[৮] সরিষা ও চাউলের পিণ্ড পাকাইয়া অগ্নিতে তিনবার আহুতি দিতে হইবে, প্রত্যেক বারে আটটি মন্ত্রপাঠ করিয়া। এবং বিভিন্ন গৃহ্যসূত্রে এই অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যও বড় কম নহে।

এই প্রসঙ্গে সুবিস্তৃত শাস্ত্রীয় আলোচনা বর্তমানে অনাবশ্যক। বিশেষতঃ, পরবর্তী শাস্ত্রে পূর্বতন প্রাচীন সূত্রসমূহের বিধানের বহু পার্থক্য ঘটিয়া গিয়াছিল। আমাদের আলোচ্য সময়ে এবং আধুনিককালে সন্তান-জন্মের পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিবসে কতকগুলি কৃত্য

১ Kane ধৃত ৪, ৩.৩৮ ২ Kane, p 229 ৩ ঐ ধৃত S. B. E, Vol. 44, p 199
৪ ঐ, ঐ ১.৫.২ ৫ ঐ, ঐ ৬, ৪, ২৪-২৮ ৬ তু. শা-ব্র ৪, তু. পৃ ৩৪, পা-টী ৫
৭ Kane, pp 232-235 ৮ ঐ ধৃত আপ. মন্ত্রপাঠ ২, ১৩, ৭-১৪

অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু, সে-বিষয়ে সূত্রসমূহে কোনো নির্দেশ দেখা যায় না। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন,[১] এই সকল বিধানের জন্ম সম্ভবতঃ পৌরাণিক যুগে। এই সময়ে সন্তানের পিতা অথবা কোনো আত্মীয় পুরুষ সান্ধ্যস্নান সমাপনান্তে গণেশ-বন্দনা করিয়া 'জন্মদা' নামক এক দেবীকে একমুষ্টি চাউলসহযোগে পূজা করিতে থাকেন; ষষ্ঠীদেবী এবং ভগবতী বা দুর্গার পূজা করা হয় যোড়শোপচারে। অতঃপর, ব্রাহ্মণগণকে তাম্বূল-দক্ষিণা দান করা হয় এবং বাড়ীর লোকেরা মঙ্গলগীতি গাহিয়া ও জাগরণে নিশি যাপন করেন। স্পষ্টতঃই ইহা অপদেবতা-বিতাড়নের কৃত্যমাত্র। মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলেন, সন্তানের জন্মদিনে গৃহস্থ সশস্ত্র হইয়া সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইবে। সন্তান অশুভলগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবার বিধান আছে; এবং অন্ততঃ অষ্টম বর্ষ পর্যন্ত তাহার মুখদর্শন নিষিদ্ধ।

জাতকর্মের বিশিষ্ট অঙ্গ উত্থান[২] কৃত্য। ইহা শিশুর শয্যা হইতে উত্থান। বৈখানস-স্মার্ত-সূত্র[৩] মতে, সন্তান-জন্মের দশম অথবা দ্বাদশ দিবসে পিতা ক্ষৌরকর্ম, স্নান, গৃহ-পবিত্র এবং 'জাতকাগ্নি' যজ্ঞ করিবেন। এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিবেন ভিন্নগোত্রের লোক। অতঃপর, তিনি ঔপাসন বা গৃহ্য অগ্নি আনয়ন করিবেন, ধাত্রী-বরণ করিবেন এবং বরুণদেবের নিকট পঞ্চহোম করিয়া, ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবেন। সাংখ্যায়ন-গৃহ্যসূত্রে[৪] ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এই বিধানে, সূতিকাগ্নিতে অন্ন রন্ধন করিতে হয় এবং হোম করিতে হয় নব-জাতকের 'তিথিকে', অধিষ্ঠাতৃ-দেবগণসমেত নক্ষত্রত্রয়কে, অগ্নিকে এবং সোমকে। হিরণ্যকেশী-গৃহ্য-সূত্র[৫] ও ভারদ্বাজ[৫] জাতকর্ম প্রসঙ্গে 'উত্থান'-কৃত্যের উল্লেখ করিয়াছেন। উভয়েই বলেন, সূতিকাগ্নি নির্বাপিত করিয়া 'উপাসন'-অগ্নি স্থাপন করিতে হয়। সেই অগ্নি আবাহনের সময় ঘৃতাহুতি দিতে হয়, তাহার মন্ত্র—'ধাতা দদাতু নো রয়িম্'—।

৬

ধর্মশাস্ত্রে সংস্কার : প্রাচীন বৈদিকসাহিত্যে 'সংস্কার' শব্দটি নাই[৬] বলিলেই হয়। জৈমিনি-সূত্রে শব্দটি কয়েকবার উল্লিখিত হইয়াছে যজ্ঞলব্ধ পুণ্যকর্ম অর্থে। জৈমিনির মতে, জ্যোতিষ্টোম-যজ্ঞকারী[৭] মস্তকমুণ্ডন, দন্তধাবন, নখচ্ছেদন করিয়া সংস্কৃত হইবেন। তিনি সংস্কার বলিয়াছেন—উপনয়নকে[৮]। ভাষ্যকারদের মতে, জন্মগতভাবে অর্জিত পাপ হইতে

১ Kane, p 287   ২ ঐ pp 287-38   ৩ Kane ধৃত ৩, ১৮   ৪ ঐ, ঐ ১. ২৫
৫ ঐ, ঐ ২, ৪. ৬-৯ ; ১. ২৬   ৬ Kane, p 190   ৭ ঐ ধৃত ৩, ৮. ৩   ৮ ঐ, ঐ ৬, ১. ৩৫

মুক্ত হইয়া সদ্‌গুণ অর্জন দ্বারা যোগ্যতা লাভই প্রকৃত সংস্কার। 'সংস্কার' শব্দটি বেশীর ভাগ গৃহ্যসূত্রে নাই; কিন্তু ধর্মসূত্রসমূহে আছে[১]।

সংস্কার-প্রকরণে আলোচ্য বিষয় এইগুলি: সংস্কারের উদ্দেশ্য, শ্রেণীবিভাগ ও সংখ্যা এবং যেভাবে পালন করিবেন ও পালন করাইবেন তাহার বিচার। মনুর মতে,[২] দ্বিজাতির ক্ষেত্রে পাপ অর্শায় পিতামাতার বীজ ও শোণিত হইতে; এবং তাহা বিদূরিত হয় গর্ভকালে ও জাতকর্মে হোমকৃত্যের দ্বারা। মানবদেহ ব্রহ্মলাভের যোগ্য হয় বেদাধ্যয়ন, ব্রতপালন, হোম, দেব-ঋষি পূজা, পুত্রোৎপাদন, নিত্যপঞ্চযজ্ঞ সম্পাদন করিলে। যাজ্ঞবল্ক্যেরও[৩] এই মত। পরবর্তী ভাষ্যকারগণ তাঁহাদের এই অভিমত নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রাচীনকাল হইতে সংস্কারের উদ্দেশ্য হইতেছে, মানুষের অন্তর্নিহিত যোগ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটানো। সংস্কারের তালিকা লক্ষ্য করিলে বোঝা যায়, ইহার উদ্দেশ্য বহুমুখী। উপনয়ন-সংস্কারের আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক উন্নয়নের তাৎপর্য আছে। নামকরণ, অন্নপ্রাশন এবং নিষ্ক্রমণ সংস্কারগুলি লৌকিক। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রীতি, স্নেহ এবং উৎসবের আনন্দ শতধারে উৎসারিত হইয়া থাকে। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন সংস্কারগুলি নিগূঢ়ার্থক ও প্রতীকধর্মী। বিবাহ-সংস্কার দুই ব্যক্তিকে এক করিয়া সমাজ-বিস্তার, এবং সংযম দ্বারা আত্মোন্নতি, আত্মত্যাগ ও পারস্পরিক সহযোগিতার দিকে আগাইয়া দেয়।

হারীতের মতে, সংস্কার দুইপ্রকার—ব্রাহ্ম ও দৈব[৪]। স্মৃতিকারদের মধ্যে সংস্কার-সংখ্যা সম্পর্কে প্রবল মতপার্থক্য বিদ্যমান। গৌতমের মতে,[৫] সংস্কার চল্লিশটি—গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চৌল, উপনয়ন, বেদের ব্রতচতুষ্টয়, স্নান বা সমাবর্তন, বিবাহ, নিত্যপঞ্চমহাযজ্ঞ, সপ্তপাকযজ্ঞ, সপ্তহবির্যজ্ঞ, সপ্তসোমযজ্ঞ। বৈখানস-স্মার্তসূত্রমতে, শারীর সংস্কার অষ্টাদশ। অঙ্গিরাঃ বলেন, সংস্কার পঞ্চবিংশতি। বেদব্যাসের মতে, সংস্কার-সংখ্যা ষোল। হলায়ুধ বলেন,[৬] দশ; রঘুনন্দন[৭] বারো।

গৃহ্যসূত্র[৮] দুই প্রকারে সংস্কার আলোচনা করিয়াছেন। অনেকে আরম্ভ করিয়াছেন বিবাহ হইতে সমাবর্তন পর্যন্ত। কেহ আরম্ভ করিয়াছেন, উপনয়ন হইতে। গৃহ্যসূত্র, স্মৃতি এবং পুরাণ মতে, প্রধান সংস্কারাবলী: ঋতু-সঙ্গমন, গর্ভাধান: নিষেক: চতুর্থীকর্ম বা -হোম, পুংসবন, গর্ভরক্ষণ, সীমন্তোন্নয়ন, বিষ্ণুবলি, সোষ্যন্তী-কর্ম বা -হোম, জাতকর্ম, উত্থান, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ বা উপনিষ্ক্রমণ বা আদিত্যদর্শন বা নির্ণয়ন, কর্ণভেদ, অন্নপ্রাশন,

১ Kane, p 191 ২ ঐ স্মৃত ২, ২৭ ২৮ ৩ ঐ, ঐ ১, ১০ ৪ Kane, p. 193
৫ ঐ স্মৃত ৮, ১৪-২৪ ৬ দ্র. ব্রা-স ৭ দ্র. সং-ত ৮ Kane, pp 196-201

বর্ধবর্ধন বা অব্দপূর্তি, চৌল বা চূড়াকর্ম বা চূড়াকরণ, বিদ্যারম্ভ, উপনয়ন, ব্রতচতুষ্টয়, কেশান্ত বা গোদান, সমাবর্তন বা স্নান, বিবাহ, পঞ্চমহাযজ্ঞ, উৎসর্গ, উপাকর্ম ও অন্ত্যেষ্টি।

জাতকর্ম হইতে চূড়াকর্ম পর্যন্ত সংস্কারগুলি নবজাত ব্রাহ্মণকুমারের পক্ষে বৈদিকমন্ত্র-সহযোগে অবশ্যপ্রতিপাল্য ছিল এবং কন্যা-সন্তানের পক্ষে ইহা অনুষ্ঠিত হইত বৈদিকমন্ত্র ব্যতিরেকে। গর্ভাধান হইতে উপনয়ন পর্যন্ত সংস্কার ব্রাহ্মণ-সন্তানের পক্ষে অবশ্যকরণীয় ছিল। ক্লীব সন্তানের জাতকর্ম হইত না।

শূদ্রগণের পক্ষে কোন্ কোন্ সংস্কার[১] বিধেয়—এই বিষয়েও নানা মুনির নানা মত। বেদব্যাস বলেন, বেদমন্ত্রবিহীন দশ সংস্কার; বৈজবাপ-গৃহ্য বলেন, গর্ভাধান হইতে চৌল পর্যন্ত সাত সংস্কার; অপরার্ক বলেন, গর্ভাধান হইতে চৌল পর্যন্ত আট সংস্কার; আবার অনেকের মতে—ছয় সংস্কার—জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়া ও বিবাহ। রঘুনন্দন তাঁহার শূদ্রকৃত্যতত্ত্বে বরাহপুরাণ হইতে উদ্ধৃতি-সহযোগে দেখাইয়াছেন, শূদ্রের পক্ষে মন্ত্রহীন শ্রাদ্ধ বিধেয়। ব্রাহ্মণ মন্ত্র বলিবেন এবং শূদ্র 'নমঃ' 'নমঃ' বলিবে। শূলপাণির বিধান স্বীকার করিয়া নির্ণয়সিন্ধু বলেন, শূদ্রের ধর্মে-কর্মে, পুরাণ হইতে মন্ত্র গৃহীত হইবে এবং সেই মন্ত্র ব্রাহ্মণ-পুরোহিত উচ্চারণ করিবেন। ব্রহ্মপুরাণের মতে, বিবাহ ব্যতীত শূদ্রের কোন সংস্কার নাই। এই বিষয়ে নির্ণয়সিন্ধু সমন্বয় ঘটাইয়াছেন এই বলিয়া,—সৎ-শূদ্রের পক্ষে উদার নীতি বিধেয়; অসৎ শূদ্রের পক্ষে নহে; এবং দেশে দেশে ভিন্ন আচার।

আমাদের আলোচ্যযুগে এবং বর্তমানকালে চল্লিশ সংস্কারের অধিকাংশই বিস্মৃতির অতলতলে তলাইয়াছে। ব্রাহ্মণগণও স্মৃতির বিধান যথাযথভাবে আর মানিয়া চলেন না। সংস্কারের মধ্যে মাত্র আর অবশিষ্ট আছে গর্ভাধান, উপনয়ন ও বিবাহ। আধুনিক যুগে ব্রাহ্মণ-কন্যাগণের অধিক বয়সে বিবাহ হওয়ায় গর্ভাধান-সংস্কারও লোপ পাইতেছে। নামকরণ ও অন্নপ্রাশন বৈদিকমন্ত্র বা পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণ ছাড়াই সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বহুক্ষেত্রে চৌল অনুষ্ঠিত হয় উপনয়নের দিনে এবং সমাবর্তন হয় উপনয়নের কিছু পরে। জাতকর্ম ও অন্নপ্রাশন কোনো কোনো অঞ্চলে, যেমন বাঙ্গালাদেশে অনুষ্ঠিত হয় একই দিনে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সম্ভবতঃ এইরূপ বিধান চলিয়া আসিতেছে।

প্রাচীন ঋগ্বৈদিক বা অসুর ও ব্রাত্য এবং অর্বাচীন যজুর্বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য বিধান বাঙ্গালী-সমাজে কম-বেশী প্রচলিত ছিল অনুমান করা যায়। কিন্তু প্রাক্,-সম,-পর-

১ Kane, pp 198-99

বৈদিক ও অর্বাচীন যুগে উপনিবিষ্ট বাঙ্গালী অন্-আর্য কোল-দ্রবিড়াদি আদিবাসী সমাজ, সহাবস্থানের ফলে, কালে কালে যতই ব্রাহ্মণ্য-সমাজের 'নবশাখায়' উন্নীত হইতে থাকুন না কেন, তাঁহাদের নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান কতক কতক, বা ক্ষেত্রবিশেষে বহুলপরিমাণে, তাঁহাদের সহজাত গোত্রাচার রূপেই রহিয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও হেতু নাই। 'জাতকর্ম'-প্রসঙ্গে বিশিষ্ট বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যগুলির সূত্র ধরিয়া রাঢ়দেশের প্রাচীন গ্রামগুলির বনেদী বাড়ীতে অদ্যাপি প্রচলিত সুবিস্তারিত মেয়েলী আচার-বিচার-সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এখনও সন্ধান ও সংগ্রহ করিয়া তুলনামূলক আলোচনা করিলে, বাঙ্গালী-সংস্কৃতির এমন এক মৌলিক প্রেক্ষাপট আবিষ্কৃত হইবে, কিঞ্চিৎ জৈন ও বৌদ্ধ আভাস ব্যতীত যাহার বেশীর ভাগই অন্-আর্য আচারের[১] ছাঁচে ঢালাই করা।

---

১ তু. O. R & C., Roy, pp 116-184, ইত্যাদি

এতদিন ভারতীয় সমাজের যে আধারের উপরে তার বিবাহ-প্রথা প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই আধারের বিকৃতি হওয়াতে বিবাহের মূলগত ভাবসকল ও তার ব্যবহারসকল কিছুর সঙ্গে ঠিকমতো খাপ খাচ্ছে না। সত্যযুগের জন্যে একদল অপেক্ষা করছে, সে আক্ষেপের ডাকে সত্যযুগ সাড়া দিচ্ছে না। এখন সময় এসেছে নূতন ক'রে বিচার করবার, বিজ্ঞানকে সহায় করবার, বিশ্বলোকের সঙ্গে চিন্তার ও অভিজ্ঞতার মিল ক'রে ভাববার।

১৩৩২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ বিবাহ ॥

(সন ১১৫৮-১২৯৫ : খৃ. ১৭৫১-১৮৮৮)

খৃ. ১৭৫১-১৮৮৮ অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষপাদ পর্যন্ত সময়ের 'বিবাহ'-বিষয়ক চিঠিপত্র ও ফর্দাদি পাওয়া গিয়াছে। সুবে বাঙ্গালায় রাষ্ট্রীয় ঘন ঘন পট-পরিবর্তনে কিছুমাত্র বিক্ষুব্ধ না হইয়া রাঢ়ের সমাজজীবনে এই দেড়শত বৎসর যাবৎ পুরাতন পরম্পরারই অনুবৃত্তি চলিতেছে দেখা যায়।

আলোচ্য চিঠিপত্রে বিধৃত বিষয়গুলি[১] খণ্ডিত আকারে পাওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে সেকালের বিবাহ-ব্যাপারের অখণ্ডিত চিত্র অঙ্কিত করিতে গেলে, পরিপ্রেক্ষিত-স্বরূপে ভারতীয়-ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের কৌলিন্য-প্রথা ও বাঙ্গালীর নিজস্ব লোকাচার বিষয়ে ধারাবাহিকতার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক। আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায় হইতে নিষ্কাশিত তথ্যগুলি বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন প্রকারের। তথাপি, ইহাদের মধ্যে কার্য-কারণের একটি যোগসূত্র আছে।

বিবাহ-প্রসঙ্গে যে-সকল তথ্য দ্বিতীয় খণ্ডে ও এই প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টে সঙ্কলিত হইয়াছে সেগুলি এই ক্রমে সাজানো যাইতে পারে : স্বৈরাচারিতা বা কুলের বাহির হওয়া,[২] তথা পুনঃপুনঃ বাহির হইয়া যাওয়া[৩], স্বয়ংবর,[৪] কৌলিন্য,[৫] মেলবন্ধন,[৬] ঠিকুজি-প্রস্তুত,[৭] বিবাহের বয়স বা বিবাহকাল,[৮] পাত্র-পাত্রী নির্বাচন,[৮] বাগ্‌দান,[৯] কন্যাপণ,[১০] ও বরপণ,[১১] ঘটকালি,[১২] লগ্ন-পত্র,[১৩] রাজদরবারে লগ্নপত্র-সম্পাদন[১৪] (Registration), উৎসব-অনুষ্ঠানের বিস্তার[১৫] ও ব্যয়,[১৬] পুনর্বিবাহ,[১৭] গৃহস্থালী,[১৮] সহমরণ,[১৯] দ্বিতীয় সংসার,[২০] স্ত্রীকে পর্দাপোশে সংরক্ষণ[২১] ও বিবাহ-বিচ্ছেদ[২১]।

২

ক. স্বৈরাচার : বর্তমান খণ্ডের 'পরিশিষ্টে' একখানি চিঠি ছাপা[২২] হইয়াছে। চিঠিখানি কোনো এক কানাই কর্মকারের লেখা ১১৬৫ বঙ্গাব্দ বা ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে। বক্তব্য : তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার স্ত্রী বিবাহের পরে 'মাথায়সোতে' অর্থাৎ সদ্য-বিবাহের পর, 'সিঁথি-মউড়'

১ পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃ ১৯-২০ ২ দ্র. পরিশিষ্ট ৩ চি-স ২, প-সং ২২৯ ৪ ঐ, ঐ ৫৯৭
৫ ঐ, ঐ ১০ ৬ ঐ, ঐ ৬৮ ৭ ঐ, ঐ ৫৩ ৮ ঐ, ঐ ৯, ৬৮, ৬২৩ ৯ ঐ, ঐ ২০
১০ ঐ, ঐ ৯, ২১ ১১ ঐ, ঐ ১৩, ১৮, ৬৮ ১২ ঐ, ঐ ১৪, ১৬, ২১ ১৩ ঐ, ঐ ৮, ৯, ১৩, ১৮, ২০, ২১ ১৪ ঐ, ঐ ১৮ ১৫ পূর্বে দ্র., পৃ ১৯-২০ ১৬ ঐ, ঐ ১৭ ঐ, ঐ ৬২১
১৮ ঐ, ঐ ৪৪২ ১৯ ঐ, ঐ ১৪ ২০ ঐ, ঐ ৫৩৯ ২১ ঐ, ঐ ৪৪২ ২২ পরে দ্রষ্টব্য।

পরিয়া সবে শশুরবাড়ি আসিয়াছিল, অতঃপর আর আসে নাই ; সে বাপের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, দ্বিতীয় খণ্ডে দেখা যাইবে,—সিদাম পাগলের স্ত্রী বাড়ি হইতে 'পুনঃপুনঃ বাহির' হইয়া যাইতেছে[১] ; সাকী বেয়ার 'আসাত সজ্ঘটন' ঘটিয়াছে[২] ; কন্যা গরবিনী দেবী বাড়ির অন্ত্যজ কৃষাণ ভৃত্যের সঙ্গে 'স্থানান্তরে' যাইতেছে[৩] ; পরীক্ষিৎ শৌ-এর বিবাহিতা কন্যা 'জবনাম স্বীকার' করিতেছে[৪] ; কৃষ্ণকান্ত 'মদকের' বিধবা ভ্রাতৃবধূর 'দুষ্ট জনরব' হইয়াছে[৫] ; নফর দে মদকের বিধবা কন্যা জয়মুনি আহার ব্যবহার 'বেআন্দাজ' করিতেছে[৬] ; বেনীমাধব মণ্ডলের 'মুচানী অপবাদ' হইয়াছে[৭] ; হারাধন পাণের ভগ্নীর 'যুগী সংসর্গ' ঘটিয়াছে[৮] ; চন্দ্রা চাষানী 'হামেল নষ্ট' করিতে গিয়া মারা পড়িয়াছে[৯] ; বাঞ্ছারাম দে-এর মাতার 'নীচ জনরব' হইয়াছে[১০] ইত্যাদি।— আলোচ্য ঘটনাগুলির পাশাপাশি আরো দেখা যায়[১১] যে, বিবাহের পূর্বে 'প্রথম সংসর্গি' কন্যার বিবাহ-ব্যবস্থা দিয়াছেন মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের উত্তরপুরুষ শ্লাঘ্যরাম চক্রবর্তী প্রমুখ বিধিকর্তাগণ। এবং সে-বিবাহ হইয়াছে—'স্বয়ংবরের আকারে'।

আলোচ্য সময়ে এই সকল 'অসামাজিক' ঘটনা অনুধাবন করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, স্থান-কাল-পাত্র-নির্বিচারে ইহাই যেন চিরন্তন মনুষ্যসমাজের নিত্যনৈমিত্তিক, হয়তো-বা স্বাভাবিক প্রবণতা। একদিকে সমাজপতিগণ যেমন নানা বিধি-বিধানে সমাজ-বন্ধনকে স্থিতিশীল করিতে চাহিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে, একটি নিয়ম-ভাঙ্গার দল চিরকালই সমাজ-শাসন উপেক্ষা করিতে চাহিয়াছে। এই টানা-পোড়েনের ভালোমন্দ বিচারের গহনে আপাততঃ প্রবেশ না-করিয়া, ইহার কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্তের সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

খ. প্রাগৈতিহাসিক স্বৈরাচারিতা : অতি প্রাচীনকালে নরনারীর যথেচ্ছ সম্ভোগই ছিল আচার। স্বৈরাচারই[১২] ছিল সে-যুগের ধর্ম। বৈদিকযুগে, ব্রতবিশেষে সমাগমার্থিনী স্ত্রীলোকের মনোবাসনা পূর্ণ করা ছিল ধর্ম-কৃত্যের অঙ্গ। মনুষ্যেতর প্রাণীর কথা বাদ দিলে, পৃথিবীর আদিম মনুষ্য-সমাজ জুড়িয়া এই ব্যবহার রকম-ফেরে প্রচলিত ছিল, বা আছে, লক্ষ্য করা যায়। মহাভারতের সমাজে[১৩] এইরূপ আচরণকে স্ত্রীলোকের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ-প্রদর্শন বলিয়া ভাবা হইয়াছে।

কথিত হয় যে, কালক্রমে প্রাচীন ভারতীয় আর্য-সমাজে উদ্দালক ঋষির পুত্র শ্বেতকেতু বিবাহ-প্রথার প্রচলন[১৩] করেন। কাহিনী এইরূপ : একদা শ্বেতকেতু পিতামাতার নিকট

১ চি-স ২, প-সং ২২৯ ২ ঐ, ঐ ২৪৮ ৩ ঐ, ঐ ২২৫ ৪ ঐ, ঐ ২২৭ ৫ ঐ, ঐ ২৪০
৬ ঐ, ঐ ২৪১ ৭ ঐ, ঐ ২৪৫ ৮ ঐ, ঐ ২৪৭ ৯ ঐ, ঐ ৩৮০ ১০ ঐ, ঐ ৫১৬
১১ ঐ, ঐ, প-সং ৫৯৭ ১২ H. H. M., Chap. IV-VI ১৩ ম. স, পৃ ১

বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ সহসা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার মাতার হস্তধারণপূর্বক বলিলেন,— 'চল, আমরা যাই'। শ্বেতকেতু অজ্ঞাতকুলশীল ব্রাহ্মণের অশিষ্টতায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে উদ্দালক বলিলেন,—'বৎস, ক্রুদ্ধ হইও না ; ইহা সনাতন ধর্ম, স্ত্রীলোকগণও গাভীর মত অনাবৃতা এবং স্বৈরাচারিণী'। অতঃপর, সেকালের কাহিনীর সহজ পরিশিষ্ট : পুত্র অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেও, 'সনাতন ধর্ম'-অনুসারে, নিরাসক্ত অথবা ক্লীব এক পুরুষের আশ্রয় হইতে শ্বেতকেতুর মাতা পাণিগৃহীতা হইয়া অপরিচিত অন্য এক পুরুষের সহিত চলিয়া গিয়াছিল, বোধহয় অনাবৃতা গাভীর মতোই। যাইবার সময় তাহার মনে যে কোনো-প্রকার অতি-আধুনিক নাটকীয় দ্বন্দ্বের বিপর্যয় ঘটে নাই, তাহাও সহজে অনুমান করা যায়। কিন্তু এই দৃশ্য দেখিয়া, পুত্র শ্বেতকেতু অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া বিবাহ-প্রথার নিয়ম বাঁধিয়া ফেলিলেন।

উদ্দালক-শ্বেতকেতুর এই কাহিনীটি[১] বাস্তব অবাস্তব যাহাই হউক, ভারতীয় বিবাহ-প্রথা-প্রবর্তনের প্রেক্ষাপট স্বরূপে ইহার গল্পরস অনবচ্ছিন্নভাবে হিন্দু-সমাজে হাজার হাজার বৎসর যাবৎ সঞ্জীবিত হইয়া আছে।—প্রাগৈতিহাসিক এই পটভূমিকায় ঐতিহাসিক যুগেও দেখা যায় ভাঙ্গা-গড়ার অসংখ্য নিদর্শন।

১ এই মূল আখ্যায়িকার একটি পাথুরে প্রতিরূপ সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত হইয়া, প্রকৃত ব্যাখ্যার অভাবে অদ্যাপি অনালোকিত রহিয়াছে। কুষাণ যুগে মথুরা-শিল্পের একটি চমৎকার প্রস্তর-চিত্রের বিষয়-বস্তু অদ্যাপি যথাযথ ব্যাখ্যাত হয় নাই। আমার স্থির ধারণা, এই ফলক-চিত্রটিতে অজ্ঞাতকুলশীল ব্রাহ্মণ কর্তৃক শ্বেতকেতুর মাতৃ-আকর্ষণ কাহিনীটিই অঙ্গীভূত হইয়া আছে। দৃশ্যটিতে গ্রাহকের গৃধ্নুতা, গৃহীতার প্রবণতা, সন্তানের অসম্মতি ও নপুংসকের নিরাসক্তির ব্যঞ্জনা নিখুঁত ভাস্কর্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

আলোচ্য চিত্রটির সম্পর্কে পাশ্চাত্য পণ্ডিত কৃত মৌলিক ভ্রান্ত ব্যাখ্যার পরম্পরায়, সাম্প্রতিক নিদর্শনস্বরূপে উদ্ধৃত করা যায়: The Bacchanalian scene in relief seems to have been based on a Western theme and to have been inspired by Roman aesthetic ideals and artistic treatment. A woman, apparently drunk, is here shown being helped to rise by a male who is pulling her up. Her left hand is on the shoulder of a young attendant who holds the wine-cup, Another male is looking on. (Saga of Indian Sculpture, K. M. Munshi, 1957, Pl. no. 80, Notes on plates, p 2)। কিন্তু, ভারতীয় জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মাদর্শ এবং সমাজ-চিত্রাবলীর পটভূমিতে রোমান শিল্পকলার ভাবে অনুপ্রাণিত পাশ্চাত্য আদর্শের এই সমাজচিত্রের ব্যাখ্যান, নিতান্ত অসঙ্গত ও বিসদৃশ ; সুতরাং নিঃসন্দেহ ভ্রমাত্মক।

৩

ধর্মশাস্ত্রমতে বিবাহ-সংস্কার :

ক. বিবাহ : স্ত্রী-পুরুষের নিয়ন্ত্রিত যৌনজীবন-যাপনের বৈধ অধিকারলাভের নাম বিবাহ। বিবাহ-সমস্যা মানব-সমাজের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। হিন্দু-সংস্কারগুলির মধ্যে ধর্মার্থকামমোক্ষ-সাধনায় ইহা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহবাচক শব্দাবলীর[১] মধ্যে ইহার প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত আছে— উদ্বাহ, বিবাহ, পরিণয় বা পরিণয়ন, উপযম এবং পাণিগ্রহণ।

ভারতীয় সাহিত্য হইতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্বৈরাচারী সমাজব্যবস্থার কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মহাভারতে দেখা যায়, উত্তর কুরুতে এবং মাহিষ্মতী নগরে বিবাহ-প্রথা অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু এই উভয় দেশের ভৌগোলিকত্ব প্রমাণ হয় নাই; সুতরাং প্রাচীন সমাজের স্বৈরাচারিতার উল্লেখ প্রাগৈতিহাসিক কালের স্মৃতিমাত্র কিনা তাহা বলা মুশকিল। কারণ ঋগ্বেদের কালে দেখা যায়, বিবাহ-ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত। মূলতঃ স্বৈরাচারিতার দেশ বলিয়া একদা যাহা সমাজবিজ্ঞানীগণ অনুমান করিয়াছিলেন এখন তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে[১]।

বৈদিক যুগে বিবাহ-প্রথা সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কাররূপে অত্যাবশ্যক কৃত্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। ইন্দো-ইরানী যুগেও অনুরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়। আবেস্তার মতে, দেবগণ ও পিতৃগণ কুমার-কুমারীর হাতের জল স্পর্শ করেন না। বৈদিক সাহিত্যেও দেখা যায়, অবিবাহিত ব্যক্তি অশুদ্ধ; ধর্মসংস্কারে অনধিকারী।—এই বিশ্বাস সমাজে অদ্যাপি বিদ্যমান। জৈমিনি ও আপস্তম্ব বলেন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বিবাহের সময় প্রজ্বলিত গার্হপত্য অগ্নি অনির্বাণ রাখাই ছিল দম্পতির বিশিষ্ট কর্তব্য; দেবযাগ ও পিতৃযজ্ঞ ছিল নিত্যকর্তব্য; এবং সর্বশেষ কর্তব্য প্রজাবৃদ্ধি। পরবর্তী কালের চতুরাশ্রমের তিন আশ্রমের লোকই গৃহীর উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকিত। গৃহী ছিল সমাজ-দেহের নিঃশ্বাসস্বরূপ[২]।

ঋগ্বেদের মতে, বিবাহের উদ্দেশ্য হইতেছে, গৃহস্থ হইয়া দেব-যজ্ঞ-কর্ম-সম্পাদন ও পুত্রোৎপাদন। স্বামী স্ত্রী গ্রহণ করিতেন 'গার্হপত্যের' উদ্দেশ্যে; দেবার্চনায় দম্পতির সহযোগিতার জন্য; এবং গৃহিণীই গৃহ (জায়েদ্-অস্তম্)। পরবর্তী সাহিত্যেও একই উক্তি দেখা যায়। স্ত্রীর নাম 'জায়া', কারণ স্বামীই স্ত্রীর গর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। শতপথ ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় আরণ্যক, আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, মনু এবং অন্যান্য স্মৃতিকার ও নিবন্ধকগণও

১ Kane, pp 427-28 ২ P. W. H. C. pp. 31-32

বলিয়াছেন, বিবাহ ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা মানুষ সম্পূর্ণতা লাভ করে। জৈমিনি ও আপস্তম্ব বলেন, দম্পতি একত্রে যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করিবে; সেইজন্য স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য[১]।

খ. শাস্ত্রীয় বিবাহের প্রকারভেদ: গৃহসূত্র, ধর্মশাস্ত্র এবং স্মৃতির যুগ হইতে আট[২] প্রকারের বিবাহ-প্রথা সুপরিচিত—ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আর্ষ, দৈব, গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ। আশ্বলায়ন[৩] প্রথম চারিটিকে সাজাইয়াছেন এইভাবে— ব্রাহ্ম, দৈব, প্রাজাপত্য ও আর্ষ; বিষ্ণুধর্মসূত্রে[৪] — ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য। আশ্বলায়ন পৈশাচ বিবাহকে রাক্ষস বিবাহের পূর্বে বসাইয়াছেন। মানবগৃহ্যসূত্র[৫] মাত্র ব্রাহ্ম ও শৌল্ক অর্থাৎ আসুর বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন; সম্ভবতঃ তাঁহার সময়ে এই দুই প্রকার বিবাহ বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। আপস্তম্বধর্মসূত্র[৬] প্রাজাপত্য ও পৈশাচ বাদে ছয় প্রকারের বিবাহ স্বীকার করিয়াছেন। বশিষ্ঠ[৭] বলিয়াছেন, বিবাহ মাত্র ছয় প্রকারের— ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, গান্ধর্ব, ক্ষাত্র (রাক্ষস) ও মানুষ (আসুর)। এই বিষয়ে নানা মুনির নানা মতের মধ্যে মনুর[৮] মতই প্রমাণ। মনু[৯] বিবাহ আট প্রকারের বলিয়া, আসুর ও পৈশাচ বিবাহকে নিষিদ্ধ[৯] করিয়াছেন।

বেদবিৎ ও সচ্চরিত্র পাত্রকে বিধিমতে আমন্ত্রণ করিয়া সালঙ্কারা ও সুসজ্জিতা কন্যাকে দান করার নাম ব্রাহ্ম বিবাহ। কন্যার পিতা সালঙ্কারা কন্যাকে যজ্ঞকর্মে নিযুক্ত ঋত্বিক্‌কে দান করিলে তাহার নাম দৈব[১০] বিবাহ। এক জোড়া অথবা দুই জোড়া গো-মিথুন গ্রহণ করিয়া বিধিমতে কন্যাদান করার নাম আর্ষ বিবাহ। প্রাজাপত্য বিবাহে কন্যার পিতা বরকে মধুপর্কাদি দ্বারা অর্চনা করিয়া, 'তোমরা উভয়ে একত্র হইয়া ধর্ম-কর্ম সম্পাদন কর'— এই কথা বলিয়া কন্যাদান করিয়া থাকেন। যাজ্ঞবল্ক্য[১১] এই বিধানকে 'কায়'-বিবাহ বলেন; কারণ বিভিন্ন ব্রাহ্মণে 'ক' অর্থে 'প্রজাপতি'। বরের নিকট হইতে প্রচুর অর্থাদি লইয়া কন্যাসম্প্রদান করার নাম আসুর বিবাহ। কন্যা ও বরের সম্মতিতে গভীর প্রণয়জাত ও সহবাস-ঘটিত বিবাহের নাম গান্ধর্ব বিবাহ। কন্যার পিতৃকুলকে পর্যুদস্ত করিয়া পিতৃ-গৃহ হইতে বলাৎধৃতা রোরুদ্যমানা কন্যাকে বিবাহ করার নাম রাক্ষস বিবাহ। নিদ্রিতা, প্রমত্তা, উন্মাদ অথবা অচেতন কন্যাকে গোপনে সহবাস করিয়া বিবাহ করার নাম পৈশাচ বিবাহ।

গ. ভারতীয় তথা বঙ্গীয় পরম্পরা: সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ব্রাহ্মাদি

১ Kane, pp 428-29 ২ ঐ pp. 516-17 ৩ ঐ গৃহ্য ১.৬ ৪ ঐ, ঐ ২৪. ১৮-১৯
৫ ঐ, ঐ ৩, ২১ ৬ ঐ, ঐ ২, ৫. ১১, ১৭-২০-২, ৫. ১২. ১-২ ৭ ঐ, ঐ ১, ২৮-২৯
৮ ঐ, ঐ ৩, ২৭-৩৪ ৯ ঐ, ঐ ৩, ২১ ১০ ঐ, ঐ, বৌধা. ধর্ম ১. ১১. ৫ ১১ ঐ, ঐ ১. ৬০

আট প্রকারের বিবাহ-প্রথার আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে[১] মনে করেন, অননুমোদিত পৈশাচ, রাক্ষস ও আসুর বিবাহ প্রাগৈতিহাসিক সমাজের স্মৃতিমাত্র। গান্ধর্ব বিবাহের স্তুতি নিন্দা দুইই শোনা যায়। পৈশাচ বিবাহ সমধিক ঘৃণিত; অথচ বয়সে প্রাচীনতম। তবুও স্মার্তগণ ইহাকে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, সে মনে হয়, তৎকাল-প্রচলিত প্রাগৈতিহাসিক প্রথাপরম্পরা-স্বীকৃতির গুরুত্ব-স্বরূপে। পক্ষান্তরে, পৈশাচবিবাহ তখনও দেশে প্রচলিত ছিল নিম্নতর সমাজে। নিদ্রিতা, প্রমত্তা অথবা যৌগিক[২] ও তান্ত্রিক[৩] প্রক্রিয়া দ্বারা, যাদুবিদ্যা[৪] বা তুকতাক্[৫] প্রয়োগে অচেতন কন্যাকে বশীভূত ও অপহরণ করিয়া গোপনে উপগত হইয়া বিবাহ করা পৈশাচ বিবাহ। এই প্রকার বিবাহ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। এইরূপ ক্ষেত্রে অপহৃতা কন্যাকে অপহরণকারীকেই শাস্ত্রমতে বিবাহ করিতে বাধ্য করা হইত। ফলে, প্রকারান্তরে পৈশাচ বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হইয়াছে। খৃষ্টীয় শতকের প্রারম্ভকালে, বিবাহযোগ্যা কন্যা অবশ্যই কুমারী হইবে, ইহাই সকলে চাহিত। অপহৃতা কন্যার অন্যত্র সম্মানজনক বিবাহ অসম্ভব বিধায় অপহারককেই বিবাহ করিতে বাধ্য করা হইত। কিন্তু প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকার বশিষ্ঠ ও আপস্তম্ব অতি-আধুনিক দৃষ্টিতে দুর্বৃত্তের প্রকারান্তরে উপকার করিতে, পৈশাচ বিবাহ আদৌ স্বীকার করেন নাই। তবে, তাঁহারা অবৈধ গান্ধর্ব, রাক্ষস ও আসুর বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন।

পিতৃগৃহ হইতে কন্যার পিতৃকুলকে পর্যুদস্ত করিয়া বলাৎধৃতা রোরুদ্যমানা কন্যাকে বিবাহ করার নাম রাক্ষস বিবাহ। রাক্ষস বিবাহের নামান্তর 'ক্ষাত্র'-বিবাহ। এই প্রথাও প্রাগৈতিহাসিক কালের নিশ্চিত নিদর্শন। বিজয়ী বীরকে তখন কন্যা উপহার দেওয়া হইত। সুভদ্রা ও অর্জুনের বিবাহে শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি ছিল। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই প্রথায় রুক্মিণীকে বিবাহ করেন। ঋগ্বেদে[৬] দেখা যায়, বিমদ যুদ্ধ জয় করিয়া তাঁহার পত্নীকে লাভ করিয়াছিলেন। ক্ষাত্র বিবাহের নিন্দা যত্রতত্র দেখা গেলেও, অবশেষে ইহা স্মৃতিসম্মত হয়, এবং মহাভারতে ইহার অসংখ্য নিদর্শন মিলে। বাৎসায়ন[৭] সুন্দরী কন্যাকে যে-কোনো প্রকারে বিবাহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বশিষ্ঠ পরিষ্কার বলিয়াছেন, বলাৎধৃতা সুন্দরী কন্যা ধর্মপত্নী হইতে পারে। শাস্ত্রসঙ্গত বিবাহ না-হইলে, অন্যের সহিতও তাহার বিবাহ হইতে পারে—কুমারী কন্যার অনুরূপ। স্মৃতি বলেন, হোম ও সপ্তপদী দ্বারা শুদ্ধ করিয়া অপহারককে কন্যাদান করা যায়। মনু, মেধাতিথি ও নারদেরও এই অভিমত। পণ্ডিতগণ অনুমান[৮] করিয়াছেন, তৃতীয় খৃষ্টপূর্বাব্দের দিকে রাক্ষস বিবাহ উন্নত ক্ষত্রিয়সমাজে রহিত

১ P. W. H. C, pp 35-36 ২ যো. শু, পৃ ২১০-১২ ৩ ঐ পৃ ২১০
৪ P. W. H. C, pp 36-38 ৫ পু.-প, ২খ, পৃ ২৫৪ ৬ ১, ১১৬ ৭ Kane, pp. 520-21
৮ P. W. H. C., pp 38-39

হইয়া গিয়াছিল। তবে হিন্দুসমাজে যুগযুগান্তরের এই বিবাহপ্রথার স্মৃতিটিকে হিন্দু-বিবাহের নানা লোকগাথা ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। বর্তমানে বিবাহানুষ্ঠানের ঝগড়া-বাধানো কৃত্যগুলির অধিকাংশই অপদেবতা-বিতাড়নের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়,—মনে করার কোনও সঙ্গত কারণ নাই।

কন্যাপণ দিয়া বিবাহের নাম আসুর বিবাহ। বরের প্রদত্ত কন্যাপণ কন্যার ও তাহার পিতৃকুলের মান্যস্বরূপ। কাঞ্চন অথবা কাঞ্চনমূল্যের বিনিময়ে কন্যা বিক্রয় করিয়া আসুর বিবাহের এই নামের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা শক্ত। পণ্ডিতগণ অনুমান[১] করেন, প্রাচীন আসিরীয়গণ কন্যাপণ দিয়া বিবাহ করিতেন। তাঁহাদের সহিত যোগাযোগে, অনুকরণ হইতে এই নাম গৃহীত হইয়া থাকিবে। অথবা ইহা প্রাচীনতর ঋগ্বৈদিক অসুর বা ব্রাত্য-সমাজে প্রচলিত বিবাহ-ব্যবস্থা হইতে পারে। পিতৃগৃহে কন্যার অনুপস্থিতি-জাত ক্ষতিপূরণ বাবদ বরের নিকট হইতে কন্যাশুল্ক গ্রহণ করা হইত। পক্ষান্তরে, বরপণ বা যৌতুকস্বরূপে অংশতঃ ইহা আবার কন্যাকে প্রত্যর্পণ করা হইত। নিম্নতর সমাজে কন্যাপণের বদলে বর শ্বশুরবাড়ীতে থাকিয়া কায়িক পরিশ্রম করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে। হিন্দুসমাজের কোনো শাখায় বা সাহিত্যে আসুর বিবাহের প্রচলনের উল্লেখ বিশেষ দেখা যায় না। কিন্তু, রাঢ়ের প্রতিবেশী বর্তমান কোল-গোষ্ঠীতে ও সমাজে এই প্রথা অদ্যাপি সুপ্রচলিত। ক্ষাত্র বিবাহ অপেক্ষা আসুর বিবাহ শ্রেষ্ঠতর। ইহা স্ত্রীলোকের মূল্যবোধের বিশেষ স্বীকৃতি; ফলতঃ, ভবিষ্যৎ স্ত্রীর সৌভাগ্যবিধায়ক।

বৈদিক যুগে আসুর বিবাহের নিদর্শন আছে। কিন্তু, ইহা সম্মানসূচক বিবাহ নহে। আসুর-বিবাহার্থী বরকে হীন বুঝাইতে বলা হইয়াছে— 'বিজামাতা'। পালি-সাহিত্যে, থেরীগাথা ও ধম্মপদে আসুর বিবাহের উল্লেখ আছে। রামায়ণে কৈকেয়ীর এবং মহাভারতে গান্ধারী ও মাদ্রীর বিবাহে প্রভূত কন্যাশুল্ক গৃহীত হইয়াছিল। মনে হয়, সমাজের কোনো কোনো অংশে গৃহ-ব্যবহাররূপে ইহা প্রচলিত থাকিলেও, গর্হিত বলিয়া গণ্য হইত। ধর্মশাস্ত্রকারগণ কন্যাশুল্ক-গ্রহণকে অত্যন্ত নিন্দা করিয়াছেন। বৌধায়ন কন্যা-বিক্রেতার ভয়ঙ্কর নরকগমনের শাপ দিয়াছেন। এবং ক্রীতা কন্যাকে ধর্মপত্নী বলিতে অস্বীকার করিয়াছেন। আরো বলিয়াছেন, এই বিবাহে কন্যার গোত্রান্তর হয় না এবং সেই কন্যার গর্ভজাত পুত্র তাহার পিতৃগণকে পিণ্ডদানে অনধিকারী। পদ্মপুরাণে কন্যাশুল্ক-গ্রহীতার মুখদর্শন নিষিদ্ধ। পঞ্চদশ শতকেও কন্যাশুল্ক-গ্রহীতাকে সমাজচ্যুত করা হইত। খৃষ্টীয়-শতকের প্রারম্ভে, বাল্যবিবাহের প্রচলন হওয়ায় কন্যাশুল্ক-গ্রহণ সুপ্রচলিত হয়। অধিক

১ P. W. H. C., pp 39-42

বয়সে কন্যার বিবাহ হইলে সাধারণতঃ ইহা সম্ভব হয় না। আমাদের আলোচ্য চিঠিপত্রের সমাজে[১] কন্যাপণ গ্রহণের বহু নিদর্শন আছে। এমন-কি উচ্চনিম্ননির্বিশেষে সমাজে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত হওয়ার ফলে, কন্যাশুল্ক-গ্রহণের এই গর্হিত প্রথা সমাজদেহের শিরায় শিরায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল।

পাত্র ও পাত্রীর সম্মতিতে প্রণয় ও সহবাসঘটিত বিবাহের নাম গান্ধর্ব[২] বিবাহ। এইরূপ বিবাহ শুদ্ধ ও সরল। এই বিবাহে পিতাকে কোনো উপহার দিতে হয় না। পক্ষান্তরে, কন্যা সাময়িকভাবে পিতৃকর্তৃত্ব পরিত্যাগ করে। পণ্ডিতগণ বলেন, বৈদিকযুগে 'স্ত্রীকামা' গন্ধর্বগণের সমাজ-আচরণের অনুকরণে এই বিবাহ শাস্ত্রসম্মত হয়। কিন্তু সকল শাস্ত্রকার ইহাকে বৈধ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বৌধায়ন-ধর্মসূত্র ইহা বৈধ বলিয়াছেন। বাৎসায়নের মতে, ইহা শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ বিবাহ। অঙ্গিরসেরও অনুরূপ মত। মহাভারতেও ইহাকে বৈধ বলা হইয়াছে। কিন্তু মনু এই বিষয়ে নীরব। নারদও নীরব; তিনি ইহাকে 'সাধারণ' বিবাহ বলিয়াছেন। পরবর্তী লেখকগণ গান্ধর্ব এবং স্বয়ংবর উভয় প্রকার বিবাহকেই অবৈধ বলিয়াছেন। কারণ বোধহয়, তাঁহাদের সময়ে বাল্য-বিবাহ প্রবর্তিত হওয়ায় এই প্রথা লোপ পাইতেছিল। গান্ধর্ব-মিলনের শেষে, শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা ইহাকে বৈধরূপে গণ্য করিয়া লওয়া হইত।

ব্রাহ্ম, দৈব, প্রাজাপত্য ও আর্ষ—এই চতুর্বিধ[৩] বিবাহ বৈধ বলিয়া স্বীকৃত। ইহাতে সপ্তপদী গমনের পর কন্যার গোত্রান্তর হয়। পূর্বোক্ত চতুর্বিধ বিবাহে তাহা হয় না।

আর্ষ বিবাহে কন্যার পিতা জামাতার নিকট হইতে একটি বৃষ ও একটি গাভী গ্রহণ করিতেন। ইহা কন্যা-পণের সমতুল। গো-দান হেতু এই বিবাহ চতুর্বিধ বৈধ বিবাহের সর্বনিম্ন শ্রেণীর; প্রায় আসুর বিবাহের অনুরূপ। কিন্তু জৈমিনি ও শবরের মত আলাদা। তৎসত্ত্বেও ইহা আসুর বিবাহের রূপান্তর, সে-কথা অস্বীকার করা যায় না।

দৈব-বিবাহে পিতা স্বীয় যজ্ঞকর্মে নিযুক্ত ঋত্বিক্‌কে সুসজ্জিতা ও সালঙ্কারা কন্যা সম্প্রদান করিতেন। ইহা কোনো দেব-যজ্ঞের সময় অনুষ্ঠিত হইত। সম্ভবতঃ, সেইজন্যই এই নাম। দৈব-বিবাহ মাত্র ব্রাহ্মণ-সমাজের উপযুক্ত। কারণ ব্রাহ্মণই যজ্ঞাধিকারী। এই বিবাহে কন্যা ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণের দক্ষিণাস্বরূপ। দৈব বিবাহ স্মার্তগণের স্বচ্ছন্দ অনুমোদন লাভ করে নাই। কারণ, দেবযজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে গার্হস্থ্য-কর্ম তাঁহাদের অভিমত নহে। চতুর্থ খৃষ্টপূর্বাব্দের দিকে, বৈদিকমতে দীর্ঘকালব্যাপী সুবিস্তারিত যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের বিলোপের সহিত দৈব-বিবাহ-প্রথারও বিলুপ্তি ঘটে। পরবর্তী কালে ইহার নিদর্শন নাই।

---

১ পূর্বে ও পরে দ্রষ্টব্য ২ P. W. H. C., pp. 42-43 ৩ ঐ pp 44-48

ব্রাহ্ম ও প্রাজাপত্য বিবাহের পার্থক্য স্মৃতিশাস্ত্রে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয় নাই। ব্রাহ্মবিবাহে সুসজ্জিতা সালঙ্কারা কন্যাকে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত পাত্রের হাতে অগ্নি সাক্ষী করিয়া সমর্পণ করা হয়; এবং প্রাজাপত্য-বিবাহে বরকে মধুপর্কাদি দ্বারা সম্মান করিয়া যথোচিত বিধিপালনপূর্বক 'কন্যাদান' করা হয়—নবদম্পতি একত্রে ধর্ম-কর্মে নিরত হইবে বলিয়া। প্রাজাপত্য বিবাহের নামান্তর 'কায়' বিবাহ। 'ক' অর্থে প্রজাপতি। এই বিবাহের মর্মানুসারে স্বামী স্ত্রীকে আমরণ ত্যাগ করিতে পারে না। ইহা সম্পূর্ণ একপত্নীক বিবাহ। স্ত্রী স্বামীর পুণ্যকর্মের অংশভাগিনী। ইহাতে বহুবিবাহ সম্ভব নহে; এবং স্বামী স্ত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকে বা স্ত্রীকে সঙ্গে না-লইয়া বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিতে পারে না। এইভাবে উভয় বিবাহে পার্থক্য খুব কম হওয়ায় পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, মূলতঃ ব্রাহ্ম ও প্রাজাপত্য বিবাহ অভিন্ন ছিল। প্রাচীন স্মার্ত বশিষ্ঠ ও আপস্তম্ব পৈশাচ ও প্রাজাপত্য বিবাহের উল্লেখ করেন নাই। মনে হয়, তাঁহাদের সময়ে এই দুই প্রকার বিবাহ স্বীকার করা হইত না। অন্য ঋষিগণ ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন, কারণ প্রাচীনতর শাস্ত্রে ইহাদের উল্লেখ ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, প্রাজাপত্য বিবাহ আট প্রকার বিবাহের পাদপূরণের নিমিত্ত উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র; এবং এইজন্যই স্মার্ত পণ্ডিতগণ ব্রাহ্ম ও প্রাজাপত্য বিবাহের পার্থক্য যথাযথ ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই।

বেদজ্ঞ সৎস্বভাব পাত্রকে আমন্ত্রণ করিয়া সুসজ্জিতা ও সালঙ্কারা কন্যাকে দান করার নাম ব্রাহ্মবিবাহ। ব্রাহ্ম অর্থে বেদসম্মত, পবিত্রতম ও সর্বোত্তম 'ধর্ম'-সম্মত বিবাহ। ব্রাহ্মবিবাহে দেব ও অগ্নি সাক্ষী করিয়া ধর্মসংস্কারসহকারে অঙ্গীকারপূর্বক কন্যাদান সম্পন্ন করা হয়। সেইজন্য ব্রাহ্মবিবাহে স্ত্রীর নিরাপত্তা সমধিক। কালক্রমে ব্রাহ্মবিবাহে নানা আচারানুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিকতা আরোপিত হয়। ফলে, এই বিবাহ আটপ্রকার বিবাহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পবিত্ররূপে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। যাহাই হউক, দম্পতি পারস্পরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান ও কল্যাণ কামনা দ্বারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হইলে বিবাহ পরম সুখের হইয়া থাকে।

প্রাচীন ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ চুক্তিবদ্ধ[১] বিবাহের কোনো ধারণা ছিল না। বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায়, সোম প্রতিজ্ঞাপালনে অসম্মত হওয়ায় সীতা সাবিত্রী তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। উর্বশী পুরুরবাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া বিবাহ করেন। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করায় অপ্সরা উর্বশী মর্ত্যবাসী রাজা পুরুরবাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।—এই সকল কাহিনী হইতে বোঝা যায়, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিবাহের প্রতি প্রবণতা থাকিলেও, সেই যুগে ইহা

১ P. W. H. C., pp 48-49

প্রচলিত হয় নাই। অগ্নি-সাক্ষী করিয়া মন্ত্র-সংস্কার দ্বারা দম্পতির অচ্ছেদ্য বিবাহ-বন্ধনের স্বীকৃতিতে চুক্তির কোনো স্থান নাই। কিন্তু আমাদের আলোচ্য চিঠিপত্রের সমাজে বৈদিকযুগের উর্বশী-পুরূরবার চুক্তিবদ্ধ বিবাহের অনুরূপ বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে এইরূপ নিদর্শন[১] আছে। ইহা বৌদ্ধ ভৈক্ষ্য-বিবাহের পরম্পরা বলিয়া অনুমান করি।

বীরমিত্রদয়-টীকা বলেন, ধর্মশাস্ত্রসমূহের বিবৃতি[২]-অনুসারে স্বয়ংবর-বিবাহ গান্ধর্ব-বিবাহের অনুরূপ। এই বিবাহের নানা প্রকরণ আছে। তন্মধ্যে সহজ প্রকরণ হইতেছে, ঋতুমতী কন্যার পিতা তিন বৎসরের মধ্যে তাহার উপযুক্ত স্বামী সন্ধান করিতে না-পারিলে, কন্যা নিজেই তাহার ঋতুকালের তিন মাসের পর তাহার স্বামী খুঁজিয়া লইতে পারে। মতান্তরে, কন্যা স্বয়ংবর-বিবাহ করিতে পারে, তাহার পিতা বর্তমান না-থাকিলে, এবং অন্য অভিভাবকেরা তাহার জন্য উপযুক্ত পাত্র সন্ধান করিয়া দিতে না-পারিলে। কন্যা স্বয়ং তাহার স্বামী মনোনীত করিলে সে তাহার পিতৃপ্রদত্ত সমস্ত অলঙ্কার তাহার পিতাকে অথবা ভ্রাতাকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য থাকিবে; এবং তাহাকে বিবাহার্থী পাত্র, ভাবী শ্বশুরকে কোন শুল্ক বা কন্যাপণ দিতে বাধ্য থাকিবে না; কারণ, পিতা যথাসময়ে বিবাহ না-দেওয়ায় কন্যার উপর কর্তৃত্ব হইতে বঞ্চিত হইবেন। এইরূপ সহজ স্বয়ংবর-বিবাহ সকল জাতির কন্যাগণের পক্ষেই প্রযোজ্য। সাবিত্রী এইভাবেই সত্যবান্‌কে বিবাহ করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও মহাভারতে ক্ষত্রিয় রাজ-রাজড়ার বাড়ীর স্বয়ংবর-বিবাহের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। কালিদাসও ইহার সুবহু বর্ণনা করিয়াছেন। বিক্রমাঙ্কদেবচরিতে বিহ্লন একটি ঐতিহাসিক স্বয়ংবর বিবাহের বর্ণনা দিয়াছেন—করহাটের (আধুনিক করদ) রাজা শিলাহারের কন্যা চন্দ্রলেখা বা চন্দলা দেবীর স্বয়ংবর-বিবাহ হইয়াছিল। চন্দ্রলেখা কল্যাণের চালুক্য রাজা আহবমল্ল বিক্রমাঙ্ককে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহা একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ঘটনা। মহাভারতকার এইরূপ স্বয়ংবর-বিবাহকে ব্রাহ্মণের পক্ষে অনুপযুক্ত বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে, কাদম্বরীতে পত্রলেখা বলেন—স্বয়ংবর-বিবাহ ধর্মশাস্ত্রসিদ্ধ। আমাদের আলোচ্য চিঠিপত্রে[৩] স্বয়ম্বর-বিবাহের নিদর্শন আছে।

ফলাফল : আপস্তম্ব-ধর্মসূত্রে, মনু-স্মৃতিতে ও আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রে আটপ্রকার বিবাহের স্বীকৃতির ফলে, প্রত্যেক প্রকরণমতে বিবাহিত দম্পতির সন্তানদের মধ্যে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট গুণাগুণ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ[৪] দেখা যায়। গৌতমেরও অনুরূপ অভিমত। কিন্তু বিশ্বরূপ এবং মেধাতিথির মতো টীকাকারগণ এই সকল ফলাফল বিশ্বাস করেন না। শবরের অনুসরণে তাঁহারা বলেন, এগুলি ব্রাহ্মবিবাহের অনুকূলে রায়দানমাত্র। বিভিন্ন

১ চি. প. স ২, প-সং ৪৪২ ২ Kane, pp 523-24 ৩ চি. প. স ২, প-সং ৫৯৭

৪ Kane, pp 524-28

বিবাহের গুণাগুণ বর্ণনা নিরর্থক মনে হইলেও ইহার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। আসলে, বিবাহের উচ্চতম আদর্শ স্থাপন করিয়া ঋষিগণ জাতির এবং সমাজের ভবিষ্যতের উপর গুরুত্ব স্থাপন করিয়াছেন। কেবলমাত্র বিবাহই নহে, উচ্চতর নীতিবোধ এবং সুরুচিসম্পন্ন ও শান্তিময় জীবনযাপনই ইহার আদর্শ।

ঘ. পাত্রপাত্রী-নির্বাচন: বিবাহে পাত্রপাত্রী-নির্বাচন প্রসঙ্গে[১] আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র বলেন, বুদ্ধিমান্ পাত্রে কন্যাদান করা উচিত। আপস্তম্ব বলেন, সদ্বংশজাত, সচ্চরিত্র, পুণ্যবান্, বিদ্বান ও স্বাস্থ্যবান পাত্রে কন্যাদান করিবে। বৌধায়ন বলেন, সদ্‌গুণসম্পন্ন এবং তৎকাল পর্যন্ত ব্রহ্মচারী পাত্রকে কন্যাদান করা বিধেয়। শাকুন্তল, যম, বৃহৎ-পরাশর, আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র, মনু, হারীত, বাণভট্টের হর্ষচরিত, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি, নারদ, কাত্যায়ন, মহাভারতাদিতে এই প্রসঙ্গে সবিস্তর বর্ণনা আছে।

বিভিন্ন শাস্ত্রে পাত্রী-নির্বাচনের নির্দেশ আছে বিস্তৃততর। কোথাও কোথাও বিধান পাত্র-নির্বাচনের অনুরূপ। শাস্ত্র-প্রমাণের জন্য উল্লেখ করা যায়: বিষ্ণুধর্মোত্তর, কামসূত্র, শতপথ ব্রাহ্মণ, আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র, সাংখ্যায়ন-গৃহ্যসূত্র, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, আপস্তম্ব-গৃহ্যসূত্র, নারদ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ভারদ্বাজ-গৃহ্যসূত্র, মানব-গৃহ্যসূত্র, বরাহ-গৃহ্যসূত্রাদি। আশ্বলায়ন পাত্রী-নির্বাচনের ব্যাপারে বিশেষ একটি দৈব তুক্ নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সুলক্ষণা কন্যা নির্বাচন করা উচিত। সুলক্ষণ নির্ণয় করা খুব শক্ত বলিয়া তাঁহার প্রদত্ত প্রক্রিয়া এই: আটটি মাটির ঢেলা সংগ্রহ করিতে হইবে—যথাক্রমে ১ দো-ফসলের জমি, ২ গোহাল, ৩ যজ্ঞশেষের যজ্ঞবেদী, ৪ বারমাসিয়া দহ, ৫ জুয়ার আড্ডা, ৬ চৌরাস্তার মোড়, ৭ অনাবাদী জমি এবং ৮ শ্মশান হইতে। অতঃপর, ঢেলাগুলির প্রতি এই মন্ত্র পাঠ করিবেন:—'ঋত আদিতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, ঋতের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠিত, এই কন্যার যে-জন্য জন্ম হইয়াছে, সে এখানে তাহা গ্রহণ করুক; যাহা সত্য তাহা পরিদৃশ্য হউক।'—এই মন্ত্র পাঠের পর কন্যাটিকে ইহার একটি লইতে বলা হয়। কন্যা যে-ঢেলাটি তুলিবে তাহা হইতে তাহার পরিচয় জানা যাইবে। এই ঢেলা-ভেদে এবং তাহার ফলাফল-চিন্তায় নানা মুনির নানা মত। নির্গলিতার্থ হইতেছে যথাক্রমে: ধনধান্যবতী, গোধনসমৃদ্ধা, অধ্যাত্মপরায়ণা, গভীর-নিষ্ঠাবতী, জুয়াড়ী, অসতী, বন্ধ্যা ও পতিঘাতিনী। গোভিল এই ঢেলা-ভেদের পদ্ধতিতে আরো একটি বিধান যোজনা করিয়াছেন। লৌগাক্ষি গোভিলকে মোটামুটি অনুসরণ করিয়া একটু ভিন্ন পদ্ধতি বাৎলাইয়াছেন। বারাহ, ভারদ্বাজ, মানব ও গৌতমও এই বিষয়ে মোটামুটি একমত। অন্য নিবন্ধাদিতেও এই প্রসঙ্গ দেখা যায়। 'বিবাহতত্ত্বার্ণবে' শ্রীনাথ আচার্যও বাঙ্গালাদেশে এই পদ্ধতি-প্রচলনের উল্লেখ করিয়াছেন।

---

১ Kane, pp 429-33

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন শাস্ত্রে পাত্রী-নির্বাচনের নানা বিধান আছে।—কন্যা পাত্র অপেক্ষা বয়সে ও আকৃতিতে ছোট হইবে, অক্ষতযোনি ও সমজাতীয়া হইবে; কন্যার ভাই থাকিবে। শেষোক্ত নিয়ম মধ্যযুগে ও পরবর্তী কালে মান্য করা হয় নাই। সগোত্র, সপ্রবর বা সপিণ্ড কন্যা বিবাহে সকল শাস্ত্রেরই নিষেধ।[১]

ঙ. বিবাহের বয়স-নির্ধারণ: স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহের বয়স সম্পর্কে আলোচনা[২] করা যাইতেছে। বর ও কন্যার বিবাহের বয়স-নির্ধারণে যুগে যুগে, প্রদেশে প্রদেশে, জাতিতে জাতিতে একই কালে পার্থক্য দেখা যায়। পুরুষের বিবাহের বয়স সম্পর্কে বিশেষ বাঁধাবাঁধি ছিল না। পুরুষ সারাজীবন অবিবাহিত থাকিতে পারে; কিন্তু দেখা যায়, মধ্যযুগে ও পরে, স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহ অবশ্যকর্তব্য হইয়া পড়ে। আর্য-ব্রাহ্মণকুমার বেদাধ্যয়নের পর বিবাহ করিতে পারিত যথাক্রমে ১২, ২৪, ৩৬ ও ৪৮ বৎসর বয়সে। পুরাকালে ব্রহ্মচর্য করিতে হইত অন্ততঃপক্ষে দ্বাদশ বৎসর। ব্রাহ্মণের উপনয়ন হইত সাধারণতঃ অষ্টম বর্ষে; সুতরাং বিবাহের বয়স ধরা যায় ৮+১২=২০ বৎসর। মনু ত্রিশ বৎসরের পাত্রের সহিত দ্বাদশ বৎসরের কন্যার বিবাহের বিধান দিয়াছেন। তাঁহার মতে, চব্বিশ বৎসরের পাত্র আট বৎসরের কন্যা বিবাহ করিতে পারে। বিষ্ণুপুরাণের মতে, বর ও কন্যার বিবাহের বয়সের আনুপাতিক পার্থক্য থাকিবে ১ হইতে ৩ বৎসর। কেহ কেহ বলেন, পাত্রী পাত্র অপেক্ষা ২, ৩, ৫ অথবা আরো বেশী বয়সের ছোট হইবে। মহাভারতে দেখা যায়, ১৬ বৎসরের যুবকের বিবাহ হইতে পারিত। তখন সম্ভবতঃ ৬০ বৎসরের বৃদ্ধেরও বিবাহ হইত। মহাভারতের সমাজে বর ও কন্যার বিবাহের বয়স যথাক্রমে ৩০ ও ১০, অথবা ২১ ও ৭ বৎসর অনুমোদিত হইয়াছিল। উদ্বাহতত্ত্বে দেখা যায়, ৩০ বৎসরের পাত্র ১৬ বৎসরের পাত্রী বিবাহ করিবে। কিন্তু এই 'ষোড়শ' শব্দটি কেহ কেহ মূল পুঁথির 'দশ' শব্দের ভ্রান্ত পাঠ বলিয়া মনে করেন।

ঋগ্বেদে কন্যার বিবাহের বয়স সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট অভিমত দেখা যায় না। তবে, পরিণত বয়সে কন্যাগণের বিবাহ দেওয়ার নিদর্শন অনেক পাওয়া যায়। অন্ততঃ সে-যুগে অষ্টমবর্ষীয়া শিশুকন্যার যে বিবাহ হয় নাই তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু ভ্রাতৃহীনা কন্যা বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত অবিবাহিতা থাকিত। বৃদ্ধা কন্যারও বিবাহ হইত। অথর্ববেদে দেখা যায়, সুন্দরী ও সুবেশা কন্যা স্বয়ং তাহার পাত্র খুঁজিয়া লইতেছে। ইহাতে প্রমাণ হয়, সেকালে কন্যাগণ উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করিত। ঋগ্বেদের বিবাহিতা কন্যাগণ বালিকা-বধূ নহে। তবে সেকালে বাল্যবিবাহও হইত, ঋতুকালের পূর্বেও। বৃদ্ধ বরের সহিত অজাতরজস্কা

১ বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য Kane, পৃ ৪৫২-৫০১ ২ ঐ, pp. 438-447

শিশুকন্যারও বিবাহ হইয়াছে। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে কন্যাগণের বিবাহের যথাযথ বয়স বোঝা না-গেলেও মোটামুটি বলা যায়, যে-কোনও বয়সে তাহাদের বিবাহ হইত। ক্ষেত্র-বিশেষে কন্যা আমরণ কুমারীও থাকিত। পরবর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণে কন্যাগণের বিবাহের বয়স নির্ধারণ-প্রসঙ্গে বিশেষ কোন উল্লেখ নাই।

প্রাচীন গৃহ্য ও ধর্মসূত্রের মতে, কন্যাগণের বিবাহ ঋতুকালের ঠিক্ পূর্বে অথবা ঠিক্ পরেই দেওয়া বিধেয়। কয়েকটি গৃহ্যসূত্রে 'নগ্নিকা'-বিবাহের উল্লেখ আছে। 'নগ্নিকা' শব্দের অর্থ লইয়া নানা মুনির নানা মত।—অচিররজস্কা বা সহবাসযোগ্যা; যৌবনের অনুভূতিহীনা বা নগ্না থাকিলেও সুশোভনা; অজাতরজস্কা ইত্যাদি।—যাহাই হউক, এই সকল মতানৈক্যের হেতু সম্পর্কে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, এই সকল শাস্ত্র রচিত হইবার সময়ে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত ছিল না।

পণ্ডিতগণ গৃহ্যসূত্রসমূহের আর একটি বিধান হইতে কন্যার বিবাহের বয়স-নির্ধারণ বিষয়ে একটি বিশেষ ইঙ্গিত আবিষ্কার করিয়াছেন। বহু গৃহ্যসূত্রে বিবাহের পর দম্পতির ত্রিরাত্র ব্রহ্মচর্য পালনের বিধান আছে। পরাশর বলেন, বিবাহের পর এক বৎসর, দ্বাদশ রাত্রি, ছয় রাত্রি, অন্ততঃপক্ষে তিন রাত্রি সহবাস নিষেধ। দ্বাদশ শতকে স্মার্ত হরদত্ত এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। এই সকল বিধান ও আলোচনা হইতে অনুমান হয়, অন্ততঃ দ্বাদশ শতক পর্যন্ত কোনো কোনো অঞ্চলে কন্যার বিবাহের বয়স কমপক্ষে ছিল চৌদ্দ বৎসর। গৃহ্যসূত্রে উল্লিখিত 'চতুর্থীকর্ম'-কৃত্যের বিধানেও একটি বিশেষ ইঙ্গিত মিলে। ইহা বিবাহের পর চতুর্থ দিনের কৃত্য। এই প্রাচীনতর অনুষ্ঠান, পরবর্তী স্মৃতিসমূহের 'গর্ভাধান'-সংস্কারের অনুরূপ। সহবাস-কর্ম এই কৃত্যের বিশিষ্ট অঙ্গ; ফলে, ইহা নিশ্চিত যে, কন্যাগণের তখন পরিণত বয়সে বিবাহ হইত। বিবাহের পূর্বে কন্যা ঋতুমতী হইলে কোনো কোনো গৃহ্যসূত্রে ও স্মৃতিতে সামান্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে মাত্র।

গৌতম বলেন, ঋতুকালের পূর্বেই কন্যার বিবাহ বিধেয়। কাহারো মতে, কন্যা কাপড় পরিতে জানিবার পূর্বেই বিবাহ দেওয়া উচিত। বয়স্থা কন্যার বিবাহ না-দিলে, তিনটি ঋতুকালের পরে কন্যা স্বেচ্ছায় স্বয়ংবরা হইতে পারে।—এই সকল উক্তি হইতে প্রমাণ হয়, গৌতমের পূর্বে অর্থাৎ পাঁচ হইতে ছয় শত খৃষ্টপূর্বাব্দে ভারতীয় সমাজে শিশু-কন্যার বিবাহ প্রচলিত ছিল; এবং ঋতুকালের পরে বিবাহ হইলেও গৌতম বিচলিত হন নাই। মনুর মতে, কুমারী কন্যা ঋতুমতী হইলেও আমরণ তাহার বাপের বাড়ীতে কাটাইবে, তথাপি গুণহীন পাত্রে তাহার বিবাহ দিবে না। ঋতুমতী হইবার পর কন্যা তিন বৎসর অপেক্ষা করিতে পারে। এই সময়ের মধ্যে তাহার বিবাহ না দিলে সে তাহার মনোমত বর খুঁজিয়া লইতে পারিবে। বৌধায়ন ও বশিষ্ঠেরও এই মত। উপরন্তু, বৌধায়ন বলেন,

ঋতুকালের পর কন্যা অবিবাহিতা থাকিলে, প্রতি ঋতুকালে কন্যার পিতামাতাকে ভ্রূণ-হত্যার সমান পাপ অর্শায়। যাজ্ঞবল্ক্য ও নারদেরও এই বিধান। শাস্ত্রের এই সকল উক্তি সমাজে সুপ্রচারিত হওয়ায়, গুণহীন পাত্রেও কন্যার বাল্যকালে বিবাহ দিবার প্রথা প্রচলিত হয়।

ছয় শত খৃষ্টপূর্বাব্দ হইতে খৃষ্টাব্দের প্রবর্তন অবধি সময়ে দেখা যায়, কন্যাগণের আন্ত-ঋতুর কয়েক মাস বা বৎসর পরে বিবাহ দূষণীয় নহে ; কিন্তু দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দে রচিত যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতির বিধান হইতে অনুমান হয়, তখন সমাজে অজাতরজস্কা কন্যার বিবাহ সবিশেষ প্রচলিত হইয়াছে।—এই পরিবর্তনের হেতু অস্পষ্ট। এই সময় বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রবল হইয়া উঠে। সম্ভবতঃ কুমারীগণ প্রকৃত আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা বা অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত দলে দলে বৌদ্ধ ও জৈন সঙ্ঘে প্রবেশ করার ফলে, প্রায়শঃই তাহাদের নৈতিক মান শ্লথ হইয়া পড়িত। ফলে, ইহার বিরুদ্ধে সমাজে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সমাজ-পতিগণ এই প্রথা রোধ করিবার জন্য কন্যাগণের পক্ষে বিবাহ অবশ্যকর্তব্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন। দ্বিতীয়তঃ, এই সময়ে কন্যাগণকে শিক্ষাদান-প্রথা অপ্রচলিত হয় ; কেহ কেহ অবশ্য পাণিনি, পতঞ্জলি, অধ্যয়ন করিত। কিন্তু সমাজ সাধারণ কন্যাগণের নিষ্কর্মা থাকা উচিত মনে করেন নাই। ইহা ছাড়া, স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহ উপনয়নের সমতুল মনে হওয়ায়, উপনয়নের বয়স অর্থাৎ আট বৎসর বয়সে কন্যার বিবাহকাল নির্দিষ্ট হয়। এই সময়ে লোকের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের নিকট স্বর্গদ্বার রুদ্ধ। এই সকল বিশ্বাসে, খৃষ্টাব্দের পাঁচ ছয় শতাব্দীর মধ্যে কন্যাগণের বিবাহের বয়স কমিয়া আসে। লৌগাক্ষি-গৃহ্যসূত্রে বলেন, কন্যাগণের ব্রহ্মচর্য দশম অথবা দ্বাদশ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। বৈখানসের মতে, ব্রাহ্মণ-কন্যাকে বিবাহ করিবে 'নগ্নিকা' অথবা 'গৌরী' অবস্থায়। তাঁহার মতে, 'নগ্নিকা' অষ্টম বর্ষের পর এবং দশম বর্ষের মধ্যে ; এবং 'গৌরী' দশ এবং বারো বৎসরের মধ্যে ; কিন্তু যাহার তখনও ঋতু হয় নাই। মতান্তরে, 'নগ্নিকা' দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত। কেহ কেহ ইহার পরেও যান। পরাশর বলেন, আট বৎসরের কন্যা 'গৌরী', নয় বৎসরের কন্যা 'রোহিণী', দশ বৎসরে 'কন্যা' এবং তাহার পর অর্থাৎ দশ বৎসর বয়সের পরে—'রজস্বলা'। যদি কেহ কন্যাকে বারো বৎসরের মধ্যে বিবাহ না-দেয়, তাহার পিতৃগণ কন্যার মাসিক প্রতিমাসে পান করেন। রজস্বলা-কন্যা দর্শন করিলে কন্যার পিতামাতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও নরক গমন করেন। পরাশর বলেন, ব্রাহ্মণ এইরূপ কন্যা দর্শন করিলে তাহার সহিত বাক্যালাপ করিবে না, এবং তাহার সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে অন্নগ্রহণ করিবে না এবং সে বৃষলীপতি। পক্ষান্তরে, বায়ুপুরাণ বলেন, গৌরীবিবাহে কন্যার পুত্র তাহার পিতার একবিংশ পুরুষ পবিত্র করে ; এবং তাহার ছয় পুরুষ উদ্ধার করে। পরাশরের মতো সংবর্ত

বলেন, অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার বিবাহ সমীচীন। কিন্তু বৃহৎযম-সংহিতায় মতান্তর আছে। অঙ্গিরসেরও অনুরূপ অভিমত। কশ্যপ বলেন, কন্যাকে সপ্তম বর্ষে গৌরী বলা হয়, দশে কন্যকা এবং দ্বাদশে কুমারী; কিন্তু বৈখানস ও কশ্যপ গৌরীর সংজ্ঞা-নিরূপণে পরাশর হইতে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনটি স্মৃতি ঋতুকালোত্তর বিবাহ পাপ বলিয়া মনে করেন; তাহাতে কেবল পিতামাতা নয়, স্বামীও সম-অপরাধী। বিবাহ-কৃত্যের সময়ে কন্যা রজস্বলা হইলে বৌধায়ন পিতার কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়াছেন। মারীচি বলেন, পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা বিবাহের পক্ষে সর্বোত্তম। মনু বাল্য-বিবাহ অনুমোদন করিয়াছেন, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে। খৃষ্টীয় শতকের প্রারম্ভে, অজাতরজস্কা কন্যাগণের বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হয়। যম-স্মৃতি বলেন, কন্যাগণের পক্ষে বিবাহ অবশ্যকর্তব্য; এবং তাহাদের ঋতুকালের পূর্বেই বিবাহ হওয়া উচিত—এমন-কি, অবাঞ্ছিত পাত্রেও। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতক হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণ-কন্যাগণের অষ্টম হইতে দশম বর্ষের মধ্যে বিবাহ দিবার সাধারণ নিয়ম প্রচলিত ছিল।[১]

মধ্যযুগে বাল্য-বিবাহের[২] বহুলপ্রচলন ছিল। সম্রাট্ আকবরের মতো প্রজারঞ্জক তাহা না-মানিয়া, কন্যাগণের ঋতুকালোত্তর বিবাহ-প্রথা প্রবর্তনের জন্য প্রজাদের নির্দেশ দিলেও তাহাতে কোনো ফল হয় নাই। বহুসংখ্যক বিদেশী পর্যটক এবং বণিকের বিবরণ হইতে জানা যায়, ভারতবর্ষে ঋতুকালের বহুপূর্বেই কন্যাগণের বিবাহ হইত। ষোড়শ শতকের ইংরাজ বণিক্ Fitch-এর বিবরণে আছে, বাঙ্গালাদেশের মুর্শিদাবাদে ছেলে ও মেয়ের যথাক্রমে দশ ও ছয় বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে। Manucci বলেন, সপ্তদশ শতকে কন্যাগণের কথা-বলিতে-পারার পূর্বেই বিবাহ হইত; কিন্তু, কদাচ দশ বৎসর বয়সের পরে নহে। Tavernier বলেন, বিবাহের সাধারণ বয়স সাত অথবা আট।

হিন্দু-সমাজে বাল্যবিবাহের বিধি-নিষেধ[৩] কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ-সমাজেই বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। বৈখানস ব্রাহ্মণের পক্ষে নগ্নিকা বা গৌরী কন্যা বিবাহার্হা বলিয়াছেন; কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের ক্ষেত্রে এইরূপ কথা বলেন নাই। সংস্কারপ্রকাশ পরিষ্কার বলিয়াছেন, ঋতুপ্রাপ্ত-কন্যা-বিবাহে ক্ষত্রিয় এবং অন্যের কোনো বাধা নাই। পৌরাণিক যুগে প্রাপ্তবয়স্কা কুমারী কন্যার কথা শুনা যায় না। ব্রহ্মপুরাণের মতে, বিবাহের সময় কন্যাগণের বয়স ৮, ১২, ১৬ বা ২০ হইলে যথাক্রমে ১ বৎসর, ১২ দিন, ৬ দিন বা ৩ দিন ব্রহ্মচর্য বিধেয়।

প্রাচীন ভারতীয় স্মার্তগণের বাল্যবিবাহ-নীতি-প্রচার আদৌ উপহাসের ব্যাপার নহে।

---

১ Kane, p 445   ২ P. W. H. O., p 61   ৩ Kane, pp 446-47

য়ুরোপের সকল প্রদেশে বাল্যবিবাহ[১] প্রচলিত ছিল। এমন-কি, ইংলণ্ডেও ১৯২৯ সাল অবধি বর ও কন্যার আইনতঃ বিবাহের বয়স নির্দিষ্ট ছিল যথাক্রমে ১৪ এবং ১২। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা আবশ্যক,—বাল্যবিবাহ সর্বতোভাবে সমাজ-ধর্মের একটি সংস্কার। তবে ঐ সময়ে সহবাস-বিধি প্রচলিত ছিল না; তাহা ঋতুকালের পরে অনুষ্ঠিত হইত। ঋষিগণ এই নিয়মের ব্যতিক্রমকে ঘোরতর নিন্দা করিয়াছেন। Winternitz দেখাইয়াছেন, তিন শত বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডে নয় বা দশ বৎসরের, এমন-কি দুই বা তিন বৎসরের শিশুরও বিবাহ হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত চিঠিপত্রগুলি[২] পাঠ করিলে বাল্যবিবাহের প্রভূত নিদর্শন মিলিবে।

আমাদের আলোচ্য চিঠিপত্রের যুগে[৩] অর্থাৎ অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীতে কন্যাগণের বিবাহের বয়স ৫, ৭, ৮, ৯ অবধি নির্ধারিত ছিল। পাত্রগণের বয়স জানা যায় না। তবে ৬০ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ পাত্রও দেখা যায় বিবাহার্থী। বৃটিশ শাসনের সূত্রপাতে ভারতীয় সমাজে পাশ্চাত্য ভাবধারা, সভ্যতা ও শিক্ষা প্রবর্তিত হইলে, শিক্ষিত জনগণ কন্যাগণের বিবাহের বয়স বাড়াইবার পক্ষপাতী হইলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের দিকে কন্যাগণের ঋতুকালোত্তর বিবাহের আন্দোলন চলিল। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ইহা কার্যকর হয় নাই। দেশে প্লেগ-জনিত মহামারীর পর[৪] কন্যাগণের বিবাহের বয়স ৮ হইতে ১২ অথবা ১৩ করা হয়। কিন্তু সমাজ তখনও কন্যাগণের বিবাহ-ব্যাপারে ঋতুকাল অতিক্রমণের ভয়ে ভীত। কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারের ক্রমভঙ্গুরতা, স্ত্রী-শিক্ষা-প্রসারের প্রয়োজন অনুভব, এবং সর্বোপরি, জীবনধারণের জন্য অর্থনৈতিক সংগ্রাম হিন্দু-সমাজের শিক্ষিত জনগণকে স্মৃতির নিয়ম ভাঙ্গিতে বাধ্য করিতেছে। ভারতীয় বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে এ-যুগে (XIX of 1929, as ammended by Act 19 of 1938) কন্যাগণের বিবাহের নিম্নতম বয়স চৌদ্দ এবং তৎপূর্বে বিবাহ দিলে দণ্ডনীয় অপরাধ। অবশ্য অর্থনৈতিক কারণে যুবকগণ যদি চব্বিশ পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকে, তাহা হইলে তাহারা বিবাহের সময় কমপক্ষে ১৬, ১৭ বৎসর বয়সের পাত্রীর অনুসন্ধান করিবে।

চ. বিবাহে শুভদিন-নির্ণয়: ঋগ্বেদের বিবাহ-সূক্তে আছে, অঘাতে গো-হত্যা করা হয়, আর ফাল্গুনীতে বধূকে তাহার বাপের বাড়ী হইতে বহিয়া লইয়া যাওয়া হয়[৫]। সেকালে বিবাহার্থী বরের অর্চনার নিমিত্ত মধুপর্কের জন্য গো-হত্যা করা হইত। কেহ কেহ অনুমান

১ Kane, p 446 ২ পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃ ১৯-২০ ৩ ঐ ঐ ৪ P. W. H. O., pp 61-63
৫ Kane, pp 511-516

করেন, ইহা বর কর্তৃক কন্যার পিতাকে গরু-প্রদানের প্রসঙ্গ। ইহাই পরে আর্ষ-বিবাহে পরিণতি লাভ করে। যাহাই হউক, মূল প্রতিপাদ্যের অর্থ হইতেছে,—চন্দ্র অঘা বা মঘা নক্ষত্রের সহিত মিলিত হওয়ার শুভক্ষণে বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হইত। মঘা নক্ষত্রের পরে, দুইটি ফাল্গুনী তাহার অনুসরণ করে। আপস্তম্ব-গৃহ্যসূত্রে ইহারই প্রতিধ্বনি আছে; মঘা নক্ষত্রে গো গ্রহণ করা হয়, এবং বধূ ফাল্গুনীনক্ষত্রে বরের বাড়ীতে বাহিতা হয়। পণ্ডিতেরা ইহার অর্থ বুঝিয়াছেন: বিবাহ আর্ষ পদ্ধতিতে মঘা নক্ষত্রে অনুষ্ঠিত হইত, এবং বধূ তাহার পিতৃগৃহ হইতে বিবাহের পরের দিন অথবা আরও একদিন পরে যাইত। আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রের মতে, সূর্যের উত্তরায়ণের সময় শুক্লপক্ষে চান্দ্রলগ্নে কৌল-উপনয়ন, গো-দান এবং বিবাহ অনুষ্ঠিত হইত। কোনো কোনো শাস্ত্রকারের মতে, বিবাহ সকল সময় অনুষ্ঠিত হইবে। আপস্তম্বের মতে, শিশির অর্থাৎ মাঘ ও ফাল্গুন, গ্রীষ্মের শেষ দুই মাস, এবং আষাঢ় ব্যতীত সমস্ত মাস বিবাহের পক্ষে প্রশস্ত; এবং সমস্ত নক্ষত্রই শুভ। আপস্তম্ব বলেন, পিতা কন্যাকে স্বামীর প্রিয় করিতে চাহিলে তাহার নিষ্ঠা বা স্বাতী নক্ষত্রে বিবাহ দিবেন। আপস্তম্বের মতো বৌধায়ন এই মাসগুলি মানিয়া, নক্ষত্রের মধ্যে রোহিণী, মার্গশীষ, উত্তরা-ফাল্গুনী এবং স্বাতী নক্ষত্রকে প্রশস্ত বলিয়াছেন। মানব-গৃহ্যসূত্র বিবাহের পক্ষে প্রশস্ত নক্ষত্র বলেন—রোহিণী, মৃগশিরা, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, উত্তরাষাঢ়া, বা উত্তরা-ফাল্গুনী এবং উত্তরা-ভাদ্রপদা। তাঁহার মতে, পিতৃগৃহ হইতে কন্যাকে লইয়া যাইবার পক্ষেও এই নক্ষত্রগুলি শুভ। কাঠক এবং বারাহও এই কথা বলেন। রামায়ণে দেখা যায়, উত্তরা-ফাল্গুনীতে বিবাহ দেওয়া উচিত; তাহার দেবতা ভগ্। মহাভারতে আছে, বিবাহ দেওয়া উচিত ভগাধিষ্ঠিত নক্ষত্রে। কৌশিক-সূত্র আধুনিক আচারের অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, বিবাহ কার্ত্তিক-পূর্ণিমার পর হইতে বৈশাখী পূর্ণিমা পর্যন্ত দেওয়া বিধেয়। অথবা, চৈত্র বা চৈত্রার্ধ পরিহার করিয়া নিজ নিজ অভিরুচি মতো বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। বঙ্গীয় স্মৃতিকার[১] রঘুনন্দন বলেন, আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক এবং পৌষ ও চৈত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। মলমাস ও সংক্রান্তি বর্জনীয়। সৌরমাসের উল্লেখ কর্তব্য। শ্রীনাথের মতে, চান্দ্রমাসের উল্লেখ বিধেয়। রঘুনন্দন বলেন, দিবাবিবাহ নিষিদ্ধ।

বিবাহে কোষ্ঠী-ঠিকুজির যোটকতা[২] বিচার করার প্রথা পূর্বে ছিল না। গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্র-সমূহে ইহার কোনও উল্লেখ নাই। ইহার সহজ কারণ মনে হয়, সেই সময়ে ফলিত জ্যোতিষের শৈশব অবস্থা; রাশিচক্রাদির গণনা তখন অজ্ঞাত, অথবা এদেশে আসে নাই। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত, বর্তমানের মতো জটিল কোষ্ঠী-রচনা ও যোটকতা-বিচার প্রচলিত

১ স্মৃ-বা, পৃ ৬৩ ২ P. W. H. C., p 72

ছিল না। ভাসের নাটকে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে দেখা যায়, জ্যোতিবিগণ বিবাহে দিন-ক্ষণ, মঙ্গল-অমঙ্গল ও নক্ষত্রের শুভাশুভ বিচার করিতেছেন ; পিতামাতাও পুত্র-কন্যার বিবাহের জন্য শুভদিন নির্ধারণ করিতেছেন। বিবাহব্যাপারে ফলিত জ্যোতিষের তেমন কোনও প্রয়োজন ছিল না। খৃষ্টীয় চতুর্থ হইতে নবম শতকের মধ্যে ফলিত জ্যোতিষের বিশেষ প্রগতি হয়। এমন-কি, ইহা তখন বিবাহ-সম্বন্ধ গড়িবার ও ভাঙ্গিবার ব্যাপারে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই সময়ে কোষ্ঠী-লিখন-পদ্ধতি প্রচলিত হয় ; এবং সম্বন্ধ-নির্ণয়ে কোষ্ঠী-গণনা-প্রথা প্রবর্তিত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে দশকুমারচরিত-গ্রন্থে প্রথম দেখা যায়, পিতা-মাতা কন্যার বিবাহের নিমিত্ত নক্ষত্রজীবীর সহিত পরামর্শ করিতেছেন।

মধ্যযুগের নিবন্ধাবলীতে ফলিত-জ্যোতিষ সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। প্রয়োজন-বোধে প্রসঙ্গতঃ তাহার কয়েকটি বলিতেছি। উদ্বাহতত্ত্বে রাজমার্তণ্ডের ও ভুজবলভীমের উদ্ধৃতি আছে : বিবাহের পক্ষে চৈত্র ও পৌষ ছাড়া সকল মাসই প্রশস্ত। কন্যা অরক্ষণীয়া হইলে, শুভ ঋতুর অপেক্ষা না-করিয়া যে-কোনো অনুকূল লগ্নে ও যে-কোনও দিনে বিবাহ বিধেয়। কন্যার দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত শুভ অয়ন, মাস ও দিন দেখার প্রয়োজনমাত্র। সংস্কার-রত্নমালায় বিধান আছে, সূত্রের আদেশ ও স্মৃতির বিধানে গোলযোগ ঘটিলে বিবাহ-ব্যাপারে মাসাদি-নির্ণয়ে দেশাচার অনুসরণ করিবে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ কাহারও জ্যেষ্ঠ কন্যার সহিত জ্যেষ্ঠ মাসে অথবা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে দিতে নাই। কাহারও জন্মমাসে, জন্মদিনে অথবা জন্মনক্ষত্রে বিবাহ দিবে না। বিবাহের পক্ষে সোম, শুক্র ও বৃহস্পতি সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন। পক্ষান্তরে, মদনপারিজাত বলেন, রাত্রিকালে বিবাহ অনুষ্ঠিত হইলে যে-কোন দিন প্রশস্ত। বিবাহে কন্যাপক্ষে চন্দ্র প্রবল থাকা উচিত। রাশিচক্র হইতে শুক্রের চতুর্থ অষ্টম ও দ্বাদশ স্থান পরিত্যাজ্য। কন্যা ঋতুপ্রাপ্তা হইলে শুক্রের উদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করা অবিধেয় ; পক্ষান্তরে, জন্মরাশির অষ্টমে শুক্র থাকিলেও বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবে। উপনয়ন ও বিবাহ সিংহ-রাশিতে হয় না ; এই প্রথা কেবল গঙ্গা ও গোদাবরীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রচলিত।

ফলিত-জ্যোতিষের মতে, বর ও কন্যার জন্মরাশি ও নক্ষত্র-বিচার আট প্রকারে সম্পন্ন হয়, তাহার নাম 'কূট'। এই কূট : বর্ণ, বশ্য, নক্ষত্র, যোনি, গ্রহ (দ্বাদশ রাশিতে অধিষ্ঠিত), গণ, রাশি ও নাড়ী। ইহার প্রত্যেকটি যদি পূর্বেরটি অপেক্ষা বলবান্ হয়, এবং ১ হইতে ৮টি গুণ প্রত্যেকটিতে যুক্ত হয় তাহার ফল শুভ। ইহার মধ্যে গণ ও নাড়ীর বিচার অদ্যাপি গুরুত্বপূর্ণ, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সকলের নিকট। সাতাশ নক্ষত্রকে নয়টি করিয়া তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। প্রত্যেক শ্রেণী হইতে যথাক্রমে দেবগণ, মনুষ্যগণ ও রাক্ষসগণ এইরূপ বিভাগ করা হইয়াছে।

বর ও কন্যা এই তিন গণের একই গণভুক্ত নক্ষত্রজাত হইলে সর্বাপেক্ষা শুভ। জন্ম-নক্ষত্র ভিন্নশ্রেণীর হইলে, দেবগণ মনুষ্যগণে বিবাহ মধ্যম; দেবগণ রাক্ষসগণের বরের বিবাহ মনুষ্যগণের কন্যার সহিত হইবে; কন্যা রাক্ষসগণের এবং বর মনুষ্যগণের হইলে ফল মৃত্যু। যোটকের নক্ষত্র দেব ও রাক্ষসগণের হইলে ফল বিরোধ।

নাড়ী-নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে নক্ষত্রগুলি নয়টি করিয়া তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—আদ্যনাড়ী, মধ্যনাড়ী ও অন্ত্যনাড়ী। দম্পতির নক্ষত্র একই নাড়ীর অন্তর্ভুক্ত হইলে ফল মৃত্যু; সে বিবাহ পরিত্যাজ্য। দম্পতির জন্মনক্ষত্রসমূহ ভিন্ন নাড়ীর হওয়া বিধেয়।

বিবাহের লগ্ন-নিরূপণ হইবার পর, এবং অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবার পূর্বে, উভয় পক্ষের কোনো আত্মীয় মারা গেলে, কোনো শাস্ত্রমতে বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। এমতাবস্থায় শৌনক বলেন, বর ও কন্যার পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী, খুল্লপিতামহ, ভ্রাতা বা ভাবী বধূর বা বরের অবিবাহিতা ভগ্নী, বরের প্রথমা স্ত্রী, অথবা বরের অন্য স্ত্রীর পুত্র মারা গেলে, প্রতিকূল বিবেচনায় সে-বিবাহ নিষেধ। বিবাহানুষ্ঠান অর্থাৎ নান্দীশ্রাদ্ধ নিষ্পন্ন হইবার পূর্বে কন্যার মাতার অথবা বরের মাতার মাসিক হইলে, শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ ঋতুর পঞ্চম দিন পর্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখা বিধেয়।

ছ. শাস্ত্রীয় বিবাহানুষ্ঠান: শাস্ত্রীয় বিবাহানুষ্ঠানের বিস্তৃত আলোচনা আপাততঃ অনাবশ্যক। ইহার সংস্কারগত ও সমাজগত কয়েকটি দিক্ লইয়া আলোচনা করিতেছি। বাগ্‌দান ও বিবাহ এই অনুষ্ঠানের দুই প্রধান অঙ্গ[১]। কন্যাগণের ঋতুকালোত্তর বিবাহ প্রচলিত থাকার সময় এই উভয় অনুষ্ঠানে বিশেষ ভেদ ছিল না। বাল্যবিবাহ প্রচলনের ফলে, বাগ্‌দান ও বিবাহের মধ্যে বেশ কয়েক মাস, এমন-কি, কয়েক বৎসর চলিয়া যাইত। ফলতঃ, ইহাতে প্রায়শঃই বিশেষ জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইত। সময়ের ব্যবধানে ভালো পাত্র ও পাত্রীও জুটিয়া যাইত। এইরূপ ক্ষেত্রে স্মার্তগণ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ক্ষতিপূরণ দিয়া পূর্ব-বিবাহ-চুক্তি ভাঙ্গিয়া দিতে বিধান দিয়াছেন। কিন্তু, কোনো পক্ষের মৃত্যু হইলে পরিস্থিতি জটিলতর হইত। পাত্রী মারা গেলে পাত্র অন্য পাত্রী বিবাহ করিতে পারিত, কিন্তু নির্বাচিত পাত্র মারা গেলে সমস্যার সমাধানে নানা মুনি নানা মত দিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, এ-ক্ষেত্রে ভিন্নপাত্রে পাত্রীর বিবাহ দোষাবহ নহে। তাঁহাদের মতে, বাগ্‌দান বিবাহ নহে; এবং বিবাহ সম্পূর্ণ ও বিধিবদ্ধ হয় মন্ত্রপাঠের পর। পক্ষান্তরে, অন্যেরা বলেন, এ-ক্ষেত্রে, বাগ্‌দত্তা পাত্রীর জন্য নির্বাচিত পাত্রের মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক প্রকৃত বিবাহ নিষ্পাদনের পূর্বে, পাত্রের মৃত্যু হইলে, বাগ্‌দত্তা পাত্রী বিধবা বলিয়া গণ্য হইবে,—ইহা মনুরও মত। বিকল্প-বিধানে তিনি বলেন, এ-ক্ষেত্রে পাত্রীর বিবাহ হইবে তাহার

১ P. W. H. C., pp 79-88

দেবরের সহিত, নিয়োগ-প্রথার মাধ্যমে। কিন্তু, এইরূপ অতি সংকীর্ণ মতবাদ সমাজ গ্রহণ করে নাই; উপরন্তু, মনুর প্রদত্ত পূর্ববিধানেই ইহার বিরুদ্ধ-বচন আছে। হিন্দু-সমাজে বাগ্‌দত্তা বিধবা কন্যার নিদর্শন দেখা যায় না।

জলস্পর্শপূর্বক বিবাহে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বাগ্‌দত্তা কন্যার ভাবী বর মারা গেলে, বৈদিক মন্ত্রপাঠ না-হওয়ায় কন্যা তখনও অদত্তা থাকিয়া যায়[১]; এবং কন্যার পিতা অপর পাত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিতে পারেন। কাত্যায়ন বলেন, পাত্রী-নির্বাচন করিয়া পাত্র মারা গেলে, বা নিখোঁজ হইলে, কন্যা তিনবার মাসিক হইবার পরে অপরকে বিবাহ করিতে পারে। অন্যত্র ইনি বলিয়াছেন, কেহ কন্যাশুল্ক এবং স্ত্রীধন দানের পরে, বিদেশ যাত্রা করিয়া এক বৎসরের মধ্যে প্রত্যাবর্তন না-করিলে অপর পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ হইতে পারে। মতান্তরে, উদ্বাহতত্ত্বাদিতে দেখা যায়, সপ্তপদী-গমন না-হইলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না। ইহার পূর্বে বর মারা গেলে, বধূ কন্যাই থাকে, বিধবা হয় না; এবং সে অপর লোককে বিবাহ করিতে পারে। হোম এবং সপ্তপদী বিবাহের মধ্যে প্রধান সংস্কার। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ অবশ্যকর্তব্য নহে। কামসূত্র বলেন, অগ্নিসাক্ষী করিয়া যে-বিবাহ তাহা ভঙ্গ হইতে পারে না। শূদ্রের পক্ষে বৈদিক মন্ত্রের ব্যবহার অবিধেয়। তৎপরিবর্তে তাহাদের বিবাহ সম্পূর্ণ করিবার জন্য নিজ নিজ দেশাচার বা বংশাচার অনুসরণ করা উচিত। কোনো কোনো নিবন্ধকের মতে, শূদ্রের বিবাহ সম্পূর্ণ হয়, শূদ্রকন্যা বরের বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিলে। বলাৎধৃতা কন্যার বিবাহ মনু স্বীকার করেন নাই; বশিষ্ঠ ও বৌধায়ন বৈধ বলিয়াছেন; বিশ্বরূপ ও অপরার্ক কিঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়াছেন। আধুনিক আইনে ইহা বিধিবদ্ধ নহে।

সুপ্রাচীন কাল হইতে সুবহু বৈচিত্র্য-পরম্পরা[২] হিন্দু-বিবাহানুষ্ঠানের সহিত বিজড়িত। আশ্বলায়ন বলেন, এই আচারসমূহ দেশে দেশে এবং গ্রামে গ্রামে ভিন্ন; এবং বিবাহানুষ্ঠানে যস্মিন্ দেশে যদাচারই বিধেয়। এই সকল বিচিত্র আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে যেগুলি সাধারণ তাহাই গ্রহণ করা উচিত। আপস্তম্ব বলেন, স্ত্রীলোকের নিকট এই সকল আচার-অনুষ্ঠান জানিয়া লইবে। কারণ, দেশাচার তাঁহারাই ভালো জানেন। সুদর্শনাচার্য বলেন, গ্রহপূজা, অঙ্কুরারোপণ এবং প্রতিসরবন্ধন বিবাহকৃত্যে সাধারণ আচার এবং এইগুলি অনুষ্ঠিত হয় বৈদিকমতে। পক্ষান্তরে, নাগবলি, যক্ষবলি এবং ইন্দ্রাণীপূজা অনুষ্ঠিত হয় অবৈদিক মতে। কাঠক-গৃহ্য বলেন, দেশের এবং বংশের আচার-বিচার-সহযোগে বিবাহ-কর্ম নিষ্পন্ন করা বিধেয়। টীকাকারগণ কয়েকটি অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়াছেন। আশ্বলায়ন-

১ Kane, pp. 539-40 ২ ঐ, pp. 527-539

গৃহ্যসূত্রে বিবাহানুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ততম বিবরণ আছে। এবং এই গৃহ্যসূত্রটি সর্বাপেক্ষা পুরাতন। আমরা ইহা হইতে হিন্দু-বিবাহানুষ্ঠানের বিবরণ সঙ্কলন করিয়া দিতেছি। অন্য গৃহ্যসূত্র হইতেও কিছু কিছু উদাহরণ দিয়া উচ্চশ্রেণীর বিবাহ-পরম্পরা দেখানো যাইতেছে। আমাদের আলোচ্য চিঠিপত্রের ব্রাহ্মণ্য-সমাজে এইভাবেই বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হইত। বিবাহ-সংস্কার বিষয়ে মতপার্থক্যের ও ইহার ক্রমবিবর্তনের পর্যায়ে মন্ত্রও ভিন্ন ভিন্ন। তথাপি, এই সকল বৈচিত্র্য সত্ত্বেও বিবাহ-সংস্কারের রূপরেখা হইতে প্রমাণ হয়, ঋগ্বেদের যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত হাজার হাজার বৎসর যাবৎ একটি অবিচ্ছিন্ন সনাতন পরম্পরার স্রোত বহিয়া আসিয়াছে।

গৃহ্যসূত্রমতে বিবাহানুষ্ঠান: বিবাহানুষ্ঠানের প্রধান বিভাগ তিনটি, কয়েকটি কৃত্য প্রাথমিক ভূমিকাস্বরূপ। বাকী কয়েকটি সংস্কারের প্রধান অংশ ; পাণিগ্রহণ, হোম, অগ্নিপ্রদক্ষিণ এবং সপ্তপদী-গমন। ধ্রুবনক্ষত্র-প্রদর্শনের মতো কয়েকটি কৃত্য মূল অনুষ্ঠানের অনুষঙ্গ। প্রধান কৃত্যগুলি সকল সূত্রকার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের ক্রমনির্ণয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত। কাহারও মতে, সপ্তপদী-গমনের পূর্বে অগ্নিপ্রদক্ষিণ, আবার কেহ বলেন, অগ্নিপ্রদক্ষিণের পূর্বে সপ্তপদী-গমন। মধুপর্ক-অনুষ্ঠান কেহ করিতে বলিয়াছেন, কেহ বলেন নাই। কেহ আবার কন্যাদানের উল্লেখ করেন নাই। গৃহ্যসূত্র হইতে বিবাহানুষ্ঠানের প্রধান কৃত্যগুলি সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।—

১ বধূবর-গুণপরীক্ষা, ২ বরপ্রেষণ অর্থাৎ ঘটক-নিয়োগ। মধ্যযুগে এবং আধুনিকযুগেও ইহা প্রচলিত। ৩ বাগ্‌দান বা বাগ-নিশ্চয় অর্থাৎ বিবাহ-স্থিরীকরণ। মধ্যযুগে ইহা সুপ্রচলিত ছিল। ৪ মণ্ডপ-করণ, ৫ নান্দী-শ্রাদ্ধ ও পুণ্যাহবাচন। মাত্র বৌধায়ন ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ৬ বধূগৃহাগমন, ৭ মধুপর্ক। ইহা বিবাহের পূর্বে বা পরে প্রদান করা হইত। ৮ স্নাপন ; পরিধাপন এবং সংনহন। ৯ সমঞ্জন, ১০ প্রতিসরবন্ধ বা কন্যার হাতে তাগা-বন্ধন। ১১ বধূবর-নিষ্ক্রমণ, ১২ পরস্পর-সমীক্ষণ, ১৩ কন্যাদান, ১৪ অগ্নিস্থাপন ও হোম, ১৫ পাণিগ্রহণ, ১৬ লাজ-হোম, ১৭ অগ্নিপরিণয়ন, ১৮ অশ্মারোহণ, ১৯ সপ্তপদী, ২০ মূর্ধাভিষেক, ২১ সূর্যোদীক্ষণ, ২২ হৃদয়স্পর্শ, ২৩ প্রেক্ষকানুমন্ত্রণ, ২৪ দক্ষিণাদান, ২৫ গৃহপ্রবেশ, ২৬ গৃহপ্রবেশনীয় হোম, ২৭ ধ্রুবারুন্ধতী-দর্শন, ২৮ আগ্নেয় স্থালীপাক, ২৯ ত্রিরাত্রব্রত, ৩০ চতুর্থীকর্ম, ৩১ সীমান্তপূজন, ৩২ গৌরী-হর-পূজা, ৩৩ ইন্দ্রাণী-পূজা, ৩৪ তৈল-হরিদ্রারোপণ, ৩৫ আর্দ্রাক্ষতারোপণ অর্থাৎ বর ও বধূর ভিজা ও অভগ্ন তণ্ডুল নিক্ষেপ। ৩৬ মঙ্গলসূত্র-বন্ধন, ৩৭ উত্তরীয়প্রান্ত-বন্ধন, ৩৮ ঐরিনিদান, ৩৯ দেবকোট্‌ঠাপন ও মণ্ডপোদ্বাসন।

বিবাহের অনুষ্ঠান শেষ হইলে দম্পতিকে তিন দিনের ব্রত[১] পালন করিতে হয়। এই তিন দিন পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন করিলে পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই সময়ে এক ঘরে পৃথক্ শয্যায় শয়ন করিতে হয়। এইরূপ বিধান হইতে বোঝা যায়, বিবাহিত জীবনে আত্মসংযম আবশ্যিক। সর্বগুণান্বিত সন্তান-কামনা করিলে, কোনো কোনো স্মার্ত এই ব্রত দীর্ঘকাল পালন করানোর পক্ষপাতী। পক্ষান্তরে, কেহ কেহ এই বিধির বিরোধিতা করেন। তাঁহাদের মতে, এই তিন দিনের ব্রহ্মচর্যের বিধানে নবদম্পতির গুরুতর মানসিক প্রতিক্রিয়া ঘটাইয়া থাকে। এক্ষেত্রে, উভয় চরমপন্থীর যুক্তির সামঞ্জস্য থাকে—তিন দিনের ব্রহ্মচর্য স্বীকার করিলে। বিবাহের প্রথম রাত্রেই সহবাসের বিধান আছে। আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রের টীকাকার নারায়ণ বলেন, এই প্রথা উত্তরবিহারের বৈদেহগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

গর্ভাধান বা দ্বিরাগমন-কৃত্য সম্পন্ন হয় কন্যা ঋতুমতী হইলে। এই প্রথা সূত্রকারগণের নিকট অজ্ঞাত ছিল। তাঁহারা বুঝিতেন, বিবাহের পর চতুর্থ রাত্রিতে সহবাস হইবে। কারণ, তখন বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না। পক্ষান্তরে, পরবর্তী শাস্ত্রকারগণ বাল্য-বিবাহের সহিতই পরিচিত থাকায় এই বিধান তাঁদের মাথায় ঢোকে নাই। ফলতঃ, কেহ কেহ চতুর্থীকর্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন সহবাস-কর্মের সহিত পৃথগ্‌ভাবে; আবার, মিত্রমিশ্রের মতো কেহ কেহ ইহাকে বিবাহানুষ্ঠান হইতে একেবারে বাদ দিয়াছেন।

কন্যাগণের যখন নয় দশ বৎসর বয়সে বিবাহ হইত তখন সহবাস-কর্ম স্বভাবতঃই কয়েকবৎসর পরে হইত। এবং ইহার জন্য স্বতন্ত্র গর্ভাধান-সংস্কারের বিধান দেওয়া হইয়াছিল। কন্যা ঋতুমতী হইলে ইহা সম্পন্ন হইত। আলবিরুণীর বর্ণনায় দেখা যায়, এই সংস্কার একাদশ খৃষ্টাব্দের দিকে বিশেষ প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে ও আমাদের আলোচ্য সমাজে ইহার বহুপ্রচলন ছিল। মধ্যযুগের নিবন্ধগ্রন্থ স্মৃতিচন্দ্রিকায় ইহার বিশেষ বর্ণনা আছে।

বিবাহ সম্পূর্ণ ও বিধিবদ্ধ হইবার কাল বিচার করিলে দেখা যায়, বাগ্‌দান দ্বারা বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না। কেহ কেহ বলেন, সপ্তপদী-গমনের পর স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ পাকা হয়, এবং তখনই স্ত্রী স্বামীর গোত্র পাইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বলেন,—বিবাহ সিদ্ধ হয় সহবাসে। প্রাচীনকালে যখন ঋতুকালোত্তর বিবাহ প্রচলিত ছিল তখন এই উভয় মতের পার্থক্য বোঝা যাইত। কারণ, তখন চতুর্থ রাত্রিতেই সহবাসের বিধান ছিল। পরবর্তী কালে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকার সময়ে, এই প্রশ্ন গুরুতর হইয়া দেখা দেয়। সহবাসের পূর্বে বিবাহ অসম্পূর্ণ হইবার বিধি থাকিলে, তৎপূর্বে যদি স্বামীর মৃত্যু হয়,

১ P. W. H. C., pp. 81-88

তাহাতে কন্যার কুমারীরূপে পুনরায় বিবাহের সুযোগ থাকে। কিন্তু সমাজ এই মত গ্রহণ করে নাই, এবং সপ্তপদী-গমনেই বিবাহ সিদ্ধ—এই মত প্রচলিত হয়। ফলতঃ, সমাজে শিশু-বিধবার সমস্যা প্রবল হইয়া উঠে ; কারণ তখন কন্যাগণের বিবাহ হইত আট কিংবা নয় বৎসর বয়সে।

জ. বহুবিবাহ : ভারতীয় সমাজে সম্ভবতঃ এক-বিবাহই আদর্শ[১] ছিল। তবে, বৈদিক সাহিত্যে বহুবিবাহের বহু নিদর্শন আছে। ঋগ্বেদের একটি সূক্তে দেখা যায়, সপত্নী নিগ্রহ করিয়া স্বামীপ্রেম-লাভের উদ্দেশ্যে সম্মোহন-বিদ্যা প্রয়োগ করা হইতেছে। অথর্ববেদেও অনুরূপ সূক্ত আছে। আপস্তম্ব-মন্ত্রপাঠ ও আপস্তম্ব-গৃহ্যসূত্রে এইরূপ প্রসঙ্গ রহিয়াছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১৫৯ সূক্তে শচী তাঁহার সপত্নীগণকে নিহত করিয়া ইন্দ্র এবং মানব-লোকের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছেন। আপস্তম্ব-মন্ত্রপাঠেও এই সূক্ত আছে, এবং আপস্তম্ব-গৃহ্যসূত্র সপত্নী পর্যুদস্ত করিবার উদ্দেশ্যে এই মন্ত্রটিকে পুনঃপুনঃ পাঠ করিতে বলিয়াছেন। ঋগ্বেদে 'ত্রিতা' কূপে নিপাতিত হইয়া যে আক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে তীব্র সপত্নী-বিদ্বেষের ইঙ্গিত মিলে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বহু-বিবাহের উজ্জ্বল আলেখ্য পাওয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার 'বহুবিবাহ'-গ্রন্থে এই শ্লোকটির এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন : 'যেমন এক এক যূপে দুই রজ্জু বেষ্টন করা যায়, সেইরূপ, এক পুরুষ দুই স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে। যেমন এক রজ্জু দুই যূপে বেষ্টন করা যায় না, সেইরূপ এক স্ত্রী দুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না।' ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বহুবিবাহের ইঙ্গিত দিয়াছেন। শতপথ ব্রাহ্মণে রাজার চারি প্রকারের বৈধ স্ত্রীর উল্লেখ আছে—মহিষী (ধর্মপত্নী), বাবাতা (সুয়ো), পরিবৃক্তা বা পরিবৃক্তি (দুয়ো), ও পালাগলী (নীচকুলজাতা)। তৈত্তিরীয় সংহিতা মহিষী ও পরিবৃক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। বাজসনেয়ী সংহিতায় মহিষী, বাবাতা ও পরিবৃক্তির উল্লেখ আছে। ঐতেরেয় ব্রাহ্মণে দেখা যায়, হরিশ্চন্দ্রের শতপত্নী ছিল। রাজা এবং মহত্তরগণই যে বহুবিবাহ করিতেন তাহা মনে হয় না ; মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী ছিল।

সূত্রের যুগে কোনো কোনো ঋষি মহত্তর আদর্শ স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। আপস্তম্ব-ধর্মসূত্র বলিয়াছেন, ধর্মপরায়ণা ও সন্তানবতী স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলে কোন পুরুষ দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিবে না। তবে স্ত্রী ধর্ম- বা সন্তানবিহীনা হইলে স্বামী অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে—শ্রৌতযজ্ঞ সম্পন্ন করিবার পূর্বে। অন্যত্র, আপস্তম্ব বলেন, কেহ নির্দোষ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে তাহার শাস্তি কঠিন ; তাহাকে গাধার চামড়া পরাইয়া, তাহার

১ Kane, pp. 550-53

মাথা কামাইয়া, ছয় মাস ধরিয়া তাহাকে সাতটি গৃহস্থবাড়ীতে ভিক্ষা করিতে বাধ্য করিতে হইবে। নারদও সৎ স্ত্রী পরিত্যাগকারীর গুরুদণ্ডের বিধান দিয়াছেন। কৌটিল্য বলেন, স্ত্রীর প্রথম সন্তানের পর দ্বিতীয় সন্তান না হইলে, বা পুত্র না জন্মিলে, বা বন্ধ্যা হইলে, স্বামী আট বৎসর অপেক্ষা করিবে; মৃতবৎসা হইলে দশ বৎসর অপেক্ষা করিবে; কেবল কন্যা-সন্তান জন্মিলে বারো বৎসর অপেক্ষা করিবে। অতঃপর, পুত্র-সন্তানের জন্য বিশেষ উৎসুক হইলে স্বামী অন্য স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে। এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে স্ত্রীকে মাসহারা, স্ত্রীধন ও অর্থ-ক্ষতিপূরণ ('আধিবেদনিক') দিতে হইবে, এবং রাজার নিকট দণ্ড দিতে হইবে চব্বিশ পণ। কৌটিল্যের এই উক্তি পরবর্তী কালে বিশেষ প্রচলিত হয় কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে। আপস্তম্ব এবং অন্যেরা একপত্নীত্বের আদর্শ, এবং নারদ ও অন্যেরা অকারণে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ দণ্ডনীয় অপরাধ ঘোষণা করিলেও, বহুবিবাহকারী পুরুষ কখনও দণ্ড পাইয়াছিল কিনা, সে-বিষয়ে পণ্ডিতগণ সন্দেহ প্রকাশ করেন। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য সুরাসক্তা, রোগযুক্তা, ছলনাময়ী, অমিতব্যয়ী, রূঢ়ভাষিণী, পুত্রসন্তানবিহীনা স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের বিধান দিয়াছেন। মনু ও বৌধায়ন রূঢ়ভাষিণী স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিতে বলিয়াছেন। দেবলের মতে, শূদ্রের এক স্ত্রী থাকিবে, বৈশ্যের দুইজন, ক্ষত্রিয়ের তিনজন, এবং ব্রাহ্মণের চারজন, কিন্তু রাজা যত খুশী বিবাহ করিতে পারিবেন। মনে হয়, রাজার পক্ষে এই উদারতা-প্রদর্শন সেকালের সমাজের রাজগণের আচরিত প্রথার বৈধ স্বীকৃতিমাত্র। মহাভারত আদিপর্বে বলিয়াছেন, পুরুষের পক্ষে বহু স্ত্রী-গ্রহণ অধর্ম নহে; কিন্তু, প্রথম স্বামীর প্রতি কর্তব্যচ্যুতি স্ত্রীলোকের পক্ষে মহা অধর্ম। মৌষলপর্বে আছে, কৃষ্ণের ষোল হাজার স্ত্রী ছিল। ঐতিহাসিক যুগেও রাজগণ শতশত স্ত্রী পরিগ্রহ করিতেন। চেদীরাজ গাঙ্গেয়দেব বা বিক্রমাদিত্য প্রয়াগে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন তাঁহার শতস্ত্রী-সমন্বিত হইয়া। বাঙ্গালা দেশে কৌলীন্য-প্রথার কুফল সুপরিচিত। স্ত্রীলোকের প্রতি এই সামাজিক নির্যাতনের কারণ সুবহু,—পুত্রের আধ্যাত্মিক মূল্যমান, বাল্যবিবাহ, স্ত্রীলোকের অশিক্ষা, স্ত্রীলোকের ধর্মকর্মে শূদ্রতুল্য অশুচিবোধ এবং পুরুষের উপর স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা। তবে, সেকালে বহু স্ত্রী বিবাহ করা সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল না; বরং, ইহা ঘৃণার চক্ষেই দেখা হইত। দাক্ষিণাত্যে উনবিংশ শতকে পুরুষ তাহার সামর্থ্য অনুসারে যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারিত। বাঙ্গালাদেশে প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পরে 'দ্বিতীয় সংসার' পাতা বোধহয় চিরকালই সাধারণ নিয়ম ছিল। আমাদের আলোচ্য চিঠিপত্রে[১] ইহার নজীর আছে।

---

১ চি-স ২, প-সং ৫৩৯

প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা না হইলে বহুবিবাহ সাধারণতঃ কেহ করিত না। সরকারী নথিপত্রে দেখা যায়, ভারতবর্ষে বহুবিবাহ প্রচলিত থাকিলেও, কার্যতঃ প্রথমা স্ত্রী জীবিতা থাকিতে দ্বিতীয় স্ত্রী কচিৎ গ্রহণ করা হইত। এবং সমগ্র ভারতবর্ষে প্রতি ১০০০ স্বামীর ১০১১ জন স্ত্রী আছে; তাহা হইলে, কোনো স্বামীর দুইয়ের অধিক স্ত্রী থাকিতে পারে না; প্রতি হাজারে কেবল ১১ জন পুরুষ একাধিক বিবাহ করিতে পারে।

ঝ. পণপ্রথা : বিবাহে কন্যা-বিক্রয়-প্রসঙ্গে[১] দেখা যায়, মৈত্রায়ণীয় সংহিতায় পত্নী-ক্রয়ের উল্লেখ রহিয়াছে। পূর্ব-পক্ষের প্রসঙ্গে জৈমিনির একস্থানে আছে, কন্যার পিতাকে একশত গরু ও একটি রথ দান করা উচিত। জৈমিনি ইহার উত্তরে বলেন, একশত গরু ও একটি রথ বধূ-ক্রয়ের জন্য দেওয়া হয় না; ইহা কর্তব্যমাত্র; এবং একশত গরু উপহারস্বরূপে দেওয়া হয়—কন্যা সুন্দরী হউক বা না হউক। ইহাতে প্রমাণ হয়, মৈত্রায়ণীয় সংহিতার সময়ে বিবাহে কন্যা ক্রয় করা হইত; কিন্তু লোকে ইহা ঘৃণার্হ বিবেচনা করিত। সূত্রকার-দের যুগে কন্যা-বিক্রয় অত্যন্ত গর্হিত-কর্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। আপস্তম্ব-ধর্মসূত্র এই বিষয়ে বলেন, ইহা কন্যা-বিক্রয় নহে, কর্তব্যের পূর্ণতামাত্র। বশিষ্ট-ধর্মসূত্র 'মানুষ' বা 'আসুর' বিবাহের সমর্থনে দুইটি বৈদিক সূক্ত উদ্ধার করিয়া কন্যা-বিক্রয়-প্রসঙ্গ দেখাইয়াছেন। নিরুক্ত বলেন, 'বিজামাতা' অর্থে ক্রীতা বধূর স্বামী, সে অনুপযুক্ত অসৎপাত্র। যাস্ক বলেন, দক্ষিণদেশে বৃদ্ধ বা অবাঞ্ছিত পাত্রগণ প্রচুর অর্থ দিয়া বধূ ক্রয় করিত। নিরুক্ত আরও বলেন, কোনো স্ত্রীলোক সেই দানের অধিকারী হয় না; কিন্তু পুরুষেরা হয়। শুনঃশেপের আখ্যানে কন্যা-বিক্রয় বা কন্যা-ত্যাগের নিদর্শন মিলে।

এই সকল উদ্ধৃতি হইতে অনুমান করা যায়, প্রাচীনকালে বিবাহের জন্য কখনও কখনও কন্যা ক্রয় করা হইত; পৃথিবীর অন্য দেশেও এই প্রথার প্রচলন ছিল। কিন্তু কালক্রমে ইহা অপ্রচলিত হয়। এবং কন্যা-বিক্রয় কেবল অবিধেয় নহে, এমন-কি উপহার গ্রহণ করাও নিন্দার্হ হইয়া উঠে। আপস্তম্ব-ধর্মসূত্রের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বৌধায়ন-ধর্মসূত্র ক্রীতা বধূকে ধর্মপত্নী বলিতে চাহেন নাই। এইরূপ স্ত্রী যজ্ঞাধিকারী নহে। কাশ্যপ বলেন, ক্রীতা স্ত্রী 'দাসী'-মাত্র। কন্যার শুল্কগ্রহীতা পাপী, আত্ম-বিক্রয়ী এবং নরকগামী হয়। অন্যত্র বৌধায়ন বলেন, বিবাহে কন্যা-বিক্রয় করিলে পিতার পুণ্য বিক্রয় করা হয়। মনুও ইহার ঘোরতর নিন্দা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, পিতা, ভ্রাতা, স্বামী এবং শ্বশুর নিজেদের মঙ্গলের জন্য স্ত্রীলোককে অলঙ্কারাদি প্রদান করিয়া সম্মান করিবেন। আমাদের আলোচ্য চিঠিপত্রে বরকে 'প্রদান' করিয়া বিবাহের নিদর্শন আছে। মনু আরও বলিয়াছেন, শূদ্রও

১ Kane, pp. 503-509

কন্যার বিবাহে যৌতুক লইবে না ; কারণ, যৌতুক-গ্রহণ স্বরূপতঃ আদিম সমাজের কন্যা-বিক্রয় মাত্র। যাজ্ঞবল্ক্য এবং মনু সন্তান-বিক্রয়কে 'উপপাতকের' মধ্যে ধরিয়াছেন। মহাভারতের অনুশাসন-পর্বে কন্যা-বিক্রয়ের নিন্দা আছে ; এবং অনুশাসন-পর্ব ধর্মশাস্ত্রোক্ত যম-গাথার কথায় বলেন, যে অর্থের জন্য নিজ পুত্রকে বিক্রয় করে, বা যে কন্যা-বিক্রয়ের যৌতুক দ্বারা নিজ জীবিকা অর্জন করে, সে 'কালসূত্র'-নামক ভয়ানক নরকে পতিত হইয়া থাকে। ইহার ২৩ সংখ্যক শ্লোকে আছে, সন্তান-সন্ততি দূরের কথা, অতিথিকেও বিক্রয় করা যায় না। মনু আর্ষ-বিবাহে কন্যার পিতার গো-গ্রহণ দ্বারা কন্যা-বিক্রয়ের নিন্দা করিয়াছেন। কেরেলা বা মালাবারে স্থির ধারণা, আচার্য শঙ্কর তাঁহার উপস্থাপিত ৬৪ আচারের মধ্যে কন্যা-বিক্রয় ও সতীদাহ-প্রথা নিষিদ্ধ করেন। অথচ পণগ্রহণ-প্রথা আধুনিক কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। উত্তর আর্কট জেলায় পড়ৈবীডু হইতে ১৪২৫ খৃষ্টাব্দে প্রাপ্ত একটি লেখে দেখা যায়, কর্ণাট, তামিল, তেলুগু এবং লাট (দক্ষিণ গুজরাট)-এর মুখ্য ব্রাহ্মণগণ এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করিতেছেন : তাঁহারা তাঁহাদের কন্যার বিবাহে স্বর্ণ গ্রহণ করিবেন না ; 'ব্রাহ্ম'-মতে 'কন্যাদান' করিয়া তাঁহারা কন্যাগণের বিবাহ দিবেন। এবং যে পিতা স্বর্ণ গ্রহণ করিবেন এবং যে বর স্বর্ণ প্রদান করিবেন রাজা তাঁহাদের শাস্তি দিবেন। এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে জাতিচ্যুত হইবেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের দিকে পেশোয়া সাতারা জেলার ওয়াই-র ব্রাহ্মণগণকে এক নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন : কন্যাগণের বিবাহে অর্থগ্রহণ করিলে দাতা, গ্রহীতা ও ঘটক সকলেরই দণ্ড হইবে। শূদ্রের মধ্যে কয়েকটি জাতির কন্যার বিবাহে এখনও অর্থাদি গ্রহণ করার প্রথা আছে। কিন্তু, এ-স্থলে সেই অর্থ কন্যার সম্পত্তি এবং কন্যার পিতার ব্যয়ের ক্ষতিপূরণ মাত্র।

সুপ্রাচীন কাল হইতে বিবাহে কন্যা-বিক্রয়ের প্রশ্ন বিজড়িত আছে— সন্তানের উপর পিতৃ-কর্তৃত্বে। ঋগ্বেদের একটি সূক্তে ঋজ্রাশ্বের কাহিনী আছে। তাঁহার পিতা তাঁহাকে অন্ধ করিয়াছিলেন ; হেতু, পুত্র একটি নেকড়ে-বাঘিনীকে একশতটি রাসভ দিয়াছিল। তবে এই গল্প কোন প্রাকৃতিক ঘটনার রূপকও হইতে পারে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিধৃত শুনঃশেপের গল্পে বোঝা যায়, কচিৎ পিতা তাহার পুত্র বিক্রয় করিত। নিরুক্তের বিক্রয়াধিকার সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত পূর্বেই বলা হইয়াছে। বশিষ্ঠ-ধর্মসূত্র বলেন, শুনঃশেপ-প্রসঙ্গ পুত্র-বিক্রয়ের দৃষ্টান্ত। এই পুত্র বারো প্রকার পুত্রের অন্যতম। একই সূত্রে আছে, 'অপবিদ্ধ' পুত্র তাহার পিতা-মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে অপরে তাহাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। মনু 'অপবিদ্ধ' পুত্রের অনুরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন। বশিষ্ঠ-ধর্মসূত্র বলেন, পিতা মাতা আপন শোণিত দ্বারা পুত্রকে উৎপন্ন করিয়াছেন বলিয়া পুত্র প্রদানে, বিক্রয়ে ও পরিত্যাগে তাঁহাদের পূর্ণ অধিকার। কিন্তু, কেহ কাহারও একমাত্র পুত্রকে

দান বা গ্রহণ করিবে না। মনু ও মহাভারত বলেন, স্ত্রী, পুত্র এবং ক্রীতদাস নির্ধন; তাহাদের সঞ্চিত দ্রব্যাদির উপর মালিকের অধিকার। মনু বলেন, কন্যার পিতার উপহারে, কন্যার উপর অধিকার সত্ত্বেও তাহার স্বামীর অধিকার। কিন্তু, কালক্রমে পিতার অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়; হেতু, পুত্র-আত্মা পিতা; পুত্র নরকত্রাতা এবং পিতৃগণের শ্রাদ্ধে পিণ্ডাধিকারী; সেইজন্য ক্রমশঃ পুত্রের উপর পিতার অধিকার একান্ত হইয়া উঠে। কৌটিল্য বলেন, ম্লেচ্ছগণের সন্তান-বিক্রয়ে দোষ নাই, কিন্তু কোনো আর্য এই দাসসুলভ কর্ম করিতে পারে না। যাজ্ঞবল্ক্য ও নারদ উভয়েই পুত্র বা স্ত্রী প্রদান নিষেধ করিয়াছেন। কাত্যায়ন বলেন, যদিও স্বামীর স্ত্রী এবং পুত্রের উপর অধিকার, তথাপি তাহারাও পুত্রকে দান বা বিক্রয় করিতে পারে না। যাজ্ঞবল্ক্যও পুত্র-সংগ্রহ সম্পর্কে নিয়ম সংশোধন করিয়াছেন। মনু বিধান দিয়াছেন, কেহ মাতাকে, পিতাকে, পত্নীকে বা পুত্রকে নির্দোষ অবস্থায় পরিত্যাগ করিলে ৬০০ পণ দণ্ড দিবে। যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু-ধর্মসূত্র এবং কৌটিল্যও অনুরূপ বিধান দিয়াছেন। মনু বলেন, কোন পুরুষ বা স্ত্রী, পুত্র বা ক্রীতদাসের অসৎ-চরিত্রতার জন্য তাহাকে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে রজ্জু-বেষ্টন করিয়া বেত্রাঘাত করিবে।

স্ত্রী ও সন্তানের উপর কোন পুরুষের অধিকার আছে কি না সে-বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রকারগণ বিচার করিয়াছেন। জৈমিনি বলেন, বিশ্বজিৎ-যজ্ঞে সর্বস্ব দান করিতে হয়; কিন্তু কেহ ইহাতে তাহার পিতা মাতা এবং অন্য আত্মীয়-কুটুম্বকে দান করিতে পারে না; পারে মাত্র তাহার পূর্ণ অধিকৃত বিষয়। যাজ্ঞবল্ক্যের টীকায় মিতাক্ষরা বলেন, কেহ তাহার স্ত্রীকে বা সন্তানকে অপরকে দান করিতে না-পারিলেও, তাহাদের উপর তাহার পূর্ণ অধিকার। বীরমিত্রদ্বয়েরও অনুরূপ অভিমত। পক্ষান্তরে, পার্থসারথিমিশ্রের তন্ত্ররত্ন বলেন, পুত্র-প্রসঙ্গে 'দান' শব্দটি গৌণ অর্থবহ; অর্থাৎ ইহা অন্যের উপর পুত্রের বা কন্যার কর্তৃত্ব-হস্তান্তর। ব্যবহারময়ূখেরও অনুরূপ অভিমত।

আমাদের অনুমান হয়, ব্রাহ্মণ্য-সমাজে কন্যাদানের প্রসঙ্গে যেমন 'দান' দক্ষিণা-স্বরূপে কন্যা-পণ-প্রথার উদ্ভব হইয়াছে, সেইরূপ তাহারই প্রতিক্রিয়ায় 'পুত্রদান' দক্ষিণাস্বরূপে বরপণ-প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল। বিবাহে বরের উপর কন্যার পিতার পুত্রের অনুরূপ কর্তৃত্বাধিকার না জন্মিলেও, লোকবিশ্বাসে সমাজে বরপণ-প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

প্রাচীন ভারতে পণপ্রথা[১] কন্যার বিবাহে ঘোরতর প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায় নাই। প্রাগৈতিহাসিক যুগে স্ত্রীলোক ছিল পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তিবিশেষ; এবং সেইজন্যই বরের পিতার বদলে কন্যার পিতা বিবাহে কন্যাপণ চাহিলে তাহা যোগ্য বলিয়াই বিবেচনা করা

১ P. W. H. C., pp. 69-72

হইত। বর কন্যাকে বহিয়া লইয়া যাওয়ার ফলে, কন্যার পিতৃ-পরিবার তাহার সেবা হইতে বঞ্চিত হইত। এক্ষেত্রে বর কন্যার পিতার নিকট হইতে এতদতিরিক্ত পণ বা দানের কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না। বরং কখনও চাহিলে ভয়ানক দূষণীয় বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা হইত। পুরাকালে স্ত্রী স্বামীর সংসারে সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইত না। কন্যার শ্বশুর তাহার স্বামীকে ব্যয়বহুল শিক্ষাও দিত না।

প্রাচীন সমাজে পণপ্রথা প্রায় অজ্ঞাত ছিল। প্রাচীন হিন্দুসমাজেও ইহার নিদর্শন মিলে না। ধনী ও রাজপরিবারে অবশ্য বিবাহের সময় জামাতাকে কিছু কিছু উপহার দেওয়া হইত। অথর্ববেদে দেখা যায়, রাজবধূগণ তাঁহাদের সহিত শত-গাভীর উপহার আনিতেছেন। ঋগ্বেদের ১, ১০৯, ২ সূক্তে বরপণের উল্লেখ আছে মনে করা হয়। কিন্তু তাহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয় নাই। দ্রৌপদী, সুভদ্রা, উত্তরা বিবাহের পর তাঁহাদের পিতৃগৃহ হইতে অশ্ব, হস্তী, ও মণিমাণিক্যের বহুমূল্য উপহার আনিয়াছিলেন। জাতকেও দেখা যায়, বিশাখার পিতার মতো ধনী বণিক্‌গণ তাঁহাদের কন্যাগণকে স্বামীগৃহে পাঠাইবার সময় মূল্যবান্ উপহার প্রদান করিতেছেন। রাজপুত্রদের বিবাহের সময় মূল্যবান্ উপহার-প্রাপ্তির প্রসঙ্গ বহু শিলালিপিতেও পাওয়া গিয়াছে। রঘুবংশে দেখা যায়, রাজা বিদর্ভ তাঁহার ভগ্নীর বিবাহের পর স্বামীগৃহে যাইবার সময় প্রচুর উপহার দিয়াছিলেন। তবে এই উপহার-প্রদানকে বরপণ বলা যায় না। ইহা কন্যার প্রতি স্নেহবশতঃ তাহার বিবাহে স্বেচ্ছায় দান। বিবাহের পূর্বে বরকে বা বরপক্ষকে কন্যার পিতার অর্থাদি প্রদানের চুক্তির প্রসঙ্গ স্মৃতিসমূহে বা সংস্কৃত নাটকে উল্লিখিত নাই। বরপণ-প্রথা কোনোরূপে প্রচলিত থাকিলে কন্যা-শুল্কের মতো স্মার্তগণ তাহার নিন্দা করিতেন। এইরূপ নিন্দার কোনো নিদর্শন নাই। স্মৃতি বলেন, উপযুক্ত অলঙ্কারাদি প্রদান করিয়া কন্যার বিবাহ দিতে হয়; কিন্তু সেই অলঙ্কারের মূল্য কখনই কন্যার পিতার আয়ত্তের বাহিরে যাইবে না। বিবাহের পূর্বে এইরূপ চুক্তির বিষয় স্মার্তগণ চিন্তা করেন নাই; বা এইরূপ দৃষ্টান্ত তাঁহাদের গোচরে আসে নাই। বিবাহে কন্যা 'দান' করা হয়—এই অর্থে পণ-প্রথার উদ্ভব হইয়াছে। ধর্মানুষ্ঠানে দান নগদে বা স্বর্ণে প্রদান করা হইত। সেই সূত্রে কন্যাদানের ক্ষেত্রেও নগদ বা অলঙ্কার 'দান' করার প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। আমাদের আলোচ্য চিঠিপত্রে[১] দেখিতেছি, এই দান উনবিংশ শতক পর্যন্ত নগণ্য ছিল এবং বিবাহ-সম্পর্ক-স্থাপনে কৃষিপ্রধান সমাজে, ইহা প্রবল বাধার সৃষ্টি করে নাই। বরপণ-প্রথা কন্যাপণের প্রতিক্রিয়াজাত এক অভিনব সামাজিক দুর্নীতি। হিন্দুসমাজ ও সংস্কৃতির পরম্পরায় কন্যাপণ অপেক্ষা বরপণ অধিকতর দূষণীয়।

ঞ. পর্দা-প্রথা ঃ পর্দাপ্রথা[২] মুসলমান-সমাজে এবং ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশের

---

১ চি. প. স ২, প-সং ১৮ ২ Kane, pp. 596-98

হিন্দুসমাজে বর্তমানে যেভাবে প্রচলিত আছে, প্রাচীনভারতে সেরূপ ছিল কি না, তাহা প্রশ্নের বিষয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ৮৫, ৩৩ বিবাহ-অনুষ্ঠানে উচ্চারিত সূক্তে জনসাধারণকে একত্র হইয়া বধূকে নিরীক্ষণ করিয়া সৌভাগ্যের আশীর্বাদ করিয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য আহ্বান জানানো হইয়াছে। আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র বলেন, বর বধূকে লইয়া যখন স্বগ্রামে ফিরিবে তখন প্রতি বিশ্রামভূমে সে ঐ 'সুমঙ্গলীরিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত' মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে দর্শকদের দিকে দেখিবে। ইহাতে প্রমাণ হয়, সেকালে বধূর অবগুণ্ঠন ছিল না। এবং নববধূ প্রকাশ্যে বাহির হইত। ঋগ্বেদের বিবাহসূক্তে বধূকে শ্বশুর শাশুড়ী, ভাশুর, দেবর, যা, ননদের উপর আধিপত্য করিবার আশীর্বাদ করা হইলেও তাহা অন্তরের বাসনা মাত্র; প্রকৃত ঘটনা ঘটিত অন্যরূপ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেন, পুত্রবধূ শ্বশুরের নিকট লজ্জা পায় এবং তাঁহার নিকট হইতে বধূ আত্মগোপন করিয়া চলিয়া যায়। ইহাতে বোঝা যায়, অল্পবয়স্কা বধূদের বয়স্কদের নিকট আচার-আচরণে কিছু বাধা-নিষেধ ছিল। কিন্তু গৃহ্যসূত্রে ও ধর্মসূত্রে প্রকাশ্য গমনাগমনের সময় স্ত্রীলোকদের অবগুণ্ঠনের কোন উল্লেখ নাই। পাণিনি 'অসূর্যম্পশ্যা' শব্দটি বলিয়াছেন রাণীদের সম্পর্কে। ইহাতে বোঝা যায় যে, রাজ-অন্তঃপুরিকাগণ প্রাসাদের বাহিরে জনসমক্ষে আসিতেন না। অযোধ্যাকাণ্ড বলেন, আকাশের ভূতগণও যাঁহাকে দেখেন নাই, সেই সীতাকে আজ রাজ-মার্গগত লোকে দেখিবে। অন্যত্র আছে,—ব্যসনে, কৃচ্ছ্রে, যুদ্ধে, স্বয়ংবরে, যজ্ঞস্থলে এবং বিবাহবাসরে স্ত্রীলোকের উপস্থিতি দোষাবহ নহে। সভাপর্বে দ্রৌপদী বলিয়াছেন,—শুনিয়াছি পূর্বে লোকেরা ধর্মপত্নীগণকে সাধারণ সভায় লইয়া যাইতেন না, সেই পুরাতন পরম্পরা কৌরবগণ ভঙ্গ করিতেছেন। তিনি বলিয়াছেন, স্বয়ংবর-সভায় রাজগণ তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন; অতঃপর যুধিষ্ঠির পাশাখেলায় সর্বস্ব হারাইলে তাঁহাকে পুনরায় সভাগৃহে সকলে দেখিল। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, স্ত্রীলোকগণ, বিশেষতঃ উচ্চকুলের মহিলাগণ বিশেষ কারণ ব্যতীত সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইতেন না। এবং হইলেও তাঁহারা সব সময় ঘোমটা দিতেন না। শল্যপর্বে আছে, কৌরবগণ নিহত হইয়াছেন বলিয়া অসূর্যম্পশ্যা কৌরব-রমণীগণকে সাধারণ লোকে দেখিল। সভাপর্বে, শল্যপর্বে, স্ত্রীপর্বে, আশ্রম-বাসী-পর্বে অনুরূপ বিবরণ আছে। হর্ষচরিতে রাজকন্যা রাজ্যশ্রীকে বিবাহের পূর্বে ভাবী বর গ্রহবর্মা দেখিতে আসার বর্ণনায় দেখা যায়, তাঁহার মুখ অরুণাংশুকের অবগুণ্ঠনে আবৃত ছিল। অন্যত্র, স্থানীশ্বরদেশের বর্ণনায় বাণের উক্তিতে আছে, উচ্চকুলের স্ত্রীলোকগণ অবগুণ্ঠন ব্যবহার করিতেন। কাদম্বরীতেও বাণের বর্ণনায় দেখা যায়, পত্রলেখা লাল শাড়ীর অবগুণ্ঠনে তাঁহার মুখ ঢাকিয়াছেন। শকুন্তলাকে যখন দুষ্মন্তের সভায় লইয়া যাওয়া হয় তখন তাঁহার মুখে ঘোমটা ছিল। সুতরাং ইহাতে অনুমান করা যায়, উচ্চকুলের রমণীগণ অবগুণ্ঠন ব্যতীত

সাধারণ্যে উপস্থিত হইতেন না; কিন্তু সাধারণ স্ত্রীলোকগণ ঘোমটা টানিতেন না। সম্ভবতঃ মুসলমানদের আগমনের পর হিন্দুসমাজে ইহা বিশেষভাবে প্রচলিত হয়; তৎপূর্বে ইহা এদেশে অজ্ঞাত না-থাকিলেও, উত্তরপূর্বভারতের স্ত্রীলোকগণের নিকট সাধারণ প্রথা হইয়া দাঁড়ায় নাই। Indian Antiquary গ্রন্থে[১] নবম শতকের বাচস্পতির সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী-গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি আছে। তাহাতে দেখা যায়, সৎকুলের মহিলাগণ অবগুণ্ঠন ব্যতীত জনসমাজে উপস্থিত হইতেন না। বৌদ্ধগ্রন্থেও পর্দা-প্রথার উল্লেখ আছে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত একখানি 'ছাড় ফারখতি পত্রে' আমরা দেখিতেছি,[২]—লক্ষ্মী বেওয়া রামলোচন রায়ের সহিত 'আসনাই করিয়া' ঘর-গৃহস্থালী ত্যাগ করিয়া যখন রায়মহাশয়ের সহিত বসবাস করিতেছিল তখন রায়মহাশয় লক্ষ্মী বেওয়াকে 'পরদাপোসে' রাখিয়াছিলেন।

ট. সহমরণ ঃ ইংরাজী গ্রন্থে ও নথিপত্রে 'Suttee' বা 'সতী'।[৩] ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের পরে অর্থাৎ বৃটিশ-ভারতে সতীদাহ-প্রথা-নিষেধ আইন প্রবর্তিত হয়। তাহার পর হইতে গবেষণার বিষয় হওয়ায়, এই প্রসঙ্গের আলোচনা চলিতেছে। লর্ড উইলিয়াম্ বেন্টিঙ্কের Sec. 1. of the Regulation XVII of 1829 এই নামে এই আইন পরিচিত। Mr. Edward Thomson-এর ১৯২৮ সালে লিখিত 'Suttee'-গ্রন্থে সুপ্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় এই প্রথা রহিত হওয়া পর্যন্ত ঘটনাবলীর সবিশেষ বিবরণ দেওয়া আছে। ভারতবর্ষের বাহিরে ইউরোপখণ্ডেও সহমরণ-প্রথার বহুলপ্রচলন ছিল। বিধবাগণকে পোড়াইয়া মারা কেবল ব্রাহ্মণ্য-ধর্মেরই বৈশিষ্ট্য নহে; ইহার মূল মানব-সমাজের প্রাচীনতম ধর্ম-বিশ্বাস ও সংস্কার-সমূহের মধ্যে নিহিত। বিধবাদের পোড়াইয়া মারার কথা প্রাচীন গ্রীক্, জার্মান, শ্লাভ এবং অন্য প্রাগৈতিহাসিক জাতির মধ্যেও ছিল। কিন্তু ইহা সেকালে কেবল রাজ-অন্তঃপুর ও বিশিষ্ট পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বৈদিকসাহিত্যে সতীদাহের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না; কোনো মন্ত্রেও ইহার উল্লেখ নাই; কোনো প্রাচীন গৃহ্যসূত্রেও এই বিষয়ে কোনো নির্দেশ নাই। ইহাতে মনে হয়, সতীদাহ-প্রথা খৃষ্টজন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্বে ব্রাহ্মণ্য-ভারতে প্রচলিত হয়। ইহা দেশজ বা কোনো অন্-আর্য প্রথার অনুকরণ, অথবা কোনো অভারতীয় জাতির নিকট হইতে আসিয়াছে কি না, বলা মুশকিল। বিষ্ণু-ধর্মসূত্র ব্যতীত কোনো ধর্মসূত্রে 'সতী'-প্রথার উল্লেখ নাই। মনু-স্মৃতি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। আলেকজাণ্ডারের সময় গ্রীকগণ পাঞ্জাবে কঠৈইদের মধ্যে সতীদাহ-প্রথা দেখিয়াছিলেন; এবং সেকালে স্ত্রীরা তাহাদের স্বামীদের ত্যাগ করিবে, অথবা বিষ খাওয়াইবে—এই সন্দেহ-বাতিক হইতে এই প্রথার উদ্ভব হয়।

১ For 1933 p. 15 ২ চি-স ২, প-সং ৪৪২ ৩ Kane, pp. 624-636

বিষ্ণুধর্মসূত্র বলেন, স্বামীর মৃত্যুতে বিধবা ব্রহ্মচর্য করিবে; অথবা, সহমরণে যাইবে। মহাভারতে যুদ্ধ-পরাজয়ের প্রভূত বর্ণনা থাকিলেও সহমরণের তেমন দৃষ্টান্ত নাই। মাদ্রী পাণ্ডুর মৃত্যুর পর সহমরণে গিয়াছিলেন। বিরাটপর্বে, সৈরিন্ধ্রীকে কীচকের সহিত পোড়াইয়া মারার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। ইহা পুরাকালের ক্রীতদাসগণকে মৃত রাজার সঙ্গে পোড়াইয়া মারা-প্রথার অনুরূপ। মৌসলপর্বে দেখা যায়, বসুদেবের চারি পত্নী—দেবকী, ভদ্রা, রোহিণী ও মদিরা সহমরণে গিয়াছিলেন; এবং কৃষ্ণের প্রিয়তমাদের মধ্যে রুক্মিণী, গান্ধারী, শৈব্যা, হৈমবতী, জাম্ববতী সহমৃতা হন; এবং সত্যভামার মতো অন্য মহিষীগণ তপশ্চর্যার জন্য অরণ্যগমন করেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে, কৃষ্ণের রুক্মিণী প্রভৃতি আটজন মহিষী কৃষ্ণের তিরোধানে সহমরণে গিয়াছিলেন। শান্তিপর্বে আছে, একটী কপোতী তাহার কপোত-স্বামীর মৃত্যুতে সহমৃতা হইয়াছিল। স্ত্রী-পর্বের বর্ণনায়, নিহত কৌরবগণের শেষকৃত্যের বিবরণে দেখা যায়, বীরগণের ব্যবহৃত রথ, পরিচ্ছদ অস্ত্রশস্ত্রাদি চিতায় নিক্ষেপ করা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের বিধবাগণের সহমরণের উল্লেখ নাই। ইহাতে প্রমাণ হয়, সতীদাহ-প্রথা ভারতবর্ষে মূলতঃ রাজবংশে ও বীর যোদ্ধাদের পরিবারেই প্রচলিত ছিল; এবং এইরূপ সমাজেও ইহার ব্যাপক প্রচলন হয় নাই। পৈঠীনসী, অঙ্গিরস, ব্যাঘ্রপাদ হইতে অপরার্কের উদ্ধৃতিসমূহে ব্রাহ্মণ-বিধবাগণের সহমরণে যাওয়ার বিশেষ নিষেধ আছে। পরবর্তী নিবন্ধকগণ এই সকল শ্লোকের ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, ব্রাহ্মণ-বিধবাগণের স্বামীর চিতাভিন্ন অন্য চিতায় সহমরণ নিষেধ; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-বিধবা তাঁহার স্বামীর চিতায় সহমরণে যাইতে পারেন; এবং স্বামী বিদেশে মারা গেলে তাঁহার বিধবা পরে সেই সংবাদ শুনিয়া সহমরণে যাইতে পারেন না। তাঁহারা উশনসের বচন প্রমাণ ধরিয়া বলেন, ব্রাহ্মণ-বিধবা স্বতন্ত্র চিতায় স্বামীর সহমরণে যাইবে না। বেদব্যাস-স্মৃতি বলেন, ব্রাহ্মণী তাঁহার স্বামীর মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিপ্রবেশ করিবে; স্বামীর মৃত্যুর পর পত্নী জীবিত থাকিলে সে তাহার চুল বাঁধিবে না; এবং তপশ্চর্যার দ্বারা তাহার দেহ রক্ষা করিবে। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে ব্রাহ্মণ-স্ত্রীর স্বশরীর-দহনের একটি দৃষ্টান্ত আছে। কোনও ব্রহ্মর্ষির স্ত্রী এবং বেদবতীর মাতাকে রাবণ অপমান করিলে তিনি অগ্নিপ্রবেশ করেন। মহাভারতের স্ত্রী-পর্বে কৌরবগণের ব্রাহ্মণ-সেনাপতি দ্রোণের পত্নী কৃপী তাঁহার স্বামী নিহত হইলে, আলুলায়িতকেশে রণক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন; কিন্তু কৃপী সহমরণে গিয়াছিলেন কিনা, তাহার উল্লেখ নাই। ইহাতে অনুমান হয়, ক্ষত্রিয়-বিধবাদের সহমরণের অনেক পরে, ব্রাহ্মণ-বিধবাদের সহমরণ-প্রথা প্রচলিত হয়।

স্বামীর চিতায় বিধবাকে দাহ করার নাম—সহমরণ বা সহগমন বা অন্বারোহণ। অন্বারোহণ অর্থে স্বামীর সহিত একই চিতায় পুড়িয়া মরা। বিদেশে স্বামীর মৃত্যু শুনিয়া বিধবার

স্বামীর চিতাভস্ম বা তাহার পাদুকা ধারণ করিয়া, বা কেবলমাত্র স্বামী-স্মরণ করিয়া চিতারোহণের নাম অনুমরণ।—অপরার্ক ও মদনপারিজাতের এই অভিমত। কুমারসম্ভবে কালিদাস দেখাইয়াছেন, হরকোপে মদনভস্ম হওয়ার পর, রতি সহমরণে গমনোদ্যতা হইয়াছিলেন; কিন্তু, আকাশবাণী শুনিয়া তিনি নিরস্ত হন। গাথাসপ্তশতীতে একটি স্ত্রীলোকের অনুমরণ-গমন-প্রস্তুতির উল্লেখ আছে। কামসূত্রও অনুমরণের কথা বলেন। বরাহমিহির স্বামীর সহিত স্ত্রীর পুড়িয়া মরার সাহসের প্রশংসা করিয়াছেন। হর্ষচরিতে দেখা যায়, রাজা প্রভাকরবর্ধনের প্রধানা মহিষী ও হর্ষের মাতা যশোমতী রাজার মৃত্যুকালে সহমরণোদ্যতা হইয়াছিলেন। কিন্তু 'সতী' সম্পর্কে এই উদাহরণটি প্রমাণসহ নহে। কারণ, কোনো স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে সহমৃতা হইতে পারেন না। হর্ষচরিতে একস্থানে রাত্রির বর্ণনা প্রসঙ্গে, কুমুদলক্ষ্মীর গৌরবের কথায় কবি বলিয়াছেন,— ইহা অমলদন্তা, পত্রপ্রসাধিতকর্ণিকা, কেসরমালার মুণ্ডমালিকাধারিণী, প্রহসিতমুখী, অনুমরণোদ্যতা সহধর্মিনীর অনুরূপ। কাদম্বরীতে বাণ জোরালো যুক্তিপূর্ণ ভাষায় অনুমরণের নিন্দা করিয়াছেন। ভাগবতপুরাণ বলেন, ধৃতরাষ্ট্রের মৃত্যুতে গান্ধারী সহমরণে গিয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণী 'সতী'-র কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

বহু প্রত্নলেখেও সতী-প্রথার উল্লেখ আছে। প্রাচীনতম উল্লেখ পাইতেছি, গুপ্তযুগের (খৃ. ৫১০) গোপরাজের মরণোত্তর প্রস্তরস্তম্ভ-শাসনে। যুদ্ধক্ষেত্রে গোপরাজের মৃত্যু হইলে তাঁহার মহিষী তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। ৭০৫ খৃষ্টাব্দের নেপাল-লেখে ধর্মদেবের বিধবা রাজ্যবতী স্বামীর সহিত সহমরণে যাইবেন বলিয়া তাঁহার পুত্র মহাদেবকে রাজ্যশাসন-ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রদেব চোলের সময়ে ৯৮৯ শকাব্দের বেলাতুরু-লেখে আছে, জনৈক শূদ্রা-স্ত্রী দেকব্বে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া, তাঁহার পিতা-মাতার বিশেষ আপত্তি সত্বেও 'সতী' হইয়াছিলেন। J. B. O. R. S. পত্রিকায়[১] 'Satī memorial stones' নামক একটি প্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে, সতী-স্তম্ভে সাধারণতঃ ঊর্ধ্ববাহু, এবং উভয়পার্শ্বে চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্ররাজি অঙ্কিত থাকিত। ঐতিহাসিক সতীদের মধ্যে ১২৭২ খৃষ্টাব্দে পেশোয়ার মাধব রাও-এর স্ত্রী রমাবাই-এর দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। মুসলমান-বিজেতাদের নির্যাতন হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত চিতোরের রাজপুত মহিলাদের জহরব্রতের অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

'সতী' না-হইয়াও সতীদাহের অনুরূপ দৃষ্টান্ত আছে। প্রভুর প্রতি অনুরক্তিবশতঃ কোনো কোনো ভৃত্য প্রভুর চিতায় আত্মদহন করিত। সতীস্তম্ভের দুই রকম নাম[২] আছে—

১ Vol. 23, p. 435 ff ২ I. A., Vol. 35, p. 129

'মাস্তিকল' অর্থাৎ মহাসতীর স্তম্ভ এবং 'বীরকল' অর্থাৎ সাহসী বা প্রভুভক্ত মানুষের স্মৃতি-স্তম্ভ। হর্ষচরিতে দেখা যায়, প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর, রাজার অন্তরঙ্গ, অমাত্য, ভৃত্য এবং অনুগৃহীতগণ আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণীতে রাজা অনন্তের রাণী 'সতী' হইলে, অন্য অনেকে এবং তাঁহার তিনজন দাসী সহমরণে যায়। এই গ্রন্থেই পুত্রের মৃত্যুতে মাতার সহমরণে যাওয়ার প্রসঙ্গ আছে। প্রয়াগের ত্রিবেণী-সঙ্গমের পুণ্যতীর্থে স্বর্গ ও মহাসুখ লাভের আশায় আত্মহত্যার দৃষ্টান্ত অনেক। জীবনকে তুচ্ছ করিয়া পতি ও প্রভুর উদ্দেশ্যে আত্মদহন আধুনিককালে শিক্ষিতজনগণের নিকট ভয়ঙ্কর মনে হইলেও পুরাকালে ইহা যেন অতি সহজভাবেই অনুষ্ঠিত হইত। ঐতিহাসিকযুগে পুরোহিতগণ অথবা জ্ঞাতিগণ অনিচ্ছুক স্ত্রীলোককে জোর করিয়া 'সতী' করে নাই। পুরুষ জবরদস্তি করিয়া সতী-প্রথা স্ত্রীলোকের ঘাড়ে চাপাইয়াছে, এই অভিযোগ যথার্থ নহে। সাধারণ-লোক-বিশ্বাসে বা ধর্ম-বিশ্বাসে এই প্রথার উদ্ভব। প্রথমতঃ, ইহা রাজবাড়ীতে[১] ও বিশিষ্ট সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ পরাজিত রাজার অন্তঃপুরিকাগণকে বিজয়িগণের হাতে নির্যাতিত হইতে হইত। মনু বিজিত ব্যক্তির স্ত্রীগণকে দাসীরূপে রাখিবার বিধান দিয়াছেন। রাজন্যবর্গের আচরণ অনুকরণ করিয়া এই প্রথা ব্রাহ্মণ্য-সমাজে বিস্তারলাভ করে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, কয়েকজন স্মৃতিকার ব্রাহ্মণ-স্ত্রীগণের সহমরণের বিধান দেন নাই। সমাজে ইহা প্রচলিত হইবার পরে, পণ্ডিত টীকাকারগণের ও নিবন্ধকগণের ব্যাখ্যায় সহমরণ হিন্দু-স্ত্রীকে ভবিষ্যৎস্বর্গের স্বপ্ন দেখাইয়াছে। মনু এই বিষয়ে পিতৃপিতামহদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে আদেশ দিয়াছেন।

'সতী' হওয়ার পুণ্য এই: শঙ্খ ও অঙ্গিরস বলেন, স্বামীর সহমৃতা হইলে, মানুষের শরীরে যতগুলি রোম আছে, অর্থাৎ সাড়ে তিন কোটি বৎসর স্বর্গবাস হইবে। সাপুড়ে যেমন গর্ত হইতে জোর করিয়া সাপ বাহির করে তেমনি সহমৃতার স্বামী যেমনই হউক-না-কেন তাহাকে উদ্ধার করিয়া 'সতী' তাহার সহিত আনন্দ উপভোগ করিবে, চতুর্দশ ইন্দ্রের সমকাল স্বামীর সহিত স্বর্গভোগ করিবে, স্বামীর ব্রহ্মহত্যার পাতক বিদূরিত করিবে, অরুন্ধতীর সমান হইয়া স্বর্গলোকের প্রশংসা পাইবে, স্ত্রীজন্ম হইতে উদ্ধার পাইবে, ইত্যাদি। হারীত বলেন, স্বামীর অনুমৃতা হইলে মাতৃ-পিতৃ ও শ্বশুর-কুল উদ্ধার হয়। মিতাক্ষরা আরও বলেন, অগ্ন্যারোহণ ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত সকল জাতির স্ত্রীলোকের সাধারণ ধর্ম। তবে স্বামীর মৃত্যুর সময়ে স্ত্রী গর্ভবতী থাকিলে, বা সন্তান শিশু থাকিলে এই বিধান অচল।

প্রাচীন টীকাকারগণের অনেকে এই প্রথার বিরোধিতা করেন। মেধাতিথি মনুর ব্যাখ্যায় বলেন, ইহা 'শ্যেনযাগ' অর্থাৎ শত্রু-নিধনের উদ্দেশ্যে মারণ-ক্রিয়ামাত্র। তিনি বলেন, অঙ্গিরস অনুমরণের বিধান দিলেও স্বরূপতঃ ইহা আত্মহত্যা; এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে

১ ম. ব-ম্র্য, পৃ ৫-৮

সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বেদ বলিয়াছেন, 'শ্যেনেনাভিচরণ যষেৎ'; কিন্তু তবুও, 'শ্যেনযাগ' ধর্ম বলিয়া গণ্য হয় না। বরং, ইহা জৈমিনির শাবরভাষ্যমতে অধর্ম; সুতরাং অঙ্গিরস ইহার বিধান দিলেও, ইহা প্রকৃতপক্ষে অধর্ম। যে-স্ত্রীলোক স্বর্গলাভের জন্য ব্যস্ত, সে অঙ্গিরসের মতে আচরণ করিতে পারে; কিন্তু, তাহার সেই কাজ অশাস্ত্রীয়; অন্বারোহণ আদৌ বেদসম্মত নহে। কারণ, বেদে স্পষ্টই বলা আছে, জীবনের বিধি-নির্দিষ্ট পরিধি পরিক্রমা না-করিয়া কেহ পৃথিবী ছাড়িয়া যাইবে না। যাজ্ঞবল্ক্যের টীকায় মিতাক্ষরা এই সকল যুক্তি খণ্ডন করিয়া বলেন, শ্যেনযাগ অবাঞ্ছিত, সুতরাং অধর্ম; কারণ, ইহা অপরের ক্ষতি করে। পক্ষান্তরে, 'অনুগমন' এইরূপ নহে; ইহাতে বাঞ্ছিত স্বর্গদ্বার অবারিত। শ্রুতিরও অনুরূপ অনুকূল বচন: ঐশ্বর্য কামনা করিলে বায়ু-দেবতায় নিকট শ্বেতছাগ বলি দিবে। 'অনুগমন' বিষয়ে স্মৃতি শ্রুতির বিরুদ্ধ নয়; স্বতন্ত্র অর্থবহ মাত্র। শ্রুতি বলেন, ব্রহ্মজ্ঞানের চেয়ে স্বর্গসুখ তুচ্ছ। সুতরাং, স্বর্গলাভের আশায় কেহ জীবন অপচয় করিবে না। এ-ক্ষেত্রে স্ত্রীলোক যেহেতু মাত্র স্বর্গসুখ চাহে, সুতরাং, সে শ্রুতিবচনের বিরুদ্ধে কাজ করে না। যাহাই হউক, মিতাক্ষরার এই সকল যুক্তি পক্ষপাতিত্বদুষ্ট। অপরার্ক, মদন-পারিজাত, পরাশর মাধবীয় মিতাক্ষরের যুক্তি অনুসরণ করিয়া স্বপক্ষে আরো জোরালো যুক্তি দেখাইয়াছেন। স্মৃতিচন্দ্রিকা বলেন, বিষ্ণুধর্মসূত্র ও অঙ্গিরস অন্বারোহণের বিধান দিলেও ইহা ব্রহ্মচর্যের অপেক্ষা হীন, কারণ অন্বারোহণের ফল ব্রহ্মচর্যের ফল অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। এই যুক্তির বিরুদ্ধে অঙ্গিরস শেষকথা বলিয়াছেন,—স্বামীর মৃত্যুর পরে, প্রত্যেক স্ত্রীর সহমরণ ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো কর্তব্য নাই। শুদ্ধিতত্ত্ব বলেন, সহমরণের প্রশস্তিহেতু এইরূপ চরম সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ-বিধবাগণ অন্বারোহণ করিতে পারিতেন; কিন্তু অনুমরণ নিষিদ্ধ। স্মৃতিশাস্ত্রে সকল বিধবার পক্ষে আরো কিছু নিষেধ আছে— বিধবাগণের সন্তান শিশু থাকিলে, বিধবা স্বয়ং গর্ভবতী থাকিলে, অজাতরজস্কা হইলে, রজস্বলা হইলে সহমরণ নিষিদ্ধ,— বৃহন্নারদীয় পুরাণের এই মত। বৃহস্পতি অনুরূপ কথা বলিয়াছেন—বিধবা রজস্বলা থাকিলে, চতুর্থ দিনে স্নান করার পর সহমরণে যাইবে।

আপস্তম্ব বলেন, যদি কোনো বিধবা সহমরণে যাইবে বলিয়া স্থির করিয়া, শেষমুহূর্তে মত পরিবর্তন করে, তাহার জন্য বিধেয় 'প্রাজাপত্য' তপ। রাজতরঙ্গিণীতে এক রাণীর কাহিনী আছে। তিনি 'সতী' হইবেন বলিয়া মনস্থ করিয়া, শেষে অনুশোচনা করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

শুদ্ধিতত্ত্বে সতীদাহের প্রক্রিয়া বিবৃত হইয়াছে: সদ্য-বিধবা প্রথমে স্নান করিয়া, দুইখানি সাদা কাপড় পরিবে। হাতে কুশ লইয়া পূর্ব কিংবা উত্তর দিকে মুখ করিয়া আচমন করিবে,

ব্রাহ্মণ 'ওঁ, তৎসৎ' মন্ত্র পড়িবেন, বিধবা 'নারায়ণ'-স্মরণ করিবে। মাস, পক্ষ, তিথি উল্লেখ করিবে; অতঃপর সংকল্প করিবে। সূর্যচন্দ্রাদি অষ্টলোকপালকে তাহার সহমরণের সাক্ষী হইবার জন্য স্মরণ করিবে। ইহার পর তিনবার চিতা-প্রদক্ষিণ করিবে। পরে ব্রাহ্মণ বৈদিক মন্ত্র 'ইমা নারীর্' ইত্যাদি এবং পুরাণের শ্লোক উচ্চারণ করিবেন; বিধবা 'নমো নমঃ' বলিতে বলিতে চিতায় উঠিবে। 'অরুন্ধতী…পতিপুতত্বকামা' সংকল্প-বচনের এই মন্ত্রটি অঙ্গিরসের শ্লোকের উপর লিখিত। শুদ্ধিতত্ত্বে যাহা ছাপা হইয়াছে তাহা ভুল। ইহাতে মনে হয়, 'আরোহন্তু জলয়োনিম্-অগ্নে' এই বৈদিক সূক্তের অর্থ,—আগুন তাহাদের নিকট জলের মতো শীতল হউক; অথবা মৌলিক অর্থ, হে অগ্নি, তাহারা জলাসনে বা জল-উৎসে আরোহণ করুক। কোনো কোনো লেখক কোনও ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে বা রঘুনন্দনকে বৈদিক মন্ত্রের এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী করিয়াছেন—'অগ্রে'র স্থলে 'অগ্নে' বা 'অগ্নেঃ' বসাইবার জন্য। কিন্তু ইহা ঠিক্ নহে। কারণ, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৮.৭ সূক্তটী রঘুনন্দনের বহুশতাব্দী পূর্ব হইতে প্রচলিত আছে। রঘুনন্দন যে ব্রহ্ম-পুরাণ ও অপরার্কের অনুসরণ করিয়াছেন তাঁহারা একই অর্থে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে পাঠ-বদল অনাবশ্যক। উপরন্তু, কোন পুরোহিত বা রঘুনন্দন ইহা বদল করিলে, কোনো সময়ে ইহা ধরা পড়িত। কারণ, সেকালে ঋগ্বেদের শ্লোকের প্রত্যেকটি অক্ষর হাজার হাজার লোকের কণ্ঠস্থ থাকিত। ফলে, স্বীকার করিতে হয়, হয় পুঁথির ভুল, কিংবা, রঘুনন্দন অজান্তে ভুল করিয়াছেন। ঐ মন্ত্রটী বিধবাদের উদ্দেশ্যে লিখিত নহে; মৃতের বাড়ীর সধবাদের উদ্দেশ্যে লেখা; আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র মন্ত্রটীকে সেই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। রঘুনন্দন ধর্মশাস্ত্র এবং স্মৃতির গভীর পণ্ডিত—'স্মার্ত ভট্টাচার্য'; তাঁহার পক্ষে আশ্বলায়নের উক্তি অজানা থাকিবার কথা নহে। নির্ণয়সিন্ধুকার কমলাকরভট্টের মাতা স্বয়ং 'সতী' হইয়াছিলেন; তাঁহার গ্রন্থে, মাতার স্মৃতির প্রতি তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থেও তিনি স্বতন্ত্র কথা বলিয়াছেন; এবং ধর্মসিন্ধু-গ্রন্থে তাঁহাকেই অনুসরণ করা হইয়াছে।

বিভিন্ন পর্যটকদের বিবরণে দেখা যায়, সতীদাহ-প্রথা নিবারণের পূর্বে, ভারতবর্ষে বাঙ্গালাদেশেই ইহার সর্বাধিক প্রচলন ছিল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৮ পর্যন্ত তেতাল্লিশ বৎসরে ইহার অসংখ্য বিবরণ পাওয়া যায়। Thomson-এর 'Suttee'-গ্রন্থে ১৮১৫-১৮২৮ সালের মধ্যে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীতে (তখন ইহা বিহার ও বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল) 'সতী'র সংখ্যা দেওয়া আছে। ১৮১৫ সালে সবচেয়ে কম; মাত্র ৩৭৮ জন; এবং ১৮১৮ সালে সবচেয়ে বেশী, ৮৩৯ জন। ১৮১৫ হইতে ১৮১৮ এই চার বৎসরে মোট ২৩৬৬টি ঘটনার মধ্যে কলিকাতা বিভাগেই ১৪৮৫; কিন্তু ব্রাহ্মণ্য-পীঠ বারাণসীতে মাত্র ৩৪৩ জন। H. H. Wilson-এর History of India (1858)-গ্রন্থের ১৮৯ পৃষ্ঠার ছক (১৮১৫-১৮২৮) হইতে দেখা

যায়, ১৮২৮ সালে ৪৬৩জন 'সতী'র মধ্যে বাঙ্গালা, বিহার, ওড়িষ্যায় ছিল ৪২০জন; এবং ইহার মধ্যে একমাত্র কলিকাতা-বিভাগেরই ২৮৭ জন। মনে হয়, এই প্রথা বাঙ্গালাদেশে সর্বাধিক প্রচলিত ছিল বিশেষ কারণে। বাঙ্গালাদেশ ছাড়া সমগ্র ভারতে বিধবাগণ একান্নবর্তী হিন্দু-পরিবারের একজন মাত্র; এবং তাহারা কেবল খোরপোষ পায়; এতদ্ব্যতীত পরিবারের অন্য কোনো সম্পত্তিতে বিধবার অধিকার বর্তায় না। বাঙ্গালাদেশে দায়ভাগের প্রচলন হেতু,-নিঃসন্তানের বিধবাও একান্নবর্তী হিন্দুপরিবারে তাহার মৃতস্বামীর অনুরূপ সম্পত্তির অধিকারী হয়। এইরূপ বিধবাকে তাহার একান্ত শোকের সময়, তাহার স্বামীভক্তি উদ্দীপ্ত করিয়া, সহমরণে প্ররোচিতকরতঃ তাহার নিকট হইতে গৃহস্থ অব্যাহতি পাইবার উপায় খুঁজিত। বিধবাদের এই উত্তরাধিকার-স্বত্বের বিধান জীমূতবাহন প্রথম প্রচলন করেন নাই। তিনি পরিষ্কার বলিয়াছেন, তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী জিতেন্দ্রিয়কে অনুসরণ করিয়াছেন। আমাদের আলোচনার সমর্থনে আরো দেখানো যায়, বারাণসীধামে যেখানে বিধবার জীবনের মূল্য নগণ্য, সেখানেও সহমৃতা 'সতী'র সংখ্যা অতি তুচ্ছ। সাধারণ গৃহস্থের বিধবাগণ কখনও সহমৃতা হইত বলিয়া বিশ্বাস হয় না। মনে হয়, যাহারা 'সতী' হইয়াছিল, তাহাদিগকে হইতে বাধ্য করা হইয়াছিল। অসংখ্য প্রত্নলৈখিক প্রমাণে দেখা যায়, ভারতের অন্যত্র আত্মীয়-স্বজনগণ বিধবাকে সহমৃতা হইতে নিরস্ত করিতেন। বাঙ্গালা-দেশেও সহমৃতার সংখ্যাও তেমন বেশী নহে। সংস্কৃতসাহিত্যে বিশিষ্ট পণ্ডিত Colebrooke তাঁহার জীবনের বেশীর ভাগ সময় বাঙ্গালাদেশে কাটাইয়াছিলেন; তিনি ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের দিকে এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—এই কুসংস্কারের স্বেচ্ছাবলির সংখ্যা নগণ্য। তাঁহার সময়ে সতীদাহ-প্রথা বাঙ্গালাদেশে খুবই কমিয়া আসিয়াছিল। বেণ্টিংকের সতীদাহ-প্রথা-নিরোধ আইন প্রবর্তনের পর, রাজা রাধাকান্ত দেবের সমর্থনে, ইহার বিরুদ্ধে Privy Council-এ একটি মাত্র আবেদন ছাড়া, সমাজের দিক্ হইতে মৌখিক বা অন্য কোনোরূপ আপত্তি উঠে নাই। ইহাতে প্রমাণ হয়, সতীদাহ সেকালে কচিৎ হইত; এবং লোকে এই বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিল না; উপরন্তু, প্রধান ধর্ম-সংস্কাররূপে ইহা সমাজ-মনে কখনও বদ্ধমূল হয় নাই।

বর্তমান ভারতে সতীদাহ-প্রথা কেহই অনুমোদন করেন না। বরং, স্থির ও অকম্প্র-সাহসী 'সতী'দের জন্য কেহ সশ্রদ্ধ গৌরববোধ করিলে তিনি ধিক্কৃত হন। অথবা, সতীত্ব-রক্ষার আদর্শে সেকালের স্ত্রীলোকদের জৌহরব্রত-অনুষ্ঠানের সাহসেরও আজ আর কেহ প্রশংসা করে না। ইংরাজ যদি তাহার পূর্বপুরুষদের একচতুর্থাংশ পৃথিবী আত্মসাৎ করার জন্য গৌরববোধ করিতে পারে, ফরাসীরা যদি সমগ্র য়ুরোপ দাসত্বে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সম্রাট্ নেপোলীয়নের জন্য গৌরববোধ করিতে পারে, এবং আদৌ তাহা অগৌরবের

ব্যাপার না-হয়, তাহা হইলে, ভারতীয়গণ তাহাদের সহমৃতা 'সতী'দের সম্পর্কে গৌরববোধ করিলে এমন কিছু অন্যায় হয় না। সতীদাহ-প্রথা ভয়ঙ্কর ব্যাপার মনে হইলেও অতীত ভারত-ললনাগণের স্বেচ্ছায় আদর্শের উদ্দেশ্যে আত্মাহুতি অবশ্যই প্রশংসনীয়।

আমাদের আলোচ্য চিঠিপত্রের মধ্যে[১] বিবাহের একখানি আমন্ত্রণ-পত্রের সঙ্গে একটি পুস্তক-তালিকা আছে। তাহাতে অন্য পুস্তকের মধ্যে 'সহমরণ' ও 'কালীপূজার' পুঁথির উল্লেখ রহিয়াছে। আমার মনে হয়,[২] বাঙ্গালী-সমাজে তখন সহমরণ-প্রথা দেবায়িত হইয়া লোক-বিশ্বাসে মৃত্যুরূপা দেবী কালীর পূজার সগোত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাণভট্টের বর্ণনায় পূর্বেই আমরা মুণ্ডমালিনী ('মুণ্ডমালিকা'-ধারিণী) অনুমৃতার আভাস পাইয়াছি। যাহাই হউক, এই পুঁথির উল্লেখে বাঙ্গালী-সমাজের অন্ততঃ দেড়শত বৎসর পূর্বের একটি বহুপ্রচলিত প্রথার ইঙ্গিত মিলিল। বলা বাহুল্য, উল্লিখিত 'সহমরণের' পুঁথিখানি আমাদের হস্তগত হয় নাই ; তবে, বাঙ্গালী-সমাজের সমকালীন বা প্রাচীনতর 'সতী'-কাহিনীর নানা নিদর্শন এখনও রাঢ়দেশের অতি পুরাতন নদীতীরে গ্রামাঞ্চলে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে। শহর বর্ধমানে সুপ্রাচীন 'মঙ্গলাপাড়ার' সন্নিহিত 'বঙ্কা-ঘাটের' অদূরে 'সতীমন্দির' অদ্যাপি বিরাজিত। নদীর ওপাড়ে সুবিস্তৃত আম্রকাননে 'সতীর মাঠ' এখনও পূর্ব-প্রথার স্মৃতি বহন করিতেছে। এতদ্ব্যতীত, দক্ষিণ-দামোদর উপত্যকায় অতি-পুরাতন মরা-নদী মুণ্ডেশ্বরীর (মুড়াই) তীরে তীরে সেকালের 'মুণ্ডমালিনী' সতীদের নামে নামে 'আগুন-খাকীর পুকুর', 'আগুন-খাকীর ডাঙ্গা' বহু গ্রামেই রহিয়াছে[৩]। 'আগুন-খাকীর' ডাঙ্গাগুলি সুপ্রাচীন mound বলিয়াই অনুমান করি। প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্তূপের মহাশ্মশানের পবিত্র মহিমমণ্ডিত পুণ্যক্ষেত্রে আদর্শ 'সতী' হওয়ার মধ্যে, পৃথিবীর আদিমতম ঐতিহ্যের একটি বহুপুরাতন আদর্শপরম্পরা জাগিয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

বিবাহ-বিচ্ছেদ[৪] : বৈদিকসাহিত্যের বচন উদ্ধার করিয়া বিধবা-বিবাহের পক্ষ সমর্থন করা যায়। অন্ততঃ, স্বপক্ষে 'পুনর্ভূ' শব্দটি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বৈদিকসাহিত্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা সম্পর্কে উল্লেখমাত্র নাই ; পর-বৈদিক সাহিত্যেও বিশেষ কিছু নাই। ধর্মশাস্ত্রলেখকদের মতে, হোম এবং সপ্তপদী সম্পূর্ণ হইলে, বিবাহ সম্পূর্ণ অচ্ছেদ্য। মনু বলেন, স্বামী-স্ত্রীর বিশ্বাস আমরণ স্থায়ী হওয়াই স্ত্রী-পুরুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। অন্যত্র মনু বলেন, বিক্রয় বা পরিত্যাগের দ্বারা স্ত্রী স্বামীর নিকট হইতে মুক্ত হয় না। মনুর বিশ্বাস, পুরাকালে বিধাতা এই নিয়ম বাঁধিয়াছিলেন। ধর্মশাস্ত্রকারদের মতে, বিবাহ একটি সংস্কার ; এবং

১ চি. প. স ২, প-সং ১৪ ২ বর্ধ., শার., ১৩৬৯, পৃ ১১৯ ৩ দামো., শার., ১৩৭০, পৃ ৭৭ ; তুলনামূলক আলোচনা দ্র. P. W. H. O., pp. 115-142 ৪ Kane, pp. 619-628

সংস্কার হইতেই পত্নীত্বের মর্যাদা উদ্ভূত হয়। স্বামী বা স্ত্রী 'পতিত' হইলেও অনুষ্ঠিত সংস্কার ব্যাহত হয় না। পত্নী ব্যাভিচারিণী হইলেও সে পত্নীই থাকে; তাহার ভ্রষ্টতার জন্য নূতন বিবাহ-সংস্কারের প্রয়োজন হয় না; কিঞ্চিৎ তপশ্চর্যা করিতে হয় মাত্র। পুরুষ স্ত্রীকে লঙ্ঘন করিয়া, অন্য স্ত্রী বা স্ত্রীগণকে বিবাহ করিতে পারে; অথবা, ক্ষেত্রবিশেষে পত্নীকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু, তাহা বিবাহ-বিচ্ছেদ বা বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হওয়া নহে; বিবাহবন্ধন তাহাতে অটুটই থাকে। নারদ, পরাশর এবং অন্য কয়েকজন ঋষির মতে, স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী পুনর্বিবাহ করিতে পারে, অথবা স্বামী নিখোঁজ হইলেও পুনর্বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু, ভাষ্যকার ও টীকাকারগণের মতে, এই সকল নিয়ম পূর্বযুগে প্রচলিত ছিল। সুতরাং 'বিবাহ-বিচ্ছেদ' শব্দটি সাধারণ অর্থে প্রায় দুই হাজার বৎসর ধরিয়া হিন্দুসমাজে এবং ধর্মশাস্ত্রকারগণের নিকট অজ্ঞাত ছিল; অবশ্য নিম্ন-শ্রেণীর সমাজাচারে ইহার ব্যতিক্রম—সে স্বতন্ত্র ব্যাপার। স্বামী স্ত্রীর ব্যভিচারের জন্য স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে সেকালে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ত্রী অন্ততঃপক্ষে তাহার খোরপোষ পাইত। সুতরাং 'ত্যাগ' অর্থে বিবাহবিচ্ছেদ তো নয়ই; উপরন্তু, বাড়ী এবং শয্যা হইতেও বিচ্ছিন্ন করা বুঝাইত না। পরবর্তী স্মৃতিসমূহে এবং মধ্যযুগের ভাষ্যে স্ত্রী তাহার স্বামীকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারে, এইরূপ কোনো যুক্তির অবতারণা করা হয় নাই। নারদ এবং আরো কয়েকজন ঋষি এই সকল ক্ষেত্রে—অর্থাৎ স্বামী নপুংসক হইলে, সন্ন্যাসী হইলে এবং জাতিচ্যুত হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, স্ত্রীর পুনর্বিবাহের আদেশ দিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্যের টীকায় মিতাক্ষরা বলেন, স্বামী পতিত হইলে স্ত্রী তাহার স্বামীর অধীনে থাকে না; এবং স্বামী ব্রতাদির দ্বারা শুদ্ধ হইয়া জাতিতে না-উঠা পর্যন্ত স্ত্রী অপেক্ষা করিবে; অতঃপর, সে পুনরায় স্বামীর অধীন হইবে। তপের দ্বারা গুরুতর পাপ বিদূরিত হয়; সুতরাং স্ত্রী পতিত স্বামীকেও ত্যাগ করিতে পারে না। প্রসঙ্গতঃ আমাদের আলোচ্য চিঠিপত্রের মধ্যে ৭১ সংখ্যক পত্রখানি[১] বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহাতে দেখা যায়, নফর চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সম্ভবতঃ স্বামী) তাহার স্ত্রী শ্রীমতী বামাময়ীকে (সম্ভবতঃ স্ত্রী) বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল 'ফৈজত' করিয়া ও 'মারধর' করিয়া। ফৈজত ও মারধর করিয়া বাড়ী হইতে তাড়ানোর হেতু মনে হয়, স্ত্রীর বা স্বামীর ব্যাভিচারের অনুরূপ কোন গুরুতর অপরাধ। কিন্তু, সেকালের সমাজের চোখে তাহাতে শ্রীমতী বামাময়ীর বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করার প্রশ্ন কাহারও মনে উঠে নাই; উপরন্তু, সমাজ তাহার ভরণপোষণের জন্য ব্যস্ত—স্বামী গৃহে সম্ভব না হইলে, পিতৃগৃহে। পত্রলেখক ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় অনুমান হয়

---

১ চি. প. স ২, পৃ ৫২

শ্রীমতী বামাময়ীদের আত্মীয়। সেই কারণ শ্রীমতী বামাময়ী সাময়িকভাবে তাঁহার বাটীতে থাকিলেও, তাহার স্বামী 'কিনারা' করিবার উদ্দেশ্যে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দশরথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে (সম্ভবতঃ শ্রীমতী বামাময়ীর পিতা অথবা ভ্রাতা) নিরুপায় বামাময়ীর তরফে সনির্বন্ধ অনুরোধ-পত্র লিখিয়াছিলেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ টীকা-টিপ্পনী আছে: স্ত্রী স্বামীকে ঘৃণা করিলে স্বামীর নিকট হইতে মুক্তি পায় না। স্বামী অনিচ্ছুক হইয়া স্ত্রীকে যাইতে দিতে না-চাহিলে স্ত্রী যাইতে পারে না; পক্ষান্তরে, স্ত্রী অনিচ্ছুক হইলে স্বামীও স্ত্রীর নিকট হইতে মুক্তি পায় না; কিন্তু, যদি পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করে তাহা হইলে উভয়েই যাইতে পারে। যদি স্বামী স্ত্রীর নিকট হইতে কোনো আঘাতাদির আশঙ্কা করিয়া স্ত্রীর নিকট হইতে পৃথক্ হইতে চায়, সেক্ষেত্রে স্বামী বিবাহের সময় স্ত্রীকে যাহা উপহার দিয়াছিল সমস্ত প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু, যদি স্ত্রী স্বামীর নিকট হইতে আঘাতাদির আশঙ্কা করিয়া তাহার নিকট হইতে মুক্তি চায়, তাহা হইলে স্বামী স্ত্রীকে বিবাহের সময় যাহা দিয়াছিল, তাহা প্রত্যর্পণ করিবে না; এবং বিবাহ বিবিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া তাহা বিচ্ছিন্ন হইবে না। কৌটিল্য স্বয়ং বলেন, ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আর্য ও দৈব বিবাহ 'ধর্ম্য'-বিবাহ; কারণ, এই চারি প্রকার বিবাহ পিতৃ-কর্তৃত্বে নিষ্পন্ন হয়। সেইজন্য কৌটিল্যের মতে, এই চারি প্রকারের কোনো বিবাহই বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু গান্ধর্ব, আসুর বা রাক্ষস বিবাহে দম্পতি পরস্পরকে ঘৃণা করিলে, উভয়ের সম্মতিতে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইতে পারে। কিন্তু মনে হয়, তাঁহার মতে, যে-কোনো প্রকারের বিবাহে, পরস্পরকে ঘৃণা করিলেও, কোনো এক পক্ষের সম্মতিতে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয় না। তবে শেষোক্ত ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম আছে; যেমন, কোনো পক্ষ অপর পক্ষের দ্বারা শারীরিক আঘাতাদির আশঙ্কা করিলে, বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইতে পারে।

পৃথিবীর অন্যদেশের, বা, অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন-কানুনের তুলনা-মূলক আলোচনা করিবার অবসর আমাদের নাই। সংক্ষেপে বলা যায়, রোমান ক্যাথলিক চার্চের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মে বিবাহবন্ধন অচ্ছেদ্য; অবশ্য, দস্তুরমতো দান-দক্ষিণা দিয়া কেহ কেহ এই বিবাহবন্ধনও ছিন্ন করার অনুমোদন লাভ করিয়াছে। ইংল্যাণ্ডে Restoretion-পর্বের পরে, বিবাহবিচ্ছেদ পার্লামেন্টে একটি Private Bill-এর সহায়তায় সম্ভব হইত। তবে, এই সুবিধা মাত্র ধনীগণই পাইত। কারণ, Private Bill-এ বিবাহবিচ্ছেদ-মামলার খরচা কমপক্ষে দিতে হইত ৫০০ পাউণ্ড। ইংল্যাণ্ডের Ecclesiastical Court বিবাহ-বিচ্ছেদের সপক্ষে রায় দিত—ব্যাভিচার, নির্দয়তা বা অস্বাভাবিক অপরাধের যুক্তিতে; অবশ্য, এইরূপ বিবাহবিচ্ছেদে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইত না। কিন্তু, এই মামলাও ব্যয়-

বহুল। প্রতিবাদী না-থাকিলেও সাধারণতঃ ইহাতে খরচ পড়িত ৩০০ হইতে ৫০০ পাউণ্ড। অতঃপর, আসে Matrimonial Causes Act of 1857-এর কথা। ইহার ২৭ ধারা মতে, স্বামীর নানাপ্রকারের ব্যাভিচারের জন্য স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদের মামলা আনিতে পারিত। Matrimonial Causes Act of 1923-এ ব্যাভিচারহেতু বিবাহবিচ্ছেদের মামলায় স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হইল। অতঃপর, ১৯৩৭ সালের আইন— A. P. Herbert's Act-এ স্বামী অথবা স্ত্রীকে চার প্রকার অভিযোগের ভিত্তিতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার জন্য আবেদন করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে প্রবল নিষেধাজ্ঞা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম, বা, জাতিভেদ-প্রথারই একমাত্র বৈশিষ্ট্য নহে; পক্ষান্তরে, ইহা তথাকথিত প্রগতিশীল, জাতিভেদহীন খৃষ্টান-জগতেও সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। রোমান ক্যাথলিক দেশেও বিভিন্ন কারণে বিবাহবিচ্ছেদ অতি-সম্প্রতি সম্ভব হইয়াছে; এবং ভারতবর্ষেও বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে হিন্দুদের মধ্যেও বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রথা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে বর্তমানে আইন রচনা হইয়াছে। এবং স্বীকার করিতে হয়, প্রাচীনশাস্ত্রীয়-পদ্ধতিতে বিবাহ হইলেও, বিবাহ-বিচ্ছেদের কতকগুলি জটিল মামলায় আইনের কতকগুলি ধারা ১৯৩৭ সালের ইংরাজী আইনের অনুরূপ।

বিধবা-ধর্ম: ঋগ্বেদে 'বিধবা' শব্দটি কয়েকবার পাওয়া যায়।[১] তাহাতে সেকালের সমাজে বিধবাদের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত পরিচয় মিলে না; তবে, তখন বিধবাগণ যে অপমান ও দুর্ব্যবহারের ভয়ে ভীত তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

বৌধায়ন-ধর্মসূত্র বলেন, বিধবা একবৎসর মধু, মাংস, মদ্য ও লবণ খাইবে না এবং ভূমি-শয্যায় শয়ন করিবে; মৌদ্গল্যের মতে, ছয় মাস এইরূপ করিবে; তাহার পরে, নিঃসন্তান বিধবা জ্যেষ্ঠদের অনুমতি লইয়া, দেবরের সাহায্যে পুত্রোৎপাদন করিবে। বশিষ্ঠ-ধর্মসূত্রও অনুরূপ বলেন। কিন্তু, মনুর বাক্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; এবং মনুর বিধানই সমস্ত স্মৃতিতে পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হইয়াছে:— পতি মৃত হইলে, স্ত্রী পুষ্পফলমূলাদি অল্পাহার দ্বারা দেহ ক্ষীণ করিবে, কদাচ ব্যাভিচার-বুদ্ধিতে পরপুরুষের নাম গ্রহণ করিবে না। বিধবা ধৈর্যশীলা, ব্রতপরায়ণা, ব্রহ্মচারিণী হইবে। পতিপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রীর প্রতিপাল্য সনাতন বিধি-নিষেধ ও আমরণ ব্রহ্মচর্য পালন করিলে, সে নিঃসন্তান হইলেও সনক-সনাতনাদির মতো স্বর্গলাভ করিবে। অনুরূপ-ভাবে কাত্যায়ন বলেন, পুত্রহীনা বিধবা তাহার স্বামীর শয্যা অকলঙ্ক রাখিবে এবং গুরুজনদের সহিত বসবাস করিয়া, বিধি-নিষেধ পালন পূর্বক আত্মসংযম করিয়া আমরণ তাহার স্বামীর

১ Kane, pp. 583-592

সম্পত্তি ভোগ করিবে; বিধবার মৃত্যুর পর তাহার স্বামীর উত্তরাধিকারিগণ ঐ সম্পত্তির মালিক হইবে। বিধবা ব্রত-উপবাসাদি দ্বারা ব্রহ্মচর্যের নিয়ম পালন করিয়া ইন্দ্রিয়বশ এবং দানধ্যানাদি করিলে, পুত্রহীনা হইলেও স্বর্গে যাইতে পারিবে। পরাশর মনুর অনুরূপ আদেশ দিয়াছেন। বৃহস্পতি বলেন, স্ত্রী স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী, সে স্বামীর পাপ-পুণ্যের অর্ধেক ভোগ করে; ধর্মপ্রাণা স্ত্রী সহমরণে যাউক, বা না-যাউক স্বামীর পুণ্যের ভাগ পাইবে। বৃদ্ধ-হারীত বলেন, বিধবা আমরণ কবরীবন্ধন করিবে না, পান খাইবে না, সুগন্ধি মাখিবে না, ফুল বা গহনা পরিবে না, রঙ্গীন কাপড় পরিবে না, কাংস্যপাত্রে আহার করিবে না, দিনে দুইবার আহার করিবে, চোখে কাজল পরিবে না, শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিবে, কামক্রোধ খর্ব করিবে, প্রতারণা বা শঠতা করিবে না, অলস হইবে না, ঘুমাইবে না, শুচি থাকিবে, সৎস্বভাব হইবে, হরিভজনা করিবে, রাত্রিতে কুশ-ঘাসের মাদুরের উপর ঘুমাইবে, মন সংযত করিবে এবং সৎসঙ্গে থাকিবে। হর্ষচরিতে বাণ বলিয়াছেন, বিধবাগণ চোখে কাজল পরিবে না এবং মুখে 'রোচনা' মাখিবে না, বেণীবন্ধন করিবে না। প্রচেতস্ সন্ন্যাসী এবং বিধবাকে পান খাইতে, তেল-হলুদ মাখিয়া আনুষ্ঠানিক স্নান করিতে, এবং কাংস্যপাত্রে আহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আদিপর্ব বলেন, মাটিতে এক টুকরা মাংস পরিলে যেমন পাখীর দল জুটিয়া যায়, তেমনি স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গেলে তাহাকে সকলেই ফুসলাইবার চেষ্টা করে। শান্তিপর্ব বলেন, বিধবার বহু সন্তান থাকিলেও তাহারা সর্বদাই শোচনা করে। স্কন্দপুরাণে বিধবা-ধর্ম সম্পর্কে অনেক শ্লোক আছে; সেইগুলি মদনপারিজাত, নির্ণয়সিন্ধু, ধর্মসিন্ধু এবং অন্য নিবন্ধাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কতকগুলির অনুবাদ দেওয়া গেল: স্কন্দপুরাণ বলেন, বিধবাগণ সকল অশুভ বস্তুর চেয়ে অশুভ; কার্যারম্ভের পূর্বে বিধবা-দর্শনে ফল নিষ্ফল; মাত্র ব্যতিক্রম, বিধবা-মাতা। জ্ঞানী ব্যক্তি বিধবার আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে না, সাপের বিষের মতো তাহা পরিত্যাজ্য। স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে আছে, বিধবাগণ কবরী-বন্ধন করিলে তাহাদের স্বামীগণের বন্ধন দৃঢ় হয়; সেই কারণ, বিধবাগণ সর্বদা মস্তকমুণ্ডন করিবে। বিধবা দিনে একবার আহার করিবে, কদাচ দ্বিতীয়বার নহে; অথবা সে এক মাসের উপবাস-ব্রত গ্রহণ করিবে, বা চান্দ্রায়ণ-ব্রত করিবে। বিধবা খাটের উপর শুইলে তাহার স্বামী নরকে পতিত হয়। বিধবা সুগন্ধি দিয়া গাত্রমার্জনা করিবে না, সুগন্ধ শুঁকিবে না; সে প্রত্যহ তিল-জল-কুশ দিয়া নাম-গোত্র উচ্চারণপূর্বক তাহার স্বামীর ও শ্বশুরকুলের তর্পণ করিবে; মুমূর্ষ হইলেও সে গরুর গাড়ীতে চড়িবে না; কাঁচলীবন্ধন করিবে না, রঙ্গীন পোষাক পরিবে না, এবং বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে বিশেষ নিয়ম পালন করিবে। স্কন্দপুরাণের একমাত্র শ্লোক 'বিধবা-কবরী-বন্ধো' ইত্যাদির উপর নির্ভর করিয়া মধ্যযুগের স্মার্তগণ বিধবার নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচর্যের বিধান দিয়াছেন। কিন্তু,

স্কন্দপুরাণের এই অংশকে পণ্ডিতগণ প্রক্ষেপ বলিয়া মনে করেন। নির্ণয়সিন্ধু ব্রহ্মপুরাণের একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইতে পৃথ্বীচন্দ্রোদয় বলেন, অপর গোত্রের বিধবাকে দিয়া শ্রাদ্ধান্ন রন্ধন করাইবে না।

হিন্দু-বিধবার অবস্থা অত্যন্ত দুঃখময় এবং অবাঞ্ছিত হইয়াছিল। অশুভ বিবেচনায় বিধবাকে বিবাহাদি কোনো শুভকর্মে যোগদান করিতে দেওয়া হইত না। নিঃসন্তান বিধবা পূর্ণব্রহ্মচর্য করিবে। উপরন্তু, সে সন্ন্যাসিনীর মতো আচরণ করিবে, দিনে একবারমাত্র যৎসামান্য আহার করিবে, মলিন পোষাক পরিবে। সম্পত্তিতে তাহার অধিকার ছিল তুচ্ছ। অপুত্রক অবস্থায় স্বামী মারা গেলে, বিধবা মূলতঃ সম্পত্তির অধিকারী হইত না। পরে, বিধবার দায়াধিকার কিছু উন্নত হইয়াছিল; কিন্তু তখনও সে কেবল সম্পত্তির উপস্বত্ব-মাত্র ভোগ করিতে পারিত; এবং সংসারের বা তাহার নিজের বা স্বামীর পুণ্যার্থে আইন-গত প্রয়োজন ঘটিলে সম্পত্তি দান-বিক্রয় করিতে পারিত। একান্নবর্তী হিন্দুসংসারে বিধবা অসতী হইলে, বা অসৎ-জীবন যাপন করিলে, মাত্র বাঙ্গালাদেশে অন্নবস্ত্রের মালিক হইত। বিধবার স্বামীর স্বতন্ত্র সম্পত্তি থাকিলে, এবং এক বা একাধিক পুত্র থাকিলে, বিধবা কেবল খোরপোষের মালিক। এই আইন বৃটিশ-ভারতে কিছুকাল আগেও প্রচলিত ছিল। একান্নবর্তী হিন্দুপরিবারে বিধবার স্বামী স্বতন্ত্র সম্পত্তি রাখিয়া গেলে, ১৯৩৭ সালের অষ্টাদশ আইন এবং ১৯৩৮ সালের একাদশ আইনের সংশোধন বলে সম্প্রতি তাহার স্বত্বের কিছু উন্নতি হইয়াছে। আমাদের সংগৃহীত ২৪১ সংখ্যক পত্রে[১] দেখা যায়, ১২৩১ বঙ্গাব্দে নফর দে মদকের বিধবা কন্যা জয়মুনি 'আহার বেবহার বেআন্দাজ' করিতেছিল। সভাপণ্ডিতদের ব্যবস্থা অনুসারে তাহার পিতা জয়মুনিকে ত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে উদ্যত। ফলতঃ, বিধবাধর্ম বুঝাইতে বর্তমান ও পরবর্তী পরিচ্ছেদের অবতারণা।

বিধবার মস্তকমুণ্ডন[২]: বৈদিকসাহিত্য হইতে বিধবার মস্তকমুণ্ডনের কোনো সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। গৃহ্য- অথবা ধর্মসূত্রেও ইহার কোনো উল্লেখ নাই। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতো বিশিষ্ট স্মৃতি-গ্রন্থও এই বিষয়ে নীরব। কয়েকটি অপ্রামাণ্য স্মৃতিগ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে; বৃদ্ধ-হারীতাদির মতো কয়েকটি স্মৃতিতে বরং বিরুদ্ধ বর্ণনা আছে। কোনো কোনো স্মৃতি ইহার উল্লেখ করিয়া বিধবাদের মস্তক-মুণ্ডনের বিধান দিয়াছেন। কিন্তু, বিধবাগণ আজীবন মস্তকমুণ্ডন করিবে, এইরূপ বিধান কোথাও নাই। স্কন্দপুরাণ বলিয়াছেন, বিধবাগণ মস্তকমুণ্ডন করিবে। মিতাক্ষরা ও অপরার্ক এই বিষয়ে নীরব। ইহাতে অনুমান হয়, এই প্রথা দশম বা একাদশ শতাব্দীতে

১ চি. প. স ২, পৃ ১১৬ ২ Kane, pp. 592-594

প্রথম প্রচলিত হয়। এই সময়ে বিধবাগণ কোনও কোনও আচারে 'যতি'র সমতুল বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। যতিগণ মস্তকমুণ্ডন করিতেন; সুতরাং বিধবাগণের প্রতিও অনুরূপ বিধান ধার্য করা হয়। ইহাতে বিধবাগণকে কুৎসিৎ দেখাইবে; ফলতঃ, তাহারা 'সতী' হইয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ, বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুণীগণের দৃষ্টান্তে[১] এই নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। কুল্লবগ্‌গ-গ্রন্থে আমরা দেখি,[২] বৌদ্ধভিক্ষুণীগণ তাঁহাদের মস্তক-মুণ্ডন করিয়া পীতবস্ত্র পরিধান করিতেন। মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ-বিধবাগণ কিছুকাল আগেও, এবং স্থানেস্থানে এখনও কাষায় বস্ত্র পরিধান করেন। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চবর্ণের ভদ্র গৃহস্থের বয়স্ক বিধবাগণ বর্তমানেও ক্ষৌম (কেটে) ধুতি পরিধান করিয়া থাকেন। যাহাই হউক, এই প্রথা খুব পুরাতন নহে; চতুর্দশ শতকের নিবন্ধ মদনপারিজাতের পূর্বে স্কন্দ-পুরাণের বচন কেহ উদ্ধার করেন নাই। এই প্রথা ধীরে ধীরে অচলিত হইতেছে।

রামানুজপন্থী 'শ্রী'-বৈষ্ণবদের এক শাখা তেঙ্গলাইদের মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া বিধবাদের মস্তকমুণ্ডন নিষেধ। অথচ অন্য বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ গোঁড়া ও প্রাচীনপন্থী। শূদ্রকমলাকর বলেন, গৌড়ের বিধবাগণ চুল রাখেন।

সুপ্রাচীনকাল হইতে দেখা যায়, স্ত্রীলোকগণ কোনো কারণেই বধ্য নহে, এই ধারণা বদ্ধমূল। শতপথব্রাহ্মণ বলেন, লোকে স্ত্রীলোক বধ করে না; কিন্তু তাহার যথাসর্বস্ব লইয়া তাহাকে জীবন্ত পরিত্যাগ করে[৩]। বিশ্বরূপের মতে, রাজা নিম্নবর্ণের লোকের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত স্ত্রীলোককে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন। কিন্তু এই আদেশ-প্রদানের জন্য রাজাকে কিছু তপশ্চর্যা করিতে হইবে। মনুর বিধানে আছে, যদি কেহ স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়া প্রয়োজনীয় তপশ্চর্যা করে তবুও সে জাতিচ্যুত হইবে; রাজা স্ত্রীলোক, শিশু এবং ব্রাহ্মণকে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড দিবেন। মহাভারত এই মহৎ-বিধানের প্রায়ই উল্লেখ করিয়াছেন। আদিপর্ব বলেন, ধর্মজ্ঞের মতে স্ত্রীলোক বধ্য নহে। সভাপর্বে আছে, স্ত্রীলোক, গাভী, ব্রাহ্মণ, অন্নদাতা বা আশ্রয়দাতাকে কখনও বধ করিবে না। শান্তিপর্ব বলেন, তস্করগণও স্ত্রী-হত্যা করিবে না। রামের তাড়কা-রাক্ষসীবধের প্রসঙ্গে রামায়ণের বালকাণ্ডও এই কথা বলিয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্য বিধান দিয়াছেন, অন্ত্যজ পুরুষের সহিত ব্যভিচারের মতো গুরুতর অপরাধে লিপ্ত হইলে কান ইত্যাদি কাটিয়া স্ত্রীলোকের শাস্তি দিবে। অনুরূপভাবে বৃদ্ধ-হারীত বলেন, কোনো স্ত্রীলোক তাহার স্বামীকে বা তাহার গর্ভস্থ ভ্রূণকে হত্যা[৩] করিতে চাহিলে, সেই স্ত্রীলোকের নাক, কান এবং ঠোঁট কাটিয়া দিবে। কয়েকটি গুরুতর অপরাধের জন্য যাজ্ঞবল্ক্য স্ত্রীলোকের মৃত্যুদণ্ডাদেশের বিধান দিয়াছেন।

১ S. B. E., Vol. 20, p. 321; Vol. 45, p. 116। তু. চি. প. স ২, পৃ ২৭৭
২ তু. ঐ, প-সং ২৪১ ৩ তু. ঐ, ঐ, ৩৮০

স্ত্রীলোক ও শূদ্র তুল্যমূল্য[১]ঃ কালক্রমে স্ত্রীলোকগণের উপনয়ন রহিত হইল, বেদপাঠ বন্ধ হইল, বৈদিক মন্ত্রযোগে আচরিত সমস্ত সংস্কার বাতিল হইল; এবং তাহারা সম্পূর্ণরূপে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল। সমাজে স্ত্রীজাতির স্থান অনেক ক্ষেত্রে শূদ্রের সহিত একস্তরে[২] নামিয়া আসিল। সকল দ্বিজাতি তাঁহাদের শরীর শুদ্ধ করিবার জন্য তিনবার আচমন করেন; কিন্তু মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, স্ত্রীলোক ও শূদ্র এই উদ্দেশ্যে মাত্র একবার আচমন করিবে। দ্বিজাতিগণ বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে স্নান করেন; কিন্তু স্ত্রীলোক ও শূদ্র নীরবে স্নান করিবে। শূদ্র ও স্ত্রীলোক 'আমশ্রাদ্ধ' করিবে। বৌধায়ন-ধর্মসূত্র ও পরাশরের মতে, শূদ্র বা স্ত্রী হত্যা করিলে একই প্রায়শ্চিত্ত। যাজ্ঞবল্ক্য ও নারদ বলেন, ঋণদানে সাধারণতঃ স্ত্রীলোক, শিশু এবং অতিবৃদ্ধ সাক্ষী হইতে পারে না; কিন্তু মনু, যাজ্ঞবল্ক্য এবং নারদ অন্যত্র বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে ঝগড়া হইলে, অথবা কোনো সাক্ষী না-মিলিলে, চুরির ঘটনায়, ব্যভিচারের ব্যাপারে এবং বলপ্রয়োগে কোনো অপরাধ ঘটিলে স্ত্রীলোক সাক্ষী হইতে পারে। নারদ এবং যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, দান, বিক্রয়, জমি ও বাড়ী-বন্ধকের কোনো দলিল স্ত্রীলোকের সহিত সম্পন্ন হইলে, সাধারণতঃ তাহা বলপূর্বক বা প্রতারণা করিয়া কৃত বিবেচিত হইয়া অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে। তবে সাধারণ অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের পক্ষে এই নিষেধ অমর্যাদাকর নহে, বরং আশীর্বাদতুল্য। নারায়ণের ত্রিস্থলীসেতু বৃহন্নারদীয় পুরাণের শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন, স্ত্রীলোক এবং শূদ্র যাহাদের উপনয়ন হয় নাই তাহাদের বিষ্ণু ও শিব প্রতিষ্ঠায় কোনো অধিকার নাই।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের গুরুতর অসামর্থ্য থাকিলেও তাহারা পুরুষদের চেয়ে বেশী সুবিধালাভ করিয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, স্ত্রীলোক কোনো কারণেই বধ্য নহে; বা ব্যভিচারিণী হইলেও পরিত্যাজ্য নহে। পথে চলার অগ্রাধিকার নারীর। পতিতার কন্যা পতিতা বিবেচিতা হয় না, কিন্তু পতিতার পুত্র পতিত[৩]। একই অপরাধ পুরুষ ও স্ত্রীলোক করিলে, স্ত্রীলোকের প্রায়শ্চিত্ত অর্ধেক। স্ত্রীর বয়স যতই হউক স্বামীর বয়সের অনুপাতে স্ত্রীর সম্মান। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কোনো কর লাগিত না। তদ্রূপ প্রতিলোম বর্ণের ব্যতীত সকল বর্ণের স্ত্রীলোকের কোনো কর লাগিত না। বশিষ্ঠ-ধর্মসূত্র মাত্র অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকের বা সদ্যঃপ্রসূতার পক্ষে এই বিধি বিধেয় বলিয়াছেন। গর্ভের তৃতীয় মাস হইতে স্ত্রীলোক, অরণ্যের ঋষি, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ এবং ব্রহ্মচারিগণের মনু ও বিষ্ণুর মতে, খেয়াঘাটে পারানি লাগিবে না। গৌতম ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, শিশু, বিবাহিতা কন্যা ও ভগ্নী (যাহারা বাপের বাড়ীতে আছে)

১ Kane, pp 594-596 ২ তু. চি. প. স ২, প- সং ৫১৫ ৩ তু. ঐ, ঐ, ৫১৬

গর্ভবতী স্ত্রী, অবিবাহিতা কন্যা, অতিথি এবং ভৃত্যগণকে বাড়ীর কর্তা বা কর্ত্রীর পূর্বে খাওয়াইতে হইবে। মনু ও বিষ্ণুধর্মসূত্র আরো বলেন, বাড়ীর সদ্যোবিবাহিতা কন্যা, অবিবাহিতা কন্যা এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকগণকে অতিথির পূর্বেই খাওয়াইয়া দিবে। কোনো মামলার বিচারে কোনো স্ত্রীলোক পক্ষ থাকিলে, অথবা ঘটনা রাত্রে শুনিয়া থাকিলে, অথবা গ্রামের বাহিরে ঘটিলে, বা ঘরের ভিতরে হইলে, বা শত্রুর সম্মুখে ঘটিলে, নারদের মতে, তাহার পুনর্বিচার আবশ্যক। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের নিকট হইতে অগ্নি, জল প্রমাণ লইয়া কোনো বিচার হয় না; স্ত্রীলোক বাদী বা প্রতিবাদী যাহাই হউক, নিতান্ত যদি স্ত্রীলোকের শুনানিতে মামলা প্রমাণ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার জন্য 'তুলা'-প্রমাণের ব্যবস্থা। 'স্ত্রীধন'-সম্পত্তির উত্তরাধিকারে পুত্রাপেক্ষা কন্যার দাবী বেশী। স্ত্রীধনে বিরুদ্ধ-স্বত্বে স্বত্ববতী হইলেও স্ত্রীলোক স্বত্বচ্যুত হয় না। আচার সম্পর্কে সর্বদা স্ত্রীলোকের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়। আপস্তম্ব-ধর্মসূত্র বলেন, যে-সকল বিধি-নিষেধ 'সূত্রে' বিধৃত হয় নাই, অনেকের মতে, সকল জাতির পুরুষ ও স্ত্রীলোকের নিকট তাহা বুঝিয়া লইবে। আপস্তম্ব-গৃহ্যসূত্র বলেন, বিবাহের সমস্ত পরম্পরাগত শিষ্টাচার স্ত্রীলোকের নিকট হইতে শিখিতে হইবে। আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র, মনু এবং বৈখানসেরও এই মত।

সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান-নির্ণয়[১] ঃ ভারতীয় সভ্যতার বিবর্তনে স্ত্রীলোক বিশেষতঃ পত্নীগণের স্থান-নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাইতেছে; প্রাচীনভারতে স্ত্রী-চরিত্র সম্পর্কে কিরূপ ধারণা ছিল তাহাও দেখা যাইবে। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, স্ত্রী স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী, বৈদিক যুগে স্ত্রীলোক সূক্তরচয়িত্রী এবং বেদাভ্যাসকারিণী। তখন তাহারা স্বামীর সকল ধর্ম-কর্মে সহযোগিনী ছিল। কিন্তু বৈদিকসমাজে সম্পত্তিতে স্ত্রীলোকের অধিকার বর্তাইত না। তবুও মোটামুটি তাহাদের সামাজিক মর্যাদা পরবর্তী কালের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত ছিল। পক্ষান্তরে দেখা যায়, বৈদিকযুগেও স্ত্রীলোকের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব সমাজের অভ্যন্তরে প্রবাহিত হইত। তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা এবং ঘৃণার ভাব বিদ্যমান ছিল। বৈদিক ও সংস্কৃত ক্রুপদী সাহিত্যে বহু শ্লোক দেখা যায় স্ত্রীজাতি এবং পত্নীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কামসূত্র বলেন, যোষিৎগণ কুসুম-সধর্মা। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, সকলে মিলিয়া নব-বধূর এবং গর্ভবতী স্ত্রীর পথ অবারিত করিতেছে। কোনো কারণেই স্ত্রীলোক বধ্য নহে, এই বিষয়ে প্রাচীনতম লেখকদের দুই এক জন ছাড়া সকলেই একমত। অত্রি এবং দেবলের মতো স্মার্তগণ এত উদারতা দেখাইয়াছেন যে, তাঁহাদের মতে, কোনো স্ত্রীলোক অপর কোনো জাতির পুরুষের সহিত সহবাস করিলে, এবং তাহার ফলে গর্ভবতী হইলেও

১ Kane, pp. 574-582

তাহাকে জাতিচ্যুত করিবে না ; প্রসবান্তে বা পুনরায় রজস্বলা হইবার পর সে পুনরায় শুদ্ধ হইবে ; এবং সমাজে গৃহীত হইবে। এইরূপ অবৈধ সহবাসজাত সন্তান লালন-পালনের জন্য অপর কাহাকেও প্রদান করিতে হইবে। কোনো স্ত্রীলোক বলাৎকৃতা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না। পরবর্তী মাসিক পর্যন্ত সে অশুদ্ধ থাকে, ইহা অত্রির মত ; এবং দেবল বলেন, স্ত্রীলোক ম্লেচ্ছগণের দ্বারা বলাৎকৃতা হইলেও অনুরূপ ব্যবস্থা। শান্তিপর্বে আছে, এই ব্যাপারে স্ত্রীলোকের কোনো দোষ[১] নাই ; এই দোষ সম্পূর্ণরূপে পুরুষের, এবং পুরুষেই স্ত্রীলোককে বিপথে লইয়া যায়[১]। চাতুর্মাস্য-ব্রতের 'বরুণপ্রঘাস'-যজ্ঞকারীর স্ত্রীকে স্বীকার করিতে হয়, তাহার স্বতন্ত্র কোনো প্রণয়ী আছে কি না ; এমন-কি, যদি আছে বলিয়া স্বীকার করে, তথাপি তাহাকে স্বামীর সহযোগে যজ্ঞাধিকার দেওয়া হইত।

স্ত্রীজাতির প্রতি এইরূপ প্রশস্তিবাদ এবং যোগ্যব্যবহারের বিরুদ্ধেও বচন বহু আছে। মৈত্রায়ণীয় সংহিতায় স্ত্রীলোককে বলা হইয়াছে মিথ্যার অবতার। ঋগ্বেদ বলেন, স্ত্রীলোকের সহিত বন্ধুত্ব হয় না ; তাহাদের হৃদয় হায়না বা নেকড়ে বাঘের সমতুল। ঋগ্বেদ আরো বলেন, স্ত্রীলোক দাসগণের অস্ত্র ও সৈন্য। তৈত্তিরীয় সংহিতা বলেন, স্ত্রীলোকেরা বলহীন, কোন 'দায়' বা অংশ গ্রহণ করে না ; এবং তাহাদের বাচনভঙ্গী পাপীর বচন অপেক্ষাও ছলনাময়। শতপথব্রাহ্মণ বলেন, স্ত্রীলোক শূদ্র, কুকুর এবং কাক মিথ্যাচার, পাপ এবং অন্ধকারের প্রতীক ; তাহারা আত্মবশে অপারক ও দায়াধিকারে অযোগ্য ; পুরুষের সাহচর্যে আসিলে, পুরুষ তাহাকে অধীনে রাখিবে। এই সকল বচন হইতে পরিষ্কার বোঝা যায়, বৈদিকযুগে স্ত্রীলোকগণের মর্যাদা খুব উচ্চ ছিল না ; সম্পত্তিতে তাহাদের কোন অধিকার ছিল না, এবং তাহারা পরাধীন। স্ত্রী-চরিত্র সম্পর্কে যে-সকল শ্লোক পাওয়া যায়, তাহাতে যেন সকল দেশের সকল সময়ের মানববিদ্বেষী পুরুষ-সমালোচকদের স্ত্রীজাতি সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য ধ্বনিত হইয়াছে— 'frailty, thy name is woman!' ধর্মশাস্ত্র-সাহিত্যে স্ত্রীলোকদের মূল্যমান আরও নামিয়া গিয়াছিল। যত দিন যাইতে লাগিল তত আরও খারাপ হইতে লাগিল ; তবে, এই সময়ে তাহাদের দায়াধিকার স্বীকৃত হইল। গৌতম, বশিষ্ঠ-ধর্মসূত্র, মনু, বৌধায়ন, নারদ সকলেই বিধান দিলেন, স্ত্রীলোকগণের স্বাতন্ত্র্য নাই, সকল বিষয়ে পুরুষের অধীন ; যথা, কৌমারে পিতার, যৌবনে স্বামীর, এবং স্থবিরে পুত্রের অধীন। মনু একস্থানে বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকদের সতত 'রক্ষা' করিবে। অন্যত্র মনু বলেন, গৃহস্থালীর ব্যাপারে তাহারা জীবনের সকল স্তরে কোনো-না-কোনো পুরুষের অধীন। দায়ভাগে নারদ বলিয়াছেন, নিঃসন্তান বিধবার

১ তু. চি. প. স ২, প-সং ২২৭

মৃত-স্বামীর জ্ঞাতিরা তাহার রক্ষক, এবং তাহার স্বামীর সম্পত্তি হইতে ভরণপোষণের মালিক ; স্বামীর সপিণ্ড কোনো আত্মীয় না-থাকিলে, বিধবার পিতৃপরিবার তাহার অভিভাবক। বিধাতা স্ত্রীলোকদের জন্য অধীনতা নির্দিষ্ট করিয়াছেন, কারণ ভদ্রগৃহস্থের স্ত্রীলোকও স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বিপথগামী হয়। স্ত্রীলোকগণ কেবল স্বামীসেবা করিবে; হিমাদ্রির মতে, স্ত্রী অন্য ব্রত, উপবাস, তীর্থযাত্রাদি করিতে পারে, মাত্র তাহার স্বামীর অনুমতি হইলে।

মহাভারতে, মনু-স্মৃতিতে, অন্য স্মৃতিগ্রন্থে এবং পুরাণসমূহে স্ত্রীলোকের নৈতিক অধঃপতনের অনেক কাহিনী লেখাজোখা আছে। মহাভারতের কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া সূত্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,— স্ত্রীলোকগণ মিথ্যাপরায়ণা ; তাহাদের চেয়ে পাপী আর কেহ নাই। তাহারা ক্ষুরের ধার, সাপের বিষ এবং অগ্নি একদেহে মূর্তিমতী। শতসহস্র স্ত্রীলোকের মধ্যে একজনও পতিব্রতা থাকে কিনা সন্দেহ ; স্ত্রীলোকদিগকে বশ করা যায় না ; তাহারা স্বামীর সহিত বাস করে—অন্যলোকে[১] তাহাদের নিকট প্রেম-নিবেদন[১] করে না, এবং ভৃত্যদের[১] ভয় পায় বলিয়া। অনুশাসনপর্বে আরো আছে, স্ত্রীলোকগণ শম্বরাসুর, নমুচি এবং অন্যদের অনুরূপ মায়াবিনী। স্ত্রীজাতির নিন্দায় রামায়ণও মহাভারতের অপেক্ষা কম যায় না।—রামায়ণের মতে, স্ত্রী-চরিত্র ত্রিভুবনে এইরূপ : তাহারা ধর্মভ্রষ্টা, চপলা, নিষ্ঠুরা এবং বিভেদপটিয়সী। মনু কঠোর ভাষায় একস্থানে বলিয়াছেন স্ত্রীলোকগণ প্রলুব্ধকারিণী, তরলমতি, প্রেমহীনা ; এবং স্বামীকে অগ্রাহ্য করিয়া অন্য পুরুষের পিছু ধাওয়া করে[২] ; সে সুন্দর বা কুৎসিৎ যেমনই হউক তাহার পরোয়া করে না : সে পুরুষ, এই যথেষ্ট। স্ত্রীলোকের স্বভাবই হইতেছে পুরুষকে প্রলোভিত করা ; সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি যুবতী স্ত্রীলোকের সহিত কখনও অসংযত আচরণ করিবে না ; কারণ, পণ্ডিত বা মূর্খ সকল পুরুষকেই তাহারা বিপথে লইয়া যায়। বৃহৎ-পরাশর বলেন, স্ত্রীলোকের কাম পুরুষের কামের অপেক্ষা অষ্টগুণ, ব্যবসায় ছয় গুণ, লজ্জা চতুর্গুণ, আহার দ্বিগুণ। আধুনিককালেও বৃদ্ধগণের অনেকে শাস্ত্রের ধার না-ধারিলেও স্ত্রীচরিত্রের অপগুণ সম্পর্কে শ্লোকগুলি মুখস্থ রাখেন। যথা, স্ত্রীলোকের স্বভাবজ দোষ হইতেছে অনৃতভাষণ, দুঃসাহস, মায়া, মূর্খতা, অতিলোলুপতা, অশৌচত্ব, ও নির্দয়তা।

স্ত্রীজাতির প্রতি প্রাচীনকালের এইরূপ অবাঞ্ছনীয় অপবাদের এবং অবিচারের ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, পুরাকালে অবশ্য এইরূপ লেখকেরও অসদ্ভাব ছিল না। ষষ্ঠ শতকে বরাহমিহির তাঁহার বৃহৎসংহিতায় স্ত্রীজাতির প্রশস্তি রচনা করিয়া তাহাদের

১ তু. চি. প. স ২, প-সং ২২৭, ২২৫ ২ তু. ঐ, ঐ ২২৯

সমর্থন করিয়াছেন। তিনি প্রথমে বলেন, ধর্ম ও অর্থ স্ত্রীলোকের উপর নির্ভরশীল, স্ত্রীলোকদের সান্নিধ্যেই পুরুষেরা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করে, এবং সন্তানলাভ করে; তাহারা স্বয়ং গৃহলক্ষ্মী, তাহাদের সর্বদা মান-সম্পৎ দেওয়া উচিত। অতঃপর, তিনি সন্ন্যাসীদের নিন্দা করিয়াছেন; কারণ, তাঁহারা স্ত্রীলোকদের গুণ না-দেখিয়া কেবল দোষ ধরেন। তাঁহার মতে, স্ত্রীজাতির অসদাচরণ পুরুষেও করিয়া থাকে। পুরুষ ধৃষ্টতাবশতঃ স্ত্রীলোকদের ঘৃণার্হ বলিয়াছেন; প্রকৃতপক্ষে, তাহারা পুরুষ অপেক্ষা অধিক গুণশালিনী। অতঃপর, তিনি প্রমাণস্বরূপ মনু-বচন উদ্ধার করিয়া বলেন, পুরুষের মাতা ও পত্নী স্ত্রীলোক; পুরুষের জন্ম হয় স্ত্রীলোক হইতে; সুতরাং স্ত্রীলোককে নিন্দা করিয়া অকৃতজ্ঞ পুরুষে কোনো সুখলাভ করিতে পারে না। শাস্ত্র বলেন, পতি ও পত্নী দাম্পত্য-জীবনে বিশ্বাসভঙ্গ করিলে উভয়েই সমান দোষে দোষী। পুরুষ শাস্ত্রের তোয়াক্কা করিতে চায় না; পক্ষান্তরে, স্ত্রীলোকেরা চায়; সুতরাং স্ত্রীলোক পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। পুরুষ গোপনে স্ত্রীলোকদের প্রবঞ্চনা করে; কিন্তু তাহাদের মৃত্যুর পর নিন্দা করা সাজে না; কারণ স্ত্রীলোকই পাতিব্রত্যের আদর্শে স্বামীর শব আলিঙ্গন করিয়া জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, মহাকবি কালিদাস, বাণ এবং ভবভূতিকে বাদ দিলে, সংস্কৃতসাহিত্যে একমাত্র বরাহ-মিহিরই স্ত্রীলোকের সমর্থনে ও মূল্যনিরূপণে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

স্ত্রীচরিত্র সম্পর্কে এইরূপ অনাবশ্যক ঘৃণা ও নিন্দার মসীলিপ্ত প্রেক্ষাপটে উজ্জ্বল জ্যোতির্বিন্দুও দুর্লক্ষ্য নহে: সমস্ত স্মৃতিগ্রন্থেই মাতার প্রসঙ্গে প্রশস্তি এবং গভীর শ্রদ্ধা পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। গৌতম প্রথমে বলেন, বেদাধ্যায়ী আচার্য শ্রেষ্ঠ গুরু; পক্ষান্তরে, অপরে বলেন, মাতার স্থান সর্বোচ্চে। আপস্তম্ব-ধর্মসূত্র বলেন, মাতা গুরুতর অপরোধে জাতিচ্যুত হইলেও পুত্র সর্বদা মায়ের সেবা করিবে। কারণ, মাতা পুত্রের জন্য অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন। বৌধায়ন-সূত্রমতে, পুত্র মাতার ভরণপোষণ করিবে, মাতা জাতিচ্যুত হইলেও; এবং পুত্র এ-কথা তাঁহাকে ঘুণাক্ষরেও জানাইবে না। বশিষ্ঠ-ধর্মসূত্র বলেন, পিতা 'পতিত' হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা চলে; কিন্তু, মাতা 'পতিতা' হইলেও পুত্রের চক্ষে কখনও 'পতিতা' নহে[১]। মনু বলেন, মহত্ত্বে আচার্য দশজন উপাধ্যায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পিতা আচার্যের অপেক্ষা শতগুণ শ্রেষ্ঠ, এবং মাতা একহাজার পিতার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। শঙ্খ-লিখিত একটি হিতকর উপদেশ দিয়াছেন: পিতা-মাতার ঝগড়া হইলে পুত্র কোনো পক্ষ অবলম্বন করিবে না; তবে পুত্র প্রকৃত বিবেচনা করিলে, কেবলমাত্র মায়ের দিক্ টানিয়া কথা বলিতে পারে; কারণ, মাতাই

১ তু. চি. প. স ২, প-সং ৫২৬

পুত্রকে গর্ভে ধারণ ও পালন করে; পুত্র জীবৎকালে মাতার ঋণশোধ করিতে পারে না; একমাত্র 'সৌত্রামণি'-যজ্ঞ করিলে শোধ হয়। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, মাতা গুরু, আচার্য এবং উপাধ্যায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অনুশাসনপর্ব বলেন, মাতা মহত্ত্বে দশজন পিতা অপেক্ষা, অথবা সমগ্র পৃথিবী হইতেও শ্রেষ্ঠ; মাতার তুল্য গুরু নাই। শান্তিপর্বেও মাতৃ-প্রশস্তি আছে। অত্রি বলেন, মাতার তুল্য শ্রেষ্ঠগুরু আর নাই। বীর পঞ্চপাণ্ডব মাতা কুন্তীর প্রতি শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। আদিপর্ব বলেন, সকল অভিশাপের নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু মাতার অভিশাপ হইতে কেহ নিষ্কৃতি পায় না।

প্রাচীন সংস্কৃতসাহিত্যে স্ত্রীলোকের মর্যাদা সম্পর্কে বাদ-প্রতিবাদ অনুধাবন করিলে বোঝা যায়, হিন্দুসমাজের মহত্তর মানস স্ত্রীজাতির মূল্যবোধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। এবং সতীত্বই যে স্ত্রীলোকের প্রধান 'ধর্ম', সে-বিষয়েও মতদ্বৈধ ছিল না। সাধারণ জনমানসে স্ত্রীজাতির সম্পর্কে একটা হীন ধারণা সমাজের অন্তস্থলে প্রবাহিত হইত; বিশেষ করিয়া যাঁহারা সন্ন্যাসজীবনকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন এবং মানুষকে সংসারবন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন, তাঁহারাই বরাহমিহিরের বিশ্লেষণমতো 'বৈরাগ্যমার্গের' প্রচার করিয়া স্ত্রীলোকদের দোষগুলি বাড়াইয়া বলিতেন। স্ত্রীলোকের নিন্দাসূচক শ্লোকগুলি ব্যক্তিগত বিশেষ কারণে স্ত্রীলোকের উপর বীতরাগদের উক্তি। জৈমিনিভাষ্যে শবর বলিয়াছেন, শাস্ত্রীয় নিষেধগুলি শুদ্ধ ও সরল নিষেধমাত্র নহে; ইহাদের উদ্দেশ্য, নিষিদ্ধের বিরুদ্ধ আচরণ না-করা; এবং তাহার প্রশংসা করা। সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের উপর বিশেষ মূল্যস্থাপনের উদ্দেশ্যে স্ত্রীলোকের সম্পর্কে এই সকল বিধি-নিষেধ বা নিন্দাবাদ; তাহাদের হেয় করার জন্য নহে।

আপস্তম্ব, মনু ও নারদ নিঃসন্তান বিধবার দায়াধিকার স্বীকার করেন নাই। পক্ষান্তরে গৌতম বলেন, এইরূপ বিধবার মৃত-স্বামীর সপিণ্ড বা সগোত্রদের সঙ্গে সমান অধিকার। শকুন্তলায় পরিষ্কার বোঝা যায়, মৃত-বণিকের সম্পত্তি রাজকোষে যাইবে, বণিকের বিধবা পাইবে না। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, পৃথগ্‌ভাবে মৃত অপুত্রক ব্যক্তির বিধবা তাহার সম্পত্তির প্রথম উত্তরাধিকারী; বিষ্ণু, কাত্যায়ন এবং আরো অনেকে একই কথা বলেন। মধ্যযুগে সম্পত্তিতে বিধবার স্বত্বাধিকার সূত্রকারদের প্রাচীনতর যুগের চেয়ে অনেক বেশী স্বীকৃত হইয়াছিল। ফলে, মধ্যযুগে স্ত্রীলোকের মর্যাদার উন্নতি দেখা যায়; কিন্তু ধর্মানুষ্ঠানে ও অন্যক্ষেত্রে তাহাদের মান অবনত হইয়াছিল; এমন-কি, তাহারা শূদ্রের সামিল বলিয়া গণ্য হয়। যাস্ক ঋগ্বেদের ১. ১২৪. ৭ সূক্তের ব্যাখ্যায় বলেন, দক্ষিণদেশে অপুত্রক মৃত ব্যক্তির বিধবা সভাগৃহে গিয়া স্থাণুর উপর দাঁড়ায়, এবং সদস্যগণ তাহাকে অক্ষের দ্বারা আঘাত করিলে তবে সে তাহার মৃত স্বামীর সম্পত্তি পায়। অর্থাৎ উত্তরভারতে যাস্কের সময়ে

বিধবাগণ তাহাদের মৃত পতির সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইত না। আলোচ্য গ্রন্থের 'সামাজিক ও বৈষয়িক ভাষ' অধ্যায়সমূহে[১] স্ত্রীলোকের প্রায়শ্চিত্ত-বিধান ও দায়াধিকার সম্পর্কে আমরা যে-সকল আলোচনা করিব, বর্তমান পরিচ্ছেদগুলিতে তাহারই ভূমিকা করা যাইতেছে।

বেশ্যা[২] ঃ বেশ্যাবৃত্তি এবং উপপত্নীর সম্পর্কে কিছু না-বলিলে ভারতীয় সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান এবং বিবাহ-প্রসঙ্গে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। পৃথিবীর সমস্ত দেশের ইতিহাসের উন্মেষযুগ হইতে বেশ্যাবৃত্তি বর্তমান। ইহার প্রাদুর্ভাব কোন্ দেশে বেশী, অথবা আধুনিকযুগের তুলনায় প্রাচীনকালে ইহার পরিমাণ কিরূপ ছিল, পরিসংখ্যানের অভাবে তাহা বলা শক্ত। ভারতীয় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া যাহারা নাক সিটকায়, Encyclopædia Britannica-গ্রন্থে এতৎসম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করিলে তাহাদের চক্ষু উন্মীলিত হইবে।

ঋগ্বেদে আমরা দেখি, সেকালে অনেক স্ত্রীলোক ছিল যাহারা সাধারণের উপভোগ্যা অর্থাৎ বেশ্যা। ঋগ্বেদের ১. ১৬৭. ৪. সূক্তে, ঝড়ের দেবতা জ্যোতির্ময় মরুদ্গণ যুবতী বিদ্যুল্লতার সহিত সংযুক্ত হইয়াছেন, যেমন পুরুষেরা যুবতী বেশ্যার সহিত সংযুক্ত হয়। ঋগ্বেদের ১১. ২৯. ১. সূক্তে আছে, কোন স্ত্রীলোক গোপনে একটি সন্তান প্রসব করিয়া শিশুটিকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। ঋগ্বেদের ১. ৬৬. ৪, ১. ১১৭. ১৮, ১. ১৩৪. ৩. এবং অন্যত্র 'জার' (বা উপপতি বা গুপ্তপ্রণয়ী)-প্রসঙ্গ আছে। গৌতম বলেন, ব্রাহ্মণী-বেশ্যাকে এবং বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জনকারিণীকে হত্যা করিলে প্রায়শ্চিত্ত অনাবশ্যক; মাত্র অষ্টমুষ্টি ধান্য দান করিতে হইবে। মনু বেশ্যার অন্নগ্রহণ করিতে ব্রাহ্মণকে নিষেধ করিয়াছেন, এবং রাজাকে নির্দেশ দিয়াছেন, বঞ্চকী বেশ্যাকে দণ্ড দিবেন। মহাভারতের সমাজে দেখা যায়, বেশ্যাবৃত্তি যেন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান। আদিপর্ব বলেন, গান্ধারীর গর্ভাবস্থায় জনৈকা বেশ্যা ধৃতরাষ্ট্রের পরিচর্যা করিত। উদ্যোগপর্বে, যুধিষ্ঠির কৌরবদের বেশ্যাগণকে অভিবাদন জানাইয়াছিলেন। কৃষ্ণ শান্তি-মিশন লইয়া কৌরবসভায় আগমন করিলে বেশ্যাগণ কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা জানাইতে গিয়াছিল। পাণ্ডব-চমূর যুদ্ধযাত্রার বর্ণনায় দেখা যায়, গরুর গাড়ী, হাট-বাজার ও বেশ্যাগণ তাহাদের সঙ্গেই ছিল। বনপর্বে ও কর্ণপর্বেও এইরূপ বর্ণনা আছে। যাজ্ঞবল্ক্য উপপত্নীদের দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন—'অবরুদ্ধা' ও 'ভুজিষ্যা'। 'অবরুদ্ধা' অর্থে, যে-উপপত্নীকে বাড়ীতে রাখা হয়, এবং সে অন্য পুরুষের সহিত সহবাস করিতে পারে না। 'ভুজিষ্যা' অর্থে, যে-উপপত্নীকে বাড়ীতে রাখা হয় না, অন্যত্র থাকে; অথচ, ব্যক্তিবিশেষের একান্তভাবে রক্ষিতা। তাহাদের সহিত অপর লোক সহবাস

---

১ পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃ. ৩১-৩৪ ২ Kane, pp. 637-639

করিলে পঞ্চাশ পণ দণ্ড। নারদ বলেন, ব্রাহ্মণী-স্বৈরিণীর সহিত সহবাস করিবে না; বেশ্যা বা দাসীর সহিত চলিবে। প্রভুর অবাধ্য অনুলোম বর্ণের স্ত্রী গম্যা, প্রতিলোম বর্ণের স্ত্রী অগম্যা। কিন্তু, ঐরূপ স্ত্রীলোক পরপরিগ্রহা অর্থাৎ অপরের রক্ষিতা হইলে তাহার সহিত সহবাস, পরদারগমনের অনুরূপ অপরাধ। যাজ্ঞবল্ক্যের টীকায় মিতাক্ষরা স্কন্দপুরাণের বচন উদ্ধার করিয়া বলেন, বেশ্যাবৃত্তি 'পঞ্চচূড়া' নামক অপ্সরাগণ হইতে উদ্ভূত একটি সম্পূর্ণ জাতিধর্ম। এইরূপ গণিকা ব্যক্তিবিশেষের রক্ষিতা নহে; ইহাদের গমনে কোনো পাপও অর্সায় না, রাজদ্বারেও দণ্ড হয় না; তাহারা সম- বা প্রতিলোম বর্ণের পুরুষের সহিত সহবাস করিলেও দোষ হয় না; তাহারা 'অবরুদ্ধা' না-হইলে, তাহাদের গমনে কাহাকেও কোনো ক্ষতিপূরণও দিতে হয় না। কিন্তু কেহ তাহাদের সহিত সহবাস করিলে, অদৃশ্য পাপ অর্সায়; কারণ, স্মৃতির আদেশ, পতি তাহার পত্নীর প্রতি একনিষ্ঠ হইবে; এবং বেশ্যাগমন করিলে তাহাকে 'প্রাজাপত্য'-তপ করিতে হইবে। নারদ বলেন, কোনো বেশ্যা শুল্ক লইয়া তাহার গ্রাহককে বিমুখ করিলে, শুল্কের দ্বিগুণ প্রত্যর্পণ করিবে; এবং বেশ্যাগমন করিয়া শুল্ক না-দিলে অনুরূপ দণ্ড পুরুষকেও দিতে হইবে। যাজ্ঞবল্ক্য এবং মৎস্যপুরাণ একই বিধান দিয়াছেন। মৎস্যপুরাণের সপ্ততিতম অধ্যায়ে 'বেশ্যাধর্ম' বিবৃত হইয়াছে। কামসূত্র 'গণিকা' শব্দের সংজ্ঞায় বলিয়াছেন, গণিকাগণও বেশ্যা, কিন্তু তাহারা চৌষট্টি কলায় বিদগ্ধা। অপরার্ক বেশ্যাধর্ম-প্রসঙ্গে নারদের এবং মৎস্যপুরাণের কয়েকটি শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।

সেকালের সমাজ উপপত্নীদের স্বীকার করিয়া লইয়াছিল; ফলতঃ, স্মৃতিসমূহ তাহাদের ভরণপোষণের বিধান দিয়াছেন। জীবৎকালে কেহ উপপত্নী রাখিলে, উপপতির মৃত্যুর পর উপপত্নী তাহার বিরুদ্ধে আইন-গত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে না। নারদ ও কাত্যায়ন বলেন, উত্তরাধিকারীর অভাবে, মৃতব্যক্তির সম্পত্তি রাজাকে বর্তাইলে, রাজা প্রথমে মৃতের উপপত্নীদের, ক্রীতদাসগণের ভরণপোষণের এবং মৃতের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিবেন। মৃত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইলে ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। মিতাক্ষরা বলেন, এখানে উপপত্নী অর্থে 'অবরুদ্ধা'—'ভুজিষ্যা' নহে। মৃত-ব্রাহ্মণের রক্ষিতা উপপত্নীও তাঁহার সম্পত্তি হইতে ভরণপোষণের মালিক। কিন্তু Privy Council একটি ক্ষেত্রে মিতাক্ষরাকে লঙ্ঘন করিয়া বিধান[১] দিয়াছেন, 'অবরুদ্ধা' বা 'ভুজিষ্যা' উভয় প্রকার উপপত্নীই কোনো হিন্দুর আমরণ রক্ষিতা হইলে এবং উপপতির মৃত্যুর পরে, উপপত্নী আমরণ অন্য পুরুষের সহিত সহবাস না-করিলে, উপপতির সম্পত্তি হইতে ভরণপোষণ পাইবার অধিকারিণী। উপপত্নীর গর্ভজাত অবৈধ সন্তানগণ উপপতির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে কিনা, বা ভরণপোষণ পাইবে কিনা, এই প্রশ্নও গুরুতর।

১ L. R. 53. 1. A. 153=50 Bom. 604

আমাদের আলোচ্য চিঠিপত্রের মধ্যে 'লক্ষ্মী বেয়ার' ছাড় ফারখতি পত্রখানি[১] প্রসঙ্গতঃ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্মী ছিল রামলোচন রায়ের 'অবরুদ্ধা'-স্ত্রী। রামলোচন তাহাকে 'পরদা-পোসে' রাখিয়াছিলেন। পরে, লক্ষ্মী কার্ত্তিক চক্রবর্তীর সহিত 'আসনাই' করে; এবং বৈরাগ্য-আশ্রম-গ্রহণের দোহাই দেয়। যাহাই হউক, রামলোচনের দৃষ্টিতে লক্ষ্মী তখন 'ভুজিষ্যা'-স্ত্রী। এই ক্ষেত্রে সেকালের সমাজেও বোধহয় রামলোচনের মৃত্যুর পর, লক্ষ্মী বা তাহার সন্তানগণ বা পূর্ব-গৃহস্থের কেহ, রামলোচনের সম্পত্তির দায়াধিকার দাবি করিতে পারিত। সেইজন্য, লক্ষ্মী 'ছাড় ফারখতি' বা 'বেদায়া-পত্র' লিখিয়া দিয়াছে। অর্থাৎ বিলাতের প্রিভি-কাউন্সিলের নবতম আইন প্রবর্তনের পূর্বেও, হিন্দুসমাজে 'অবরুদ্ধা' ও 'ভুজিষ্যা' স্ত্রীগণ বা তাহাদের উত্তরাধিকারিগণ পূর্ব-উপপতির সম্পত্তির 'দায়াদ' বা মালিক হইত, বা ভরণ-পোষণ পাইত। বিধবা না-হইয়া, লক্ষ্মী সধবা হইলেও বোধহয় এই নিয়মই খাটিত; এবং ভবিষ্যতে সে কার্ত্তিক চক্রবর্তীকে ছাড়িয়া অন্য পুরুষের কাছে গেলেও, অনুরূপভাবে প্রণয়ি-পরম্পরায় সম্পত্তির দায়াদ হইতে পারিত— 'বে-দায়া' বা 'ছাড়-ফারখতি'-পত্র লিখিয়া না-দিলে।

সমীক্ষা-সংক্ষেপ[২]ঃ বৈদিকযুগে (খৃ. পূ. ২৫০০-১৫০০) স্ত্রীলোকের মর্যাদা সমকালীন পৃথিবীর সকল দেশের আদিম সমাজের তুলনায় উন্নত ছিল। শিক্ষা ও ব্রহ্মচর্যান্তে কন্যাগণের যোগ্য বয়সে বিবাহ হইত। ধনী- বা রাজ-পরিবারে বহুবিবাহ প্রচলিত থাকিলেও একপত্নিত্বই ছিল বিধি। সতীদাহ-প্রথা একেবারে অজ্ঞাত ছিল। বিধবার পত্যন্তর-গ্রহণ অথবা নিয়োগ-প্রথা প্রচলিত ছিল। পতির সম্পত্তিতে পত্নীর অধিকার বর্তাইত না।

পরবর্তী সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের যুগে (খৃ. পূ. ১৫০০-৫০০) যথাসময় বিবাহের পূর্বে কন্যাগণের উপনয়ন ও বেদপাঠ সুপ্রচলিত ছিল। স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার স্বীকৃত হয় নাই; বিবাহে যৌতুকস্বরূপে কিছু ধনদৌলতাদি দেওয়া হইত। বিবাহের আদর্শ এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিল প্রায় পূর্ববৎ। স্ত্রীর পক্ষে বিবাহ-বিচ্ছেদ স্বীকৃত হইয়াছিল, তবে ইহার ব্যাপক প্রচলন হয় নাই। সতীদাহ-প্রথা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। বিধবাগণ দেবরকে অথবা অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিত। তাহাদের মস্তকমুণ্ডনাদিও করিতে হইত না। পর্দা-প্রথা অজ্ঞাত ছিল; কিন্তু তাহারা প্রকাশ্য সভাসমিতিতে যোগ দিত না।

সমাজ-নীতিতে দেখা যায়, সভ্য ও প্রগতিশীল সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান সম্মানজনক। বৈদিকযুগে পুরুষেরা ব্যাপৃত থাকিত দেশ-বিজয়ে ও বসতিস্থাপনে। স্ত্রীলোকেরা নিযুক্ত থাকিত কৃষিকর্মে, বস্ত্রবয়নে ও তীর-ধনুকাদি শস্ত্র-প্রস্তুতিতে। বৈদিকযুগে সমাজপতিগণ গৃহস্থের বহু, অন্ততঃ আট-দশটি সন্তান কামনা করিতেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে দুর্ধর্ষ অন্-

১ চি. প. স ২, প-সং ৪৪২ ২ P. W. H. C., pp. 335-359

আর্যগণের সংখ্যা-বহুলতা ও প্রতিপত্তি দেখিয়া স্বভাবতঃই কালোপযোগী এইরূপ প্রত্যাশা করা হইত। ফলতঃ, এই সময়েও সতীদাহ-প্রথার প্রচলন অথবা বিধবা-বিবাহ-রহিতের আত্মঘাতী নীতি তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই।

সূত্র, মহাকাব্য ও প্রাচীন স্মৃতির যুগে (খৃ. পূ. ৫০০-খৃ. ৫০০) ভারতীয় সমাজে স্ত্রীলোকের অবস্থার সমূহ অবনতি ঘটে। এই সময়ে বৈদিক আর্যগণের সমাজবেষ্টনীতে অবৈদিক অন্-আর্যগণের শ্লথ অনুপ্রবেশ ঘটিতে থাকে। বৈদিক আর্যসমাজে তাঁহারা চিহ্নিত হন 'শূদ্র' নামে। বৈদিক আর্যসমাজে তাঁহাদের স্থান হইল 'দাস'-পর্যায়ের। শূদ্র-স্ত্রীলোকের উপস্থিতি বৈদিক-আর্যসমাজে বিশৃঙ্খলা ঘটাইল। বৈদিক-আর্যগণ গাঙ্গেয় উপত্যকায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেখানে দেশজ সভ্যতা অতিমাত্রায় দৃঢ়মূল; সম্পূর্ণ উৎখাত অসম্ভব। ফলে, তাঁহারা নামেমাত্র রাজা হইয়া রহিলেন—দাস, শূদ্র অথবা নাগবংশীদের দেশে। উভয় জাতির সহাবস্থান ও নিরাপদ প্রগতি চলিতে লাগিল। ফলতঃ, তাহাদের আন্তর্বিবাহ অপ্রতিরোধ্য হইয়া উঠিল। ঋগ্বেদের যুগে আর্য-শূদ্র বিবাহ দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ এবং মহাকাব্যের যুগে ইহার প্রভূত দৃষ্টান্ত মিলে। অর্জুন নাগবংশীয়া রাজকন্যা উড়ুপীকে বিবাহ করেন। ভীম বিবাহ করিয়াছিলেন রাক্ষস-প্রধানের ভগ্নী হিড়িম্বাকে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কবশ মুনি ছিলেন দাসীপুত্র। এই সকল দৃষ্টান্ত ছাড়াও, সংহিতা-যুগের অপরার্ধে (অর্থাৎ হাজার খৃষ্টপূর্বাব্দ হইতে পাঁচশত খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) বৈদিক-আর্যের অন্-আর্য জাতীয় স্ত্রী-গ্রহণ সাধারণ ব্যাপার হইয়া উঠে। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকারগণ আর্য-পুরুষের শূদ্র-স্ত্রী গ্রহণে আপত্তি করেন নাই। পরবর্তী কালেও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ অনুলোম বর্ণের স্ত্রী গ্রহণ করিতেন[১]। কিন্তু আর্য-পুরুষের শূদ্র-স্ত্রী ব্যতীত অন্য আর্য-স্ত্রী গ্রহণ আবশ্যিক ছিল। পরবর্তী কালের ধর্মশাস্ত্রকারগণ এই বিধানকে বিশেষ নিন্দা করিয়াছেন।

আর্যগৃহে শূদ্র-স্ত্রীর প্রবেশ ভারতীয় সমাজে স্ত্রীলোকের অবস্থার অবনতির অন্যতম কারণ। এই অবনতি অলক্ষ্যে আরম্ভ হয় হাজার খৃষ্টপূর্বাব্দ হইতে; এবং পাঁচশত বৎসরের মধ্যে ইহা বিশেষ প্রকট হইয়া উঠে। শূদ্র-স্ত্রী সংস্কৃত ভাষা ও আর্যধর্মানুষ্ঠান জানিত না। ফলতঃ আর্যা-সপত্নীর ন্যায় স্বামীর ধর্মকর্মানুষ্ঠানে সমান সুযোগ পাইত না; তাহার ভাষাও অশুদ্ধ। সংরক্ষণশীল পুরোহিতগণ ধর্মকৃত্যে শূদ্রা স্ত্রীগণের স্বামীর সহযোগিতা নিষিদ্ধ করিলেন। কিন্তু, সব সময়ে এই নিয়ম খাটিত না। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করিয়া ধর্মশাস্ত্রকারগণ স্ত্রীলোকমাত্রেরই বেদপাঠ ও ধর্মকৃত্যের অধিকার রহিত করিলেন। দুই শত খৃষ্টপূর্বাব্দের দিকে সংহিতাকার ঐতিশায়ন এই মত প্রচার করেন।[২]

---

১ সা-প-প, ৩৮, পৃ ৬২-৬৩ ২ P. W. H. C., p. 246

মনেহয়, তিনি যেন প্রায় পাঁচশত খৃষ্টপূর্বাব্দের প্রাচীন কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপে এই মত প্রচার করিয়াছিলেন।

এই সময়ের প্রথমার্ধে বিধবা-বিবাহ ও নিয়োগ-প্রথা প্রচলিত ছিল; তবে জনগণ ইহা সুনজরে দেখিত না। ফলে, খৃষ্টীয় পাঁচ শতকের দিকে এই প্রথা অচল হইল। বৈদিক-যুগে বিবাহ ছিল ধর্মসংস্কারবিশেষ। তখন সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ ক্ষেত্রবিশেষে প্রচলিত ছিল। কিন্তু, এই সময়ে স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহ অচ্ছেদ্য সংস্কাররূপে গৃহীত হইল। রাজন্যবর্গ তাঁহাদের অন্তঃপুরে অগণিত স্ত্রী পরিপোষণ করিতেন। পর্দা-প্রথা রাজপরিবারে ক্বচিৎ প্রচলিত হইল।

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকের দিকে পাঞ্জাব ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় একের পর আর বিদেশী-আক্রমণ শুরু হয়[১]।—গ্রীক্, সিথীয়ান, পার্থিয়ান, কুষাণ আক্রমণ চালাইতে লাগিল ক্রমান্বয়ে। ফলে, সমগ্র হিন্দুসমাজ দরিদ্র ও পরাধীন হইয়া পড়িল। এই পরিবেশে সন্ন্যাসধর্মের প্রচার ও সমাজে ইহার প্রচলন হইতে লাগিল। ঔপনিষদ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগুরুগণ পূর্বে ইহা প্রচার করিলেও হিন্দুসমাজ ইহা সহজে গ্রহণ করে নাই। বার্ধক্যের পূর্বে এবং স্বজনপোষণ না-করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণকারীর বিশেষ শাস্তির বিধান দিয়াছেন কৌটিল্য। প্রাচীন ধর্মসূত্রকারগণ সন্ন্যাসগ্রহণকে পূরাপুরি অবৈদিক আচার বলিয়াছেন। এই পরিস্থিতিতে সমাজে বিধবাগণের অবস্থা হীন হইয়া আসিল। নিয়োগ-প্রথা রহিত হইলেও তখনও বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল; কিন্তু জগৎ মায়া এবং সুখভোগ পাশবদ্ধ-অবস্থা, এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া বিধবা-বিবাহ রহিত করার চেষ্টা চলিতে লাগিল; এবং বিধবাগণকে আধ্যাত্মিক মুক্তিসাধনায় নিরত হইতে উপদেশ দেওয়া হইতে লাগিল, পুনর্বিবাহের পরিবর্তে। বৈদিকযুগের বিশ্বাস ছিল, পুত্রলাভে স্বর্গলাভ হয়; কিন্তু আলোচ্য সময়ে বিধবাদের পক্ষে ইহা মুক্তিলাভের আদর্শে অবান্তর বোধ হইল। ফলতঃ, বিধবাদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য আবশ্যিক, এবং পুনর্বিবাহ রহিত হইল। পক্ষান্তরে, বিপত্নীক পুরুষের পক্ষে স্মৃতি নীরব। পত্নীর মৃত্যুর পরেই পতির পুনর্বিবাহ স্বীকৃত হইল—গার্হপত্য অগ্নিনির্বাপণের আশঙ্কায়।

এই সময় সতীদাহ-প্রথা বিশেষ প্রচলিত হইল। প্রথমতঃ ইহা ক্ষত্রিয়সমাজের মধ্যে সীমিত থাকিলেও, পরে ইহা ধর্মসঙ্গত অনুষ্ঠান-স্বরূপে সমগ্র সমাজে ছড়াইয়া পড়িল। সম্পত্তিতে স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকার-স্বত্ব নানা কারণে স্বীকৃত হইতে লাগিল; বৈদিকযুগের স্ত্রীলোকগণ এই অধিকারে বঞ্চিত ছিলেন।

পরবর্তী স্মৃতি, টীকা ও নিবন্ধকদের যুগে (খৃ. ৫০০–১৮০০) স্ত্রীলোকের সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটে উত্তরাধিকার-স্বত্বের মাধ্যমে। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে স্বামীর সম্পত্তিতে

১ P. W. H. C., p. 350

স্ত্রীর অধিকার স্বীকৃত হইল। বাঙ্গালাদেশে উত্তরাধিকার ও বণ্টনের দ্বারা সমাজ স্ত্রীধন স্বীকার করিলেন[১]। ইহা ছাড়া, অন্যক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের অবস্থার অবনতি ঘটিল। পূর্বপ্রচলিত উপনয়ন-সংস্কার সম্পূর্ণরূপে উঠিয়া গেল; ফলতঃ, ধর্মকর্মে তাহাদের স্থান শূদ্রের স্তরে নামিয়া আসিল। কন্যাগণের বিবাহের বয়স অনেক কমানো হইল। কন্যাগণ তেরো-চৌদ্দ বৎসর বয়সে 'ঋতুপ্রাপ্তা' হয় না; হয়, দশ-এগারো বৎসর বয়সে তাহাদের অঙ্গে ঋতুলক্ষণ দেখা দিলে —এইরূপ শাস্ত্রবিধি প্রচার করা হইল। সুতরাং, তৎপূর্বেই কন্যাকে পাত্রস্থ করা বিধেয়। ফলতঃ, কন্যার দশ বৎসর বয়সে বিবাহ স্থির হইল। আদর্শ হইল অষ্টম বর্ষ। ক্ষত্রিয়সমাজে বিবাহের বয়স দাঁড়াইল চৌদ্দ-পনেরো। বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ হইল। যুদ্ধজীবী-সমাজে সতীদাহ প্রথা সাধারণ ব্যাপার হইয়া উঠিল।

মুসলমান-রাজত্বের প্রতিষ্ঠাকালে বারো শত শতাব্দীর দিকে হিন্দু-স্মার্তগণ প্রচার করিলেন, পতি পত্নীর দেবতা, এবং স্ত্রীলোকের একমাত্র কর্তব্য পতিসেবা। বহুবিবাহ বিলাসিতার অঙ্গরূপে পরিগণিত হইল। বাল্য-বিবাহের দরুন, স্বামীর দিক্ হইতে বিশ্বাস-ভঙ্গের অভিযোগ সাধারণ ঘটনা হইয়া উঠিল। বাল্যবিবাহের ফলে, স্ত্রীলোকদিগকে অকালমাতৃত্ব বরণ করিতে হইত। ফলে, অকালমৃত্যু হইয়া উঠিল অনিবার্য। অল্পবয়স্ক পুরুষ বিপত্নীক হইলে মনু-বাক্য স্মরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয়দারপরিগ্রহে তৎপর হইয়া উঠিত। পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর বয়সের পাত্রের ভাগ্যে নয়-দশ বৎসর বয়সের শিশু ব্যতীত, বয়স্কা পাত্রী জুটিত না। ফলে, সমাজে ব্যভিচার বৃদ্ধি পাইল। ইহাতে নীতিবোধের মান নামিয়া গেল। উপনয়ন বা বিবাহানুষ্ঠানে অথবা মন্দিরে নৃত্যগীতাদির জন্য গণিকা অথবা দেবদাসী আনয়ন দূষণীয় বিবেচিত হইত না।

খৃষ্টীয় পাঁচ শতক পর্যন্ত বাল-বিধবা-বিবাহ বিধেয় ছিল। বয়স্কা বিধবাদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। দশম শতাব্দী হইতে ভদ্রঘরের কোনো বিধবা পুনর্বিবাহ করিতে পারিত না। কালক্রমে নিম্নস্তরের লোকের উচ্চবর্ণাভিমান জাগ্রত হওয়াতে, সেখানেও বিধবা-বিবাহ রহিত হইল। এই বিধি এইরূপ দৃঢ়মূল হইয়া গেল যে, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের আইনের আনুকূল্যলাভ করিয়াও[২] অদ্যাবধি ইহা প্রবর্তিত হইতে পারে নাই।

স্মৃতিসমূহ ও তাহার টীকাকারগণ প্রায় একাদশ শতক অবধি প্রচার করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ-বিধবার পক্ষে 'সতী' হওয়া পাপ। পরে ক্ষত্রিয়কুলকে টেক্কা দিয়া ব্রাহ্মণসমাজেও ইহা প্রবর্তিত হইল। সদ্য-বিধবাগণও নানা অনিবার্যকারণে 'সতী' হওয়া বিধেয় মনে করিত। ক্ষেত্রবিশেষে বিধবার আত্মীয়স্বজনগণ বলপ্রয়োগে বিধবাকে 'সতী' হইতে বাধ্য করিত।

১ P. W. H. C., p. 354 ২ ঐ, p. 356

এই সময়ে স্ত্রীলোকগণ সমাজে ছিল শূদ্রের সামিল। ধর্ম-দর্শন ইত্যাদি পাঠে তাহাদের অধিকার ছিল না। মেয়েদের স্বভাবজ ধর্মপ্রবণতাহেতু আর একটি শাস্ত্র গড়িয়া উঠিল—তাহা নব্যপুরাণ। ইহাতে হিন্দুধর্মের মৌলিক আদর্শগুলি ঘরোয়া, সহজ ও চিত্তাকর্ষক কাহিনী-সহযোগে সাজাইয়া কথকতার আকারে প্রচারিত হইতে লাগিল।

দ্বাদশ শতক পর্যন্ত পরদা-প্রথার বিরোধিতা চলিয়াছিল। মুসলমান-আগমনের পর, পরিস্থিতি পরিবর্তিত হইল। বিজেতৃগণের আচার-ব্যবহার ত্রয়োদশ শতক হইতে উনবিংশ শতক পর্যন্ত প্রবল উৎসাহসহকারে অনুসৃত হইতে লাগিল। পরদা প্রথমে প্রবর্তিত হইল সমাজে রাজা-মহারাজার ঘরে, অতঃপর উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে। ইংরেজ আমলের সূত্রপাতে সাক্ষরা বয়স্কা বধূ স্বামীর সংসারে সন্দেহের পাত্রী হইল।

দশম শতাব্দীর পর হইতে হিন্দু-স্মার্তগণ স্ত্রীলোকের প্রতি নির্মম ব্যবহার করিতে লাগিলেন। বলাৎধৃতা বা ধর্মান্তরিতা স্ত্রীলোককে সমাজে গ্রহণ করা হইত না। হাত ধুইয়া শুদ্ধ না-করিয়া, তাহা কাটিয়া ফেলার মতো, এইরূপ স্ত্রী-পুরুষকে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইত। দ্বাদশ শতাব্দী হইতে সমাজে ইহা দৃঢ়মূল হইয়া উঠিল[১]। অবশ্য হিন্দুসমাজকে ইহার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছে বিপুল পরিমাণে। ইহার চরমতম পরিণতি ঘটে পাকিস্তান[১]-প্রতিষ্ঠায়। ইহাতে বুঝা যায়, গত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া সমাজে স্ত্রীলোকের 'শূদ্রত্বের' অপমান ও অবনতি কী চরম সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে।

বাঙালী ব্রাহ্মণ ও কৌলীন্য-প্রথা ঃ আমাদের আলোচ্য চিঠিপত্রে বিবাহবিষয়ক চিঠিপত্রগুলিতে কুলাচার্য মহাশয়গণ লগ্নপত্রে ইসাদ[২] হইয়াছেন ; বিবাহে কুটুম্বিতার নিমন্ত্রণে কুলীনগণের ঝগড়া[৩] চলিতেছে ; অনেক ঘটক, কুলীনের আগমন হইতেছে ; কুলমর্যাদা[৪] পণ গ্রহণ করা হইতেছে ; কুলাচার্যের বিদায়[৪] প্রসঙ্গে পক্ষনির্ণয় করা হইতেছে ; শ্রোত্রিয়গণ কন্যাপণ[৫] দিয়া বিবাহ করিতেছেন ; সিদ্ধান্তী মেলের[৬] অকৃতদার পাত্রের মূল্যনিরূপণ করা হইয়াছে ; বাঁকুড়া অঞ্চলের কুলাচার্যগণ 'কুলমিশ্র' উপাধি গ্রহণ করিতেন—ইত্যাদি বাঙ্গালীব্রাহ্মণের কৌলীন্যপ্রথা সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য সমাহৃত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, নানা বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণগণেরও নানা নিদর্শন এই গ্রন্থের যত্রতত্র পাওয়া যাইবে। ফলতঃ, এতৎসম্পর্কে আদি-অন্ত-নিরূপণের জন্য সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক।

বর্তমানে হিন্দুর প্রধান বর্ণগুলির প্রত্যেকটির অসংখ্য উপবর্ণ আছে। এই সকল শ্রেণীভেদ দেশ, বৃত্তি, সম্প্রদায় ও অন্য নানা কারণ হইতে উদ্ভুত। ঋগ্বেদ ও ব্রাহ্মণের পরে, সংহিতার যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শ্রেণী-বিভাগ সুস্পষ্ট হইয়াছে। এবং

১ P. W. H. O, p 859 ; তু. চি. প. স ২, প-সং ২২৭ ২ ঐ, ঐ ৮ ৩ ঐ, ঐ ১০

৪ ঐ, ঐ ১৬, ১৮ ৫ ঐ, ঐ ২১ ৬ ঐ, ঐ ৬৮

তাঁহাদের গুণ, বৃত্তিও নির্দিষ্ট দেখা যায়। স্কন্দপুরাণে দুই[১] শ্রেণীর ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে—পঞ্চ-গৌড় এবং পঞ্চ-দ্রাবিড়ী। সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, উৎকল ও মৈথিল—আর্যাবর্তের এই পঞ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ 'পঞ্চগৌড়' নামে আখ্যাত, এবং বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণভূভাগস্থ গুজরাট, কর্ণাট, তৈলঙ্গ, অন্ধ্র এবং দ্রবিড়দেশবাসী ব্রাহ্মণগণকে 'পঞ্চদ্রাবিড়ী' বলা হয়। 'পঞ্চগৌড়' কথাটির দ্বারা আর্যাবর্তে পাঁচটি গৌড় ছিল অনুমান করা যায়। বৈদিকযুগে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্য-বোধ হইতে কালক্রমে ভৌগোলিক, সামাজিক ও বিভিন্ন কারণে ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে বিভাগ ও উপবিভাগের সৃষ্টি হয়। অত্রি বলেন, ব্রাহ্মণ দশ[২] প্রকারের। বৃত্তিভেদে যথাক্রমে দেব-, মুনি-, দ্বিজ-, ক্ষাত্র-, বৈশ্য-, শূদ্র-, নিষাদ-, পশু-, ম্লেচ্ছ- এবং চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ।

অত্রি রহস্যচ্ছলে বলিয়াছেন, যাহারা বেদমন্ত্র জানে না তাহারা ব্যাকরণ তর্কশাস্ত্রাদি পাঠ করে, যাহারা শাস্ত্র জানে না তাহারা পুরাণ পাঠ করিয়া অর্থাগম করে, যাহারা পুরাণ পাঠ জানে না তাহারা চাষবাস করে, যাহারা চাষবাসও জানে না তাহারা শিব বা বিষ্ণুর ভক্ত সাজিয়া ভণ্ডভাগবত হয়। অপরার্ক দেবলের উদ্‌ধৃতি দিয়া বলেন, আট প্রকারের ব্রাহ্মণ আছে; তাহাদের উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টের ক্রম এইরূপ: 'মাত্র' অর্থাৎ যিনি ব্রাহ্মণকুলে জাত, বেদের কোনো অংশ পাঠ করেন নাই, বা ব্রাহ্মণের উপযুক্ত কোনো আচারও পালন করেন না। 'ব্রাহ্মণ' অর্থাৎ যিনি বেদের একটি শাখা পাঠ করিয়াছেন। 'শ্রোত্রিয়' অর্থাৎ যিনি বৈদিকশাখার একটি, ষড়ঙ্গসমেত পাঠ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্মান্বিত; 'অনূচান' অর্থাৎ যিনি বেদ ও বেদাঙ্গের অর্থ জানেন, শুদ্ধান্তঃকরণ এবং যজ্ঞ-সম্পাদন করিয়াছেন; 'ভ্রূণ' অর্থাৎ অনূচান হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা যজ্ঞ করেন এবং যজ্ঞান্তে অবশিষ্ট আচার পালন করেন; 'ঋষিকল্প' অর্থাৎ যিনি জগতের এবং বেদের সমস্ত জ্ঞান অধিগত করিয়াছেন এবং মন বশীভূত করিয়াছেন; 'ঋষি' অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মচারী, তপস্বী, সত্যবাদী এবং শাপ বা বর দিতে সমর্থ; 'মুনি' অর্থাৎ যাঁহার নিকট মাটি ও সোনা সমান, কর্মবিরত এবং কামক্রোধাদিবিরহিত। অপরার্ক শাতাতপের বচন উদ্ধার করিয়া বলেন, ছয় প্রকারের লোক ব্রাহ্মণকুলে জাত হইলেও প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহে; যেমন, রাজসেবী, ব্যবসা-বাণিজ্যকারী, বহুযজমানযাজী, গ্রামযাজী, গ্রামে বা নগরে চাকুরীজীবী এবং ত্রিসন্ধ্যাবন্দনাহীন। অনুশাসন পর্ব দেখাইয়াছেন, কোনো ব্রাহ্মণ ভীষণ ঠগ, কেহ কেহ কৃচ্ছ্রব্রতধারী, কেহ চাষী এবং গোপালক, কেহ ভিক্ষাজীবী, কেহ চোর, কেহ প্রতারক, কেহ কুস্তিগির এবং নট; কিন্তু তথাপি মহাভারতের সমাজে এই সকল প্রকার ব্রাহ্মণকেই সম্মান করিতে হইত।

১ ম-বা, পৃ. ৩৮০ ২ Kane, pp. 130-32

'কুলীন' শব্দটি সৎকুলজাত অর্থে শতপথব্রাহ্মণে ও ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে। কুলীন অর্থাৎ সৎকুলজাত হইলেও, অধ্যয়ন ব্যতীত কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। মনু-ভাষ্যে মেধাতিথি বলেন, সৎকুলজাত ও খ্যাতি-ধন-বিদ্যা-শৌচাদিগুণসম্পন্ন ব্যক্তি কুলীন। যাজ্ঞবল্ক্যের টীকায় বিজ্ঞানেশ্বর বলেন, সদ্বংশজাত মাতা ও পিতা হইতে জাত পুত্র কুলীন। রামায়ণের টীকায় রামানুজ বলিয়াছেন, মান্য ও সৎকুলোদ্ভব ব্যক্তি কুলীন। বেদবিহিত আচার ও ধর্মের অনুষ্ঠানকারী কুলীন। মহাভারতে ও পুরাণে ঋষি ও সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় বীরগণকে কুলীন বলা হইয়াছে। শাস্ত্রকার, ভাষ্যকার ও টীকাকারগণ ধনে-মানে-কুলে-শীলে শ্রেষ্ঠকে কুলীন বলিয়াছেন। পরবর্তী কুলাচার্যকারিকায় আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপ ও দান এই নবগুণবিশিষ্ট ব্যক্তি কুলীন বলিয়া স্বীকৃত। বঙ্গদেশে এইরূপ শাস্ত্রীয় লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তি সময়ে সময়ে রাজসম্মান লাভ করিয়া 'কুলীন' হইয়াছিলেন। কালক্রমে সেইসকল কুলীনবংশধরগণ কৌলীন্যগুণসম্পন্ন না-হইয়াও কেবল 'মহাবংশজাত' বলিয়াই কুলীনরূপে চিহ্নিত হন। তাঁহারা বিবাহে যে-প্রথায় দান-গ্রহণ সম্পন্ন করেন তাহাই 'কৌলীন্য-প্রথা' নামে খ্যাত হয়। এতদ্ব্যতীত এদেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি জাতির কোনো কোনো শ্রেণীর মধ্যে কেহ কেহ কুলীন বলিয়া বিদিত[১]।

বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রধানতঃ এই কয়টি শ্রেণী[২] আছে—সাতশতী, রাঢ়ী, বারেন্দ্র, মধ্যশ্রেণী, পাশ্চাত্য বৈদিক, দাক্ষিণাত্য বৈদিক ও গ্রহ-বিপ্র।

প্রচলিত বিশ্বাস মতে, কান্যকুব্জের অন্তর্গত 'কোলাঞ্চ' হইতে পঞ্চব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে আগমন হয়। তৎপূর্বে এখানে 'সাত শত' ঘর ব্রাহ্মণের বসবাস ছিল। তাঁহারা 'সাতশতী' নামে পরিচিত। এই সাতশতীগণের এক সময়ে সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল, এবং তাঁহারাই সমাজের নেতা ছিলেন। নিরগ্নিক[৩] সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ বেদবিধানে বঞ্চিত; পক্ষান্তরে, তাঁহারা কুলাচারী, আভিচারিক-ক্রিয়ানিপুণ, শান্তিকার্যে পটু ও গুণবান্ বলিয়া রাঢ়ীয় কুলজীতে কথিত। মতান্তরে, তাঁহারা ছান্দোগ ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ, সামবেদী প্রাচীনতম বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ[৩]। প্রবাদ, সাগ্নিক পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনে তাঁহাদের প্রভাব হ্রাস হইয়া যায়, এবং তাঁহারা সমাজে হেয় হইয়া পড়েন। পরে, তাঁহাদের মধ্যে কতক রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক সমাজভুক্ত হইয়া গিয়াছেন—কতক ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলে গিয়া বসবাস করিয়াছেন—কতক নিকৃষ্ট জাতির পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়াছেন—কতক অগ্রদানী ও ভাট হইয়া গিয়াছেন। বর্তমানে সাতশতী ব্রাহ্মণের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে।

প্রবাদ, আদিশূরের সময়ে যে পঞ্চব্রাহ্মণ পশ্চিমপ্রদেশ হইতে আগমন করেন তাঁহাদের

১ বি-কো ৪, পৃ ৩০৬-৭ ২ বা. পু, পৃ ৯৬-৯৯ ৩ ম. বা, পৃ ৩১১

সন্তানগণই বল্লালসেনের রাজ্যকালে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র নামে পরিচিত হন। যাঁহারা রাঢ়ে অবস্থান করেন তাঁহারা 'রাঢ়ী' এবং যাঁহারা বরেন্দ্র অঞ্চলে বসবাস করেন তাঁহারা 'বারেন্দ্র'।

রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁহারা কৌলীন্যপ্রাপ্ত হন নাই সমাজে তাঁহারা হীনপ্রভ হইয়া পড়েন। সুতরাং তাঁহারা রাঢ় ও বঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কৈবর্ত-প্রধান মেদিনীপুর অঞ্চলে এবং মল্ল প্রভৃতি জাতির আবাসভূমি বাঁকুড়া-অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেখানে রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া আপনাদের অবস্থার উন্নতি বিধান করেন। মধ্যশ্রেণীগণ তাঁহাদের সন্তান। তাঁহারা উৎকল, দাক্ষিণাত্য বৈদিক, এবং সাতশতী ব্রাহ্মণদিগের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সমাজে একটি পৃথক্ শ্রেণীরূপে পরিগণিত হন। সমাজে তাঁহারা নিম্নস্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও তাঁহাদের মধ্যে অনেক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত জন্মিয়াছেন।

পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনের পরে পশ্চিমপ্রদেশ হইতে যে-সকল বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আগমন করেন তাঁহারা পাশ্চাত্য বৈদিক নামে অভিহিত হইয়াছেন। পূর্ববঙ্গেই অধিকাংশ পাশ্চাত্য বৈদিকগণের বাস ছিল। বঙ্গদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতে দাক্ষিণাত্য বৈদিকের বাস। তাঁহারা সম্ভবতঃ দ্রবিড় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

গ্রহ-বিপ্রগণ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের কুলপঞ্জিকা মতে, গৌড়রাজ শশাঙ্ক (খৃ. ৬০৬) সরযূ-নদীতীরবাসী জপ-যজ্ঞ-পরায়ণ দ্বাদশ ব্রাহ্মণ আনাইয়া গ্রহযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন এবং রোগমুক্ত হন। তাঁহারা সপরিবারে গৌড়দেশে বাস করেন। তাঁহারা শাকদ্বীপবাসী মার্তণ্ডাদি আটজন মুনির বংশধর। গরুড় শাকদ্বীপ হইতে তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণকে মধ্যদেশে আনয়ন করেন[১]। এতদ্ব্যতীত বঙ্গদেশে মৈথিলী, জিঝোতিয়া, মাথুরী, উৎকল প্রভৃতি ব্রাহ্মণও আছেন।

পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধির 'সম্বন্ধনির্ণয়', মহিমাচন্দ্র মজুমদারের 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' এবং নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে'র 'ব্রাহ্মণকাণ্ডে' বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ-আগমনাদির সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কুলজী আছে বিস্তর। সমস্তগুলির উপর আস্থা স্থাপন করিতে না-পারিলেও বিচারপূর্বক উহাই অবলম্বন করিয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের কথা জানিতে হইবে। এই বিষয়ে 'মধ্যযুগে বাঙ্গলা'-গ্রন্থের লেখক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তদীয় গ্রন্থের (১৩১০) অধ্যায়বিশেষে ক্ষুরধার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি লইয়া সমালোচনা ও সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণসমাজে কৌলীন্য-প্রথা প্রচলিত আছে। বারেন্দ্র ও রাঢ়ীয় কুলাচার্যগণ কুলীনদের বংশাবলী লিখিয়া রাখিতেন। অনুমান হয়, প্রাচীন জনপ্রবাদ অবলম্বন করিয়া কুলশাস্ত্রগুলি রচিত হইয়াছিল। বঙ্গে ব্রাহ্মণগণের

১ বা. যে. ই., পৃ ১৮৩

আগমন, তাঁহাদের বংশপরম্পরা ও বিবাহ-সম্বন্ধ—এই সকল জটিল প্রসঙ্গ কুলশাস্ত্রের প্রধান উপজীব্য।

আদিশূর: বল্লালসেনের মাতা বিলাসদেবী অপরমন্দারের শূরবংশের কন্যা; সুতরাং, বল্লালসেন শূর-বংশের দৌহিত্র। রণশূর রাজেন্দ্রদেব চোলের সময়ে দক্ষিণরাঢ়ের অধিপতি ছিলেন। রামপালের সামন্তরাজা ছিলেন অপরমন্দারের লক্ষ্মীশূর।—এই সকল জ্ঞাত ঐতিহাসিক তথ্যের সহিত অদ্যাবধি 'অপরিজ্ঞাত' তথ্য পরিবেশন করা যায়: অপরমন্দার বর্তমানে হুগলীজেলার গড়মান্দারণ। ইহা অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের (খৃ. ১১৩৫) 'আরম্যানগর'[১] বা বর্তমানের আরামবাগ[১] শহরের নয় মাইল নৈঋতে অবস্থিত। শূরবংশের নামের সহিত বিজড়িত অপরমন্দারের সন্নিহিত অঞ্চলে অন্ধ্রা সাতবাহনগণের, গুপ্তযুগের, পালযুগের, সেনযুগের, পাঠান-মোগল আমলের অসংখ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন ইতস্তত: ছড়াইয়া আছে।

রণশূর ও লক্ষ্মীশূর স্থানৈক্যবশতঃ একই বংশজাত হওয়া সম্ভবপর। লক্ষ্মীশূর রণশূরের উত্তরপুরুষ বলিয়াই মনে হয়। তাঁহাদেরই আদিপুরুষ কেহ, 'আদিশূর' নামে পরিচিত হইয়া থাকিবেন। দক্ষিণরাঢ়ে তিনি বৌদ্ধ পাল-আধিপত্য নির্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই বঙ্গদেশে কোলাঞ্চল হইতে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন ঘটিয়াছিল বলিয়া প্রচলিত প্রবাদ। এইসূত্রে দক্ষিণরাঢ়ে অপরমন্দারকে কেন্দ্র করিয়া 'শূরে', 'পুড়শূরো' বা 'শূঁউরো',[২] ইত্যাদি এই পর্যায়ের গ্রামনাম এবং 'শূর'-পদবীক বংশের কুলজী ইত্যাদি ধরিয়া অনুসন্ধান চালাইলে বাঙ্গালার শূর-বংশের পরিচয় মিলিয়া যাইতে পারে। প্লিনীর বর্ণনা মতে, শূরগণ শবর জাতীয় হওয়া অসম্ভব নহে[৩]। 'পঞ্চব্রাহ্মণের' 'পঞ্চ' শব্দটি মনে হয়, 'পঞ্চগৌড়', 'পঞ্চদ্রবিড়'—এইরূপ 'পঞ্চ' সংখ্যাবাচক শব্দ হইতে লোকবিশ্বাসে 'পঞ্চব্রাহ্মণে' রূপান্তরিত হইয়া কালেকালে 'পঞ্চগ্রামীর' মতো তথাকথিত তথ্যনিষ্ঠ সুনির্দিষ্ট রূপ পাইয়া কুলশাস্ত্রে কায়েম হইয়াছে।

প্রাচীন বাঙ্গালার অপরমন্দারের (বর্তমান গড়মান্দারণ) শূরবংশ সুপরিচিত হইলেও, 'আদিশূর' নামক প্রকৃত বা ছদ্ম কোনো রাজার, অথবা শূর-বংশের প্রথম রাজার সম্পর্কে কোনো ঐতিহাসিক নিদর্শন[৪] অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। একমাত্র বাঙ্গালার কুলপঞ্জিকাই অযত্নে, শূরসেনাদি বিভিন্ন নামে তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া আসিতেছে। পক্ষান্তরে, মৈথিল পণ্ডিত বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার ন্যায়কণিকা[৫]-গ্রন্থে ৮৯৮ বিক্রম সংবতে বা ৮৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার

১ বা. ই., প্র-ভা, পৃ ২৮১ ; বা. দে. ই., পৃ ৭৩ ২ ব. সা. স, ৮, ১৩২১, 'শূরনগর' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য

৩ বা. পু., পৃ ৪৪-৪৫ ৪ H. B., Vol. I, pp. 625-26

৫ J. A. S. Let. Vol. XVIII. 1962, no. 11, pp. 176-78

সমকালীন পূর্বভারতের এক ব্রাহ্মণ-রাজা 'আদিশূরের' উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি মিথিলায় ও বাঙ্গালায় রাজত্ব করিতেন— পালরাজগণের সামন্তরাজরূপে। মিথিলায় তাঁহার নামে কোলাঞ্চ হইতে ব্রাহ্মণ-আনয়নের কাহিনী জড়াইয়া আছে। একাদশ শতকের তৃতীয় বিগ্রহপালের বনগ্রাম-তাম্রশাসন[১] সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, কৌলীন্য-প্রথা ও কুলপঞ্জিকা রক্ষা করার পরম্পরা মিথিলায় প্রচলিত ছিল। মৈথিল ব্রাহ্মণ-গণ তাঁহাদের আদিপুরুষ কোলাঞ্চ ব্রাহ্মণদের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক বিশেষভাবে প্রচার করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন। 'কোলাঞ্চ' বা কোল-অঞ্চলের ভৌগোলিক সংস্থান অদ্যাপি নির্ণিত হয় নাই।[২] কেহ কেহ মনে করেন, বাঙ্গালার কৌলীন্য-প্রথা মধ্যযুগে মিথিলা[৩] হইতে ধার করা হইয়াছে। মিথিলার গঙ্গৌলী মূলগ্রামী ব্রাহ্মণের সহিত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-সমাজের 'গাঙ্গুলী' অভিন্ন। শ্রীহট্টের উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে মৈথিলপ্রভাব খুব বেশী।

কেহ কেহ মনে করেন, বাঙ্গালী আদিশূর বা বল্লালসেন কৌলীন্য-প্রথা প্রবর্তন করেন নাই। উত্তরবিহারবাসী ব্রাহ্মণদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের কতিপয় বিদ্যাস্থানের শিক্ষিত ব্রাহ্মণ যুবকগণের হস্তে কন্যা-সম্প্রদানের অতিরিক্ত আগ্রহ হইতে স্বাভাবিক নিয়মে ইহার জন্ম। মিথিলা হইতে কালে উহা বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত হয়।[৪]

কেহ কেহ আরো বলেন,[৫] বাঙ্গালার কুলীন-ব্রাহ্মণের আগমন-সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীটি সেনযুগে দক্ষিণভারত হইতে এদেশে আমদানি হইয়াছিল। কিন্তু, মনে হয়, কুলীনত্বের পরম্পরা সংজ্ঞাভেদে আর্যসভ্যতার প্রায় সমকালীন। বাঙ্গালাদেশে আর্য ব্রাহ্মণ্যসভ্যতা বিস্তারের পর হইতে যুগেযুগে 'কুলীন'-শব্দের অর্থ ও প্রয়োগে বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে মাত্র। ষষ্ঠ শতকের বাঙ্গালা শিলালেখে 'চট্ট', এবং ওড়িষ্যায় অষ্টম শতকের শিলালেখে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের 'বন্দ্য' বংশের উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় দশম শতকে দক্ষিণরাঢ়ের শূর-শাসিত অপরমন্দারের সন্নিহিত ভুরিশ্রেষ্ঠীর ব্রাহ্মণগণের কৌলীন্যগর্বের ও আচারশুচিতার প্রমাণ

১ Epi. Ind., vol. XXIX, 1951-52, pp. 52-54

২. 'কোলাঞ্চ' কোল (মতান্তরে, গোণ্ড) অঞ্চল হইতে পারে। প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয় যে, কোলদের অঞ্চল ছোটনাগপুরে আচারসম্পন্ন কোল-পুরোহিত বা 'পাহান'গণ বর্তমানেও 'জনউ' বা যজ্ঞোপবীত গ্রহণ ও বৃষভারোহণ করিয়া থাকেন।

৩ পক্ষান্তরে, মিথিলা দেশ ও মৈথিল অক্ষর দেখিলে ইহাকে বাঙ্গালাদেশের উপনিবেশবিশেষ বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়। মৈথিল ব্রাহ্মণগণও বাঙ্গালী-ব্রাহ্মণদের মতো মৎস্য-মাংসভোজী।

৪ আমাকে লিখিত ড. দীনেশচন্দ্র সরকারের ১-১-১৯৬৪ তারিখের পত্র ; প্রবা., ফা, ১৩৪৮, পৃ ৫৭১-৭২

৫ ঐ ৮-৩-১৯৬৪ ঐ, ঐ

আছে ভট্ট শ্রীধরের ন্যায়কন্দলীতে। একাদশ শতাব্দীতে উত্তররাঢ়ের সিদ্ধল[১]গ্রামের সাবর্ণগোত্রীয় ভট্টভবদেবের কুলপ্রশস্তি লিপি মিলিয়াছে। কৃষ্ণমিশ্র প্রবোধচন্দ্রোদয়-নাটকে কুলীনব্রাহ্মণের ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।[২] সুতরাং এদেশের কৌলীন্য-প্রথা বল্লালসেনের (১১৫৮) বহুপূর্ব হইতেই সুপ্রচলিত ছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শূরবংশ ও সেনবংশের ঘনিষ্ঠতা বাঙ্গালী-ব্রাহ্মণের কৌলীন্য-প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে বিশেষ প্রেরণা যোগাইয়া থাকিবে; বিশেষতঃ, পশ্চিমবঙ্গের আদিম শবর, পুলিন্দাদি জাতির অবলম্বিত জৈন-বৌদ্ধ পরিবেশে।

আমার মনে হয়, পালপূর্ব যুগের বাঙ্গালী আদিশূর এখনও নিরুদ্দেশ। বল্লালসেন কৌলীন্য-প্রথার প্রবর্তক নহেন; তিনি বিশিষ্ট সংস্কর্তা ও সম্প্রদাতা বটেন। ষোড়শ শতকে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম 'বল্লালসেন্যা' কৌলীন্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্রায় সমকালীন কবি দৈবকীনন্দনসিংহ তাঁহার গোপালবিজয়-গ্রন্থে উদার 'কুলীন সাপের' কথা বলিয়াছেন। সুতরাং বাঙ্গালার এই কৌলীন্য-প্রথার প্রাচীনতর পরম্পরা অস্বীকার করা চলে না।

বাঙ্গালাদেশে প্রবর্তিত কৌলীন্য-প্রথার সহিত আদিশূর, ধরাশূর, ক্ষিতিশূর, শ্যামলবর্মণ, হরিবর্মণ, বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন, দনুজমর্দনদেব বা দনুজমাধব প্রভৃতির নাম পরম্পরাগতভাবে জড়াইয়া আছে। আধুনিক গবেষকগণ কৌলীন্য-প্রথার সহিত তাঁহাদের সম্পর্কই অস্বীকার করিতেছেন। তাঁহাদের মতে, ইহা যুগের প্রয়োজনে সমাজের স্বয়ংক্রিয় অবদান। কিন্তু প্রাচীন পরম্পরা ও বাঙ্গালীর বিভিন্ন বর্ণ ও উপবর্ণের বিবর্তন ও সমাজব্যবস্থা বিচার করিয়া এই যুক্তি মানা যায় না। অবশ্য কুলজী-বিধৃত সকল উক্তিই অভ্রান্ত নহে। পক্ষান্তরে, কুলজীবিধৃত সকল পরম্পরাও অস্বীকার যায় না। সেকালে দেশের রাজাই ছিলেন প্রধান সমাজপতি। সমাজে প্রবর্তিত বিধি-নিষেধের সংশোধন-সংযোজন সাধনে তাঁহাদের হাত থাকাই স্বাভাবিক। সুতরাং পূর্বোক্ত নৃপতিবৃন্দ কৌলীন্য-প্রথার প্রবর্তক না-হউন, তাহার কালোচিত সংস্কার ও যোগ্যপাত্রে মর্যাদা বিতরণ করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ করা চলে না।

এদেশে সুপ্রাচীনকাল হইতেই ব্রাহ্মণের বসবাস ও প্রাধান্য ছিল[৩]। পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগকে 'আর্য ব্রাহ্মণ', 'বেদমার্গী আর্য' ও 'ব্রাত্য আর্য' এইভাবে ভাগ করিয়াছেন।

১ বর্তমান নামুরের সন্নিহিত বাক্‌পাড়া-সোদেলেপুর গ্রাম হইতে পারে।

২ প্রা. বা. বা, পৃ ২৮, ১৫, ২৮-২৯

৩ বা. সা. ই., ১ম, পূর্ব, পৃ ২০: "অনেক দেবতার পূজারী ছিলেন প্রাক্-ব্রাহ্মণ্য ব্রাহ্মণ, এবং তাঁহারা পরে ব্রাহ্মণের মর্যাদা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। চণ্ডালেরা হয়ত এই রকম ভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অন্যতম। পুরাণের বিশ্বামিত্রের কাহিনী এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।" আরও লক্ষণীয় যে (বা. দে. ই, পৃ ১৫২-৫৩), বাঙ্গালার সহজতন্ত্রে পঞ্চ 'কুল' যথাক্রমে: ডোম্বী, নটী, রজকী, চণ্ডালী ও ব্রাহ্মণী।

গুপ্তযুগে[১] বাঙ্গালার সর্বত্র ব্রাহ্মণ-বসবাসের কথা জানা গিয়াছে। বহুপরবর্তী কালেও বাঙ্গালার বাহির হইতে বহু ব্রাহ্মণ এদেশে আসিয়া বসবাস করেন নানাশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া। রাজা অথবা ধনী জমিদারগণ ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি অথবা সমগ্র গ্রাম দান করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতেন। এই সকল প্রদাতা ও প্রদাত্রীগণের মধ্যে আমরা অসংখ্য হিন্দু-মুসলমানের রাজকীয় উদার বদান্যতার পরিচয় পাই। আদিশূরাদি হিন্দু রাজা এবং ভূম্যধিকারীদের মতো, ব্রাহ্মণের আশিসপ্রার্থী বাদশাহ, ভিহিদার, আয়মাদার, তালুকদার মুসলমান স্ত্রী-পুরুষের নাম আলোচ্য গ্রন্থের দলিল-দস্তাবেজ ও পরিশিষ্টাংশে দেখা যাইবে।

কুলগ্রন্থ ও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-সমাজ : কুলগ্রন্থে আদিশূরের ব্রাহ্মণ-আনয়নের কাল ৬৫৪ হইতে ৯৯৪ শক। বল্লালের সময় কুলপ্রথা পুনর্বিন্যস্ত হইবার কালে কনৌজাগত ব্রাহ্মণগণের অধস্তন অষ্টম হইতে পঞ্চদশ পুরুষ পর্যন্ত ছিলেন বলিয়া দেখানো হইয়াছে। কিন্তু, এই হিসাবেও গোলযোগ থাকিতে পারে। কুলগ্রন্থের মতে, শূরবংশের প্রথম রাজা কনৌজের কোলাঞ্চল হইতে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য ব্রাহ্মণ আনেন এবং পরবর্তী রাজন্যগণ তাঁহাদিগকে ভূমিদান করিয়া প্রথমে গৌড়ের নিকটবর্তী স্থানে, ও পরে, তাঁহাদের অনেক বংশধরকে রাঢ়ে স্থাপিত করেন। পঞ্চব্রাহ্মণের নাম লইয়াও কিছু গোলযোগ আছে। 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ'-রচয়িতা গৌড়মণ্ডলে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের যে-পরিষ্কার নামতালিকা দিয়াছেন, তাহাতে নামঘটিত অনৈক্য পরিহার করা হইয়াছে। তাঁহার মতে, শাণ্ডিল্যগোত্রে ক্ষিতীশ, ভরদ্বাজগোত্রে তিথিমেধা, কাশ্যপগোত্রে বীতরাগ, বাৎস্যগোত্রে সুধানিধি ও সাবর্ণগোত্রে সৌভরি।

প্রবাদ, রাজা আদিশূরের পরে পালবংশ গৌড়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, ভূশূর রাঢ়ে আসিয়া 'পুণ্ড্র' নামে[২] নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। শূরবংশের সহিত আগত ব্রাহ্মণদল পরে 'রাঢ়ীয়'-ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন। যাঁহারা বরেন্দ্রভূমে রহিলেন তাঁহারা পরে 'বারেন্দ্র' নামে অভিহিত হইলেন। শাণ্ডিল্যগোত্রে দামোদর, কাশ্যপগোত্রে কৃপানিধি, ভরদ্বাজগোত্রে গৌতম, বাৎস্যগোত্রে ধরাধর এবং সাবর্ণগোত্রে রত্নগর্ভ 'বারেন্দ্র', পক্ষান্তরে, শাণ্ডিল্যগোত্রে ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপগোত্রে দক্ষ, বাৎস্যগোত্রে ছান্দড়, ভরদ্বাজগোত্রে শ্রীহর্ষ এবং সাবর্ণগোত্রে বেদগর্ভ 'রাঢ়ী'নামে অভিহিত হইলেন।[৩]

কোলাঞ্চলের ব্রাহ্মণপঞ্চের বংশধরগণ ক্ষিতিশূরের সময়ে রাঢ়ে ৫৬খানি গ্রাম পাইয়াছিলেন বলিয়া 'পাঁচ গোত্র ছাপান্ন গাঁই, ইহা ছাড়া বামুন নাই'— এই প্রবাদ

---

১ বা. দে. ই., পৃ ১৪১-৪২

২ অপরমন্দারের বা বর্তমানের গড়মান্দারণ হইতে সোজা পূর্বদিকে আট ক্রোশ দূরে মুণ্ডেশ্বরী নদীর তীরে বর্তমানের 'পুঁড়ো'-গ্রাম প্রাচীন 'পুণ্ড্র' হইতে পারে।

৩ ম. বা, পৃ ৩৮৮-৯২

প্রচলিত হয়। বারেন্দ্রেরা এই ছাপার গাঞীভুক্ত নহেন। বাঙ্গালার প্রাচীনতম ব্রাহ্মণগণও গ্রাম পান নাই। প্রাচীনবঙ্গে সারস্বত বা সাতশতী ও গৌড় দুই সমাজের ব্রাহ্মণই বাস করিতেন। গৌড়মণ্ডলের ব্রাহ্মণদের কৌশিকাদি উপাধি ছিল; রাঢ়দেশের প্রাচীনতর[১] ব্রাহ্মণগণ সারস্বত বা পরবর্তী কালে 'সপ্তশতী' বলিয়া পরিচিত[১] হইয়াছেন। সেকালের কোনও বারেন্দ্র-ঘটক সাতসতী-সংসর্গ হেতু পরবর্তী রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণকে হীন প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রাঢ়ীয় ও সপ্তসতী-সংসর্গে উৎপন্ন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ সামবেদী হইলেন। বৈমাত্র রাঢ়ী-বারেন্দ্র ঝগড়া অনেককাল চলিয়াছিল।

১ বাঙ্গালাদেশের চণ্ডীচরণপরায়ণ 'সাতশতী' ব্রাহ্মণগণকে আমি 'সাতবাহন'-'কুলের' মহারাষ্ট্র বা আন্ধ্র-জাতীয় 'বৃষল' বা আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করি। পরবর্তী কালে 'মধ্যদেশবিনির্গত' দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের সহিত ইহাঁদের গোত্র-প্রবরে ঐক্য (স-নি, পৃ. ৫২) থাকায় এবং বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে ও বিবাহে বাগ্‌দান-পদ্ধতির মিল হেতু (গৌ. ব্রা, পৃ. ২০৯) আমার এই অনুমান সমর্থিত হয়। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির দিগ্বিজয়ের সময় খৃষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতকে তাঁহারা 'আনূপ'দেশে আসিয়া থাকিবেন। পূর্বতন গবেষকগণের 'সাত শত' ঘর প্রাচীন ব্রাহ্মণ-বসতির ইতিকথা নানা কারণে গ্রহণযোগ্য নহে। আমার মনে হয়, 'সাতশতী' শব্দের বানান আসলে হইবে 'সাতসতী'। সাতকর্ণির সহিত বা সময়ে আগত, এই অর্থে ইহা 'সাতসৎ'। 'সৎ' শব্দটি পাণিনির মতে, ক্রিয়াযোগে গতিসংজ্ঞক (৩. ২. ১২৭)। সাতসতী ব্রাহ্মণগণের উপনিবিষ্ট এই 'আনূপ'দেশ মূলতঃ ছিল দক্ষিণরাঢ়ে আমোদর-দারকেশ্বর-মুণ্ডেশ্বরী-অববাহিকায় অপরমন্দার (গড়মান্দারণ), 'আসিকনগরী' (আসনৌরি), অসুরগড়-সাতবাহন-সালেপুর, ডহরকুণ্ড, বালী, নকুণ্ড, বিক্রমপুর, গুজরাট, কানপুর, খানাকুল (হুগলী), ভুরশুট (হাওড়া) ইত্যাদি কলিঙ্গ-সীমান্তের এই অঞ্চল জুড়িয়া। সন্নিহিত অঞ্চলের রত্নানু-তীরবর্তী দামিন্যা-নগরীর (বর্ধমান॰) কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম 'সালিবাহন' রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। মুকুন্দরামের বর্ণিত কাহিনী হইতে স্থানীয় ইতিহাসের প্রভূত ইঙ্গিত মিলিতেছে। সেন-পূর্ব যুগে সালিবাহন শকাব্দের একমাত্র প্রয়োগ পাওয়া যাইতেছে ভুরশুটের ভট্ট শ্রীধরের গ্রন্থে। এই বিষয়ে সর্বাধুনিক ঐতিহাসিক গবেষণা 'Home of the Satavahanas' প্রবন্ধ (J. I. H., vol. XLI, p. III, no. 123, Dec. 1963, pp. 749-755) এবং মদীয় স্বতন্ত্র প্রবন্ধ 'আরম্যানগর' দ্রষ্টব্য।

বর্তমানে অপরমন্দার বা গড়মান্দারণের সুবিশাল ও সুপ্রাচীন স্তূপ খনন করিলে শূরবংশের প্রকৃত ইতিহাস আবিষ্কৃত হইবে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। গড়মান্দারণের কিছু-পূর্বে দারকেশ্বর নদীর তীরে সালেপুর গ্রামের বিস্ময়কর স্তূপও অবিলম্বে খনন করা প্রয়োজন। এখানে সালিবাহন-রাজার সুপ্রাচীন বিশাল 'অসুর'-গড়ের অবশেষ অদ্যাপি বর্তমান। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে এই গড়ের উল্লেখ ও বন্দনা আছে। নানা প্রমাণে আমি ইহাকে আন্ধ্র সাতবাহন রাজগণের সুপ্রতিষ্ঠিত রাজধানী বা দুর্গাবশেষ বলিয়া মনে করি। ইহার কিঞ্চিৎ উত্তর-পূর্বে গড়-মাধবপুরে গুপ্তযুগের একাধিক স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা এখানে সাতবাহন-রাজধানীর পরিপূরক প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করা যায়। গড়বাড়ীর সন্নিকটে প্রাচীন-পরিখাবেষ্টিত বিক্রমপুর গ্রাম। এখানে অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থান (দ্র. মহানাদ, পৃ ২৪) বলিয়া প্রবাদ। পরবর্তী কালে রামপালের সহায়ক সামন্ত বিক্রমরাজের বিক্রমপুর-রাজ্য এখানেই অবস্থিত ছিল প্রমাণ করা যায়। সন্নিহিত 'ময়ী'-গ্রামে 'রাজার পোতা'ও খনন করা কর্তব্য। এখানে রামপালের আর-এক সামন্তরাজ উচ্ছাল- প্রদেশের ময়গলকে

সাতসতী ব্রাহ্মণদের গাঞী সম্পর্কে মতভেদ আছে—কাহারও মতে ২৮, কাহারও মতে ৪২২। আদিশূর বা ধরাশূর অথবা বল্লালসেন প্রধান ২৮জনকে যে ২৮খানি গ্রাম দান করেন, দেশজ নামযুক্ত সে গ্রাম-তালিকা এই : সাগাই, সুরাই, নাল্‌সি, জলাই, হেলাই, কালাই, দাই, বান্‌সি, বাণ্টুরা, ধান্‌সী, কাটানি, কুশল, উজ্জ্বল, কাশ্যপ, কাঞ্চারী, লতারি, পিথারি, বাতারী, চেক্ক, বাগরাই, উল্মুক, ঝর্ঝর, মগ্মুক, ফর্ফর, কম্বপ, ষড়ল, চেরচেরাই, ঘাস, বালথুবি। পরবর্তী কালে নগড়ি, দগড়ি, হামু, বাপাড়ি, কেয়ু, কড়ারী, বৈজুড়ী ইত্যাদি নাম যুক্ত করিয়া ৪২২ সংখ্যা পূরণ করা হইয়াছে ; তন্মধ্যে বেলাড়ী আধখানি।

ভূশূরের পুত্র ক্ষিতিশূর রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণকে ৫৬ খানি (মতান্তরে, ৫৭ খানি) গ্রাম দিলেন। সেই গাঞীগুলি এই : বন্দ্য বা বাঁড়ুর, কুসুমকুল, কুলভ, গড়গড়, ঘোষল, সেউ, দীর্ঘ, কর্তী, মাস, বড়া, কেশরকোণা, পারি, বসু, কুশ, ঝিকড়া, বোকট্ট, ডিণ্ডী, রায়, মুখটী, সাহুড়া, চট্ট বা চাটুতি, গুড়, শিমলা, পালধি, হড়, দগ্ধবাটী (বা, পোড়াবাড়ী), পোষ, তৈলবাট (বা, তিলোড়া), অম্বুল, ভুরি, পলসা, পক্কট, মূল, পীতমুণ্ড, পিপ্পল, ঘোষ, পূর্ব, পূতিতুণ্ড, বাপুল, হিজ্জল, কাঞ্জি, কাঞ্জা, চতুর্থ, মহন্ত, শিমুল, গাঙ্গো, ঘণ্টা, পালি, বালি, কুন্দ, নন্দি, সিদ্ধ, সান্তা, দায়া, শির বা শিহর, এবং নাঞি। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই সকল গ্রামের ভৌগোলিক সংস্থান-নিরূপণে ক্ষেত্রবিশেষে গোলযোগ ঘটাইয়াছেন। পাঠোদ্ধারে বা মূলে গোলযোগ না-থাকিলে, বর্তমানেও এই গ্রামগুলিকে আলোচ্য গ্রন্থ-বিধৃত স্থান-নামের নির্দেশানুসারে রাঢ়দেশে খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত নহে।

কুলাচার্য হরিমিশ্রের মতে, ৫৬খানি গ্রামের মধ্যে প্রথম ১৬খানি ভট্টনারায়ণের ১৬ পুত্রকে, তাহার পরের ৪খানি শ্রীহর্ষের ৪ পুত্রকে, পরবর্তী ১৪খানি দক্ষের ১৪ পুত্রকে, তাহার

পাওয়া যাইবে। পাল-যুগের 'চম্পিতলা'-বিহার, বিজয়সেনের 'প্রদ্যুম্নেশ্বর' এবং রামপালের 'পদুবম্বার সোম রাজা'কে এই অঞ্চলেও পাওয়া যাইতে পারে। প্রাচীন 'আরম্যানগর' এখনকার 'মেতুলের বন' বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এখানেই দারকেশ্বরের পুরাতন খাত অবস্থিত। এখানকার 'পাকা-পোলের' প্রতিক্রিয়াশীল পীরকে বন্দনা করিয়াছেন বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যকার। এই মরা সোঁতা—বর্তমান 'ঘসিংঘাটা'-খালের উত্তরতীর ব্যাপিয়া 'ঘসিংঘাটা-সরাই', পুরাতন 'আরম্যানগরে'র উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। এই ঘসিংঘাটা সরাই-এর উল্লেখ একাধিক ধর্মমঙ্গলকার করিয়া গিয়াছেন। (বর্ধমান-সাহিত্যসভায় রক্ষিত মৎ-সংগৃহীত রাম বাঁড়ুজ্জের ধর্মমঙ্গল দ্রষ্টব্য।)

সাতবাহন-কুলের, শূর-বংশের, পাল-বংশের ও সেনরাজগণের অবস্থান বিচার করিতে চাহিলে, সন্নিহিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গ্রামগুলিসমেত, বাদশাহী সড়কের উভয় দিকে অবস্থিত আলোচ্য অঞ্চলে সঠিক্ প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালানো অবশ্যকর্তব্য বলিয়া মনে করি। একালেও রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমি অপরমন্দারকে ঘেরিয়া ত্রিকোণমণ্ডলে অবস্থিত আলোচ্য অঞ্চলে 'সাতসতী'-ব্রাহ্মণগণের অবস্থিতি এবং বাঙ্গালী-কৌলীন্যের প্রথম স্বীকৃতি, বাঙ্গালী-ঐতিহ্যে আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না।

পরের ১১খানি ছান্দড়ের ১১ পুত্রকে এবং শেষ ১১খানি বেদগর্ভের ১১ পুত্রকে প্রদত্ত হয়। প্রবাদ, হরিমিশ্র সেনবংশের শেষ রাজা দনুজমাধবের সমকালীন লোক—ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগের।

নবাগত কনৌজিয়া ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালার পুরাতন ব্রাহ্মণের অনাচার দেখিয়া প্রথমে তাঁহাদের সহিত মেলামেশা করিতে চাহেন নাই। পরে ঘনিষ্ঠতা বাড়িলে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই বিষয়ে বিভিন্ন কুলগ্রন্থে নানারূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। অযাজ্য-যাজী এবং শূদ্রের শ্রাদ্ধে প্রতিগ্রাহী প্রাচীন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের দল এখন অগ্রদানী, ভাট, বর্ণের ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। খাঁটি সাতসতী দেশে অনেক স্থানে এখনও আছেন।[১]

কুলপ্রথা ঃ ক্ষিতিশূরের অনেক পরে ধরাশূরের সময়ে রাঢ়ীশ্রেণীর মধ্যে সর্বপ্রথম কুলবিধি[২] প্রবর্তিত হয় বলিয়া প্রবাদ। পূর্বে সকল ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় নামে খ্যাত হইতেন। এই সময়ে কেবল রাঢ়ীয়গণই কুলাচল ও সৎ-শ্রোত্রিয় এই দুই ভাগে বিভক্ত হইলেন। বন্দ্য, মুখুটি, চট্ট, কাঞ্জিলাল, গাঙ্গুলী, হড়, গড়গড়ি, পূতিতুণ্ড, ঘোষাল, কুন্দলাল, চতুর্থী, রায়ী, কেশরকুণি, দীর্ঘাঙ্গী, পারিহাল, কুলভী, মহিন্ত্যা, গুড়, পিপ্পলী, ঘণ্টা, দিণ্ডা ও পীতমুণ্ডী এই ২২ গাঞীও 'কুলাচল' হইলেন। আর ৩৪টি গাঞী সৎ-শ্রোত্রিয় হইয়াছিলেন—পূর্ব, পালধি, সিদ্ধল, কুশারি, কাঞ্জারী, বাপুলি, মাসচটক, সাহুড়িয়ান্‌, ভুরিষ্ঠান, কুসুমকুলী, বটব্যাল, অম্বুলী, বোকট্যাল, শিরাড়ী পোরাড়ী, তিলাড়ী, পোষলী, নন্দী, পলসাঞি, শিমুলী, সিমলাঞি, সেউ, কড়াল, নাঞাড়ী, ঘোষলী, বালী, বম্বাড়ী, পালি, ঝিকরাড়ী, হিজ্জল, শাণ্ডেশ্বরী, মূলী, দায়ী ও শিয়াড়ি।[৩]

কুলাচলেরা সৎ-শ্রোত্রিয় অপেক্ষা অধিক সম্মান পাইলেন। কিন্তু একালে কুলাচল ও সৎ-শ্রোত্রিয়ের মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদান চলিত ; সৎ-শ্রোত্রিয়ের ঘরে কন্যা দিলেও কুলাচলের কুলক্ষয় হইত না। তবে এই সময়েও রাঢ়ী ও সাতসতীর মধ্যে আদান-প্রদান প্রচলিত হয় নাই। ইহা বল্লালসেনের পূর্বযুগে শূররাজ্য-কালের ঘটনা। সুতরাং বল্লালসেন বঙ্গদেশে কৌলীন্য-প্রথার প্রথম প্রবর্তক নহেন।

বল্লালসেন সমাজে শুদ্ধিস্থাপনের অভিপ্রায়ে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের উন্নতি-বিধানের উদ্যোগ করিলেন। তিনি সনাতন-ধর্ম ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের সমাদর-বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে নূতন করিয়া কৌলীন্য-প্রথার সংস্কারসাধন করেন। প্রবাদ, বল্লালসেন ধরাশূরের ২২ গাঞী কুলাচলকে বাছিয়া গুণানুসারে ৮টিকে 'মুখ্য কুলীন' এবং ১৪টি গাঞীকে 'গৌণ কুলীন'

১ ম. বা, পৃ ৩৯৩-৯৮ ২ ঐ, পৃ ৩৯৮-৪০৩

৩ তুল. বি-কো, ৪, পৃ ৩২৭ ; ব. জা. ই, ব্রা ৩, পৃ ৪০ ই.

আখ্যা দিলেন। বাচস্পতি মিশ্রের কুলরামে বল্লালসেনের সময় হইতে কুলীনের যে বংশাবলী দেওয়া আছে তাহা প্রামাণিক বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। মুখ্য কুলীনদিগকে 'রাজ্ঞা প্রপূজিতঃ পুষ্টং প্রতিগ্রহ পরাঙ্মুখাঃ' বলা হইয়াছে। শাণ্ডিল্যগোত্রে বন্দ্যঘটীয় জাহ্লন, মহেশ্বর, দেবল, বামন, মকরন্দ, ও ঈশান; কাশ্যপগোত্রে চট্ট বহুরূপ, শুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ ও বাঙ্গাল; বাৎস্যগোত্রে গোবর্ধন পূতি, শিরো ঘোষাল, কাঞ্জিলাল কানু ও কুতুহল; ভরদ্বাজগোত্রে মুখবংশীয় উৎসাহ ও গরুড় এবং সাবর্ণগোত্রে শিশু গাঙ্গোলী ও কুন্দ রোষাকর—এই সর্বশুদ্ধ ১৯ জন মুখ্য কুলীন। গৌণ কুলীন হইলেন ১৪ জন। তাঁহারা শ্রোত্রিয় অপেক্ষা হীন নহেন। গৌণ কুলীনের সহিত আদান-প্রদানে মুখ্যের কুল 'ভাঙ্গিয়া' যাইত না। মেলসৃষ্টির পরে ভাঙ্গাভাঙ্গির সৃষ্টি হইয়াছে।

বল্লালসেন রাঢ়ী-বারেন্দ্র শ্রেণীবিভাগ করেন, এই মত ভ্রান্ত। রাঢ়ীর মধ্যে যেমন কুল-পদ্ধতি স্থাপিত হয়, তেমনি বারেন্দ্রের মধ্যেও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 'কুলীন' করা হইয়াছিল। সাধু ও রুদ্র বাগছি, ক্রতু ভাদুড়ী, মৈত্রেয় মৈত্র, লক্ষীধর সান্যাল, জয়মান মিশ্র, ভীমকালী হাই—এই সাত জন প্রথম বারেন্দ্র কুলীন। বারেন্দ্রের গাঞী সময়ে সময়ে নূতন নূতন সৃষ্ট হইয়াছে। এই বিষয়ে 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

রাঢ়ী-বারেন্দ্রের বংশলতা অপেক্ষা মেল[১] বা পরিবর্ত মর্যাদাই সামাজিক হিসাবে অধিকতর প্রয়োজনীয়[১]। ঘটকেরা বলেন, বল্লালসেন কুলীনের আচার-ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার উদ্দেশ্যে কুলাচার্য নিযুক্ত করেন। এবং ব্যবস্থা হয় যে, কুলীন আদান-প্রদান (পরিবর্ত) দ্বারা স্বধর্ম রক্ষা করিবেন। কুলীন শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিবেন, কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্যা দিলে কুলক্ষয় হইবে। দানধ্যানপরাঙ্মুখ, রিপুর বশীভূত, লুব্ধ, মূর্খ দ্বিজের কুল থাকে না। বংশলোপে এবং রণ্ড ও পিণ্ডদোষে কুল থাকে না। বলাৎকারদূষিত এবং বিবাহবর্জিত হইলেও কুল যাইবে, ইহা হরিমিশ্রের মত।

সমীকরণ : কালক্রমে কুলীনের পদমর্যাদা লইয়া গোল বাধিলে, প্রবাদ, লক্ষ্মণসেনের সময়ে একবার ও দনৌজামাধবের সময়ে কয়েকবার সমীকরণ হয়, অর্থাৎ কোন্ কোন্ ব্যক্তি সমান কুলীন, তাহা স্থির করা হয়। নিয়মিতরূপে আবৃত্তি অর্থাৎ আদান-প্রদান যাঁহাদের মধ্যে হয় নাই, তাঁহারা 'বংশজ' বলিয়া খ্যাত হন। কিন্তু তখনও দোষ ধরিয়া থাক্ করা হয় নাই। মুসলমান-অধিকারের প্রথম দিকের সমাজ-বিপ্লবে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজ বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। অনেকে রাঢ়-দেশ ত্যাগ করিয়া বিক্রমপুরাদি অঞ্চলে গিয়া বসবাস করেন, অনেকে সঘর না পাইয়া অকুলীনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন; পক্ষান্তরে, পূর্ববঙ্গে মুসলমান-উৎপাত হইলে অনেকে মধ্যবঙ্গে ভাগীরথীসমীপে আসিয়া বাস করেন। সেই সময়ে এই বিপর্যয়ের জন্য প্রধান কুলাচার্যগণ মাঝে মাঝে মিলিত হইয়া নূতন নূতন সমীকরণ করিয়া সমাজ-রক্ষার

---

১ চি. প. স. ২, প-সং ৬৮

কালোচিত ব্যবস্থা করিতেন। বাস-গ্রামের নামানুসারে গাঞী-এর উপর আবার নূতন গাঞী যোগ হইয়াছিল। যেমন—কাঁটাদিয়া বন্দ্যঘটী, ফুলিয়ার মুখুটি, পাটুলির চট্ট ইত্যাদি।

মুসলমান-অধিকারের প্রথম যুগে বরেন্দ্রভূমির উপর চাপ পড়িয়াছিল বেশী। অনেক জায়গীর ঐ অঞ্চলে স্থাপিত হইল। হিন্দু-জমিদারেরা এখানে মুসলমান-প্রভাবের সংস্পর্শে আসিয়া আর্থিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইলেও সামাজিক অবনতি ঘটে বিশেষভাবে। তাঁহাদের কুলপঞ্জী-বিধৃত শত গাঞী-সৃষ্টির গল্পের কোনো মূল আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন না। মেলবন্ধনের সময়ে ও পরে রাঢ়ীয় কুলাচার্য ধ্রুবানন্দ, বাচস্পতি প্রভৃতি রাঢ়ীয় কুলীনের অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন মিশ্র-গ্রন্থের প্রবাদসমূহ প্রবাদ হইলেও পুরাতন কাহিনী। সুতরাং তাহা হইতে রাঢ়ী-সমাজের অবস্থা ও ব্যবস্থা কতকটা জানা যাইতে পারে। তাহাতে দোষ-গুণের সমাবেশ দেখিয়া সেকালের অনেক কথা কল্পনা ও সমালোচনা করা চলে।[১]

ব্রাহ্মণ-সমাজ[১] ঃ বৌদ্ধ পালরাজগণের সময়ে বাঙ্গালী-সমাজের কিয়দংশের বৌদ্ধভাবাপন্ন হইয়া পড়া স্বাভাবিক। কোলাঞ্চলের ব্রাহ্মণগণের আচার-ব্যবহারও আর্য-ব্রাহ্মণের আদর্শ অপেক্ষা অবনত হয়। কিন্তু পালরাজগণ এই ব্রাহ্মণশ্রেণীর অনেককেও সমাদর করিয়াছিলেন ও দান দিয়াছিলেন ; তবে বৌদ্ধরাজের ও বৌদ্ধভাবের চরম বিকাশের সময়েও ভারতীয় সমাজে জাতির প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা ছিল পূর্ববৎ। বৌদ্ধপ্লাবনে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রাধান্য লুপ্ত হইলেও সমাজ হইতে ব্রাহ্মণ্য-শাসন ভাসিয়া যায় নাই। ব্রাহ্মণগণ তখনও রাজকীয় প্রধান কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন মন্ত্রী বা সেনাপতিরূপে। ব্রাহ্মণকে চিকিৎসকের ও ভাণ্ডারের কার্যেও নিযুক্ত দেখা যায়। বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবের সময়ে ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ বা জৈন-ভাবাপন্ন জনসাধারণের পৌরোহিত্যের কার্য করিতেন। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ অজ্ঞ হইয়া পড়ায় আদিশূর কোলাঞ্চল হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। পাল-অধিকারে নবাগত ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ পথভ্রষ্ট হওয়ায়, প্রবাদ, রাজা শ্যামলবর্মা বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। কিন্তু ধর্ম ও সমাজের উন্নতিকামী এই রাজন্যবর্গের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই।

নবগুণান্বিত কৌলীন্যের বদলে, বংশমর্যাদা লইয়া ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল। পরিবর্ত-মর্যাদা বা সমীকরণ দ্বারা মুখ্য কুলীন ও গৌণ কুলীন হইবার পরে, শ্রোত্রিয়গণকে আচার-ব্যবহার অনুসারে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এই চারিভাগে ভাগ করা হইল। কুলীনদল যাঁহাদের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন, তাঁহারাই প্রথম তিন শ্রেণীতে গৃহীত হইলেন। যাঁহারা আচারভ্রষ্ট তাঁহাদের সংজ্ঞা হইল 'অরি' বা কুলনাশক। যে কুলীন-

১ ম. বা, পৃ ৪০৩-৯

সন্তানের পুরুষানুক্রমে যথারীতি আদান-প্রদান ছিল না তাঁহাদের নাম দেওয়া হইল 'বংশজ'। এই সময় হইতে কুলাচার্য[১] বা ঘটক-শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। অংশ, বংশ, দোষাদি নির্ণয় করাই কুলাচার্যের কার্য হইল। কন্যাপক্ষের সম্বন্ধ-নির্ণয়কে 'অংশ' বলিত, বরপক্ষে সম্বন্ধ-নির্ণয়—'বংশ'। উভয় পক্ষের দোষ-নির্ণয় লইয়াই পরবর্তী কালে গোল বাধিয়াছে। নিষ্ঠাবান্ ও সৎকর্মপরায়ণ আদর্শ ব্রাহ্মণ-প্রতিষ্ঠাই সেনরাজগণের কাম্য ছিল। সমীকরণ ও কুলাচার্য দ্বারা দোষাদি নিরূপণ সেকালে শুদ্ধিরক্ষার নিমিত্ত আবশ্যক ছিল। পরবর্তিকালে হিন্দু-রাজার অভাবেও ঘটক[২] দ্বারা অনেকবার সভায় সম্মিলিত কুলীনদলের সমীকরণ হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে সদাচার ও আত্মোন্নতি সাধনের পরিবর্তে বংশগত গৌরবই প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠে।

আবৃত্তি বা পরিবর্ত নিয়ম সকল ক্ষেত্রে চলে না দেখিয়া রাঢ়ীয় কুলাচার্যগণ পরিবর্তের নববিধান সৃষ্টি করেন।—বাগ্‌দান,[৩] কন্যাভাবে কুশময়ী কন্যাদান, কন্যা আদান-প্রদান এবং ঘটকের সমক্ষে কন্যাদানের প্রতিজ্ঞা—এই চতুর্বিধ রূপে পরিবর্ত হইবার নিয়ম প্রচলিত হইল। ঘটকেরা প্রথমে প্রায়ই কুলীন-সন্তান ছিলেন। কালে গৌণ কুলীন শ্রোত্রিয়ভাবাপন্ন হইলে শ্রোত্রিয় ঘটকও অনেক হইয়া পড়িল। একালে বংশাবলী-রক্ষা এবং শুদ্ধাশুদ্ধ-বিচার রীতিমত লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিত।

যবন-সংস্পর্শ ও মেলবন্ধন ঃ পাঠান-অধিকারের প্রথম যুগে হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা দেশব্যাপী আলোড়ন হইয়াছিল। মুসলমান-রাজপুরুষগণ বলপ্রয়োগে, আউলিয়া পীর ও ফকিরদল ধর্ম ও নিষ্ঠার ভাণ করিয়া, গাজী পীর যুদ্ধ দ্বারা এবং ভয় দেখাইয়া অসংখ্য হিন্দুকে মুসলমান করিয়াছিলেন। ধন মান মর্যাদার প্রলোভনে স্বেচ্ছাতেও বহু হিন্দু মুসলমান হইয়াছিল। ফলে, হিন্দুসমাজে যবনসংস্পর্শ ঘটিতেছিল। এই পরিস্থিতিতে দেবীবরের আবির্ভাব। তিনি বন্দ্য-বংশে সঙ্কেত হইতে ষষ্ঠ পুরুষ এবং সর্বানন্দের পুত্র; কুলীন হইলেও মর্যাদায় সেকালের বিচারে প্রধান মুখ্য কুলীনের মধ্যে তাঁহাদের স্থান একটু নীচে ছিল। কুলাচার্য-বংশে তাঁহার জন্ম। নানা শাস্ত্রবেত্তা বলিয়া 'বিশারদ' উপাধি-প্রাপ্ত। তৎকালীন ঘটকসমাজের নেতা বন্দ্য দেবীবর ষোড়শ শতাব্দীর কুলাচার্যগণের এক সভায় তাঁহার পরিকল্পিত মেলবন্ধের ব্যবস্থা করেন। দেবীবরের সময়ে অনেকে নব-গুণের দিকে লক্ষ্য না করিয়া পরিবর্ত-বিবাহে বংশের বিশুদ্ধি-সাধনই কুলীনের কর্তব্য মনে করিতেন। আবৃত্তির জুজু সেকালের কুলীন-সমাজকে জড়ীভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। সেন-রাজগণের প্রবর্তিত শুদ্ধাচার রক্ষায় উপায় 'আবৃত্তির' কালক্রমে এই দশা ঘটিয়াছিল।

১ চি. প. স. ২, প-সং ১৬ ২ ঐ, ঐ, ১৪ ৩ ঐ, ঐ, ২০

দেবীবরের সময়ে যবন ও অন্ত্যজসংস্পর্শে অনেক কুলীন দোষাশ্রিত হইয়াছিলেন, অনেকে আচারভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। সমাজ হইতে তাঁহাদিগকে বহিষ্কৃত না-করিয়া দেবীবর মেলবন্ধন করিলেন। ৩৬টি মেল দেবীবর-কৃত বলিয়া কথিত। তাহার অনেকগুলি পরবর্তী কালে পর্যায়বদ্ধ হয়। দেবীবর কেবল দোষ দেখিয়া মেল করেন, অর্থাৎ এক ভাবের দোষযুক্ত লোককে এক পর্যায়ভুক্ত বলেন। দেবীবরের 'দোষ-নির্ণয়,' দেবীবরের 'বচন' ও 'মেলবন্ধ' বলিয়া পরবর্তী কালে ঘটকেরা যাহা চালাইয়াছেন তাহার কিছু বিশ্বাস করিলেও বলিতে হয়, দেশে নির্দোষ কুলীন ছিল না।[১]

কুলীন-সমাজ[১] : বাঙ্গালী-সমাজের হিতার্থে দেবীবরের পূর্বে স্মার্ত শ্রীনাথ, রঘুনন্দনাদি স্মৃতির ব্যবস্থায় সমাজ-সংশোধনের আদর্শ দেখাইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-সমাজের সংস্কারেরও প্রয়োজন ছিল। পরবর্তী কালে মেলের দোহাই দিয়া অনাচার প্রবেশ করায় গোল বাধিয়াছিল। মেলের জোরে গুণহীন কুলীন পণের লোভে গৌণের বা অসিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ আরম্ভ করিলে, নিস্তেজ কুলাচার্যগণ 'স্বকৃত ভঙ্গ' উপাধি দিয়া তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। উপরন্তু, 'ত্রিকুলের থাক্', 'নবগ্রহ', 'ত্রিদোষী' ইত্যাদি নূতন নূতন নামকরণ করিয়া কুলীনত্বের অভিমানকে পরিপুষ্ট করা হইয়াছিল। বড় বড় কুলীনেরা ঘটকের ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিলেও ভঙ্গের দল কুলাচার্যের শাসনের মধ্যেই ছিলেন। ঘটকদল পরামর্শ করিলে লোককে সমাজে উঠাইতে নামাইতে পারিতেন। কুলাচার্য মধ্যস্থ[২] না-হইলে সেকালে বিবাহ-সংঘটনই কঠিন ছিল। মেলী কুলীন নানাস্থানী হওয়ায় বিবাহে বিভ্রাটও ঘটিত। দূরস্থ লোকের মেল, ভাব ইত্যাদি ব্যাখ্যা করিয়া ঘটকের অন্নসংস্থান হইত। দোষ ঢাকিতেও ঘটকের সাহায্য প্রয়োজন হইত।

কালক্রমে প্রকৃতি বা পালটী না যোটায় 'স্বজনাদি' দোষ ঘটিবার ভয়ে কন্যা বয়স্থা হইলেও বিবাহ দেওয়া হয় নাই। 'গুণহীনে কন্যা দিবে না'—ইত্যাদি মনু-বাক্যের দোহাই দিয়া অনেক দরিদ্র কুলীন বয়স্থা কন্যাকে অনূঢ়া রাখিয়াছিলেন। 'উচ্চ' কুলীন পাইলে একদল কন্যাকে গছাইয়া দেওয়া হইয়াছে বয়স বিচার না করিয়া। শত দোষ সত্ত্বেও 'বংশজ' পিতা কুলীন বরে কন্যা দিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

বারেন্দ্র-সমাজ[১] : বারেন্দ্র-সমাজে চতুর্দশ শতাব্দীতে উদয়নাচার্য ভাদুড়ী পরিবর্ত-মর্যাদা স্থাপনের কর্তা বলিয়া প্রবাদ। রাঢ়ীয় সমীকরণের অনুকরণে বারেন্দ্র-সমাজেও কুলীনের করণ-কারণ স্থির হইয়াছিল। বারেন্দ্রসমাজে 'যবনাঘাত' প্রথম ও সমধিক হইয়াছিল। মুসলমান-রাজের প্রসাদে বরেন্দ্রের ব্রাহ্মণ-সমাজে বর্ধিষ্ণু ভূস্বামীরও অভ্যুদয় হয়। প্রবাদ, রাজা কংশনারায়ণ বারেন্দ্রসমাজে কুলীন, কাপ ও শ্রোত্রিয়ের মধ্যে করণ-কারণের ব্যবস্থা

---

১ ব. বা, পৃ ৪০৯-১৫ ২ চি. প. স. ২, প-সং ১৬

করেন। নিষ্কুল কুলীনেরা কুলের ভাণ করিয়া করণাদি করিতেন, তাঁহাদের এই কপট আচরণের জন্য প্রধান কুলীনেরা তাঁহাদের 'কাপ' অর্থাৎ কপটী নাম প্রদান করেন। কাপ-সংস্পর্শে কুলীনের কুলপাত হয়। মধু মৈত্রের ত্যক্ত পুত্রগণের সন্তান এবং যাবনিক দোষাক্রান্ত আঘাত-যুক্ত কুলীনগণ যাঁহাদের কুলভঙ্গ হইয়াছিল তাঁহাদিগকে লইয়া কাপ-সমাজ গঠিত হয়। প্রবাদ, রাজা কংশনারায়ণ কুলীন, কুলজ্ঞ, শ্রোত্রিয় এবং কাপ সকলকে লইয়া এইরূপ নিয়ম[১] করেন :—

১. কুশবারি-যুক্ত করণ দ্বারা কুলীন কাপের কন্যা গ্রহণ করিলে কিংবা কাপে কন্যা দান করিলে কুলীনের কুলপাত হইবে, অন্য প্রকারে কুলপাত হইবে না। কুশবারি-যুক্ত করণ ব্যতীত, শ্রোত্রিয়ের নিয়মানুসারে বরের ললাটে ফোঁটা দিয়া কোনো কাপ কুলীনে কন্যা দান করিলে কুলভঙ্গ হইবে না। কাপ শ্রোত্রিয় হইবেন।

২. যখন শ্রোত্রিয়গণ নীচ পটী হইতে শ্রেষ্ঠ পটীতে যাইবেন অর্থাৎ কন্যাদান করিবেন, তখন কাপে কন্যাদান করিতে হইবে। অধম পটীর দোষ ইহাতে কাপের স্কন্ধে দিয়া শ্রোত্রিয় নির্মল হইয়া উচ্চ পটীতে যাইবেন।

৩. উদয়নাচার্য ভাদুড়ী-কৃত পরিবর্ত-নিয়মে কন্যা অথবা ভগ্নীর অভাব হইলে পরিবর্ত হইতে পারিত না, সেইজন্য কুশময় পাত্র-কন্যার ব্যবস্থা হয়।

৪. শ্রোত্রিয়-বরে কন্যাদান করিলে কাপ শ্রোত্রিয় হইবেন। যাবনিক আঘাতাদির দ্বারা ভঙ্গ কুলীনেরা কাপ-দলে প্রবেশ করায় কুলীনগণের ঘৃণার পাত্র হন। কিন্তু কাপগণের দৌরাত্ম্যে কুলীনসমাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ায় সমাজ-রক্ষার জন্য রাজা কংশনারায়ণ কুলীন ও শ্রোত্রিয়গণের মধ্যে কাপের স্থান দেন।

তিনি কাপের সম্বন্ধে নিয়ম স্থাপন করিয়া শ্রোত্রিয়গণকে সিদ্ধ, সাধ্য এবং কষ্ট এই তিন ভাগে ভাগ করেন। ক্রমাগত কুলকার্যকারী শুদ্ধ বংশজগণ সিদ্ধ এবং যাঁহারা কুলার্চনকারী তাঁহারা সাধ্য এবং অন্যেরা কষ্ট শ্রোত্রিয় বলিয়া খ্যাত হন। কংশনারায়ণ কাপ ও শ্রোত্রিয়ের মর্যাদা বাড়াইয়া তাঁহাদিগকে কুলীনের সহিত ভোজন অনুমোদন করায় কাপের নামান্তর হয় 'স্বগিদ-কুলীন'।

কাপ এবং শ্রোত্রিয়ের কুল উঠা-পড়া হয়। কাপেরা উত্তম কাপে কন্যা দিলে কুলগৌরব হয়। কুলীনের কন্যা-গ্রহণ এবং কুলীনকে কন্যা-দান করা কাপের সমধিক গৌরবের বিষয়। কুলীনে কন্যাদান এবং কুলক্রিয়াযুক্ত সৎ-শ্রোত্রিয়ের কন্যাগ্রহণ শ্রোত্রিয়ের কুলগৌরব বৃদ্ধির হেতু। শ্রোত্রিয় কর্তৃক আদৃত হইলে মান্য শ্রোত্রিয়। কুলীন ও কাপ ভঙ্গ হইলে আর উঠিতে পারে না। কাপের সহিত করণে কুলীন কাপ হন, শ্রোত্রিয়ে কন্যা দিলে কুলীন শ্রোত্রিয় হন।

---

১ ব. বা. পৃ ৪১৩-১৫

কাপদিগের[১] অভ্যুদয়ে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরিবর্ত অথবা করণ দ্বারা বারেন্দ্রশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণগণ যে-দোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার নাম আঘাত বা অবসাদ। অবসাদ-প্রাপ্ত হইয়া যে যে-থাকে বিভক্ত হন তাহাকে 'পঠী' বলে। রাঢ়ীয় শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে 'পঠী' মেল নামে অভিহিত।

পাশ্চাত্য বৈদিক : কুলগ্রন্থে পাশ্চাত্য বৈদিকের বিবরণ আছে। তাঁহারা বেদাচার-পরায়ণ পশ্চিমাগত ব্রাহ্মণ। প্রবাদ, মহারাজ শ্যামলবর্মা তাঁহার রাজপ্রাসাদে গৃধ্রপতনের দুর্নিমিত্ত হেতু শান্তিযজ্ঞের উদ্দেশ্যে বারাণসী অঞ্চল হইতে তাঁহাদের আনয়ন করেন। লক্ষ্মণসেনদেবের পূর্বেই এদেশে পাশ্চাত্য বৈদিক ছিল। প্রবাদ,[২] ১০০১ শকাব্দে বা ১০৭৯ খৃষ্টাব্দে শ্যামলবর্মা কর্ণাবতী[৩]-সমাজনগরী হইতে এদেশে পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন। শুনক, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, সাবর্ণ ও ভরদ্বাজ—এই পাঁচটিকে পঞ্চগোত্র বলে। শুনকগোত্রীয় যশোধর মিশ্র, শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বেদগর্ভ, বশিষ্ঠগোত্রীয় রত্নগর্ভ, সাবর্ণগোত্রীয় শ্রীমান্ ও ভরদ্বাজগোত্রীয় বেদান্তবাগীশ নামে পঞ্চব্রাহ্মণ এদেশে আসেন। শাকুনিক-যাগ সমাপনান্তে মহারাজ শ্যামলবর্মা যশোধর, বেদগর্ভ প্রভৃতিকে সম্মান বা কৌলীন্য- মর্যাদা প্রদান করেন। তদবধি যশোধর ও বেদগর্ভাদির বংশধরগণ অতিশয় সম্মানিত। তাঁহারাই পঞ্চগোত্রীয় কুলীন বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এই পঞ্চগোত্র-সম্ভূত সমাজস্থানবাসী কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তিগণই কুলীন। স্থান ও কার্য অনুসারে কুল নষ্ট হয়, বর্ধিতও হয়, অর্থাৎ বৈদিকগণের সমাজ ভিন্ন অন্যস্থানে বাস, বিবাহে পণ-গ্রহণ অথবা কন্যা-পরিবর্ত ইত্যাদি সমাজবিরোধী কার্যের অনুষ্ঠান করিলে কুল নষ্ট হয়। যিনি এই সমস্ত কার্য করেন, তিনি পঞ্চগোত্রসম্ভূত হইলেও কুলীন নহেন।

যে-গ্রামে অথবা যে-নগরে পঞ্চগোত্রীয়গণ বংশপরম্পরাক্রমে বাস করেন সেই গ্রাম বা নগরই 'সমাজ' বলিয়া পরিগণিত হয়। পাশ্চাত্য বৈদিকগণের চৌদ্দটি সমাজ-স্থান ছিল। পঞ্চগোত্র ভিন্ন যে গোত্র, তাহার নাম ষষ্ঠ গোত্র। পঞ্চগোত্রীয়গণ ঋগ্বেদী ও সামবেদী। ষষ্ঠগোত্রে যজুঃ, ঋক্, সাম তিন বেদই আছে। ষষ্ঠগোত্র উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিনভাগে বিভক্ত। ষষ্ঠগোত্রের সংখ্যা একাদশ।

পাশ্চাত্য বৈদিকগণের মধ্যে বিবাহে বরযাত্রিগণকে ও শ্রাদ্ধাদিতে নিমন্ত্রিত সামাজিক-গণকে সামাজিকভা টাকা বা বস্ত্রাদি প্রদান করিবার নিয়ম আছে। বৈদিকগণের মধ্যে 'কুলীন' বা 'শ্রোত্রিয়' এই দুইটি শব্দ ব্যবহৃত হয় না। বৈদিকের বিবাহসভায় মাল্যচন্দন-প্রদান করিবার প্রণালী আছে। বিষ্ণুপুরের রাজা[৩] পশ্চিম দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়া-

১ বি-কো, ৪, পৃ ৩১৫ ২ বি-কো, ৪, পৃ ৩৩৭-৪০। মুকুন্দরামও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।
৩ গৌ. ব্রা, পৃ ২০৭-৯

ছিলেন। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরীয় পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের সহিত বঙ্গীয় পাশ্চাত্য-বৈদিকগণের পার্থক্য আছে। বিষ্ণুপুরে পাশ্চাত্য-বৈদিক মৌদ্গল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আছেন। কিন্তু বঙ্গীয় বৈদিকেরা গোত্রীয়-গণনাতে মৌদ্গল্য গোত্রীয়কে ধরেন না।

দাক্ষিণাত্য বৈদিক: প্রবাদ,[১] পাশ্চাত্য বৈদিকগণের পরে দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণ উৎকল, দ্রাবিড় হইতে ইসলাম-বিপর্যস্ত আর্যাবর্তে আগমন করেন। দাক্ষিণাত্য-শ্রেণীর মধ্যেও কৌলীন্য-প্রথা আছে। তাঁহাদের মধ্যে কুলীন, বংশজ, সম্মৌলিক ও পচা-মৌলিক—এই চারি প্রকার বিভাগ আছে। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সর্বশাস্ত্রবিহিত কর্ম করিতেন, সামাজিক নিয়ম-অনুসারে তাঁহারাই উচ্চ কৌলীন্য-মর্যাদা প্রাপ্ত হইতেন।

দাক্ষিণাত্য-শ্রেণীর কুলীনেরা পুত্রের বা কন্যার অতি শৈশবে বিবাহ-সম্বন্ধ করেন। জন্মের পর দুই এক বর্ষ মধ্যেই কন্যাকর্তা বরকর্তার বাটীতে গিয়া ঘটস্থাপনা করিয়া শাস্ত্রবিধানে পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ইহাতে বালকের অজ্ঞানাবস্থায় কেবল হাতে-হাতে সমর্পণ এবং কুশণ্ডিকা বাকি থাকে, আর-আর বিবাহসম্বন্ধের প্রায় সকল বিষয়ই হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধের পরে বর মারা গেলে সেই কন্যা অন্যপূর্বা হয়। তাহাকে অন্য কুলীনে বিবাহ করে না। তাহাকে পচা-মৌলিকের ঘরে বিবাহ দিতে হয়। পক্ষান্তরে, কন্যা মারা গেলে, বর কুলীনকন্যা বিবাহ করিতে পারে না। তাহাকে বংশজের ঘরে বিবাহ করিতে হয়। অন্যপূর্বা কন্যার হাতে কুলীন জলগ্রহণ করেন না। এমন-কি কন্যার পিতা সেই কন্যার শ্বশুরবাড়ীতে অন্নগ্রহণ করিলে তাঁহার মর্যাদাস্বরূপ অর্থ দিতে হইত। উক্ত কন্যা কর্মোপলক্ষে কুলীনের বাটীতে আসিলে তাহাকে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না।

কুলীনেরা দ্বিতীয় পাত্রে অর্থাৎ যে বরের একবার বিবাহ হইয়াছে তাহাকে কন্যাদান করেন না। ঐরূপ কুলীন অপেক্ষা মৌলিক ভালো। কন্যার কুলীন পাত্র না-পাওয়া গেলে, তাহাকে মৌলিকদের মধ্যে বিবাহ দিতে হয়। অন্যপূর্বা-কন্যার সহিত কুলীনের বিবাহ হইলে বর-বংশের কুল-লোপ হয়, এবং তদ্‌গর্ভজাত কন্যাকেও কোনও কুলীন বিবাহ করিলে, তিনি ভঙ্গ হন। কন্যার পিতা কন্যা-বিক্রয় করিলেও তাঁহার কুলপাত হয়। বাগ্‌দানের পরে কন্যার মৃত্যু হইলে বরকে বংশজ বা সম্মৌলিক বিবাহ করিতে হইবে। বর কোনো কুলীন-কন্যা বিবাহ করিলে কন্যার পিতা কুলে নিম্ন হইবেন। দাক্ষিণাত্য বৈদিকেরা বোধহয় রাঢ়ীয় শ্রেণীর কৌলীন্য-প্রথা ও কুলীন-সমাজে পাত্রাভাব দেখিয়া আপনাদের মধ্যে বাগ্‌দান[২]-প্রথা প্রচলিত করিয়া থাকিবেন। বর্তমানে শৈশবে বাগ্‌দান-প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন: কৌলীন্যের শাস্ত্র—সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গালা ছড়াসহযোগে রচিত হইয়াছিল আসলে ও নকলে অসংখ্য; তাহার সাধারণ নাম কুলজী

১ বি-কো, ৪, পৃ ৩৪০-৪১ ২ পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃ ১৯-২০

বা কুলপঞ্জী। কুলজী-শাস্ত্রী ঘটক-ব্রাহ্মণগণও সমাজে বিশেষ খাতির পাইতেন। গোড়ার দিকে কৌলীন্য-প্রথার ফল যাহাই হউক, পরবর্তিকালে ইহার ফল কুৎসিত হইতে কুৎসিততর হইতে লাগিল। আমাদের আলোচ্য সমাজ অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত—কৌলীন্য-প্রথার এই কুৎসিত রূপে মসীলিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, দেখা যাইবে। 'ধর্মের ষাঁড়'-রূপী কুলীন 'কালাচাঁদ'গণের[১] বিচরণক্ষেত্র ক্রমশঃ ঊষর হইয়া আসিলেও ইহার জের ভোল বদল করিয়া আজও চলিতেছে। কৌলীন্যের কদর্য পরিণতি প্রদর্শনে রচিত 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' বিদ্রূপাত্মক গ্রন্থ; কিন্তু ইহা বাস্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বহুবিবাহ'-গ্রন্থেও কৌলীন্যের বীভৎস কুফলের বিশদ প্রত্যক্ষ বর্ণনা আছে।

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের কুলবিধি সর্বপ্রথম কে প্রবর্তন করিয়াছিলেন, বা কে কোন্ যুগে তাহার সংস্কার-সাধন করেন, অথবা তাহা যুগের প্রয়োজনে স্বয়ংজাত, সামাজিক পরিস্থিতি আলোচনায় সে-তর্কের গহনে আমাদের প্রবেশ অনাবশ্যক। ফল কথা, বোধ হয়, এদেশে দুর্দান্ত বিদেশীদের প্রাদুর্ভাবের ফলে এবং আদিম বাঙ্গালী দল-উপদলসমূহের সহিত সহাবস্থিতি-হেতু ব্রাহ্মণ-গৃহস্থের অস্তিত্ব রক্ষার নিমিত্ত জাতিভেদ-প্রথা ও কৌলীন্যের বেষ্টনী পর পর দৃঢ়তর করা হইয়াছিল ও স্মৃতিশাস্ত্রের চর্চা বাড়িয়া গিয়াছিল। বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগের নারীর সম্মান স্মার্ত পণ্ডিতগণ নানা বিধি-নিষেধ রচনা করিয়া ক্রমশঃ সমূহ খর্ব করিলেন। তাঁহাদের শিক্ষার সুযোগ ও সামাজিক স্বাধীনতা হরণ করিলেন। নারী সম্পূর্ণরূপে পুরুষের মুখাপেক্ষী হইল। আমাদের আলোচ্য যুগে আমরা দেখি, স্ত্রীলোক যেন মনুষ্যপদবাচ্যই নহে; শূদ্রেরও অধম, গৃহস্বামীর তৈজসপত্রের সামিল। বেদ উপনিষদ্ দূরের কথা, শব্দবিশেষ (প্রণব ওঁকার নহে), 'গো'—এই শব্দমাত্র উচ্চারণ করিলেও তাঁহাদের পাপ অর্শাইত[২]। সুতরাং, কৌলীন্যের নিগড়বদ্ধ সেকালের ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজে বিবাহ-প্রসঙ্গে তাঁহাদের মতামতের তো প্রশ্নই উঠিত না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের সমাজাচারে কৌলীন্য-প্রথার কোনো পরিবর্তন হয় নাই। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে', মুকুন্দরামের উল্লিখিত 'বল্লালসেন্যা' কৌলীন্য-প্রথার প্রভাব পুরামাত্রায় বজায় ছিল দেখা যায়। কৌলীন্যের মূঢ় ব্যবহারের ফলে, কুলীন-কন্যার বিবাহ যেমন দুঃসাধ্য হইল, পক্ষান্তরে, বংশজদের মধ্যে পুত্রের বিবাহ দেওয়াও সেইরূপ অসম্ভব হইল। একদিকে কুলীনগণ শত শত বিবাহ করিতেন, অন্যদিকে বংশজগণ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বিবাহ করিতে পারিতেন না; কারণ কন্যা-সংগ্রহের জন্য সাধ্যাতিরিক্ত পণ দিতে হইত। এই বিষয়ে বিশ্বভারতীতে নানা পত্রাবলী ও কৌতুক-ছড়া[৩] সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইয়াছে।

---

১ স. বা. পৃ ৪১৮-২০ ২ চি. প. স. ২, পৃ ৪৫২-৫৩ ৩ পুঁ-প ১, পৃ ১৯০-৯১

এইরূপ দেশাচারের ফলে, কুলীন-কন্যাগণ বিবাহিতা হইয়াও অনূঢ়ার মতো বহু স্থলে পিতৃগৃহেই থাকিত। •এবং বংশজ পাত্রগণ কন্যাভাবে, অর্থাভাবে চিরকাল অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য হইত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালাদেশে সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন সুরু হয়। বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ ইত্যাদি সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান করিবার জন্য তখন একাধিক সামাজিক নাটক রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুলসর্বস্ব', উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' ও উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিধবোদ্বাহ নাটক' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অশাস্ত্রীয় বিবাহ ঃ ধর্মশাস্ত্রবহির্ভূত অন্য বহুপ্রকারের বিবাহ-প্রথাও হিন্দু-সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রচলিত আছে। অনুমান হয়, ইহাদের বেশীর ভাগই আদিম শূদ্র-সমাজের বিবাহ-প্রথা—হিন্দুধর্ম ও তাহার আর্য-সংস্কৃতির পরিবেশেও টিকিয়া আছে। বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলার সরকারী নথিপত্রে বিচিত্র বিবাহ-প্রথার বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দেখা যায়। আমাদের প্রকাশিত চিঠিপত্রেও একাধিক নিদর্শন আছে।

মনুর সময়ে শূদ্র সমাজের অতি নিম্ন স্তরে ছিল ; সেইহেতু তাহাদের কোনো সংস্কার এবং ধর্মে অধিকার না থাকায়, তিনি শূদ্রের জন্য কোনও বিবাহ-ব্যবস্থা দেন নাই। শূদ্রের জন্য বিহিত ছিল পৈশাচ বিবাহ। ইংরাজ-আমলে রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ দণ্ডনীয় অপরাধ। পরাশর-সংহিতায় হিন্দু স্ত্রীলোকের পত্যন্তর গ্রহণের নির্দেশ আছে। আসামের[১] কায়স্থাদি সমাজে এই বিধি প্রচলিত। সেখানে কোথাও গান্ধর্ব ও পৈশাচ বিবাহ চলিত আছে। ত্রিপুরার রাজবংশে 'শাস্তিগৃহীতা', ওড়িয়্যার কোনো কোনো সামন্তরাজ-পরিবারে 'ফুলবিয়া', ছোটনাগপুরের ওঁরাও-মুণ্ডাদের মধ্যে 'সিন্দুরদান'-বিবাহ প্রচলিত। বাঙ্গালী-সমাজে 'শৈব'-বিবাহ, 'কণ্ঠিবদল'-বিবাহ এবং নিম্নতর সম্প্রদায়ের মধ্যে, 'সাঙ্গা'-বিবাহ চলিত আছে। আসামে 'ধরম-বিয়া', 'বরবিয়া', 'বুঢ়াবিয়া' ও 'হাড়ভুচি-বিয়া' প্রচলিত। আমাদের আলোচ্য চিঠিপত্রে 'ভেখ' ও 'স্বয়ম্বর' বিবাহের নূতন নিদর্শন[২] মিলিবে।

তুলনামূলক আলোচনা ঃ মানুষ নিজের মতো করিয়া দেবকল্পনা করিয়া থাকে। আদি-বাঙ্গালীর দেবকল্পনায় তথা সমাজকল্পনায় পিতা-পুত্রী, মাতা-পুত্র ও ভ্রাতা-ভগিনীর বিবাহের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আদ্যাশক্তি ধর্মঠাকুরের কন্যা ও স্ত্রী ; আদ্যা ও শিব মাতা ও পুত্র, আবার ভ্রাতা ও ভগিনী।—তাঁহারাই পরস্পরে আবার বিবাহসূত্রে-আবদ্ধ স্বামী ও স্ত্রী। মিশরের জেট ও ভাউই মাতা ও পুত্র তথা স্ত্রী ও স্বামী। ঋগ্বেদের যম ও যমী ভ্রাতা ও ভগিনী। নাথধর্মে দুর্গাকে শিবের স্ত্রী হইবার জন্য এক শত আট বার বা সাত[৩] বার

---

১ আ. ব. বি. প, পৃ ৭০, ই. ; হি. আ. বি., পৃ ৭ ই. ২ চি. প. স ২, পৃ ২৭৭, ৪৫০ ৩ গো-বি, পৃ ৩

মরিয়া কায়া-পালটাইতে হইয়াছিল। অন্ততঃ, এইরূপ অস্বাভাবিক বিবাহ স্বীকার করিয়া লইবার পূর্বে সমাজে ইহার ধারণা জন্মিয়াছিল।

পৃথিবীর নানা আদিবাসী-সমাজে স্ত্রী-পুরুষের নানাপ্রকার বিচিত্র সম্পর্ক[১] দেখা যায়। ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহও অপ্রচলিত নহে। একপতিত্ব, বহুপতিত্ব আবার একপত্নীত্ব, বহুপত্নীত্ব অনুসন্ধানে দেখা যায়, কোনো-না-কোনো সমাজে প্রচলিত আছে। বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং গৃহস্থালী কোনোটিই দুর্লক্ষ্য নহে। সে-সমাজে ব্যভিচারিণীর কঠোর শাস্তি হয়; বিনোদিনী-বৃত্তি প্রায় অজ্ঞাত।

পৃথিবীর আদিবাসী-সমাজে পরস্পরবিরোধী বিধি-নিষেধও বর্তমান। কোনো সমাজে কন্যাদের 'পুনর্বিবাহে' উৎসব হয়। গো-দোহন করার জন্য কোথাও তাহারা যথার্থই দুহিতা, আবার কোনো সমাজে গো-রক্ষণ তাহাদের একেবারে নিষিদ্ধ। কোথাও তাহারা মাত্র পশুপালিকা ও গৃহকর্ত্রী। আবার কোথাও সম্পত্তির মালিক ও উত্তরাধিকারিণী। কোনও সমাজে দেখা যায়, নিকটতম আত্মীয়গণের মধ্যেও আচারগত প্রভূত পার্থক্য বিদ্যমান। তবে, সকল আদিবাসী-সমাজেই স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক সহযোগের, এবং ইহা কেবল দৈহিক সহবাস মাত্র নহে; সম্পূর্ণরূপে সংস্কারমূলক।

বলা বাহুল্য, বাঙ্গালী-সমাজে বিবাহ-ব্যাপারে বিচিত্র আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে আদিম অব্রাহ্মণ্য-সমাজের নানা ক্রিয়া-কলাপ অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে। এতন্মধ্যে সন্নিহিত প্রতিবেশী ছোটনাগপুরের ওঁরাও ও মুণ্ডাদের আচার-অনুষ্ঠানের সহিত সুবহু সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। মুণ্ডাদের সমাজে 'সকমচরি' বা বিবাহবিচ্ছেদ বর্তমান; এবং 'সাঙ্গাই', 'সাগাই' বা পুনর্বিবাহ প্রচলিত আছে। সাঙ্গা বা পুনর্বিবাহ অনুষ্ঠান খুব সরল। কেবল সিঁদুর-দানের কৃত্য অনুষ্ঠান করিতে হয়। বিবাহের 'সিঁদুর দান' শেষ হইলে মুণ্ডারা 'রাধে' 'রাধে'[২] ধ্বনি করে। তাহারা ইহার অর্থ জানে,—'আড়ান্দি টুণ্ডু জানা' অর্থাৎ বিবাহ-ক্রিয়া সমাপ্ত হইল।

গোঁড়দের[৩] সমাজে স্ত্রী-পুরুষের দাবি সমান, বরং সমাজে নারীর মর্যাদা পুরুষের উপরে। কন্যার মাতাপিতা বা অভিভাবকদের নিকট বরপক্ষের লোকেরা বিবাহের প্রস্তাব করিয়া থাকে। কন্যাপক্ষের অভিভাবকদের বিবাহ-প্রস্তাব করা মর্যাদাহানিকর। বনিয়াদী গোঁড়বংশের কন্যাগণ বহুস্থলে চিরকুমারী থাকে; এবং সমাজে তাহা আদৌ নিন্দনীয় নহে।

১ H. H. M., Chap. III ই. দ্রষ্টব্য।

২ প্রবাসী, ১৩৪১, পৃ ৬২৬

৩ গোণ্ড; মতান্তরে, গোঁদ। ভ্র. প্র., ১৩৪১, পৃ ৫৩৪

সমাজে নারীর কোনোরূপ পর্দা নাই। সামাজিক ভোজে নর-নারী একসঙ্গে বসিয়া বিভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিয়া থাকে।

নীলগিরির টোডাদের[১] সমাজে বহুপত্যাত্মক বিবাহ প্রচলিত। বড়ো ভাই বিবাহ করিলে তাহার স্ত্রী সকল সহোদরেরই সাধারণ ভার্যা বলিয়া পরিগণিত হয়। আবার স্ত্রীর অপর ভগ্নী থাকিলে, তাহারাও এই স্বামীর সহোদরগণের যৌথ স্ত্রীরূপে গণ্য হইয়া থাকে।

আমাদের আলোচ্য পরিচ্ছেদে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। কেবল আমাদের লক্ষণীয়, আদিবাসী বা আদিম-আর্য সমাজের এই সকল আচার-অনুষ্ঠানের কতখানি বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে অবশিষ্ট আছে বা হিন্দুসমাজ গ্রহণ করিয়াছে— মিলন মিশ্রণের মাধ্যমে। উপরন্তু বলা বাহুল্য, সেকালের রাঢ়ীয় সমাজের অনুষ্ঠানের জের একালের পল্লী-বাঙ্গালাতেও অনুষ্ঠিত হইতেছে।

লোকাচার : রাঢ়ের ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ উভয় সমাজেই বিবাহ ব্যাপারে আপাত-অর্থহীন নানা আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। তবে সেগুলি যে আদিম অব্রাহ্মণ্য সমাজে প্রচলিত নানা ক্রিয়াকলাপের বিস্মৃত অবশেষ সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এই সকল অদ্ভুত আচার-আচরণের মধ্যে, রাঢ়ের নিকটতম প্রতিবেশী ছোটনাগপুরের একদাতন 'রাঢ়ীয়' ওঁরাও-মুণ্ডাদের সামাজিক আচরণের বা বিধি-নিষেধের প্রভাব খুব বেশী। এমন-কি, ক্ষেত্রবিশেষে নিবিড় সম্পর্ক লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তাহাদের বিবাহ-বিধি অবলম্বনে রাঢ়ীয় বিবাহ-পদ্ধতির তুলনামূলক স্বতন্ত্র আলোচনা করা যাইবে। এতদ্ব্যতীত, গোণ্ড, কিরাতাদি আদিম জাতিসমূহের বিভিন্ন আচার-আচরণ ও বিধি-নিষিধের জেরও রাঢ়ের লোকাচারের মধ্যে সমভাবে প্রবহমান।

জাতকর্মের মতো বিবাহ-সংস্কারের আদর্শ লৌকিক চিত্রাবলী পাঠান ও মোগল আমলে লিখিত লৌকিক ভাষা-কাব্যগুলি হইতে অজস্র সংগ্রহ করা যাইতে পারে। বিজেতা মুসলমানগণ হিন্দু-সমাজের উপর ইসলামের জীবনধারা আরোপ করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ইসলামী হস্তাবলেপ স্বল্পস্থলে বিপর্যয় ঘটাইয়াছিল এবং স্থলে স্থলে মুসলমানেরা পটী নির্মাণ করিয়া, হিন্দুসমাজ হইতে স্বতন্ত্র ও আপাঙ্‌ক্তেয় হইয়া বসবাস করিতেছিল। সেই কারণ, গ্রামাঞ্চলে প্রাচীন বাঙ্গালার পরম্পরাগত সংস্কৃতির নিদর্শন আমরা গ্রামে লিখিত এই সকল লৌকিক সাহিত্যকর্মের মধ্যে প্রায় অক্ষুণ্নরূপেই পাইতেছি।

কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিংহ পঞ্চদশ শতকের শেষে, কিংবা ষোড়শ শতকের প্রথম

১ প্রবাসী, ১৩০৮, পৃ ৩৩৪-৩৫

দিকে তাঁহার 'গোপালবিজয়'-গ্রন্থ[1] রচনা করিয়াছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ অজয়-ভাগীরথী-উপত্যকার লোক ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে দৈবকী-বসুদেবের বিবাহ-বর্ণনায় খাঁটি পুরাতন পরম্পরা যথাযথভাবে মিলিতেছে। তাহাতে ফলিত জ্যোতিষের প্রসঙ্গ নাই। কুলীন, সুরূপ, শাস্ত্রজ্ঞ, সর্বগুণান্বিত, ধনী, দাতা ও বৃহস্পতিতুল্য আচার-বিচারপরায়ণ এবং শিক্ষা-দীক্ষায় দীক্ষিত বর উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন। পঞ্চদশ শতকের শেষ দশকের রচনা কবিচন্দ্র মিশ্রের গৌরীমঙ্গল গ্রন্থে[2] হরগৌরীর বিবাহে ঘটকালি করিয়াছেন স্বয়ং বিধাতা। তাঁহার নিবন্ধ-অনুসারে সালঙ্কারা সুন্দরী কন্যাকে দক্ষ কুলীন-পাত্রস্থ করিয়া আপন কুল শুদ্ধ করিলেন। পরবর্তী কালের কবি ব্রাহ্মণ পরশুরাম রায় তাঁহার মাধবসঙ্গীত-গ্রন্থে[3] রাধাকৃষ্ণের বিবাহ দিয়াছেন পুরাপুরি বৈদিক মতে। কিন্তু এই বিবাহে সঙ্কল্প রচনা করিতে হইয়াছিল লৌকিক আভীর প্রকরণে। ইহাতে দুন্দুভি ডিণ্ডিমির বাদ্যভাণ্ড এবং বাস[র]ঘরে কিছুই বাদ যায় নাই। বিনয়লক্ষ্মণের শিবের গীত গ্রন্থে[4] হরগৌরীর বিবাহসজ্জা দেখিবার মতো। শিবের সহগামী বিশিষ্ট বরযাত্রিদলের বর্ণনার মধ্যে সেকালের একটি বড়মানুষী বিবাহের শোভাযাত্রার বাস্তব চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

বিপ্রদাস পিপিলাই (১৪৯৫-৯৬), মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (১৫৯৪ ১৬০৫) এবং রূপরাম চক্রবর্তীর (১৬৪৯-৫০) রচনা হাঁটরাইলে আমরা তিন শতাব্দীর রাঢ়ীয় সমাজের খুঁটিনাটি ফলাও বর্ণনা পাইয়া যাইব। সুবহু স্থলে, সামাজিক আচার-পালনের আক্ষরিক অনুবৃত্তিও দুর্লক্ষ্য নহে। ইহার একমাত্র হেতু মনে হয়, অর্বাচীনকালের লিপিকরদের ও পাঁচালী-গায়নদের হস্তাবলেপ। ইহাদের হাতে পড়িয়া স্থানেস্থানে তিন শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য এক লহমায় একাকার হইয়া গিয়াছে। অথবা এমনও হইতে পারে, মুসলমান এবং পরবর্তী খৃষ্টীয় সংস্কৃতির সংঘাত হইতে বৈশিষ্ট্য বা স্পর্শ বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে কূর্মধর্মী হিন্দুসমাজে আচার-বিচারে বিশেষ কোনও পরিবর্তন ঘটাইতে সমকালের সমাজপতিগণ সাহস করেন নাই। সেই কারণেই বোধ করি, সংরক্ষণশীল প্রাচীন বাঙ্গালীসমাজে যে সকল বিধি-নিষেধ প্রবর্তিত ছিল, তাহার অনুরূপ কৃত্য আমাদের আলোচ্য যুগে এবং বর্তমানেও সমভাবে প্রচলিত রহিয়াছে।

বিবাহের সূত্রপাতে সম্বন্ধ-নির্ণয় করিয়াই বিপ্রদাস বলিতেছেন, দৈবজ্ঞ পাঁজি দেখিয়া লগ্ন স্থির করিল। শতবর্ষ পরে, মুকুন্দরাম বলিলেন, কন্যার বারো বৎসর বয়সের আগেই শুভক্ষণ গণিয়া লগ্ন করা হইল। প্রসঙ্গতঃ রূপরাম বলেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিয়া গণনা

---

১ সা-প্র ৬ দ্রষ্টব্য ২ পুঁ-প ৩, পৃ ৪৭ ই. ৩ পুঁ-প ২, পৃ ২৯৫ ই.

৪ সা-প্র ৫, বাদশমঙ্গল, পৃ ১৮৫ ই.

করিয়া কন্যাদানের শুভক্ষণ স্থির করিল। পরে, ভারতচন্দ্র শিব-দুর্গার বিবাহ ব্যাপারে লগ্নপত্রের কথা তুলিয়াছেন। লগ্নপত্র থাকিত বরপক্ষের নিকট। সম্পাদন করিত উভয় পক্ষ মিলিয়া।

প্রধান ও অপ্রধান বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য হইতে বিবাহ-প্রসঙ্গে এইরূপ শাস্ত্রীয় এবং লৌকিক অসংখ্য বিচিত্র আচার-আচরণের নিদর্শন সঙ্কলন করা যাইতে পারে। সঙ্কলিত চিঠিপত্রের তথ্যাবলী আলোচনা করার সময় পাদটীকায় আমরা ইহাদের কয়েকটির উল্লেখ করিলাম মাত্র। হিন্দু-বিবাহে স্ত্রী-আচার-প্রসঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যে যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায় সেগুলি যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ তেমনি সুপ্রাচীন সমাজ-বিধানের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশক। এই সকল আচার-আচরণের মূল্য নিরূপিত হউক বা না-হউক, এগুলি যে হিন্দু-শাস্ত্রকারদের পরোক্ষ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। বিবাহকালে, জন্মকালে ও মৃত্যুকালে যে-সকল বিশেষ বিশেষ আচার প্রচলিত, তাহার পরিবর্তন সহজে হয় না। এই সব আচার বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের মতামতে বিশেষ ধরা পড়ে না। ধরা পড়ে প্রাকৃতজনের সংস্কার দেখিলে। সেইজন্য আচারের প্রসঙ্গে আপস্তম্ব বলিয়াছেন,—'যৎ স্ত্রিয় আহুস্তৎ কুর্বন্তি' অর্থাৎ নারীদের কথানুসারেই আচরণ। আপস্তম্ব-গৃহ্যসূত্রও বলেন, 'আবৃতশ্চা স্ত্রীভ্যঃ প্রতীয়েরন্' অর্থাৎ মন্ত্র ছাড়া, সব ক্রিয়াকর্ম নারীদের কাছে বুঝিয়া লইবে। বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত সমস্ত স্ত্রী-আচার একত্র সংগ্রহ করিয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে দেখা যাইবে, তাহা হইতে এরূপ সমস্ত বিচিত্র তথ্য ও তত্ত্ব নিষ্কাশন করা যাইতেছে সমাজবিজ্ঞানীদের নিকট যাহার মূল্য অসামান্য।

বাঙ্গালার প্রাগাধুনিক সাহিত্য হইতে বিবাহপদ্ধতিসমূহ সঙ্কলন করিলে দেখা যায়, তাহা তৎকাল-প্রচলিত সমাজের উপরের ও নীচের তলার বিবরণে পূর্ণ। তাহার কতক মনে হয়, সমকালীন সংযোজন এবং কতকগুলি পরম্পরাগত। ব্রাহ্মণসমাজে ব্রাহ্মণ্য বিবাহের বৈদিক এবং তান্ত্রিক সমুদয় পদ্ধতি প্রচলিত ছিল মনে হয়। কুশণ্ডিকা, সপ্তপদী-গমন, মিত্রাভিষেক, চতুর্থী-হোমাদি ব্রাহ্মণ্যসমাজে অদ্যাপি সুপ্রচলিত। চিঠিপত্রে আলোচ্য তথ্যাবলী প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ-সমাজের বলিয়া এই কৃত্যগুলির উল্লেখ করা গেল। তবে ইহাও ঠিক্ যে, বাঙ্গালাদেশের পরিবেশে আর্য ব্রাহ্মণগণ কালক্রমে বেদাচার তো বিস্মৃত হইতেছিলেন বটেই, উপরন্ত, বাঙ্গালী অব্রাহ্মণ-সমাজের সঙ্গেও তাঁহাদের একটা বোঝাপড়া চলিতেছিল। এবং দেখা যায়, উদ্দাম বিধর্মিগণের প্রাদুর্ভাবের ফলে এই বোঝাপড়া দ্রুততালেই আগাইতেছিল।

বাঙ্গালার মুসলমান-সমাজ এদেশের জলবায়ুর গুণে হিন্দুবিবাহের 'পুণ্য', [জুলুয়া খেলা এবং শেষে] 'পাশাখেলা' গ্রহণ করিয়াছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত আইমুদ্দিন

প্রমুখের পুঁথি হইতে আমরা তাহার বিস্তৃত পরিচয় পাই। এই নিবন্ধগুলির[১] নামকরণ করা হইয়াছে 'নিকাহ মঙ্গল'। পরে অবশ্য মুসলমান-সমাজে এ-সব অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

বিবাহে পাশাখেলা আরব্য বিধানে নাই। এদেশের হরগৌরী বিবাহ-বাসরে একদা পাশা খেলিয়াছিলেন; সেইজন্যই হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে ইহা বাঙ্গালী-সাধারণের বিবাহ-সংস্কারে প্রতিপাল্য হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং ইহাও ঠিক যে, সেমিটিক্ মুসলমানের এদেশে দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে, তাহার বেদুইনী উদ্দামতা বহুলাংশে মোলায়েম হইয়া আসিয়াছিল। পক্ষান্তরে, মুসলমান-সমাজে ধর্মান্তরিত হিন্দু স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যাও কম ছিল না।

সংগৃহীত তথ্যালোচনা: এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এবং বর্তমান খণ্ডের পরিশিষ্টে সঙ্কলিত চিঠিপত্রাদি হইতে তথ্যাবলীর বিচার ও বর্ণনা করা যাইতেছে। তৎপূর্বে 'পুরোহিত-দর্পণ' হইতে বর্তমান ব্রাহ্মণ্য বিবাহকৃত্যের বাঁধা ছকটি দেখা যাউক।—

সামবেদীয় দশ-সংস্কারের মধ্যে বিবাহ-বিধি অন্যতম। বিবাহে সম্প্রদান-কার্যের পূর্বে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হয়। কর্তা নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তর নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধ করিয়া যথাকালে কন্যা-সম্প্রদান করিবেন। বিবাহ-লগ্নের পূর্বেই সম্প্রদান-স্থানের পশ্চিমাংশে পূর্বদিকে মুখ করিয়া বরের আসন এবং উত্তর দিকে মুখ করিয়া সম্প্রদাতার আসন রাখিতে হয়। নিকটে বরসজ্জা ও নারায়ণ-শিলা থাকিবে। সম্প্রদান সমাধা হইলে বর বিবাহ-হোমাদি বা কুশণ্ডিকোক্ত বিধিতে 'যোজক'-নামক অগ্নি স্থাপন করিবেন। ইহার পর সপ্তপদীগমন, পাণিগ্রহণ, উত্তর-বিবাহ, ভোজন, চতুষ্পথামন্ত্রণ-মন্ত্রপাঠ, ধৃতি-হোম ও চতুর্থী-হোম করিতে হয়। তৎপরে, আচারবশতঃ জামাতা বধূর সীমন্তে সিঁদুর তিলক দিয়া অবগুণ্ঠন টানিয়া দিবেন।

অতঃপর, বর-কন্যা বাসর-ঘরে যাইবে।—ব্রাহ্ম বিবাহের এইরূপ শাস্ত্রীয় আচার আমাদের আলোচ্য সমাজে প্রচলিত ছিল এবং এখনও অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতেছে।

সেকালের সমাজে কৌলীন্যের রাজটীকা পরিয়া ব্রাহ্মণগণ একদিকে যেমন বহু বিবাহ করিবার সুযোগ লাভ করিতেন, পক্ষান্তরে, অকুলীন ব্রাহ্মণগণ কন্যার অভাবে বহুস্থলে বিবাহে বঞ্চিত হইয়া চিরকুমার থাকিতেন। কুলীন বা অকুলীনের কন্যাগ্রহণ করিয়া ত্রিকোটি কুল উদ্ধার করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া সময়ে সময়ে অবিবাহিত 'ভেঙ্গ'গণ[২] যে হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেন তাহার কিছু কিছু দুর্লভ প্রাচীন নিদর্শন আমাদের হাতে আসিয়াছে।

আলোচ্য চিঠিপত্রে দেখা যায়, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর পূর্বপুরুষদের মতো ধনী ও অভিজাত ব্যক্তিগণকেও প্রচুর কন্যাপণ[৩] দিয়া বিবাহের জন্য কন্যা সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল।

---

১ পু-পরি, পৃ ২৮৫-৯০ ২ পুঁ-প ১, পৃ ১৯০-৯১ ৩ চি-প-স ২, পৃ ১২-১৩

মুকুন্দরাম ছিলেন সাবর্ণি-গোত্রীয় বেদগর্ভের সন্তান। কিন্তু, উপাধ্যায়-মিশ্র-উপাধিক সাবর্ণিগোত্রীয় হইয়াও তিনি মুখ্য কুলীন ছিলেন না। উপরন্তু, পরবর্তী কালে 'চক্রবর্তী' হওয়ায় কোনও সময়ে 'ভঙ্গ' বা 'বংশজ' হইয়া থাকিবেন। মিশ্র-পদবী হেতু মুকুন্দরামের বংশ উৎকলাগত দাক্ষিণাত্য বৈদিক বা মধ্যদেশীয় ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। তাঁহারা উপাধ্যায় বা ওঝা, মিশ্র, চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ। এই বংশের রমারাম ভট্টাচার্যের সহিত কাশীনাথ চক্রবর্তীর কন্যা সহচরী দেবীর শুভবিবাহ হইয়াছিল ১২৩১ বঙ্গাব্দে। এই বিবাহে কন্যাপণ বাবদ ৩১৯ টাকার একরার লিখিয়া 'নিজরোজ' অর্থাৎ সেইদিনেই রোকসিক্কা ২ টাকা কন্যা-পক্ষকে বায়না দিতে হইয়াছে। কিন্তু অকুলীন পাত্রের বিবাহের জন্য সম্ভবতঃ সমপর্যায়ের পাত্রী সংগ্রহ করিতেও প্রচুর কন্যাপণ দিতে হইয়াছিল। ইহার হেতু অনুসন্ধানের বিষয়। পক্ষান্তরে দেখা যায়, কুলীন পাত্র অকুলীনের কন্যা গ্রহণ করিতেছেন বরপণ গ্রহণ করিয়া, অথবা কন্যা সুন্দরী হইলে বিনা পণে। সেকালে গৌণ কুলীনের সহিত আদান-প্রদানে মুখ্যের গুরুতর দোষ অর্শাইত না।

এই বিবাহে সম্বন্ধ-পত্রের সাক্ষীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণ, গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ইসাদ অর্থাৎ সাক্ষীর স্বাক্ষর রহিয়াছে। বাগ্‌দান করিয়া লগ্নপত্র লিখিতে হইত। লিখিতেন কন্যার পিতা। ইহাতে ব-কলম স্বাক্ষরও দেখা যায়। সম্বন্ধ-পত্র কোথাও কোথাও সম্পাদিত হইত রাজদরবারে[১]। সন ১১৭৩ সালে অর্থাৎ ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে এইরূপ (রেজিষ্ট্রেশনের) ব্যবস্থা ছিল। বিবাহ সিদ্ধ করিবার জন্য সাক্ষী রাখিয়া লগ্নপত্র সম্পাদন করিতে হইত। সম্বন্ধ-পত্রের মধ্যস্থও রাখা হইত। সাক্ষিগণের লিখিবার বয়ান[২] ছিল সাধারণতঃ এইরূপ,—'বিবাহ সিদ্ধং অত্র পত্রে সন্দেহ নাস্তি'। লগ্নানুসারে শুভকার্য সম্পূর্ণ করিবার দায়িত্ব থাকিত মধ্যস্থদের। বিবাহকর্মেও মধ্যস্থ রাখা হইত। তখন ভাদ্রমাসেও[৩] কুলীন ব্রাহ্মণদের বিবাহ চলিত।

সেকালে সাত বৎসরের, এমন-কি তাহারও কম বয়সের কন্যার বিবাহ হইত। নানোরের জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় পঞ্চবর্ষীয়া কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন। 'দ্বাদশাব্দের' অর্থাৎ বারো বৎসরের মধ্যে কন্যার বিবাহ না হইলেও যদি কোনো আত্মীয় 'নিশ্চিন্ত' থাকে, তবে তাহার কুলে লজ্জা ও ধিক্কার পড়িয়া যাইত। "মধ্যমদাদা মহাশয়ের কন্যার বিবাহের কালাত্যয় হয় ইহাতে বড়ই উদ্বিগ্ন" হইয়া কবিকঙ্কণ বংশীয় রমারাম দেবশর্মা 'কর্ম' করিবার জন্য তাঁহার প্রধান শিষ্যকে সকল সুগোচর করাইয়াছিলেন[৪]।

বিবাহে নিমন্ত্রণ-পত্রের পাঠ[৫] শিষ্টাচারসম্মত এবং যথেষ্ট সহজ ছিল বলিয়া বিবেচনা

১ চি-প-স ২, পৃ ১০ ২ ঐ, ঐ, পৃ ৪ ৩ ঐ, ঐ, পৃ ১১ ৪ ঐ, ঐ, পৃ ৪৭৩ ৫ ঐ, ঐ পৃ ৪৩১

করি। গুবাক ও কড়ি দিয়া নিমন্ত্রণ[১] এবং নিমন্ত্রিতকে সম্মান করিতে হইত। আলোচ্য চিঠিপত্রে দেখা যায়, ইহা লইয়া আবার ঘরোয়া ঝগড়ারও অন্ত ছিল না[২]। বিবাহে ঘটক আসিতেন, কুলীন আসিতেন[৩]; কাহার বাজন্দার তো থাকিতই। বরপক্ষ বিদায় করিতেন কুলাচার্যকে[৪]। দান-সামগ্রী ও বরযাত্রী-খরচ কন্যাপক্ষের। সম্ভ্রান্ত কুলীনগৃহে কুলমর্যাদা-পণ দেওয়া হইয়াছে ১৪ টাকার মতো; দান-সামগ্রী ১১ টাকায়, আর বরযাত্রী-খরচ ৩ টাকা যথেষ্ট ছিল ১১৭৩ সালে অর্থাৎ ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে। এই সময়ে কুলমর্যাদা, দান-সামগ্রী ও বরাভরণ-সমেত কুলীন বর 'দেড় স্বর্ণ' পাইতেছেন দেখা যায়। ইহাতেই সৌষ্ঠব মানা হইতেছে। অকুলীনদের মধ্যে গৃহ-ব্যবহার ও অধিবাস-খরচ দিতে হইত বরপক্ষকে। বিবাহে ব্রাহ্মণেতর জাতির বাড়ী হইতে ব্রাহ্মণগণ দস্তুরি পাইতেন; দণ্ডবতীও পাইতেন। লৌকিকতা করিতে হইত পট্টবস্ত্র।

নিজের বিবাহের জন্য টাকা কর্জ করা,[৫] বা, নিমন্ত্রণপত্র-পাঠানো[৫] সেকালের সমাজে প্রচলিত ছিল। কর্জ করিয়াও বর কোঁচানো জোড় ও মাথায় তাজ চড়াইয়া[৬] রাজবেশে বিবাহ করিতে যাইত। কাহার বাজন্দার মশালচির[৭] অপ্রতুলতা না-থাকিবারই কথা। আতসের কারখানা[৮] বোধ হয় ছিল অপরিহার্য। মাহাতা, তুমরি, হওাই, চরখী, গোলাবেজ, আন্দারমানিক, হাতকুলা, আপ্তারে, বেড়্যা-হয়াই—এই সব আতস-বাজীতে বিবাহ-বাড়ী আলোকিত ও গুলজার হইয়া উঠিত।

এদিকে কনেরও বাহার[৯] কম নহে। পরনে তাহার কলিকাতার 'নারাজি পটু'। সোনার রূপার অলঙ্কারে গা ভরতি। গলায় তাহার মাদুলী, তাড় ও হাস্বা; কানে কান-মাকড়ি বা কানবালা; নাকে বোলাক, নত; বাহুতে তাবিজ; করে মরদানা, শঙ্খ, পঞ্চিছ্যা; কাঁকালে কাকলী, আমট-বিছা, জিঞ্জির; পায়ে মল, বাক, পাশুলী, অনটচুটকী আর নূপুর খনখনী।—এই সব অলঙ্কার বাদে পার্ব্বণী[১০] ইত্যাদির প্রকার ও খরচাদির হদিশও পাওয়া যায়। রথ-পর্ব, পূজার পর্ব, দোলপর্ব, আম্র-পর্বাদিতে তত্ত্ব দিতে হইত। গহনা ও পার্বণী-খরচ শুভ-বিবাহের তালিকাতেই ধরা হইত, মনে হয়।

১৷৷৹ টাকার বাতাসা আর ২ টাকার জিলাপিতে মধ্যবিত্তের বিবাহ-বাড়ী জমিয়া উঠিত। চিঁড়া-মুড়িরও কদর ছিল খুব। পোলাও-এর খরচা ৷৵৹ আনা, আর ৷৵৫ আনায় কেনা ৴৪ সের মাছে আর কাপড় ও হরেক দ্রব্য হাটখরচ সমেত ১৷৷১৩৶৹ টাকা খরচে ১২২৯ সালে অর্থাৎ ১৮২২ খৃষ্টাব্দে সম্ভবতঃ এক ধনী সৎগোপের বিবাহবাড়ী

১ চি-প-স ২, পৃ ৫ ২ ঐ, ঐ পৃ ঐ ৩ ঐ, ঐ পৃ ৭ ৪ ঐ, ঐ পৃ ৮ ৫ ঐ, ঐ পৃ ৩৮০, ৮
৬ ঐ, ঐ পৃ ৩৮৩ ৭ ঐ, ঐ পৃ ১ ৮ ঐ, ঐ পৃ ২০৪-৫ ৯ ঐ, ঐ পৃ ৪৮৫-৫৬৬ ১০ ঐ, ঐ পৃ ৯-১০

জাঁকিয়া উঠিয়াছিল। গুরু-দক্ষিণা, ধর্মরাজ-ডেগা, দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, ছব্বি-দক্ষিণা, জমিদার, পুরোহিত, নাপিত, দৈবজ্ঞ, কুটুম্ব, স্বজন, কোটাল, দাইমা প্রভৃতি বাবদও খরচ হইয়াছিল ৬৷৵০ টাকার মতো। ১১৫৪ সালে অর্থাৎ ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে ৭৪ টাকা লাগিয়াছে একটি সাধারণ বিবাহে। ১১৫৮ সালে অর্থাৎ ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে নিজ-বিবাহ জন্য আসল ৫১ টাকা কর্জ করার হিসাব পাওয়া গিয়াছে। গহনায় ৯৪ তঙ্কা, সামগ্রীতে ৯০৷০ টাকা, ঘটক-কুলীন বিদায়ে ৮০ টাকা—একুনে ২৬৪৷০ টাকা লাগিয়াছে ১১৬৪ সালে অর্থাৎ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে। ১২২৯ সালে অর্থাৎ ১৮২২ খৃষ্টাব্দে ৪০।১।০ টাকায় ভালো বিবাহ হইয়াছে। আবার ১২৯৫ সালে অর্থাৎ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ১০৫৷/১০ টাকা লাগিয়াছে একটি বড়-মানুষী বিবাহ ব্যাপারে।[১]

স্বয়ংবর-বিবাহেরও স্বীকৃতি আছে। কুমারী অবস্থায় প্রথম সংসর্গী কন্যার দানকর্তা নিরূপণ হইলে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া কুমারীর শাস্ত্র-সম্মত বিবাহ হইত। দাতার অভাবে কুমারীর বিবাহ অসিদ্ধ-স্বয়ংবরাকারে সম্পন্ন হইত[২]। পুনর্বিবাহে[৩] দিন স্থির করা হইত; ঘটা করিয়া তেল-হলুদ হইত। পিত্রালয় হইতে বধুকে বাড়ী আনিতে[৪] ডুলি ও বেহারা তো যাইতই; আর তাহাদের সঙ্গে যাইত বাটীর 'ছালারা কেহ' বা ঘরের কোনো ছেলে।

তখন কুলীন স্বামীরা পুরুষান্তর দ্বারা স্ত্রীকে বঞ্চনা[৫] করিতে লজ্জা পাইত বলিয়া বোধ হয় না। কুলীন জামাতা বাবাজীবনকে 'পরম পূজনীয়' বলিয়া সম্মান[৬] দেখাইতেন শ্বশুর মহাশয়। কারণ বোধ হয়, অনেক ক্ষেত্রে কুলীন জামাই বয়সে শ্বশুরের চেয়ে বড়োই হইতেন। জামাতাকে বিষ্ণুতুল্য জ্ঞান করিয়া তাঁহার কোপোৎপাদন করিবে না—এই মনুবাক্য তখন কুলীন জামাইদের আদর দ্বিগুণিত করিয়াছিল।

স্ত্রীর জীবনকে ভাবা হইত স্বামীর জীবনের সহিত বিজড়িত। পতি পরমগুরু এবং পত্নী অর্ধাঙ্গিনী। সুতরাং পতির মৃত্যুতে পত্নীর মৃত্যু ছিল প্রত্যাশিত। হয় স্বেচ্ছায়, কিংবা বলপ্রয়োগে। কিন্তু হিন্দুর সংসারে বেশীর ভাগ স্ত্রীই আকাঙ্ক্ষিত মনে করিতেন পতির চিতায় সহগামিনী হইয়া 'সতী' হইতে। তাহাতে ইহলোকে সুনাম আর পরলোকে নিরবচ্ছিন্ন পতিসঙ্গ। ঘটা করিয়া, তাহারই প্রকরণ 'সহমরণ' দেখা যায় তাই এক 'ভুলাতেই'—উৎসবানন্দ ভট্টাচার্যের সহিত পুনু চৌধুরির কন্যার শুভ-বিবাহের সংবাদপত্রে[৭]।

বিবাহ হইলেই যে সুখে ঘর-করণা করিতে আরম্ভ করিত, সকল দম্পতির এইরূপ কপাল ছিল বলিয়া মনে হয় না। বিবাহের পরেই 'মাথায় সোতে' অর্থাৎ 'সিথ-মৌর'-সমেত একটি বধূ উধাও হইয়া গিয়াছিল দেখা যাইবে ১১৬৫ সালের অর্থাৎ ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের

১ পরে, 'ব্যবসায়-বাণিজ্য' অধ্যায়ে ক্রমিক আলোচনা দ্রষ্টব্য। ২ ঐ, ঐ পৃ ৪৫৩ ৩ ঐ, ঐ পৃ ৪৭২
৪ ঐ, ঐ পৃ ২৬২ ৫ ঐ, ঐ পৃ ২৫ ৬ ঐ, ঐ পৃ ৬০ ৭ ঐ, ঐ পৃ ৮

একটি পত্রে[১]। শ্রীদাম পাগলের স্ত্রী পুনঃপুনঃ বাড়ি হইতে নিখোঁজ[২] হইয়াছিল ১২২৬ সালে অর্থাৎ ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে। ইহার আলোচনা পাওয়া যাইবে 'ভাষ'-প্রকরণে। ১২৫৫ সালে অর্থাৎ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মাগারাম চাষা ভগবতী চাষীনকে শাসাইয়াছিল ; কারণ, তাহার কন্যা চন্দ্রা চাষানীর সহিত তাহার অবৈধ 'আসনাই' ও তাহার ফলে চন্দ্রার 'গর্ভ' হইয়াছে। এমতাবস্থায় ভগবতী যদি তাহার কন্যাকে ঘরে আনিয়া 'ঔসধির' ব্যবস্থা না-করে, তাহা হইলে, মাগারাম চন্দ্রাকে 'ভেক দিয়া' সঙ্গিনী করিবে। কিন্তু তাহার আর প্রয়োজন হয় নাই[৩]।

রামলোচন রায়ের বরাবরে ১২৩১ সালে অর্থাৎ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মী বেয়ার লিখিত 'ছাড় ফারখতি'-পত্রখানি বৈরাগী-বিবাহের একটি দুর্লভতম নিদর্শন[৪]। রায় মহাশয়ের সহিত আসনাই করিয়া বিধবা লক্ষ্মী আপন গৃহস্থ-সংসার ত্যাগ করিয়াছিল। রায় মহাশয়ের সহিত থাকিবার সময় লক্ষ্মীকে তিনি 'পরদা পোষে' রাখিয়াছিলেন। কিন্তু লক্ষ্মীর দুর্মতি। সে পর্দা তুলিয়া, বেলডাঙ্গার কার্তিক চক্রবর্তীর সহিত পুনরায় নূতন আসনাই করিয়াছিল। সুতরাং রামলোচনের সহিত তাহার পূর্ব-'অন্তকরণ' বাতিল। এখন সে ধর্মকর্মের জন্য 'বৈরাগ্য আশ্রম' লইবে। এই হেতু, রায় মহাশয়ের নিকট যাচিঞা করায়, রায় মহাশয় তাঁহার নিজের এবং লক্ষ্মীর ধর্ম রক্ষার নিমিত্ত বৈরাগ্য-আশ্রম গ্রহণ করিবার সহায়তা করিতে নগদ তিন টাকা লক্ষ্মীকে দিয়াছিলেন। লক্ষ্মী স্বেচ্ছায় তাহা খুশী হইয়া গ্রহণ করিয়া রায়ের অন্য স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির দাবী ত্যাগ করিল। তাহার উত্তরাধিকারিগণের দাবিও নামঞ্জুর হইল। সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় এই 'ছাড় বেদায়া পত্র' লিখিয়া দিয়া লক্ষ্মী সম্ভবতঃ কার্তিক চক্রবর্তীর সঙ্গে নূতন বিবাহে খুশী হইয়া ঘর করিয়াছিল। 'ভেক' বা 'বৈরাগ্য আশ্রম' গ্রহণ করিয়া বিবাহ-পদ্ধতি পুরাপুরি সহজিয়া 'ভৈক্ষ্য' বা বৌদ্ধ আচার—সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

১ দ্র. পরিশিষ্ট ২ চি-প-স ২, পৃ ১৬৯-৭০ ৩ ঐ, ঐ, পৃ ২৭৭-৭৯ ৪ ঐ, ঐ, পৃ ৩২৬

প্রকৃত প্রণয় স্বাধীন প্রণয়। সে দাসত্ব করে কেন না দাসত্ব-বিশেষের মহত্ত্ব সে বুঝিয়াছে। যেখানে দাসত্ব করিয়া গৌরব আছে, সেইখানেই সে দাস, যেখানে হীনতা স্বীকার করাই মর্যাদা, সেইখানেই সে হীন। ভালবাসিবার জন্যই ভালবাসা নহে, ভাল ভালবাসিবার জন্যই ভালবাসা। তা যদি না হয়, যদি ভালবাসা হীনের কাছে হীন হইতে শিক্ষা দেয়, যদি অসৌন্দর্যের কাছে রুচিকে বদ্ধ করিয়া রাখে তবে ভালবাসা নিপাত যাক্।

১৮০৫ শকাব্দ রবীন্দ্রনাথ

স্বামীকে দেবতা বলিলে স্ত্রীর ভক্তি পাইবার জন্য স্বামীর কিছুমাত্র যোগ্যতালাভের আবশ্যক হয় না, এবং স্ত্রীকেও যথার্থ ভক্তির যোগ্য স্বামী অভাবে অসন্তোষ অনুভব করিতে হয় না।...ভক্তি বিতরণ করিবার জন্য ভক্তিভাজনের প্রয়োজন নাই, এরূপ পরম-সন্তোষের অবস্থাকে আমি সুবিধা মনে করি না। ইহাতে কেবল সমাজের দীনতা, শ্রীহীনতা এবং অবনতি ঘটিতে থাকে।

১৩০৪ রবীন্দ্রনাথ

তিনি এক-একদিন আমাকে সঙ্গে করিয়া একজন য়ুরোপীয় মিশনরির বাড়িতে যাইতেন। সেখানে গিয়া তিনি গান গাহিয়া, সেতার বাজাইয়া, মিশনরির মেয়েদের আদর করিয়া, তাহাদের বুটপরা ছোটো দুইটি পায়ের অজস্র স্তুতিবাদ করিয়া সভা এমন জমাইয়া তুলিতেন যে, তাহা আর কাহারও দ্বারা কখনোই সাধ্য হইত না। আর-কেহ এমনতরো ব্যাপার করিলে নিশ্চয়ই তাহা উপদ্রব বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু শ্রীকণ্ঠবাবুর পক্ষে ইহা আতিশয্যই নহে—এইজন্য সকলেই তাঁহাকে লইয়া হাসিত, খুশি হইত।

১৩১৯ রবীন্দ্রনাথ

॥ প্রণয় পত্র ॥

(সন ১২৩৪-১২৮৩ : খৃ ১৮২৭-১৮৭৬)

প্রাক্‌কথন : কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের[১] অষ্টাবিংশ প্রকরণে 'প্রতিলেখ' বা উত্তরপ্রদায়ী লেখ-রচনার বিধান আছে। তন্মধ্যে চারিপ্রকার উপায়ের মধ্যে অন্যতম 'সাম'। সাম পঞ্চবিধ।—(১) গুণসংকীর্তন (২) সম্বন্ধোপাখ্যান (৩) পরস্পরোপকারসন্দর্শন (৪) আয়তি-প্রদর্শন ও (৫) আত্মোপনিধান। যে সাম-প্রয়োগে কুল, শরীর, কর্ম, স্বভাব, শাস্ত্রসংস্কার ও দ্রব্যাদির গুণের স্বরূপাখ্যান করিয়া প্রশংসা বা স্তুতি করা হয়, তাহার নাম গুণসংকীর্তন। যে সাম-প্রয়োগে কাহারও জাতিসম্বন্ধ, যৌনসম্বন্ধ, মৌখসম্বন্ধ, স্রৌবসম্বন্ধ, কুলসম্বন্ধ, হৃদয়-সম্বন্ধ ও মিত্রসম্বন্ধের উল্লেখ করা হয় তাহার নাম সম্বন্ধোপাখ্যান। যাহাতে স্বপক্ষ ও পরপক্ষের দ্বারা কৃত উপকারের সংকীর্তন থাকে তাহাকে পরস্পরোপকারসন্দর্শন বলা হয়। এই কার্যে আমাদের উভয়ের এইরূপ শুভ ফল হইবে—এই প্রকার আশা উৎপাদন করিয়া যে সাম-প্রয়োগ বিহিত হয় তাহার নাম আয়তি-প্রদর্শন। আমরা উভয়ে অভিন্ন, যাহা আমার দ্রব্য তাহা আপনি নিজকার্যে যথেচ্ছভাবে লাগাইতে পারেন—এইরূপ আত্মসমর্পণ-সূচক উক্তিদ্বারা যে সাম-প্রয়োগ বিহিত হয় তাহাকে আত্মোপনিধান বলা হয়।

গত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙ্গালা-পত্রলিখন-প্রণালী সম্পর্কে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জ্ঞানকৌমুদী'[২] (১২৬০ সাল) ও অনরেবল্ ওয়ালটর্ স্কট্ সিটন্‌কার এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সংকলিত 'পত্রকৌমুদী' (১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ) গ্রন্থ[৩] উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত 'পত্রকৌমুদী'-গ্রন্থের মূল রচয়িতা বররুচি। বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত ও সংকলিত গ্রন্থখানির ভূমিকা[৪] বিশেষ তথ্যসমৃদ্ধ। এই গ্রন্থদ্বয়ে পত্র লিখিবার পাঠাপাঠ বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত আছে। আমাদের আলোচ্য পত্রাবলীর কয়েকটির মূল ইহাতে পাওয়া যাইবে। এই গ্রন্থদ্বয়ের হস্তলিখিত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি বিশ্বভারতীর সংগ্রহে ছিল। বাঙ্গালা পুঁথিগুলি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে[৫] প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতে মুসলমানের প্রকরণ বা পত্রলিখন-পদ্ধতিও আছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে[৬] মুদ্রিত 'মালতীমঞ্জরী দেবী'র আদর্শ পত্রখানি জ্ঞানকৌমুদী গ্রন্থে[৭] সংকলিত হইয়াছে। এই আদর্শ প্রেমপত্রখানি সম্ভবত: এই আদর্শ হইতে পরবর্তিকালে 'শিশুবোধকে' ও 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে' স্থান লাভ করিয়াছে। এই সম্পর্কে দ্বিতীয় পাঠ[৮]— 'স্বামীকে স্ত্রীর পত্র লিখিবার ধারা' এইরূপ ;—

১ কৌ. অ., ১, পৃ ৮৬-৮৭

২ দিননাথ দাসের কমলালয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত

৩ Baptist Mission Press-এ the Calcutta School Book Societyর জন্য C. B. Leuis কর্তৃক মুদ্রিত। ১৮৫৩ সালে প্রথম মুদ্রণ হয়। ১২২৬ সালের সংস্করণ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে আছে। জনপ্রিয়তাহেতু ইহার আরও সংস্করণ হইয়াছিল।

৪ পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য ৫ পৃ ১০৩-১১ ৬ পৃ ৪৩১ ৭ পৃ ৪৯-৫০ ৮ ঐ, পৃ ৫০-৫১

স্ত্রীর উক্তি ॥ ৮৮ পত্র ॥

শ্রীচরণ সেবনাকংক্ষি সেবকা শ্রীগৌরীধনী দাস্যা প্রণামা শতসহস্র নিবেদনঞ্চাগে মহাশয়ের শ্রীচরণ স্মরণস্মরণ মাত্রে মঙ্গল বিশেষ। শিরনামা। পরম পূজিনীয় শ্রীযুক্ত মধ্যম ঘোষজ মহাশয় মামাশ্রয়েষু। প্রত্যুত্তর॥ প্রথম পাঠের। আপন স্ত্রীকে পত্র লিখিবার ধারা॥ স্বামির উক্তি॥ ৮৯ পত্র। পরম প্রণয়ার্ণব গভীর নীর তীর নিরনমিত কলেবরঙ্গা সন্মিলিত নিতান্ত প্রণয়াশ্রিত শ্রীঅনঙ্গমোহন দেবশম্মণঃ ঝটিত ঘটিত বাঞ্ছিতান্তঃ করণে বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ শ্রীমতীর শ্রীকর কমলাঙ্কিত কমলপত্রী পঠিতমাত্রে অত্র শুভম্বিশেষ বহুদিবসাবধি প্রত্যবধি নিরবধি প্রিয়াশ প্রবাস নিবাস তাহাতে কর্ম্মফাস নিবাস ব্যতিরিক্ত উক্তিক্তস্তঃকরণে কালযাপনা করিতেছি অতএব মন নয়ন প্রার্থনা করে যে সর্ব্বদা ঐক্যতা পূর্ব্বকে অপূর্ব্ব সুখোদ্ভব সুখারবিন্দ যথাযোগ্য মধুকরের ন্যায় মধুমাদি আশাদি পরিপূর্ণ হয় প্রিয়াশামীমাংসাপূর্ণিতা শ্রীশ্রী৺ ইচ্ছা শীতান্তে নিতান্ত সংযোগ পূর্ব্বক কালযাপনা কত্তব্য ধনোপার্জ্জন যদর্থে তৎসম্বন্ধীয় কর্ত্তৃকা দুঃখিতা এতাদৃশ উপার্জ্জনে প্রয়োজন নাই স্থির। সিদ্ধান্ত করিয়াছি জ্ঞাপন মিতি॥ শিরনামা। দেহান্তঃকরণা ভিন্না গুণাধিক সধর্ম্ম পরিপালিকা। শ্রীমতী মা[ল]তীমঞ্জরী দেবী সাবিত্রী ধর্ম্মাশ্রিতেষু।

পত্রকৌমুদীর প্রশস্তি-প্রকরণে স্বামী-স্ত্রীর প্রেমপত্র লিখিবার পাঠ নির্দিষ্ট হইয়াছে।— স্বামীকে পত্র লিখিবার সামান্য নিয়মে 'সেবাকাঙ্ক্ষিণী শ্রীমতী অমুক দাস্যার প্রণতি পূর্ব্বকং নিবেদনং' এবং শিরোনামে 'পূজনীয় শ্রীযুক্ত অমুক মহাশয় মমাশ্রয়েষু' ইতি পাঠ বিহিত; পরন্তু প্রেম-জ্ঞাপনার্থে অন্যতর পাঠ প্রসিদ্ধ আছে; কিন্তু শিরোনাম সর্ব্বত্রই তুল্য। বিশেষ পাঠ যথা, 'হে নাথ', 'হে প্রাণ' ইত্যাদি। পত্রশেষে স্বাক্ষর যথা, 'ত্বদীয় প্রণয়াভিমানিনী শ্রীঅনঙ্গমণি দাসী'। পক্ষান্তরে, স্ত্রীকে পত্র লিখিবার প্রচলিত ধারার পাঠ যথা, 'প্রণয়াকাঙ্ক্ষি শ্রীরামদুলাল মৈত্রস্য বিজ্ঞাপনং। এবং শিরোনাম যথা, 'স্বধর্ম্মপরিপালিকা শ্রীমতী মালতী-মঞ্জরী দেবী সাবিত্রীধর্ম্মাশ্রিতাসু।' কিন্তু বিশেষ প্রেমজ্ঞাপনার্থে অন্যতর পাঠ যথা, প্রিয়তমে!...একান্তত্বদীয়...। তবে ইচ্ছানুসারে উক্ত পাঠের পরিবর্তে অন্য প্রেমজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

The Bengalee Letter-Writer গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল শ্রীরামপুর হইতে ১৮৪৫ সালে। তাহাতেও 'স্বস্তি সেবিকা' পাঠ আছে।

মূল পত্রকৌমুদীধৃত স্বামী-স্ত্রীর প্রশস্তিবাক্য এইরূপ,—

অথ ভার্য্যায়ার স্বামিপ্রশস্তিঃ। স্বস্তি শ্রীমদ্বদ্দাম প্রেম হেম ভূষিতা স্মদাদিভক্তজনেষু। কর্ম্ময়োবধিষ্ঠামষু নেত্রয়োরধি দৈবেতেষু, কামস্য পরিণামেষু। চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কেষু। মমাপররূপেষু

সমানরূপেষু। শ্রীমৎ স্বামিচরণারবিন্দেষু। গোবিন্দ ইবিন্দিরায় শঙ্কর ইব গিরিজায়াঃ মহেন্দ্র ইব পুলোমজায়াঃ প্রতিদিনং বর্দ্ধমানা মমারবিনা প্রণাম পূর্ব্বমাস্তাং ॥

অথ ভর্ত্তৃভার্যা প্রশস্তি ॥ স্বস্তি শ্রীমৎ সমস্ত প্রেম পরে লাবণ্য মর্তো প্রিয়তং মায়াং নেত্রযুগ্মস্ত কনীনিকায়ামিবচন্দ্রস্ত ক্ষণদায়ানিব কমলাকরস্ত কমলিন্যামিব সংপ্রেমনিবেদয়তী পাত্রী। ১। শুভাশীরাশীর্ন্নিবেদয়তু সর্ব্বদা।

পত্রকৌমুদী গ্রন্থের সমাপ্তি।—'যাবৎ প্রসন্না কমলা মুরারের্ব্বক্ষস্থলস্থা মুদমেষ্যতীয়ং। তাবৎ সমাস্তাং ভুবনে চিরায় শ্রীকৃষ্ণলালেন কৃতা প্রশস্তিঃ॥ সমাপ্তোয়ং গ্রন্থ ॥০॥ শকাব্দা ১৭৬৪ বৈশাখস্য।

গ্রন্থধৃত এই 'কৃষ্ণলাল' মূল পত্রকৌমুদীর লিপিকর হইতে পারেন। কিন্তু, লিপিকর হইলেও, মূলকে তিনি যেরূপ সময়োচিত পরিবর্তিত পাঠে সম্পূর্ণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে নবীন কালের প্রবীণ গ্রন্থকার বলিলে ভুল হয় না; বরং তিনি পরবর্তী কালে লিখিত বহু পত্রের আদর্শ চরিত্র হইয়াছেন। আলোচ্য প্রণয়পত্রগুচ্ছে আমরা তাহার নিদর্শন লক্ষ্য করিব।

॥ সংগৃহীত তথ্যালোচনা ॥

আমাদের সংগ্রহের মধ্যে এই বিষয়ের যে-সকল চিঠিপত্র পাওয়া গিয়াছে সেগুলিকে মোটা-মুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। এক,—পরম্পরাগত অর্থাৎ অলঙ্কারশাস্ত্রের ছাঁচে-ঢালা আদর্শ প্রেমপত্র বা 'পত্রকৌমুদী'-'জ্ঞানকৌমুদী'র পুঁথি হইতে নকল-করা[১] আদর্শ পত্র। সম্ভবতঃ বররুচির সংস্কৃতমূল 'পত্রকৌমুদী' এইরূপ পত্রলিখন-প্রণালীর আদর্শ ছিল। স্ত্রীকে স্বামীর লেখা চিঠিও[২] এই পর্যায়ে পড়িবে। দৈহিক ভোগের আবেগে এই লিখন; এবং 'প্রেমে আর ব্রহ্মে প্রভেদ নাই'—এই আদর্শে দেখা যায়[৩] ইহার পরিণতি। এই উভয় প্রকার প্রেমের যাঁহারা নায়িকা তাঁহাদের আদর্শ নাম হইল 'চম্পকলতিকা',[৪] 'মনমোহিনী'[৫] বা 'মালতী-মঞ্জরী'[৬]। অল্পবয়স্কা প্রগলভা নায়িকার প্রতীক বোধ হয় গন্ধাভিসারিকা চম্পকলতিকা[৪]; তাহার মোকাম 'বনয়ারীবাদ'[৪]। 'দারুণ পিরিতি'-তাপে চণ্ডীদাসের ভাষায় সে বলে,—'নিচয় ভখিমু মুঞী এ গরল বিষে'[৪]। আর মালতী মনে হয়, সাশ্রুস্নিগ্ধ প্রৌঢ় প্রেমের প্রতিভূ। এই পত্রলেখিকার ঠিকানা নাই। বোধ করি, প্রেমের পরিণতি-ধর্মে

১ ২খ, চি-সং ৬৬ ২ ঐ, ঐ ২৭, ২৯ ৩ ঐ, ঐ ২২ ৪ ঐ, ঐ ২৮ ৫ ঐ, ঐ ২২
৬ ঐ, ঐ ৬৬

প্রয়োজনও নাই। পরিণত বয়সের মালতীমঞ্জরীর পরিপক্ক এই স্নেহসার[১] ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ।

দুই,— বৈষ্ণব প্রেম। রূপক-আশ্রয়ে পরকীয়া রতির অপরূপ বর্ণনা[২]। চৈতন্য-চরিতামৃত তথা বৈষ্ণব-দর্শন হজম করিয়া এই পত্রাবলীর রূপ দান করা হইয়াছে। এই প্রেমের স্বরূপ হইল,—

সহজে সরল জার রসের পরান। রসিকে রসিকে করে রসের ভিআন॥
ভিআনে ভিআনে রস হয় ত সুপাক। সুপাক হইলে নাম ধরএ অবাক॥
অবাক হইলে হয় সুমধুর প্রেম। পোড়াঞা ঝোড়াঞা জেন সোহাগাতে হেম॥
সেই জে প্রেমের কথা অকথ্য কথন। কহিতে না পারে জেন গুঙ্গার সপন[৩]॥

তিন,— চাটুলিপি। রাজা মহারাজা বা বড়ো-লোকের প্রীতির নিমিত্ত তোষামদ করিয়া কিছু আদায় করিবার উদ্দেশ্যে সাধারণভাবে, বা সর্পাদির আকারে নানা বর্ণে রচিত শব্দালঙ্কারে চিত্রকাব্যের পত্রাবলী[৪]। এই বিষয়ে নাসুরের জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালঙ্কার ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁহারই ভাষা,[৪]—

স ততানুগত হব : সর্বদা নিকটে রব : অহর্নিশ মানস আমার :।

*　　　*　　　*

শ্রীযুক্ত জগতি ই ন্দ্র : সুনি এ ধরা নরে ন্দ্র : বংশ ক্লেশ পাই শ্লেষ লেখে।

*　　　*　　　*

লা ভাকাঙ্ক্ষি নহি মো রা : কেবল সাক্ষাৎ ক রা : পরিচিত হইতে অভিলাশ :।

*　　　*　　　*

রা জকীয়ানুজ্ঞা বি ধি : পাওয়া সেই লভ্য সেব ধি : পণ্ডিতগণের ইহাই চাই :।

*　　　*　　　*

বে এন্তেলা হইতে ব রং : এন্তেলা করণে ভারং : কার্যাসিদ্ধিতবিষ্যতি মম :।
দ ক্ষ রাখেন শ্রীগুরু জী : প্রসন্ন হয়েন রাজা জী : নতুবা এ বৃথা পরিশ্রম :॥

*　　　*　　　*

বারো সও তিন সালে : আজ্ঞা করি রামনালে : বনয়ারি নামার্থ জিজ্ঞাসিয়া :॥
তাহাতে নব নবার্থ : সুনাইতে সে বাক্যার্থ : অনেক বিচার হইয়া পরে :।
হৃষ্ট তুষ্ট হইয়া কৃপা : প্রকাশিয়া অনুকম্পা : স্বাদর করিয়াছিলেন মোরে :॥

১ ২৭, চি-সং ২২　২ ঐ, ঐ ২৩, ২৪, ২৫, ২৬　৩ ঐ, ঐ ২৫　৪ ঐ, ঐ ৩০, ৩১

তাৎকালীন এক কবিতা : উভয় নাম সম্বলিতা : পৃষ্ঠে লিখি সর্পবন্ধ নাম :
পুর্ব্ব পরিচয় হেতু : লিখিলাম গুণসেতু : বিচারি জানিবেন গুণগ্রাম :[১] ॥

বা,

ধৈর্য্য ধৃর্য্যে স্থৈর্য্য বাঞ্ছা আছে তথাহি স্মন্ধাগ্নি নাশং বিরহাগ্নি দীপনং সহেত বিশ্বাষ বলেন কেবলং। রতি প্রগে প্রাপ্য পুনঃ প্রিয়াগমেন চক্রবাকী বিজহাতি জীবনং[২] ।...

আদর্শ ভণ্ড-প্রণয় : ষোড়শ শতকে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী[৩] একজন 'ভণ্ড' সভাসদকে চিনিতেন। তিনি তাঁহার নামকরণ করিয়াছিলেন—'ভাঁড়ু দত্ত'। আলোচ্য শতকে সে-চরিত্রের ভোল-ফের হইয়াছে মাত্র। কিন্তু, তাহার আদর্শ সুচিরকালের।—

ভেট লয়্যা কাঁচকলা, পশ্চাতে ভাড়ুর শালা, আগু ভাঁড়ু দত্তের পয়াণ।
ফোঁটা কাটা মহাদম্ভ, ছিড়াধুতি কোঁচা লম্ব, শ্রবণে কলম খরশাণ ॥
প্রণাম করিয়া বীরে, ভাঁড়ু নিবেদন করে, সম্বন্ধ পাতায়্যা বলে খুড়া।
ছিড়া কম্বলে বসি, মুখে মন্দ মন্দ হাসি, ঘন ঘন দেই বাহু নাড়া ॥
আইলুঁ বড় প্রতি আশে, বসিতে তোমার দেশে, আহ্বানে ডাকিবে ভাঁড়ু দত্তে।
যতেক কায়স্থ দেখ, ভাঁড়ুর পশ্চাতে লেখ, কুলে শীলে বিচারে মহত্বে ॥
কহি যে আপন তত্ব, আমলহাঁড়ার দত্ত, তিন কুলে আমার মিলন।
ঘোষ বসুর কন্যা, দুই জায়া মোর ধন্যা, মিত্রে কৈলুঁ কন্যা সমর্পণ ॥
গঙ্গার দুকুল কাছে, যতেক কায়স্থ আছে, মোর ঘরে করয়ে ভোজন।
পট্টবস্ত্র অলঙ্কার, দিয়া করি ব্যবহার, কেহ নাহি করয়ে রন্ধন ॥
বহু পরিবার মেলা, দুই মাগু চারি শ্যালা, চারি পুত্র বহিনী শাশুড়ী।
ছয় জামাই ছয় চেড়ী, এই হেতু সাত বাড়ি, ধান্য দিয়া না লইবে বাড়ি ॥
হাল বলদ দিবে খুড়া, দিবে হে বিছন পুড়া, ভাঙ্গা খাইতে ঢেকী কুলা দিবে।
আমি পাত্র তুমি রাজা, ইহা জানি কর পূজা, অবশেষে ভাঁড়ুরে জানিবে ॥
ভাঁড়ুর বচন শুনি, মহাবীর মনে গুণি, ভাঁড়ুরে করিল বহু মান।
দামিন্যা নগরবাসী, সঙ্গীতের অভিলাষী, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

সঘনে হেলায়্যা শিরে, চাতুরী প্রবন্ধে ধীরে, ভাঁড়ু দত্ত কহে কাণকথা।
যে হৈলে প্রজা বৈসে, কহি আমি সবিশেষে, একে একে প্রজার বারতা ॥

১ চি-প-স ২, পৃ ২৯ ২ ঐ, ঐ ৩৩১ ৩ ক-চ, পৃ ৮৪-৫

তাড়বালা দিবে মান, করজ বলদ ধান, উচিত কহিতে কিবা ভয়।
জিনিতে প্রজার মায়া, জমি দিবে মাপিয়া, বন্দে বন্দে যেন প্রজা লয়॥
যখন পাকিবে খন্দ, পাতিবে বিষম দ্বন্দ্ব, দরিদ্রের ধানে দিবে নাগা।
খাইয়া তোমার ধন, না পালায় যেন জন, অবশেষে নাহি পাবে দাগা॥
দিয়ান ভেটের বেটা, বহিত আমার চিঠা, যারে বল বুলানমণ্ডল।
থাকিতে সকল প্রজা, আগু আন মোর পূজা, কয়্যা দিব প্রকার সকল॥
পরি দু-পণের কাচা, ভানিত আমার ভাচা, সেই বেটা হবে দেশমুখ।
নফরের হাতে খাণ্ডা, বহুড়ী জনের ভাণ্ডা, পরিণামে বড় পায় দুখ॥
শুনিয়া ভাঁড়ুর বাণী, মহাবীর মনে গুণি, মনে ভাবি না দিল উত্তর।
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান, নায়কেরে দেহ চণ্ডি বর॥
বা,
অনুক্ষণ[১] চিন্তে ভাঁড়ু বীরের বিপাক, রাজ ভেট নিল কাঁচকলা পুঁইশাক॥
চুপড়ি করিয়া নিল কদলীর মোচা, মাথের বসন পরে ভূমে নাম্বে কোঁচা॥
পাগখানি বান্ধে ভাঁড়ু নাহি ঢাকে কেশ, কেশরের তিলকে রঞ্জিত কৈল বেশ॥
কৈফিয়তী পাজীখান নিল সাবধানে, শ্রীহরি বলিয়া ভাঁড়ু কলম গোঁজে কাণে॥

* * *

ভাঁড়ু দত্ত যত কয়, একথা যদি মিথ্যা হয়, কর তবে প্রাণবধ দণ্ড।
কহি আমি হিত বাণী, মন দেহ নৃপমণি, কালকেতু হইল প্রচণ্ড॥
সোঙরি তোমার গুণ, শুধিতে আইলাম লোণ, বারতা জানাইবার তরে।
চণ্ডিকার সুচরিত, রচিল নৌতুন গীত, সুখে থাকি আড়রা নগরে॥

একটি সনাতন 'ভণ্ডরামের' চরিত্র আমরা একখানি পুরাতন পুঁথিতে[২] পাইয়াছি। দুই শত বৎসর পূর্বেও বাঙ্গালী-সমাজে এই আদর্শ ভণ্ড-চরিত্র চিহ্নিত হইয়াছিল।—
পৃথিবীতে ভাঁড় যত তাহা বা কহিব কত সংসার ভাঁড়ের কথা শুন।
দেখিঞা অজ্ঞানজনে প্রণয় করে তার সনে জানাইতে আপনার গুণ॥১॥
মিছামিছি করে ঠাট গোলমালে চণ্ডীপাঠ ভেক ধড়্যা সাধুর কাছে যায়।
নাহি জানে হিতাহিত মিছামিছি করে প্রীত জানিঞা আপনাকে খায়॥২॥
উৎপন্ন বুদ্ধি লয় পাঁজে পাঁজ দিঞা কয় ভরম কর্যা থাকে দিবানিশি।
পূর্ব্ব সভার পাসরিল দেখ্যা শুনে রসিক হৈল তারে বলি ভণ্ড তপসী॥৩॥

১ ক-চ, পৃ ৯১-৯২ ২ পুঁ-প ১, পৃ ১৮৫-৮৬

দেখিঞা আপন করে লোকে রা নাহি কাড়ে আপনাকে বড় মানে হেন।
না জানে প্রেমের তত্ত্ব মিছা করে পরমার্থ পুরাণ ভারতের মত যেন ॥৪॥
পরমার্থ করিতে যায় কথা বিচে কড়ি খায় সব মিছা তার অকারণ।
তার সঙ্গ করে যেই তার মত হয় সেই দুই জনার নরকে গমন ॥৫॥
বড় নিঃশ্বাস ছাড়িঞা বৈসে যেন দারুণ ঝড় এসে হেন ভাড় জনমিবার নয়।
সতর হইয় মনে না থাক ভাড়ের সনে এইকথা দিগাম্বরে কয় ॥৬॥
ইতি ভণ্ডরামের পদ ॥

গত শতাব্দীর জের 'প্রেমতরঙ্গ' নামক পুরাতন গ্রন্থ হইতে দেখানো যাইতেছে।—

খোসামুদের বাক্যবাবুর বিদ্যাভ্যাস।

ত্রিপদী॥ কপালে চরক ফোটা, মুখেতে স্তবের ঘটা, তুলসীর মালা বোঝা গলে। অন্তকথা মুখে পড়ে, ঘন ঘন হাত নড়ে, কতকথা কন কত ছলে॥ নম্বীর শামুক গেটে, কাচা দেওয়া খুব এটে, পাছার ভিতর লগ্ন হয়। থান কাঁকড়ার ঝোল, মুখে হরি হরি বোল, সহস্রেকে যদি সত্য কয়॥ কর্ত্তার নিকটে বসি, সর্ব্বদাই হাসি খুসি, শতরঞ্চ চৌপাড়ের খেলা। কিবল কথার ঝুড়ি, বাৎকম্মে দেন তুড়ি, গেঠে বাধি অধমের ভেলা॥ বুঝে বাবু অভিপ্রায়, তখনি তাহাতে সায়, ভালমন্দ নাহি কিছু বোধ। যদি কর্ত্তা কারো পরে, কথা কন রাগ ভরে, দ্বিগুণ করয়ে তাতে ক্রোধ॥[১]

১২৬০ সালে লিখিত 'নব-বাবু-বিলাস'-গ্রন্থেও 'খোসামুদে অমাত্য বৃত্তান্ত' পাওয়া যাইবে[২]।

॥ পরিশিষ্ট ॥

॥ লোকসঙ্গীতে[৩] স্বকীয়া প্রণয় ॥

১ কলমী-লতে বাধলি মাথা, সিঁদূর কুথা পালি লো।
ভাগ্যি ছিল পরের বেটা, মাথায় সিঁদূর দিল লো॥

২ মা দিয়েছে মাথা বাঁধে, দে গো পিসী ফুল গুঁজে।
তোদের জামাই দাঁড়ায়ে আছে, নাটাপাটার বড়তলে॥

১ প্রে-ত, পৃ ৪৬ ২ V. S. P., p II, পৃ ১৭৩৬-৩৭

৩ মদীয় সংগ্রহ: বাঁকুড়ার লোকসঙ্গীত। Indian Folk-Lore পত্রিকায় দ্রষ্টব্য মদীয় প্রবন্ধ: Folk Songs on Love (1868 B. S./October-December, 1957)

৩ নিমাই নিমাই নিমপাতা, এক বালিশে দুই মাথা, পিদিম জ্বেলে কই কথা ॥

৪ চালভাজা কড়কড়ে ভাজা, দাও মা বউয়ের আচলে,
মনে করি থোকা হবে, নাই মা বউয়ের কপালে।
কি কর কি কর বউ, কালীমেলায় বসে গো,
কালীমাকে আদ্দাস[১] কর, হবে জোড়া বেটা গ।
বাঁকুড়ার একটি ব্যাগুন, বউকে রাঁধতে দিয়ো না,
বড় হয়েছে বেটার মা গ, বউকে কিছু বোলো না ॥

৫ থোকার মা ল পুঁটীর মা, তথে না দেখিলে রইতে নারি,
এমনি কেনে তোর স্বভাব, আমায় কেনে টির্‌কারুস্[২]।
ও ল খুঁকীর মা ॥

৬ আঁচিয়ে পাঁচীরে পদ্ম পদ্ম কেনে ফুটে নাই,
আমার টুসুর হাতের পদ্ম ভোমর বই আর বসে নাই।
বাঁকুড়াতে দেখে আলম দালানেতে খড়িমাটি,
কোন্ দালানে বাজল বাঁশী মন ভরে শুনে আসি।
বড় বাঁধে ডুবে মরি ছোট বাঁধে কে তুমি,
শ্যাওড়া গাছে ডগ মিলেচে হর্তকী-তলে আমি।
আঁধার রাতের কাল শাড়ী জোস্না রাতে পোরো নাই,
আমার টুসু বেড়াতে গেলে চোর বলে কেউ ধরো নাই।
এক শো টাকা দু শো টাকা তিন শো টাকার আকবালা,[৩]
আকবালাটি ভাঙ্গে গেলে ঘুচাব তোর হাতনাড়া।
ই চালের পুঁই উ চালের পুঁই পুঁইয়ের খাব মিচুরি,
আর যাব না শ্বশুরবাড়ী ধরে ঠোকে শাশুড়ী ॥

॥ লোকসঙ্গীতে পরকীয়া প্রণয় ॥

১ অজুধ্যা নাগরে ঘর, তায় আসেচে সাঙ্গালি বর।
সাঙ্গায় যাব না হে, আমার বিহালি পুরুষ আছে।
বড় অনুরাগে নয়া নিয়ে গেচে ॥

১ আদ্দাস—মানত ২ সামধাতু—টিটকারি দিস্ ৩ অলঙ্কার

২ পায়ে আলতা কুলি[১] কাদা, তায় আসেছে নিতে।
হারালো সিঁদূরের কৌটা, মন সরে না যাতে।

৩ আমি একটানে[২] দুজনে থাকি।
আজ কেনে বঁধু অভাব কিসের, এক খিলি পান খেয়েচি দুজনে।

৪ পীরিত করা ভাল লয়, ঘাটের পাতর হ'তে হয়,
জবর ক'রে কইতে পাই নাই কতা।
বাঁচা হ'তে বরং মরা ভাল, আমার কপালে আছে লেটা।
এই পীরিতে কাজ নাই আমার, সেই ত হল দেখা।
শুঁদু শালুকের ফুল রজনীতে ফোটা,
যার সঙ্গে যার ভালবাসা, মরি, মন হ'ল তাদের চোটা[৩]॥

জের : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ধ্রুবপদ ॥

১ বেউল বাঁশের বাঁকখানি নীলপাটের শিকে
কিষ্টর কাঁদেতে দিয়ে চলিল রাধিকে।...

২ বুকের মাঝে সোনার কৌটো,
হাত দিলে হয় মুঠো মুঠো।...

৩ কঁকিলের কুহুস্বরে বিঁধিল অন্তরে
ভমরা ভমরী নাই গ ঘরে।
রাতি দিবাকর অতি সংসার ধর
য্যান সকা আমি পুব্ব্ দিগে যাই
বল সকা উটা কে বটে।
পথে চলে যেতে কথা বলে নানামতে
বেড় দিয়েঁ চলে যাই, সেইখেনে আগুলে।
প্যার হ'তে দেই নাই ও জলঘাটে॥

১ কুল্যা—পথ ২ একস্থানে ৩ কড়া, ভাজা, আঘাতপ্রাপ্ত

॥ লোকসঙ্গীতে ভোষামোদ ॥

১ সুরগুঁজার[১] রাণী ছিল,
সে রাণী কুথা রে গেল।
রাজাকে বাউল করি ॥
আমরা খসামুদির হাট করি,
দে তুলে দে বেগুনের ঝুরি ॥

২ নদি ধারে গাই কমলালো[২]।
যখন বাগাল বাজায় বাঁশী,
তখন আমি তেলকে[৩] যাই।
কুলুঘরে বাটি রাখ্যে
বাঁশীর স্বরে চলে যাই।
দে তুলে দে বাগুনের ঝুড়ি,
আমরা খসামুদির হাট করি ॥

আদিবাসীদের মধ্যে গোঁড় জাতির[৪] বন্ধুত্ব-প্রথা অতি উচ্চ আদর্শে বিধৃত। বন্ধুত্ব-প্রথাকে তাঁহারা একটা কলাবিদ্যায় পরিণত করিয়াছেন, বলা চলে। এই বন্ধুত্ব স্ত্রী-পুরুষের সংস্পর্শজাত নহে। তাঁহাদের বন্ধুত্ব স্ত্রী-পুরুষ স্ব স্ব জাতির মধ্যে আবদ্ধ। পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার গভীরতা অনুসারে তাঁহাদের বন্ধুত্ব পাঁচ প্রকারে বিভক্ত।—ভাজলি, সখী, জওয়া, মহাপ্রসাদ ও গঙ্গাজল। আমাদের বাঙ্গালী-সমাজেও 'সখী', 'মহাপ্রসাদ' ও 'গঙ্গাজল'—এই নাম তিনটি সুপরিচিত।

বিশ্বভারতী-সংগ্রহে বৈষ্ণবপদাবলীর উদ্‌ধৃতিযুক্ত[৫] পত্র, আক্ষেপ-পত্র,[৬] প্রহেলিকা-পত্র[৭] এবং স্নেহভাজনকে লিখিত আদর্শ প্রণয়-পত্রও[৮] রহিয়াছে।

১ ওড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত সরগুজা স্টেট্‌ ২ [সহবাস] কামনা করিল ৩ তেল আনিতে, তু. তলকে
৪ প্রবাসী, ১৩৪১, পৃ ২১৪ (Verrier Elwin) ৫ চি-প-স ২, প-সং ৫৯১ ৬ ঐ, ঐ, ৫১১
৭ ঐ, ঐ, ১৫৪, ৫২০, ৫২৭ ৮ ঐ, ঐ, ৫০০

এই স্মৃতির ভাণ্ডারে অত্যন্ত যথাযথরূপে ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে কিন্তু ছবি দেখার একটা নেশা আছে, সেই নেশা আমাকে পাইয়া বসিল। যখন পথিক যে-পথটাতে চলিতেছে বা যে-পান্থশালায় বাস করিতেছে, তখন সে-পথ বা সে-পান্থশালা তাহার কাছে ছবি নহে; তখন তাহা অত্যন্ত বেশি প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত অধিক প্রত্যক্ষ। যখন প্রয়োজন চুকিয়াছে, যখন পথিক তাহা পার হইয়া আসিয়াছে, তখনই তাহা ছবি হইয়া দেখা দেয়।

১৩১৮ রবীন্দ্রনাথ

॥ ঘরোয়া খুঁটিনাটি ॥

(সন ১১৩৯-১২৯৯ : খৃ ১৭৩২-১৮৯২)

অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক হইতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত সময়ের ঘরোয়া খুঁটিনাটির চিঠিপত্র[১] পাওয়া গিয়াছে। ক্রমাগত কর-বৃদ্ধির অনিবার্য কারণে মোগল-শাসনের শেষ পর্যায় হইতে কৃষিজীবী বাঙ্গালী-পল্লী-সমাজের দারিদ্র্যের চিত্রই ইহাতে প্রতিভাত হয়। মোগল-শাসনে দেশ ইতঃপূর্বেই নিঃস্ব হইয়াছিল। সুতরাং, ইংরেজ-আমলের গোড়াতে ছোটখাট জমিদার, তালুকদার, পত্তনিদার ব্যতিরেকে, সবারই ঘরে খরচের অপ্রতুলতা,[২] অসঙ্গতি[৩] বা অসুসার[৪]। উঠানাদার কলু তৈল দেয় না[৫]। কুন্থু মুদী[৬] বড়ই তাগাদা করিতেছে। লবণ তৈলের খরচ চালানো ভার। অনায়াসে না মিলিলে[৭] বড়ি, গুড়, মূলা বেগুনও দুর্লভ বস্তু। নিমন্ত্রণ না-থাকিলে[৮] ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সংসার অচল হইয়া উঠে। ঈশ্বর তাঁহাকে দায়গ্রস্ত করিয়াছেন, এই ভাবনায় কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করেন। গুরুদেব আছেন,[৯] গুরু যা করেন, সর্বদাই এইরূপ একটি আশঙ্কিত পরনির্ভর ভাব। এই বিষয়ে উপদেশও বর্ষিত হয়,—গৃহস্থালী[১০] খুব তদারক করিলে থাকে, লাভাদৃষ্ট থাকিলে অল্প প্রয়াসেই হইতে পারে। তবুও মতান্তর, প্রতারণা, ষাণ্ডিক দক্ষতায়[১১] ভায়াচারি বিরোধ, কুলীন মেয়েদের শ্বশুরঘর যাওয়া লইয়া গোলমাল, দলাদল, ফেজেএ, মারধর করিয়া বধূকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া[১২] দেওয়া, মোকদ্দমা রুজু[১৩]—এ-সব তো ছিলই। ২ টাকা বেতনেই[১৪] লোক খুশী। স্ট্যাম্পের দারোগা[১৫] হওয়া আকাঙ্ক্ষিত চাকুরি। সাহেবের নিকট ধর্ণা-[১৬] দেওয়া সে তো অবশ্যকর্তব্য। তবে মুরুব্বি ধরিয়া নির্ভাবনা[১৭] হওয়া যাইত তখনও। সোনা রূপার গহনা, পিতল কাঁসার তৈজস, টুক্রা—এই সব বন্ধক দিয়া কট বা তমস্সুকে[১৮] টাকা কর্জ করা হইত। তণ্ডুলের কারবারও[১৯] আছে। চাউল বহিবার ভাড়া চাউলেই দেওয়া[২০] হইত। গরু ৩ টাকায়, অশ্ব[২১] ৭৮০ টাকায় পাওয়া যাইত। সিদ্ধান্তি-মেলের অকৃতদার পাত্র আপনার মূল্যের দশ তঙ্কা ছাড়িয়া বিবাহে রাজি[২২] হইলে কন্যাপক্ষ ভাবিতেন, সে এক অশেষ অনুকম্পা।

ধর্মবিশ্বাসে দৈব, সংক্রান্তি ফল, পুরশ্চরণ,[২৩] শিবকবচ,[২৪] কোষ্ঠিগণনা,[২৫] দ্বিরাগমনে[২৬]

১ বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য 'বিষয়-সূচী', পৃ ২১-২৫ ; 'নির্ঘণ্ট', ২খ, পৃ ৪৮৫-৫৬৬

২ চি-প-স ২, চি-সং ৩৩ ৩ ঐ, ঐ ৩৪, ৩৫ ৪ ঐ, ঐ ৩৮ ৫ ঐ, ঐ ৬৪ ৬ ঐ, ঐ ৫৭০

৭ ঐ, ঐ ৩৮ ৮ ঐ, ঐ ১৯ ৯ ঐ, ঐ ৩০৮, ই. ১০ ঐ, ঐ ৭৮ ১১ ঐ, ঐ ৫৯

১২ ঐ, ঐ ৬১, ৭১ ১৩ ঐ, ঐ ৮৫ ১৪ ঐ, ঐ ৩৬ ১৫ ঐ, ঐ ৩৯ ১৬ ঐ, ঐ ১০০, ই.

১৭ ঐ, ঐ ৫৭১ ১৮ ঐ, ঐ ৩৭, ৫১৩, ই. ১৯ ঐ, ঐ ৪২, ৫৬ ২০ ঐ, ঐ ৭০ ২১ ঐ, ঐ ৫৫৬, ই.

২২ ঐ, ঐ ৬৮ ২৩ ঐ, ঐ ৪৩ ২৪ ঐ, ঐ ৫৪ ২৫ ঐ, ঐ ৫৩, ৬২ ২৬ ঐ, ঐ ৪৬

পশ্চিমে শুক্রবিচার, সাধার,[১] পুত্রস্থানে গ্রহ,[২] কন্যা নষ্ট (মৃত) হইলে গয়াধাম[৩] গমন, কার্ত্তিক-পূজা,[৪] ব্রাহ্মণভোজন[৫] ইত্যাদি সমস্তই প্রচলিত ছিল দেখা যাইবে। তবে সমাজে জগাই-মাধাই-এর অভাব কোনোকালেই ঘটে নাই। কেচুল্লার মুখোপাধ্যায়রা কালাশৌচ মানেন না[৬]— তখনকার দিনে সে-এক জানাইবার মতো খবর।

সচ্ছল গৃহস্থের চিত্রও যে পাই না, তাহা নহে। তাঁহাদের আহারে[৭] রামশাল চাউল, বর্ধমানের পটল, পুস্ত, ঘৃত, আম, কলা, চিনি, সন্দেশ, মুড়কি, ফেনি, দলুয়া, ছাবা, পাটালি, চাকতি, মণ্ডা, মিঠাই ; পরনে[৮] চন্দ্রকোণা ধুতি, তসরের ভুনি, মলমল, জামদানি, দোলাই, পাপোষ,[৯] বিনামা, খড়ম ; আভরণে[১০] শঙ্খ, বাক, পুটে, বোলাক, মরদানা, তাড়, হাঁসুলি, কানবালা, চুনী, রাঙ্গা-লোহা, মল, নোলক, মাদুলি, মুক্তা, ঝুমকা, নৎ ইত্যাদি সোনা ও রূপার ভালো ভালো গহনা ; বিলাসে[১১] চৌকি, পিঁড়ি, আড়ানি, সূক্ষ্ম-ঝালর-দেওয়া মশারি, কুঙ্কুম, ফুলেল ; বাহন তাঁহাদের ডুলি ও কাহার, সঙ্গে চলে পাইক ও মশালচি। তাঁহাদের ঘরেও সওয়ারী আসেন[১২] পাল্কী চড়িয়া। তৈল-ধুতি[১৩] পরিয়া তাঁহারা স্নান করিতেন ; জলেশ্বরের ধোলাই ধুতি পরিয়া মদিরা সহযোগে খানার শেষে, কুরসিতে বসিয়া সাল-মাউতে-মাখা তামাক টানিতে টানিতে তাঁহারা আফিঙ্গের মৌতাতে, গুমোট বরষায় ঝিমাই-তেছেন—এই চিত্র[১৪] দুর্লভ নহে। বেলা আড়াই প্রহর বাদে, দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরের পিঁড়াতে বসিয়া ঠাকুরানী ঘরের ভিতরে জাঁতাতে যখন ।০ আনায় কেনা ১০ সের বুট ভাঙ্গেন,[১৫] সেই স্মরণীয় শুভমুহূর্ত বুঝিয়া ইহাঁরাই দেনদারদের সহিত টাকার লেনদেন করিতেন। গাডু, ফেরুয়া, লোটা, নক্‌শি, বৌগুণ, জামবাটি, মথুরাই বাটি, আনন্দপেলা, ধুতরাফুলি, চাঁদ-পেয়ালা, ইত্যাদি ; সপ, পাটি, পাশা, পাথর, কলের বা বাঙ্গালার বন্দুক, নেপ, গো-ছাতা, সমস্তই তাঁহাদের তৈজস ও আসবাব[১৬]। তাঁহারা মেথরানী রাখিতেন মাসিক নগদ ।০ আনা বেতন দিয়া। নবম বাবুকে সন্দেশ খাওয়াইতে তাঁহাদের এককালীন খরচ হইত ।০ আনা। অবশ্য তাঁহাদের ঘরেও মৎস্য-পার্বণী আসে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার চন্দন আসে। প্রণামী আসে। তাঁহারা খরিদ করেন মাতা-গোস্বামীর কাপড়, বাটীর দাসীর কাপড়। প্রসাদ পাইতে নিমন্ত্রণ করিলে তাঁহারাও প্রণামী পাইতেন[১৭]। তাঁহারা গুরু-গোঁসাই হইলে, ব্রহ্মোত্তর ভূমির খাজানা, বার্ষিকী, প্রণামী, মঠমন্দির-ব্রত-প্রতিষ্ঠাদিতে দক্ষিণা, ভূর্জপত্রে কবচাদি

১ চি-প-স ২, চি-সং ৮১ ২ ঐ, ঐ ৪৯ ৩ ঐ, ঐ ৬৩ ৪ ঐ, ঐ ৬৩ ৫ ঐ, ঐ ৪৮৩
৬ ঐ, ঐ ৭৫ ৭ ঐ, ঐ ৭৭ ৮ ঐ, ঐ ৩২, ৬০ ৯ ঐ, ঐ ৬১২ ১০ ঐ, ঐ, দ্র. 'নির্ঘণ্ট'
১১ ঐ, ঐ ৪৮, ৫৫ ১২ ঐ, ঐ ৫৩০, ৫৩১ ১৩ ঐ, ঐ ৫৩০ ১৪ ঐ, ঐ ৭৩, ৫৩০
১৫ ঐ, ঐ ৫৩২ ১৬ দ্র. ২৭, 'নির্ঘণ্ট' ১৭ ঐ, ঐ ৫৩০

লিখন, ধান্য-বিক্রয় ইত্যাদি হইতে আয়ের পথ ছিল[১]। চেলা ও তাহার গর্ভধারিণী উভয়কে পোষণ করিবার মতো তাঁহাদের অপ্রতুলতা ছিল না[২]। তাঁহারা ময়ূরের ছা[৩] পুষিতেন, তাঁহাদের ত্যাগীয় পিতল কাঁসার তালিকা দেখিয়া তাক্ লাগে[৪]। 'ইত্যাদি' লোকে তাঁহাদের ঘরে নির্ভয়ে জিনিষ গচ্ছিত রাখে[৫]। দুই টাকা 'লৌকতায়' তাঁহাদের অমর্যাদা হয়। তাঁহাদের শ্রীপাটের[৬] সংবাদ লইতে শিষ্যবাড়ী হইতে ঘন ঘন ভেট আসে। সেবার নিমিত্ত তুপীস্থ মৎস্য[৭] আসে; 'অভ্র' আসে[৮]। বলিয়া দিতে হয়,—'বহন ব্যক্তিকে বিবেচনা করিবেন'। আর আসে তসরের কাপড়, নারিকেল, উত্তম আমট, দুই গুলি কুল-আচার, ব্যজন করাইবার নিমিত্ত বাঁশের পাখা। অনুগত শিষ্যদের কিঞ্চিৎ প্রসাদ দিয়া চরিতার্থ করিবার প্রত্যাশায় আরও আসে[৯] কত-কি। কিন্তু, গুরুর আরও পাওয়ার আশা ইহাতে মিটিত না। তাঁহার লজ্জাহীন লোভ খুঁটিনাটি বিধি-বিধানের ফরমাসে যেন শতজিহ্ব হইয়া পুণ্যকামী নিরীহ শিষ্যকে লেহন করিতে থাকিত।

মুসলমানের সহিত হৃদ্যতার অভাব ছিল না[১০]। গরীব সেখ মজুকুরের চাকরি বহাল রাখার উদ্দেশ্যে শ্রীচন্দ্র সাহা মধ্যম-ঠাকুর মহাশয়কে যার পর নাই অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। ঘরোয়া ঝগড়ার বিবরণ-সম্বলিত পত্রখানি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক[১১]। ত্রিসন্ধ্যা পরম শুভাশীর্বাদ করিয়াও প্রার্থিতের মন মিলিতেছে না। বৈরাগীর হাতেও ঠকিতে হইতেছে[১১]। বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে মনস্তাপ অনুপযুক্ত, জানাইয়াও ফল হইতেছে না[১১]। পিতা-মাতাকে খেদ দিলে সকল বৃথা[১১]। কিন্তু আধমরা জাতির অসাড় মনে সান্ত্বনা আসিতে বিলম্ব হয় না, সার কথা ভাবিয়া—তোমার চারা কি [সকলই] আমার কর্মাঙ্কিত[১১]।

এই অধ্যায়ের নিম্নলিখিত মূল্যবান্ হিসাব-ফর্দগুলির ক্রমিক আলোচনা 'ব্যবসায়-বাণিজ্য' প্রকরণে করা যাইবে।—(৪২, ৫২৫) ১১৬০ সালে ঘরোয়া হরজাই জমা-খরচের হিসাব—আর্কট (মুদ্রা); (৫৪৭) ১১৭০ সালে হাট-বাজার, ধুতি ইত্যাদির পরিমাণ ও মূল্য; (৫১৭) ১১৭১ সালে মূল্যবান্ ঘরোয়া জমা-খরচের ফর্দ— অরংসাই (মুদ্রা); (৪৯৩) ১২২৮ সালের হিসাব; (৫৩১) ১২৩০ সালের, (৫৩০) ১২৪৬ সালের, ও (৫২৯) ১২৪৮ সালের হিসাব; (৭৬) ১২৫৪ সালে তিরোলের হাট-খরচ; (৮৩) ১২৫৭ সালে ঘরোয়া খুঁটিনাটি জমা-খরচের হিসাব; (৫৫৬) ১২৭৬ সালে রাইপুরের সুধাকৃষ্ণকে থানা দে জায়—॥০, অশ্ব—৸০; (৭৩) তারিখহীন এই হিসাব-ফর্দটি বহুতথ্যে পরিপূর্ণ।

১ অ. পৃ ১৯-৪৯ ২ চি-প-স ২, চি-সং ৬৬ ৩ ঐ, ঐ ১২৭ ৪ ঐ, ঐ ৮২ ৫ ঐ, ঐ ৫১
৬ ঐ, ঐ ৬২৫ ৭ ঐ, ঐ ৩৬৩ ৮ ঐ. ঐ ১৬২ ৯ ঐ, ঐ ৫৭৩, ই. ১০ ঐ, ঐ ৫৭১
১১ ঐ, ঐ ৫৪৩

জঙ্গল বাড়িয়া উঠিতেছে, ম্যালেরিয়া নিদারুণ হইতেছে, দুর্ভিক্ষ ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে; আকাল পড়িলে পরবর্তী ফসল পর্যন্ত ক্ষুধা মিটাইয়া বাঁচিবে এমন সঞ্চয় নাই; ডাকাত অথবা পুলিস চুরি অথবা চুরি তদন্ত জন্য ঘরে ঢুকিলে ক্ষতি ও অপমান হইতে আপনার গৃহকে বাঁচাইবে এমন পরস্পর ঐক্যমূলক সাহস নাই।

* * *

যা লইয়া শরীর বল পায় ও ব্যাধিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে তাহার কী অবস্থা। ঘি দূষিত, দুধ দুর্মূল্য, মৎস্য দুর্লভ, তৈল বিষাক্ত; যে কয়টা স্বদেশী ব্যাধি ছিল তাহারা আমাদের যকৃত প্লীহার উপর সিংহাসন পাতিয়া বসিয়াছে; তাহার উপর বিদেশী ব্যাধিগুলা অতিথির মতো আসে এবং কুটুম্বের মতো রহিয়া যায়,—ডিপথিরিয়া, রাজযক্ষ্মা, টাইফয়েড্ সকলেই এই রক্তহীনদের প্রতি Exploitation-নীতি অবলম্বন করিয়াছে।

১৩১৪ রবীন্দ্রনাথ

॥ ব্যাধি ও উৎপাত ॥

(সন ১১৪৮-১২৭২ : খৃ ১৭৪১-১৮৬৫)

আলোচ্য শীর্ষকের প্রসঙ্গে চিঠিপত্র পাওয়া গিয়াছে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষ দশক হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত। সেকালের গ্রাম্য সাধারণ-বাঙ্গালী-সমাজের সাধারণ মানসিক গঠন-অনুযায়ী ব্যাধি ও উৎপাত[১]কে তিন শ্রেণীতে বিন্যস্ত করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে,—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক।

আধিভৌতিক উৎপাতে সকল সমাজের সকল মানুষেরই একই হাল বোধ হয় সর্বকালের। নানা বিভ্রাট, আঙ্গুলের বেদনায় কাহিল, পদে ক্ষত, ক্ষয়রোগ, মহাপীড়া, হাম, পোড়া-ঘা, পালাজ্বর, কাস, টিকা লইয়া অসুস্থতা, গ্রহণী, ফুলা, পেট-বেদনা, বড়ির ন্যায় মাংসবৃদ্ধি, গালে দাদ, বিজাতীয় অসুখ, ওলাওঠা, ঘা ইত্যাদি আধিভৌতিক অসুস্থতার ফিরিস্তি ও তাহার উপশম-কাহিনী, সকল দেশের সকল সমাজে নানাপ্রকারে প্রচলিত থাকিলেও আলোচ্য সমাজে এ-বিষয়ে বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। ক্ষতের মহৌষধ কাল্যা-লতার পাতা এবং তাহার প্রয়োগ সম্পর্কে ভাষা-কবিতা ও তাহার পুঁথির[২] ব্যবহার ছিল সেকালে প্রচলিত। ক্ষয়রোগে 'বাহ্যে রাখাইয়া' চিকিৎসা সেকালেও বিধেয় ছিল।

সাধ্য-পীড়ায় আরোগ্যের ব্যবস্থা কবিরাজ ও বজলে করিতে পারিতেন। কিন্তু অসাধ্য-পীড়ায় দ্বারস্থ হইতে হইত বোধ হয় ব্যবস্থাপক ভট্টাচার্য মহাশয়ের চৌপাড়িতে। 'ভাষ'-অধ্যায়ে এ-বিষয়ে আমরা অনেক ঘটনা দেখিতে পাইব।

আশীর্বাদে পীড়া শান্তি[৩] হইবার কামনা একালে বোধ হয় আছে— নামে মাত্র; কিন্তু, সেকালে ইহাতে বিশ্বাস করা হইত পুরাপুরি। কালীঘাটে মানত-পূজা[৪] আজও করা হয়; কিন্তু, সেকালের মতো একালে বোধ হয় কেহ ইহাতে একান্তনির্ভর হইয়া থাকে না। প্রতি অমাবস্যায় মহাকাল ভৈরবের পূজা করিয়া,[৫] একুশটি মরিচা দিয়া গঙ্গাজলের সহিত বাঁটিয়া, ঔষধ-সেবন বা সাত দিবস হবিষ্য করিয়া অসুখ সারানো-বিধি একালে অদ্ভুত বলিয়া মনে হইবে। গায়ে বসন্তের গুটী বাহির হইলে সেকালে অবশ্য ডাক্তারের নিকট ব্যবস্থা-পত্র যেমন লওয়া হইত, বজলের অনুমোদনে মসলা খরিদ[৬] করিয়া ব্যবহার করিয়া আরোগ্যলাভেরও চেষ্টা করা হইত। শরীর কাহিল হইলে দেবানুগৃহীত ব্যক্তির দ্বারা দেবার্চনা করাইয়া, শ্রীশ্রীগোপালের মাড়োয় তুলসী চড়াইয়া, গোত্র উচ্চারণ করাইয়া, পাপক্ষয়দ্বারা আরোগ্যলাভের আশা[৭] সেকালে ধর্মভীরু গৃহস্থের ছিল বিশেষ ব্যবস্থা।

১ পূর্বে দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ২৫-২৬ ২ চি-প-স ২, প-সং ৯১ ৩ ঐ, ঐ ৯৯ ৪ ঐ, ঐ ১০
৫ ঐ, ঐ ১০৭ ৬ ঐ, ঐ ১০৯ ৭ ঐ, ঐ ১১০

তবে, সেকালের পাকা-গৃহস্থের হিসাব-বোধও কম ছিল না। বাবাজীর নামে এক শত আট, মগ্ন-রাইয়ের নামে এক শত আট, একুনে ২১৬ তুলসী শ্রীশ্রীগোপাল-স্থলে চার দিন চড়ানোর অনুরোধ করিয়া তিনি অর্থাৎ গৃহকর্তা দেবানুগৃহীত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিবেন 'পশ্চাতে' অর্থাৎ পরে[১]। মনে হয়, ফল ফলিলে তবে দক্ষিণা মিলিবে। গালে ব্যথা হইয়াছে তজ্জন্য স্বস্ত্যয়ন[২] করিবার অনুরোধ জানানো হইতেছে একটি পত্রে। পিসিমায়ের পীড়া, ঔষধ-সেবনের নির্দেশ দেওয়া হইতেছে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া[৩]। অসুখের সময় যে-মানত করা হইত, যথাকালে চিন্তা করিয়া[৪] তাহা শোধ দেওয়া হইত।

আধিদৈবিক উৎপাতের বোধ হয় বিধি একই—স্থানকালনির্বিশেষে। দেবতার ঝড়-জলে ঘর ভাঙ্গিয়া যাওয়া, হঠাৎ হাতে শুয়া-লাগা, চৌকি হইতে চোরের পলায়ন, সিঁধ কাটিয়া সর্বস্ব অপহরণ, কুলুপ ভাঙ্গিয়া যথাসর্বস্ব লইয়া যাওয়া, অপকার করিয়া শহরে যাওয়ায় বিজাতীয় অসুখ, রাহাজানি হওয়ায় চিন্তা ইত্যাদি[৫] এই পর্যায়ে পড়ে।

আধ্যাত্মিক দুঃখের কথা—সে-ও বোধ হয় সনাতন-কালের। লাভ, ক্ষতি, সম্মানহানি, প্রাণ-ব্যাঘাতাদি নানা-অনিষ্ট নিবারণের নিমিত্ত শাস্তিকর্তা ঈশ্বরের নিকট নিজ নিজ মঙ্গলের উদ্দেশ্যে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিয়া, সাবধানে থাকার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সেকালে[৬]। একালে ইহা নিরাকরণের পন্থা বোধ হয় ভিন্ন।

তখন অন্তিমকালে গঙ্গাতীরস্থ করিবার ঘটনা দেখা যায় একখানি পত্রে[৭]। দাদামহাশয়ের শেষ-পীড়ার পরিস্থিতিতে গঙ্গা-তীরস্থ করানো উচিত, সেই উদ্দেশ্যে উদ্ধারণপুর পর্যন্ত যাওয়ার ভাড়া স্থির করিয়া, চারজন বেহারা পাঠাইতে অনুরোধ জানানো হইয়াছে এই পত্রে।

বারগীর হাঙ্গামা সম্পর্কে নূতন ছড়া কিছু মিলিয়াছে[৮]। চৈত্রমাসে নূতন ফসলের সময়ে তাহাদের আক্রমণের ইঙ্গিতও পাওয়া গিয়াছে। বারগীর অতর্কিত আক্রমণ এবং ব্যাধি ও উৎপাত একই পর্যায়ের দৈব ঘটনা—এই মর্মে একখানি রূপক-পত্রও[৯] উদ্ধার করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, ভারতীয় লোকধর্মাশ্রিত সনাতন মানসিকতার প্রতিফলন কায়যোগের কথা। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে স্বতন্ত্র অধ্যায়ে করা যাইবে।

১ চি-প-স ২, প-সং ১১০   ২ ঐ, ঐ ১১২   ৩ ঐ, ঐ ৫৭৯   ৪ ঐ, ঐ ৬২৮
৫ দ্র. পৃ ২৫-২৬   ৬ দ্র. ঐ, ঐ   ৭ চি-সং ১০৩   ৮ ঐ, ঐ ১০৪, ১০৫   ৯ ঐ, ঐ ৫৮২

মৃত্যুর পূর্বেই ঘরের বাইরে নিয়ে যাবার যে প্রথা আমাদের দেশে আছে, তার অর্থটা মনে জেগে উঠল। ঘরের ভিতরকার সমস্ত অভ্যস্ত জিনিস হচ্ছে প্রাণের বন্ধনজাল। তারা সকলে মিলে মৃত্যুকে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করতে থাকে। জীবনের শেষ ক্ষণে মনের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের কোলাহল যদি জেগে ওঠে তবে তাতেই বেসুর কর্কশ হয়; মৃত্যুর সম্পূর্ণ সংগীত শুনতে পাই নে, মৃত্যুকে সত্য বলে স্বীকার করে নেবার আনন্দ চলে যায়।

* * *

বহুকাল হল আমি যখন প্রথম কাশীতে গিয়েছিলাম তখন মৃত্যুকালের যে-একটি মনোহর দৃশ্য চোখে পড়েছিল, তা আমি কোনো দিন ভুলতে পারব না। ঠিক মনে নেই, বোধ করি তখন শরৎকাল; নির্মল আকাশ থেকে প্রভাতসূর্য জীবধাত্রী বসুন্ধরাকে আলোকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে। এপারের লোকালয়ের বিচিত্র চাঞ্চল্য, ওপারের প্রান্তরের সুদূরবিস্তীর্ণ নিস্তব্ধতা, মাঝখানে জলধারা—সমস্তকে দেবতার পরশমণি ছোঁয়ানো হল। নদীর ঠিক মাঝখানে দেখি একটি ডিঙি নৌকা খরস্রোতে ছুটে চলেছে। আকাশের দিকে মুখ করে মুমূর্ষু স্তব্ধ হয়ে শুয়ে আছে, তারই মাথার কাছে করতাল বাজিয়ে উচ্চস্বরে কীর্তন চলছে। নিখিল বিশ্বের বক্ষের মাঝে মৃত্যুর যে পরম আহ্বান, আমার কাছে তারই সুগম্ভীর সুরে আকাশ পূর্ণ হয়ে উঠল। যেখানে তার আসন সেখানে তার শান্তরূপ দেখতে পেলে মৃত্যু যে কত সুন্দর, তা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়।

* * *

হিন্দু কাশীকে পৃথিবীর বাইরের স্থান বলেই বিশ্বাস করে। তার কাছে কাশীর ভৌগোলিক সীমানা একটা মায়া, পরমার্থত সেখানে নিখিল বিশ্বের পরিচয়, সেখানে বিশ্বেশ্বরের আসন। অতএব, বিশেষ দেশবাসীর কাছে বিশেষ দেশের যে আকর্ষণবেগ তার প্রাণকে সেখানকার মাটি জল আকাশের সঙ্গে নানা বিশেষ সূত্রে বাঁধে, কাশীর মধ্যে যেন পৃথিবীর সেই বিশেষ দেশগত বন্ধনও নেই। অতএব, যথার্থ হিন্দুর কানে মৃত্যুর মুক্তিবাণী কাশীতে বিশুদ্ধ সুরে প্রবেশ করে।

* * *

সেদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার মনে হল, আমিও যেন মুক্তির তীর্থ-ক্ষেত্রে মরতে পারি; শেষ মুহূর্তে যেন বলতে পারি, সকল দেশই আমার এক দেশ, সর্বত্রই এক বিশ্বেশ্বরের মন্দির, সকল দেশের মধ্য দিয়েই এক মানব-প্রাণের পবিত্র জাহ্নবীধারা এক মহাসমুদ্রের অভিমুখে নিত্যকাল প্রবাহিত।

১৯২৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ শ্রাদ্ধ ॥

(সন ১১৯১-১২৮০ : খৃ ১৭৮৪-১৮৭৩)

ভূমিকা : স্মার্ত রঘুনন্দন তাঁহার শ্রাদ্ধতত্ত্বম্-এ পুলস্ত্য-বচন উদ্ধার করিয়াছেন—শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে। শ্রদ্ধা অর্থে, শাস্ত্রবচনে দৃঢ় প্রত্যয়। শ্রাদ্ধের দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিবার বিধান। শ্রাদ্ধ ও তর্পণের দ্বারা পিতৃলোকের সহিত নিজের সম্বন্ধ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতে হয়। ইহাতে আত্মপ্রসাদও লাভ হয়। পিণ্ডদানাদি শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপযুক্ত অনুষ্ঠানের নাম—শ্রাদ্ধ। শ্রদ্ধার সহিত পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি-অর্পণের নাম—তর্পণ। শ্রাদ্ধ ও তর্পণ উভয়ই পিতৃকৃত্য[১]। এতৎসম্পর্কে নানা বিধি ও নানা প্রশংসাবাক্য মহাভারত,[২] পুরাণাদিতে কীর্তিত আছে।

দেবযজ্ঞের সঙ্গে সমরূপ করিবার জন্য শ্রাদ্ধকে পিতৃযজ্ঞ বলা হয়। ইহাকে প্রেতযজ্ঞও বলে। বরাহপুরাণে শ্রাদ্ধের উৎপত্তি-প্রসঙ্গ আছে। কেহ কেহ মনে করেন,[৩] দত্তাত্রেয়-পুত্র নিমি ইহার প্রবর্তক। কিন্তু মহাভারতের আখ্যায়িকা ইহার প্রতিকূল[৪]। ইহাতে দেখা যায়, নিমির পূর্বেও এই প্রথা ছিল। যাহাই হউক, 'নিমির' নামে পশ্চিমবঙ্গে শ্রাদ্ধ-তর্পণের দুইটি সুপ্রাচীন প্রসিদ্ধ শ্মশানতীর্থ অদ্যাপি বর্তমান। ভাগীরথীকূলে সুপরিচিত 'নিমাইতীর্থ ঘাট' বা 'নিমিতীর্থ ঘাট'[৫] ও 'নিমতলার ঘাট'[৫] রহিয়াছে। নিমিতীর্থের প্রচলিত নাম 'নিমাই-তীর্থ'। ইহা লোকবিশ্বাসমাত্র। 'নিমাই'য়ের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই। কারণ স্বয়ং 'নিমাই' এই 'নিমিতীর্থ ঘাটে' স্নান করিয়াছিলেন। এই তীর্থের মাহাত্ম্য—নিমগাছে জবার ফুল-ফোটা[৫]। অধিষ্ঠাত্রী-দেবী কালী। 'নিমতলা ঘাটের' তীর্থাধিষ্ঠাত্রী দেবীও কালী। বলা বাহুল্য, নিস্তারিণী শ্মশানকালী। মনে হয়, 'নিমি ঘাট' হইতে 'নিম ঘাট' বা 'নিমতলার ঘাট' হইয়াছে। নিমগাছের যোগাযোগ থাকিলে লোকবিশ্বাসের সোনায় সোহাগা। এখানকার নিমগাছেও জবাফুল ফুটিবার কথা। দ্বিজ শ্রীরঘুনন্দনের মতে,[৬] দেগঙ্গাতেও নিমগাছে[৭] জবাফুল ফুটিত।

অর্জুন 'গঙ্গাদ্বারে'[৮] আসিয়া ভাগীরথীতে অবগাহনপূর্বক প্রথমেই তর্পণ করিয়াছিলেন। এই 'গঙ্গাদ্বর'[৯] বাঙ্গালাদেশেরই তীর্থ।— ইহা যে কত প্রাচীন আর্য-আর্যেতর সংস্কৃতি-সমন্বয়ের স্মৃতিবাহী তাহা বর্তমানে নিরূপণ করা দুষ্কর।

এদেশের ধর্মে-কর্মে, জীবনযাত্রায়, প্রাত্যহিক নানা অনুষ্ঠানে, ব্রাহ্মণ্য ও ব্রাহ্মণ্যেতর দুই ধারার সমন্বয় হইয়াছে। বাঙ্গালীর জীবনযাত্রায় বৈদিক অপেক্ষা অবৈদিক ধারারই

---

১ ম-স, পৃ ২৭৫, শ্রাদ্ধতত্ত্বম্, পৃ ৭৫-১২০, পু-দ, পৃ ৫৫৪-৭৫৬ ২ ম-স, পৃ ২৭৫-২৮৭ ; ভা-সং, পৃ ১৬-১৯

৩ ঐ, পৃ ১৭-১৮ ৪ ম-স, পৃ ২৭৭ ৫ পুঁ-প ২, পৃঃ১২৭, ১২৯ ; ঐ ৩, পৃ ১৬০

৬ সা-প্র ৫, পৃ ২২৭ ৭ নিমকাঠে দেবদেবীর মূর্তি-নির্মাণ প্রশস্ত ৮ ম-স, পৃ ২৭৬

অধিক প্রাধান্য। [প্রাচীন বৈদিক আর্যগণ মৃতদেহ মাটিতে নিহিত করিতেন। পরে, এদেশে কাষ্ঠবাহুল্য-হেতু দাহপ্রথা গ্রহণ করেন। গঙ্গায় বা তীর্থস্থানে অস্থি নিক্ষেপ করা বৈদিক আচার নহে। মুণ্ডাগোষ্ঠীর বিধানে, মৃতের অস্থি দামুদা-নদে পুঁতিতে হয়। ইহাদের মধ্যে দাহ-করা ও প্রোথিত-করা উভয় বিধিই বর্তমান। ইহাদের শ্মশানে প্রস্তরস্তম্ভ নির্মাণ করার প্রথা আছে। তাহা আমাদের 'বৃষকাষ্ঠ' প্রোথিত করার অনুরূপ আচার। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে কন্যাগত সম্বন্ধযুক্তদের আদর বেশী। কন্যাতন্ত্রতা আর্যাচার নহে। মাতৃযাগ না-করিয়া বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে নাই। অশৌচ-পালনের নির্দিষ্ট দিন ব্রাহ্মণদের কম, শূদ্রদের বেশী। হেতু, ইহা মূলতঃ আর্যেতর আচার। গয়াতীর্থ গয়া-অসুরের নামে সম্পৃক্ত। গয়াতীর্থে ও অক্ষয়বটে[১] শ্রাদ্ধে পিতৃলোকের অনন্ত তৃপ্তি হয়। কার্ত্তিকে 'গুড়োদনদান'[২] অর্থাৎ পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে গুড়মিশ্রিত অন্নদান প্রশস্ত। এই গৌড়াচার গোণ্ডদের হইতে পারে। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের মধ্যে মৎস্য[৩]-নিবেদন পুরাপুরি বঙ্গাচার। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণের চেয়ে যোগীদের ভোজন-করানো প্রশস্ত[৪]। ইহাও বঙ্গাচার।]

[শ্রাদ্ধে অর্চনীয়-অনর্চনীয় ব্রাহ্মণের যে বিশাল তালিকা আছে, তাহা বিচার করা সহজ নহে। কিন্তু, এরূপ বিধি-নিষেধ সত্ত্বেও শ্রাদ্ধযাজী ব্রাহ্মণ সমাজে অচল। শ্রাদ্ধ করানোর ফলে প্রেতগুরু গয়ালী 'ধামী' ব্রাহ্মণেরা[৫] সমাজে অচল। শ্রাদ্ধের দান গ্রহণ করায় অগ্রদানীরা অনাচরণীয়। তাঁহারা মহাব্রাহ্মণ। শ্রাদ্ধে তাঁহারা দান গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ করিয়া দিলে তবে অন্যেরা দান গ্রহণ করিতে পারেন।] মহাশ্রাদ্ধী বা 'মড়িপোড়া'-ব্রাহ্মণ মহা অবজ্ঞার পাত্র। সুতরাং তাঁহারা বেদবহির্ভূত বা প্রাগ্‌বৈদিক আদিম আর্যজাতির অবশেষ। অন্ততঃ বৈদিক ব্রাহ্মণ নহেন।] অন্যথা, তাঁহারা যজ্ঞে পশুহননকারী ঋত্বিকের ন্যায় মহামান্য হইতেন। [শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ খাওয়া প্রশস্ত নহে। পক্ষান্তরে, স্বকর্মনিরত, শান্তশিষ্ট এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধীয় দান-গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র।] এতদ্ব্যতীত, অপর ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ-গ্রহণেরই অধিকার নাই। হিন্দুর সকল ক্রিয়া-কর্মেই ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু, উল্লিখিত গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ব্যতীত, কেবল নামধারক ব্রাহ্মণরূপ ব্রহ্মবন্ধুকে ব্রাহ্মণের স্থানে নিযুক্ত করিলে ক্রিয়াই পণ্ড হয় বলিয়া মহাভারতে[৬] উল্লিখিত আছে।

অমাবস্যা পিতৃতিথি, গয়া পিতৃতীর্থ, শ্মশান পিতৃকানন। প্রাগ্‌বৈদিক যুগে মাটিতে নিহিত করা হইত; বৈদিকযুগে দগ্ধ করা প্রবর্তিত হইল; সেইজন্য পিতৃগণের মধ্যে কেহ অগ্নিদগ্ধ, কেহ অদগ্ধ[৭]। দগ্ধ হইলেও প্রাচীনতর প্রথানুসারে অস্থি মাটিতে পোঁতা হইত।

১ ম-স, পৃ ২৮২ ২ ঐ, পৃ ২৮০ ৩ ঐ, পৃ ২৮২ ৪ বরাহ পু, ১৪, ৫০
৫ ভা-শি-ন, পৃ ৩৪৯ ৬ ম-স, পৃ ২৮৫-৮৬ ৭ ভা, সং, পৃ ১৯

সেখানে স্তূপও তৈয়ারী করা হইত। শ্মশান অর্থ যেখানে শব শুইয়া থাকে। অতঃপর দাহস্থানও এই নামে অভিহিত হইল। শ্মশান পবিত্র ও অপবিত্র দুই-ই। সেখানে চণ্ডালের গতিবিধি। হরিশ্চন্দ্রের সেরা দুঃখ শ্মশান-সেবা। পক্ষান্তরে, ইহা সাধনার স্থান, শিব ও কালীর ভূমি, সিদ্ধির পীঠ। অর্থাৎ পুরাতন ও নূতন নানাভাবে শ্মশানের নানারূপে মাহাত্ম্য ও হীনতা।

[শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে বহুবিধ সমাজকল্যাণ-কর্ম করা হইত। পুষ্করিণী-খনন, মঠ-প্রতিষ্ঠা করা হইত। উপযুক্ত ও দরিদ্র ব্যক্তিগণ দান-গ্রহণ করায় পরোক্ষভাবে সমাজ-উপকারক-কাজও হইত।]

আলোচনায় দেখা যায়, [শ্রাদ্ধের মন্ত্রে সেকালের বিশেষ বিশেষ সমাজচিত্র অতি স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোনও কোনও মন্ত্র শুনিলে মনে হইবে, যেন জীবিত ও মৃত একসঙ্গে হাত-ধরাধরি করিয়া চলিতেছে। শ্রদ্ধার দানের তৃপ্তিতে পিতৃকুল যেন বর্তমানকে অশেষ দুর্গতি হইতে মুক্ত করিতে সদাসক্রিয়।]

বঙ্গীয় স্মার্তগণের বিধান[1] **:** হিন্দু আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এই আত্মা, তাহার মতে, অবিনশ্বর। [মানুষের মৃত্যুর অর্থ তাহার দেহের ধ্বংস, আত্মার নহে। মৃতব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, আত্মার তুষ্টিবিধান ও তাঁহার নিকট আশীর্বাদ-প্রার্থনা—শ্রাদ্ধ বলিতে এই সমস্তই বুঝায়। আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা যে মৃতব্যক্তির শুধু মৃত্যুতিথিতেই জানানো হয়, তাহা নহে, উপনয়ন এবং বিবাহাদি সংস্কারের পূর্বেও এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অবশ্যদেয়। যুগ যুগ ধরিয়া শ্রাদ্ধ হিন্দুর সমাজে ও ধর্ম-জীবনের অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপে স্বীকৃত হইয়াছে।]

শ্রাদ্ধবিষয়ক নিবন্ধ : বাঙ্গালাদেশে অদ্যাবধি প্রাপ্ত শ্রাদ্ধবিষয়ক প্রধান নিবন্ধগুলি এই :—(১) শূলপাণির 'শ্রাদ্ধবিবেক', (২) রঘুনন্দনের 'শ্রাদ্ধতত্ত্ব', (৩) গোবিন্দানন্দের 'শ্রাদ্ধক্রিয়াকৌমুদী'। এই তিনখানি গ্রন্থানুযায়ী শ্রাদ্ধের তত্ত্ব ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রাদ্ধের সংজ্ঞা : শূলপাণি কর্তৃক উদ্ধৃত আপস্তম্বের মতে, মৃতব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে কতকগুলি দ্রব্যের ত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া, ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক ঐ সকল দ্রব্যের গ্রহণ পর্যন্ত যাবতীয় কর্মকেই বলা হয় শ্রাদ্ধ। কিন্তু, শূলপাণি নিজেই এই সংজ্ঞার দোষ আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ, শ্রাদ্ধীয় অন্ন শুধু ব্রাহ্মণকে দান করাই বিধেয় নহে; অগ্নিতে বা জলে উহাকে নিক্ষেপ করারও বিধি আছে; এবং উহা গাভী বা অজকেও দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং, উক্ত সংজ্ঞায় একটি প্রধান বিষয়েরই ত্রুটি থাকিয়া যায়। 'দেবশ্রাদ্ধ' ইত্যাদি শব্দে

[1] স্মৃ-বা, পৃ ৮৫-৯৪ হইতে সংশোধিত ও সংকলিত।

শ্রাদ্ধের মুখ্য অর্থ ই নাই, আছে গৌণ অর্থ। পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ একপ্রকার শ্রাদ্ধ বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু, উক্ত সংজ্ঞা-অনুসারে ইহাকে শ্রাদ্ধ বলা যায় না; কারণ, ইহাতে কোনো দ্রব্য ব্রাহ্মণকর্তৃক গ্রহণের কোনো ব্যবস্থা নাই। এই সমস্ত দোষহেতু শূলপাণি শ্রাদ্ধের নিম্নলিখিত সংজ্ঞার নির্দেশ করিয়াছেন,—

সম্বোধনপদোপনীতান্ পিত্রাদীন্ চতুর্থ্যন্তপদেনোদ্দিশ্য হবিস্ত্যাগঃ শ্রাদ্ধম্।

সম্বোধন-পদের দ্বারা (আহূত হইয়া) উপস্থিত পিত্রাদির (আত্মাকে) চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত পদের সাহায্যে উদ্দেশ্য করিয়া হবিত্যাগের নাম শ্রাদ্ধ।

শ্রাদ্ধের তাৎপর্য সম্বন্ধে রঘুনন্দন বিশেষ আলোচনা না-করিয়া বলিয়াছেন যে, বৈদিক প্রয়োগাধীন শ্রদ্ধাপূর্বক আত্মার উদ্দেশ্যে অন্নাদি দানের নামই শ্রাদ্ধ।

শ্রাদ্ধের সংজ্ঞা সম্বন্ধে গোবিন্দানন্দ কর্তৃক উদ্‌ধৃত বিভিন্ন মতের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টিই প্রধান:— (১) পৃথিবী তে পাত্রমিতি মন্ত্রকরণকপাত্রালম্ভনপূর্বকো হবিস্ত্যাগঃ শ্রাদ্ধম্, (২) বেদবোধিতসম্বোধিতদৈবতো হবিস্ত্যাগঃ শ্রাদ্ধম্, (৩) পিতৃনুদ্দিশ্য ব্রাহ্মণস্বীকারপর্যন্তো হবিস্ত্যাগঃ শ্রাদ্ধম্।

নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া গোবিন্দানন্দ উক্ত সমস্ত মত খণ্ডনপূর্বক নিজে নিম্নলিখিত সংজ্ঞানির্দেশ করিয়াছেন,—

বেদবোধিতসম্বোধনপদোপনীতোদ্দেশ্যকতর্পণেতরঃ প্রধানো হবিস্ত্যাগঃ শ্রাদ্ধম্।

এই সংজ্ঞা ও শূলপাণিকৃত সংজ্ঞার মূল অর্থ একরূপই। উভয় সংজ্ঞা হইতেই বুঝা যায় যে, শ্রাদ্ধে হবিত্যাগই প্রধান কর্তব্য। কিন্তু প্রশ্ন এই—যাগ, দান ও হোম, এই তিন স্থলেই হবিত্যাগ বিধেয়। তাহা হইলে, শ্রাদ্ধ ইহাদের কোন্ শ্রেণীভুক্ত। এই বিষয়ে বিভিন্ন মতের সমালোচনা করিয়া শূলপাণি যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে শ্রাদ্ধ যাগ-স্বরূপ এবং দান-স্বরূপও বটে।

শ্রাদ্ধের প্রকারভেদ: শূলপাণি যে শাস্ত্রকারগণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা বিভিন্নরূপ শ্রাদ্ধের বিধান দিয়াছেন। তন্মধ্যে, বিশ্বামিত্রের মতে, শ্রাদ্ধ দ্বাদশ প্রকার; যথা:— (১) নিত্য, (২) নৈমিত্তিক, (৩) কাম্য, (৪) বৃদ্ধি, (৫) সপিণ্ডন, (৬) পার্বণ, (৭) গোষ্ঠী, (৮) শুদ্ধার্থ, (৯) কর্মাঙ্গ, (১০) দৈবিক, (১১) যাত্রার্থ ও (১২) পুষ্ট্যর্থ।

শূলপাণিধৃত 'ভবিষ্যপুরাণে'র মতে, উক্ত শ্রাদ্ধগুলি যথাক্রমে নিম্নলিখিতরূপ:— (১) প্রত্যহ কর্তব্য, (২) একোদ্দিষ্ট—একজনের উদ্দেশ্যে কৃত, (৩) 'অভিপ্রেতার্থসিদ্ধি'র জন্য করণীয়, (৪) মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পূর্বে শুভকামনায় কর্তব্য, (৫) যাহার দ্বারা সপিণ্ডসম্বন্ধ স্থাপিত হয়, (৬) অমাবস্যা বা পর্বদিনে করণীয়, (৭) সুখসম্পদ্ লাভের আশায় অনেকের একত্র করণীয়, (৮) প্রায়শ্চিত্তের পরে পাপক্ষয়ের নিমিত্ত কৃত, (৯) নিষেক, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন

ইত্যাদিতে কর্তব্য, (১০) দেবতার উদ্দেশ্যে কৃত, (১১) যাত্রার পূর্বে করণীয়,[১] (১২) স্বাস্থ্যোন্নতির আশায়, চিকিৎসারম্ভের পূর্বে ও মঙ্গলকামনায় কৃষিকর্মাদির পূর্বে কর্তব্য।

বৃহস্পতি শ্রাদ্ধের নিম্নলিখিত পাঁচটি শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন,— (১) নিত্য, (২) নৈমিত্তিক, (৩) কাম্য, (৪) বৃদ্ধি, (৫) পার্বণ। উক্ত তালিকায় 'কূর্মপুরাণে' পার্বণের পরিবর্তে একোদ্দিষ্টের উল্লেখ আছে।

শূলপাণির মতে, বিশ্বামিত্রের দ্বাদশ প্রকার শ্রাদ্ধ বৃহস্পতির পঞ্চবিধ শ্রাদ্ধেরই অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন, বিশ্বামিত্রের তালিকায় গোষ্ঠী-শ্রাদ্ধ হইতে পুষ্ট্যর্থ পর্যন্ত সমস্ত প্রকার শ্রাদ্ধই কোনো বিশেষ উপলক্ষে বা বিশেষ পদ্ধতিতে করণীয়। অতএব ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীর শ্রাদ্ধ বলা যায় না। সপিণ্ডীকরণে পার্বণ ও একোদ্দিষ্ট— এই উভয়েরই স্বরূপ আছে বলিয়া ইহাকেও পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত করা যায় না।

'মৎস্যপুরাণে' নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যভেদে শ্রাদ্ধের যে ত্রিধা বিভাগ করা হইয়াছে, তাহাও উক্ত পঞ্চধা বিভাগের বিরোধী নহে। শূলপাণি বলিয়াছেন যে, কোনো নিমিত্তবশতঃ যাহা করণীয় তাহাই নৈমিত্তিক ; সুতরাং, পর্বনিমিত্ত কর্তব্য পার্বণ, নৈমিত্তিক শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে। মঙ্গলকামনায় করণীয় বলিয়া বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কাম্যশ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

নিত্য ও কাম্যভেদে বিষ্ণুর মতে, শ্রাদ্ধ দ্বিবিধ। শূলপাণি এইরূপ শ্রেণীবিভাগও সমর্থন করিয়াছেন।

শ্রাদ্ধের উপযুক্ত স্থান : শূলপাণি কর্তৃক উদ্‌ধৃত প্রমাণ অনুসারে, নিম্নলিখিত স্থানগুলি শ্রাদ্ধের জন্য প্রশস্ত :— (১) পুষ্কর[২] নামক স্থান, (২) অপর সকল তীর্থস্থান, (৩) বড় বড় নদীর তীর, (৪) নদীর সঙ্গমস্থল, (৫) নদীর উৎপত্তিস্থল, (৬) নদীতোয়োত্থিত দেশ—অর্থাৎ, নদীর জল যে-স্থান হইতে অপসৃত হইয়াছে সেই স্থান বা দ্বীপ, (৭) নিকুঞ্জ, (৮) প্রস্রবণ, (৯) উদ্যানবাটিকা, (১০) বন, (১১) গোময়োপলিপ্ত গৃহ, (১২) 'মনোজ্ঞ' স্থান, (১৩) গঙ্গা ও সরস্বতী নদীর তীর, (১৪) গয়া, (১৫) কুরুক্ষেত্র, (১৬) প্রয়াগ, (১৭) নৈমিষ, (১৮) পর্বত বা তন্নিকটবর্তী স্থান।

রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দ উক্ত তালিকার সহিত অপর কোনো স্থানের নাম যুক্ত করেন

১ 'যাত্রা'—তীর্থযাত্রা (টীকা)

২ প্রাচীন মতে, 'পুষ্কর' তিনটি— জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। আজমীরের বর্তমান 'পুষ্কর'-তীর্থ বা বাঁকুড়া জেলার দামোদর-তীরের 'পোখরণা' বা 'পখনা' (দ্র. চি-প-স ২, পৃ ৫৭৫)-গ্রাম, জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে ইহার অবস্থান-নির্ণয়ে বিচার্য।

নাই। গোবিন্দানন্দ বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রকর্তৃক নিহত বৃত্রের মেদে সমগ্র পৃথিবী অপবিত্র হইয়াছিল বলিয়া পৃথিবীর অপর নাম মেদিনী। সুতরাং, শ্রাদ্ধস্থান 'পঞ্চগব্য'[১] ও 'উল্মুক' বা জলন্ত অঙ্গার ইত্যাদির সাহায্যে শোধনীয়। তাঁহার মতে, বারাণসীতে শুধু গোময় ভিন্ন অপর শোধক দ্রব্যের ব্যবহার অনাবশ্যক।

শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ স্থান : যে-সমস্ত স্থানে শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য,— (১) ম্লেচ্ছ-অধিকৃত বা ম্লেচ্ছ-অধ্যুষিত স্থান—চতুর্বর্ণের লোক যেখানে বাস করে না তাহাকেই ম্লেচ্ছদেশ বলা হয়, (২) ত্রিশঙ্কুদেশ—মহানদীর উত্তরে এবং কীকট বা মগধের দক্ষিণে দ্বাদশ যোজনব্যাপী দেশ, (৩) কারস্কর দেশ, (৪) সিন্ধুনদের উত্তরস্থ দেশ, (৫) 'রুক্ষ' অর্থাৎ বালুকাময় স্থান (৬) কীটপতঙ্গবহুল স্থান, (৭) কর্দমাক্ত স্থান, (৮) সংকীর্ণ স্থান, (৯) 'অনিষ্টগন্ধিক' স্থান, (১০) অপর ব্যক্তি কর্তৃক অধিকৃত স্থান—যদি এরূপ ভূমিতে শ্রাদ্ধ অপরিহার্য হয়, তবে এই ব্যক্তি জীবিত থাকিলে তাহাকে ভূমির মূল্য দিতে হইবে, এবং সে মৃত হইলে, তাহার উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যের অগ্রভাগ দিতে হইবে।

উক্ত স্থানগুলি ছাড়াও রঘুনন্দন 'ইষ্টকারচিত' স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন।

স্ত্রীলোকের শ্রাদ্ধ : 'ছন্দোগপরিশিষ্টে' নিম্নোদ্ধৃত ব্যবস্থাটি আছে,—

ন যোষিদ্ভ্যঃ পৃথগ্ দদ্যাদবসানদিনাদৃতে।
স্বভর্তৃপিণ্ডমাত্রাভ্যস্তৃপ্তিরাসাং যতঃ স্মৃতা॥

ইহার অর্থ—মৃত্যুতিথি ভিন্ন স্ত্রীলোকদিগকে পৃথক্ পিণ্ড দেওয়া বিধেয় নহে; যেহেতু, নিজ নিজ পতির পিণ্ডাংশ হইতে ইঁহাদের তৃপ্তি হয় বলিয়া কথিত আছে। এই বিধান শুধু সামবেদীয়গণের পক্ষে প্রযোজ্য, অপর বেদের অনুসরণকারিগণের পক্ষে নহে।

মৃত্যুতিথি ভিন্ন অন্য উপলক্ষে নারীর পৃথক্ পিণ্ড প্রাপ্য কিনা, সেই বিষয়ে শূলপাণি ও রঘুনন্দন উভয়েই তর্কের অবতারণা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মৃত্যুতিথিতেই শুধু নারীগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান কর্তব্য। বৃদ্ধি ইত্যাদি অপরাপর শ্রাদ্ধে তাঁহারা নিজ নিজ স্বামীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পিণ্ড হইতেই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন।

শ্রাদ্ধকর্তার কর্তব্যাকর্তব্য : শ্রাদ্ধদিনে কর্তব্য-কর্মের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান,— (১) প্রাতঃস্নানের পরে ধৌতবস্ত্র-পরিধান, (২) শ্রাদ্ধীয় অন্নের রন্ধন—স্বয়ং অক্ষম হইলে ইহা শ্রাদ্ধকর্তার পত্নী করিতে পারেন, পত্নীর অভাবে সপিণ্ডও এই কার্যে সক্ষম। এই রন্ধন মৃৎ- বা তাম্র-পাত্রে করণীয়।

১ দুগ্ধ দধি, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্রের সংমিশ্রণ।

শ্রাদ্ধদিনে বর্জনীয় কর্ম সম্বন্ধে রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দ বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত কর্মগুলি বিশেষভাবে পরিত্যাজ্য,— ১। অপরের শ্রাদ্ধোপলক্ষে ভোজনে অংশগ্রহণ বা পরান্নগ্রহণ, ২। ক্রোধ, ৩। পদব্রজে, নৌকাযোগে বা অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ, ৪। অক্ষক্রীড়া, ৫। বেদপাঠ, ৬। দারাভিগমন, ৭। দান, ৮। প্রতিগ্রহ, ৯। সন্ধ্যা, ১০। দিবানিদ্রা, ১১। ভারবহন, ১২। দন্তধাবন, ১৩। তাম্বূলভক্ষণ, ১৪। প্রাণি-হিংসা, ১৫। শরীরে তৈলমর্দন।

শ্রাদ্ধের পূর্বদিনে নিম্নলিখিত কর্মগুলি করণীয়,— ১। বস্ত্রাদি-শোধন, ২। ক্ষৌরকর্ম, ৩। শ্রাদ্ধস্থানের শোধন, ৪। ইন্দ্রিয়সংযম, ৫। একবার মাত্র নিরামিষ আহার, ৬। শ্রাদ্ধ-দিনের জন্য ব্রাহ্মণগণের নিমন্ত্রণ।

নিমন্ত্রিত শ্রাদ্ধান্নগ্রাহী ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা অযুগ্ম[১] হইবে এবং সেই সংখ্যা নির্ধারিত হইবে শ্রাদ্ধকারীর ক্ষমতা অনুসারে। শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হওয়ার যোগ্য তাঁহারাই যাঁহাদের আছে 'বিশুদ্ধমাতাপিতৃকত্বম্'—যাঁহাদের মাতাপিতা কলুষিত নহেন, 'সৎকর্মশালিত্বম্'—যাঁহারা সৎকর্ম করেন, 'আত্মানাত্মবিবেচনশক্তি'—সার ও অসার বস্তুর মধ্যে যিনি প্রভেদ বিচার কবিতে সক্ষম। উল্লিখিত গুণগুলি ছাড়াও তাঁহারা হইবেন বেদপাঠনিরত ও নির্লোভ।

দূরস্থ গুণশালী ব্যক্তি অপেক্ষা নিকটস্থ ব্রাহ্মণগণই অল্পগুণবিশিষ্ট হইলেও নিমন্ত্রণের জন্য অধিকতর যোগ্য। শ্রাদ্ধকর্তার দৌহিত্র, জামাতা ও ভাগিনেয় নির্গুণ হইলেও তাহাদিগকে অবশ্য নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। শ্রাদ্ধকর্তার ন্যায় নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণও ইন্দ্রিয়-সংযমাদি পালন করিবেন।

শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ ও প্রশস্ত দ্রব্য : রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দ এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। প্রধান প্রধান নিষিদ্ধ দ্রব্যগুলি এই,— (ক) ফল— তাল, জম্বীর, রক্তবিল্ব, (খ) শাকসব্জী—কুষ্মাণ্ড, অলাবু, বার্তাকু, পিণ্ডমূলক, নালিকা, লশুন, পালঙ্কি, রাজমাস, (গ) শস্য - মসূর চণক, বিড়ঙ্গ, কুলত্থ, শরৎ ও হেমন্তকালে পক্ব ধান্য ভিন্ন অন্য সর্বপ্রকার ধান্য,[২] (ঘ) বিবিধ—হিঙ্গু, কৃত্রিম লবণ, যে সকল দ্রব্যের উপরে কেহ হাঁচিয়াছে বা অশ্রু মোচন করিয়াছে, যে দ্রব্যের অংশ ভক্ষিত হইয়াছে, শর্করা, কীটপতঙ্গ, কাঁকর, কেশাদি সমেত পক্ব দ্রব্য, অতিশয় লবণাক্ত দ্রব্য, চণ্ডাল কর্তৃক আহৃত দ্রব্য।

শ্রাদ্ধে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বিশেষভাবে প্রশস্ত,— (ক) ফল— নারিকেল, (খ) শাকসব্জী—কালশাক, পটোল, বৃহতী, মূলক, (গ) দুগ্ধজাত দ্রব্য—দধি, ক্ষীর, (ঘ) বিবিধ—তেঁতুল, পিপ্পলী, মরীচ, মৎস্য, মাংস, লবঙ্গ, জীরক, তিল।

---

১ আভ্যুদয়িক বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ যুগ্মসংখ্যক হইবে।

২ রঘুনন্দনের মতে, বৃষের দ্বারা কৃষ্ট ভূমিতে উৎপন্ন ধান্যই প্রশস্ত।

একটি বচনে পিপ্পল, মরীচ ও হিঙ্গু ইত্যাদি শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ হইয়াছে। গোবিন্দানন্দ কিন্তু ইহার অর্থ করিয়াছেন যে উক্ত দ্রব্যগুলি অপক্ব অবস্থায় নিষিদ্ধ, পক্ব হইলে কোনো দোষ নাই।

শ্রাদ্ধে মাংসদান সম্বন্ধে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া রঘুনন্দন বলিয়াছেন যে, নিম্নলিখিত জন্তুর[১] মাংস শ্রাদ্ধে দেয়,— ১। হরিণ, ২। পৃষৎ, ৩। এণ, ৪। রুরু, ৫। বরাহ, ও ৬। শশ।

'মনুস্মৃতি'র ১১।৯৫ শ্লোকের প্রমাণ অনুসারে কেহ কেহ বলেন, শ্রাদ্ধে অপক্ব মাংস নিষিদ্ধ। কিন্তু, মনুর ৩।২৫৭ শ্লোকের সাহায্যে রঘুনন্দন অপক্ব মাংসের বিধান দিয়াছেন। শেষোক্ত শ্লোকে 'অনুপস্কৃত মাংস' শব্দ দুইটির অর্থ, কুল্লুকের মতে, 'অবিকৃত' মাংস অর্থাৎ যে-মাংস পচিয়া যায় নাই। কিন্তু, ঐ শব্দ দুইটি, রঘুনন্দনের মতে, বুঝায় অপক্ব মাংস। রঘুনন্দন স্বীয় মতের সমর্থনে গৌড়ে ও দাক্ষিণাত্যে শ্রাদ্ধে অপক্ব মাংস দেওয়ার প্রথার উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহার মৃত্যুদিবস অজ্ঞাত তাহার শ্রাদ্ধ ঃ এইরূপ ব্যাপার তিন প্রকার হইতে পারে ; যথা,— ১। মৃত্যুর তিথি ও মাস উভয়ই অজ্ঞাত, ২। মৃত্যুর মাস জ্ঞাত, কিন্তু মৃত্যুতিথি অজ্ঞাত, ৩। মৃত্যুর তিথি জ্ঞাত, কিন্তু মাস অজ্ঞাত।

এই সকল ক্ষেত্রে পালনীয় মোটামুটি নিয়মগুলি এইরূপ,—

প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ অমাবস্যাতে বা 'শ্রবণ-দিবসে' অর্থাৎ যেদিন সংবাদ পাওয়া যায় সেই দিনেই করণীয়। অমাবস্যা অপেক্ষা কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথি প্রশস্ত। রঘুনন্দন ও গোবিন্দানন্দ উভয়েরই এই মত। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ), মাঘ বা ভাদ্র মাসের ঐ তিথিতে শ্রাদ্ধ করণীয়।

শ্রাদ্ধের কালাকাল ঃ নানা শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত বচনাদির জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া মোটামুটি যে নিয়মগুলি বুঝা যায়, সেগুলি এই,—

যে যে শ্রাদ্ধে যে যে সময় প্রশস্ত,— ১। মাতৃক বা অন্বষ্টকাশ্রাদ্ধ—পূর্বাহ্ন, ২। পৈতৃক শ্রাদ্ধ— (শূলপাণি বলিয়াছেন, ইহা দ্বারা কৃষ্ণপক্ষে করণীয় পার্বণশ্রাদ্ধকে বুঝানো হয়)—অপরাহ্ন, ৩। একোদ্দিষ্ট[২]—মধ্যাহ্ন, ৪। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ—প্রাতঃকাল।

শ্রাদ্ধে এই সময়গুলি বর্জনীয়,— ১। রাত্রি, ২। ঊষাকাল ও সন্ধ্যাবেলা, ৩। সূর্যে চৈবাচিরোদিতে, অর্থাৎ, সূর্যোদয়ের ঠিক্ পরক্ষণে। এই সময়গুলির মধ্যে 'রাক্ষসী বেলা' বলিয়া রাত্রিকালই বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

১ জন্তুগুলির বিশদ পরিচয়, দ্র. 'যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতি'র ১।১০।২৫৮-৫৯ শ্লোকের উপর 'মিতাক্ষরা' টীকা।

২ পার্বণ-শ্রাদ্ধে একাধিক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করা হয়, একোদ্দিষ্টে শ্রাদ্ধ করা হয় একজনের উদ্দেশ্যে।

পিতৃমান্ ব্যক্তি শ্রাদ্ধের অধিকারী কিনা : সাধারণতঃ পিতা বর্তমানে পূর্বপুরুষগণের শ্রাদ্ধে পুত্রের অধিকার নাই। কিন্তু, পাতিত্য, সন্ন্যাস, দুরারোগ্য ব্যাধি, বার্ধক্য ইত্যাদি কারণে পিতা অক্ষম হইলে পুত্রই শ্রাদ্ধ করিবে। পিতা সক্ষম হইলে তিনি যে যে পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতেন, পুত্র শুধু সেই সেই পুরুষেরই শ্রাদ্ধ করিবে। পিতা বর্তমানেও পুত্র নিজের সন্তানের সংস্কারাঙ্গ শ্রাদ্ধাদির অধিকারী।

শাস্ত্রীয় শ্রাদ্ধকৃত্যের ক্রমিক সূচী[১] : সামবেদীয়-পার্বণ-শ্রাদ্ধসূত্র, শ্রাদ্ধদিনে বর্জনীয়, সামবেদীয় পার্বণশ্রাদ্ধ প্রয়োগ, ষোড়শপিণ্ডদানপ্রয়োগ, উল্কাদান প্রয়োগ, মঘাত্রয়োদশী শ্রাদ্ধ, গ্রহণশ্রাদ্ধ, অষ্টকাশ্রাদ্ধ, পঞ্চপাত্রশ্রাদ্ধ, প্রায়শ্চিত্তাঙ্গক পাবণ, প্রেতপক্ষীয় পার্বণ, তীর্থযাত্রা শ্রাদ্ধ, তীর্থশ্রাদ্ধ, তীর্থপ্রত্যাগত ব্যক্তির কর্তব্য, অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত, হেমগর্ভ-তিলদান, বৈতরণী, অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি, পর্ণনরদাহ, সামবেদীয়চতুর্থাশান্তি, গঙ্গায় অস্থিনিক্ষেপ, দাহাধিকারী নিরূপণ, স্ত্রীজাতির দাহাধিকারী, পূরকপিণ্ডদানাধিকারী, সপিণ্ডাদি বিচার, পূরক পিণ্ডদান, পূরকপিণ্ডদানপদ্ধতি, নীর-ক্ষীর-পদ্ধতি, অশৌচমধ্যে কর্তব্যতা, অশৌচ ব্যবস্থা, চতুর্বর্ণের অশৌচ, বালকাদি মরণে অশৌচ, গর্ভস্রাবাশৌচ, অশৌচ-সঙ্কর ব্যবস্থা, খণ্ডাশৌচ, প্রেতশ্রাদ্ধ-কালনির্ণয়, বিপ্লপতিত-শ্রাদ্ধকালনির্ণয়, অবিজ্ঞাত মৃতাহ শ্রাদ্ধকালনির্ণয়, সাধারণ শ্রাদ্ধবেলা নিরূপণ, অমাবস্যাশ্রাদ্ধকাল, সাংবৎসরিকশ্রাদ্ধ, মাসিকৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ, আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ, আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ, বসুধারা, ভোজ্যোৎসর্গ, পিণ্ডহীন আভ্যুদয়িক, শ্রাদ্ধানুকল্প-ভোজ্যোৎসর্গ, সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ, সামবেদীয় বৃষোৎসর্গপ্রয়োগ, হোমাদি, চন্দন-ধেনুদান প্রয়োগ, প্রকৃত-কর্ম, যজুর্বেদীয় আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, যজুর্বেদীয় পার্বণশ্রাদ্ধম্, যজুর্বেদীয় পূরকপিণ্ডদান, যজুর্বেদীয় সাংবৎসরিকৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ প্রয়োগ, যজুর্বেদীয় সপিণ্ডীকরণ, যজুর্বেদীয় বৃষোৎসর্গ, যজুর্বেদীয় চন্দনধেনুদানবিধি, যজুর্বেদীয়-আদ্যৈকোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধপ্রয়োগ, যজুর্বেদীয়-মাসিকশ্রাদ্ধবিধি, ঋগ্বেদীয়-পার্বণশ্রাদ্ধ-প্রয়োগ, ঋগ্বেদীয়-অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি, ঋগ্বেদীয় পূরকপিণ্ডদান, ঋগ্বেদীয় চতুর্থাশান্তি, ঋগ্বেদীয় আদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধপ্রয়োগ, ঋগ্বেদিনামাভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধপ্রয়োগ, ঋগ্বেদিনাং সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধপ্রয়োগ, ঋগ্বেদিনাং বৃষোৎসর্গপদ্ধতি, ষোড়শদান প্রয়োগ।

গয়াশ্রাদ্ধ-পদ্ধতি : গয়া-যাত্রা-প্রয়োগ, গয়াযাত্রা-কৃত্য, প্রথমদিন-কৃত্য, প্রথম পিতৃষোড়শী, দ্বিতীয়দিন-কৃত্য, প্রেতশিলাকৃত্য, তৃতীয়দিন-কৃত্য, চতুর্থদিন-কৃত্য, পঞ্চমদিন-কৃত্য, ষষ্ঠদিন-কৃত্য, সপ্তমদিন-কৃত্য অনিয়ত দিনকৃত্য, মাতৃগয়া পদ্ধতি, মাতৃ-ষোড়শী, দানসাগর বিধি, বিলক্ষণা শয্যা-দানবিধি ॥

শ্রাদ্ধ-বিষয়ক প্রাপ্ত তথ্যালোচনা : এই বিষয়ে যে-সকল তথ্য[২] আমাদের

১ পু. দ. হইতে সংকলিত ২ দ্র. পৃ ২৭

সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা সাজাইলে দেখা যাইবে, অশৌচান্তের দ্বিতীয় দিবসে আদ্য-শ্রাদ্ধ। ইহাতে তিল-কাঞ্চন ও অন্নজল উৎসর্গ করা হয়। সামর্থপক্ষে পুত্র পিতামাতার প্রেতত্ব পরিহারের নিমিত্ত বৃষোৎসর্গ করিয়া থাকেন। ইহাই হইল বৃষোৎসর্গের মুখ্যকাল। ত্রিপক্ষে পঞ্চ চত্বারিংশৎ তিথিতে অর্থাৎ চরম মৃত-তিথিতে বৃষোৎসর্গ করিবার বিধি আছে। ষাণ্মাসিক মৃত-তিথিতে বৃষোৎসর্গ দ্বিতীয় কল্প। পূর্ণ বৎসরে (সাম্বৎসরিক) মৃত-তিথিতে বৃষোৎসর্গ তৃতীয় কল্প। সপিণ্ডীকরণ[১]-শ্রাদ্ধে, মৃত্যু হইতে পূর্ণ বৎসরের মৃত-তিথিতে পিতৃলোকস্থিত প্রেতীভূত পিতামাতার পিণ্ডার্ঘ্য, শুদ্ধ ঊর্ধ্বতন ষট্‌-পুরুষের পিণ্ডার্ঘ্যের সহিত প্রেতের পিণ্ড সমন্বয় করা হয়। মৃত-ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ—'একোদ্দিষ্ট'[২]।

তুলসীবনে হরিকথা[৩] স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ, গঙ্গাতীরে পিতৃবিয়োগ, মৃত্যুকালে ৺তীরযাত্রা,[৪] চন্দন-ধেনুদান,[৫] গয়াধাম-গমন,[৬] সঙ্গতি ও বংশের পরম্পরা এবং মর্যাদা অনুসারে পিতা মাতা গুরু প্রভৃতির শ্রাদ্ধে হেঁয়ালীর ভাষায় সময়োচিত পত্রে অধ্যাপক-নিমন্ত্রণ—এই সমস্ত আচার হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল।

জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু— মানুষের জীবনের প্রধান ঘটনা এই তিনটি। প্রধান এই তিনটি ঘটনার সহিত সুপ্রাচীন আচারের ঐতিহ্য ও সমকালীন সমাজ-বিধানের বৈশিষ্ট্যাবলি, মন্ত্রাদির আকারে যুক্ত হইয়া আছে, ইহা সামাজিক ইতিহাসে পৃথিবীর প্রায় সকল জাতির মধ্যেই দেখা যায়। শ্রাদ্ধের একটি প্রাচীন শ্রাব্য মন্ত্র, গয়া-গঙ্গার সমপর্যায়ে এইরূপ,—বৃদ্ধোঽহং সাম্প্রতং কো মে পিতরঃ সম্প্রদাস্যতি ভার্যাং তথা দরিদ্রস্য দুষ্করো দারসংগ্রহঃ।[৭] ইহা সমকালের সন্ন্যাসীর অথবা অকুলীন দরিদ্র অবিবাহিত ব্রাহ্মণ-বৃদ্ধের স্ত্রী-সংগ্রহের দুষ্করতা সম্পর্কে একটি উজ্জ্বল চিত্র। শ্রাদ্ধে পিণ্ডার্ঘ্য দানের সময় পিতৃপুরুষগণকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিবার অর্থ বোধ হয়, পিণ্ডদাতাকে পিণ্ড দিবে, এমন পুত্র তো তাঁহার নাই, কারণ তখনও-যে তাঁহার স্ত্রী-গ্রহণ সম্ভব হয় নাই। যাহাই হউক, ইহা নিঃসন্দেহ যে, একটি সামাজিক বিধিই এই একটি মন্ত্রের বন্ধনে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। এবং এই সূত্র হইতে বাঙ্গালা ভাষা-মন্ত্রের জন্মকথার[৮] ইঙ্গিতও পাওয়া যাইবে। এইরূপ আচারসম্পর্কে অনেকক্ষেত্রেই মানুষ অন্ধভাবে সংরক্ষণশীল। সুতরাং, সেকালে ও একালে শ্রাদ্ধবিষয়ে আলোচ্য হিন্দুসমাজে কোনও পরিবর্তন প্রত্যাশা করা যায় না।

১ চি-প-স ২, চি-সং ৫১৯ ২ ঐ, ঐ ৫০৪ ৩ ঐ, ঐ ১৯৩ ৪ ঐ, ঐ ১০৩

৫ ঐ, ঐ ৪০৩ ৬ ঐ, ঐ ২৪৬

৭ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের অধস্তন সুযোগ্য বংশধর স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত। ইহা মার্কেণ্ডেয় পুরাণে বিধৃত সন্ন্যাসী 'রুচি'র উক্তি।

৮ দ্র. পুঁ-প ১, ২, ৩, ভূমিকা

দিঘাপতিয়া রাজের,[১] হেতমপুর-রাজের[২] মাতৃশ্রাদ্ধে সংস্কৃত ভাষায় নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠানো হইয়াছিল। প্রাচীনতর আদর্শে সম্ভ্রান্ত পরিবারে[৩] এইরূপ কুল-ক্রিয়ায় সংস্কৃতে[৩] নিমন্ত্রণ-পত্র, বিশেষতঃ অধ্যাপক-নিমন্ত্রণ প্রথা হইয়াছিল। তবে, সাধারণ গৃহস্থ নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইতেন বাঙ্গালা ভাষাতেই[৪]। শ্রাদ্ধে পুরোহিত ব্রাহ্মণ-আমন্ত্রণ,[৫] খেউরাদি[৬] কৃত্য, ক্রিয়ার খরচ,[৭] জলদানাদি,[৮] ব্রাহ্মণ-ভোজন[৯] সম্পত্তি দখলের জন্য পিণ্ডকর্তা-নিরূপণাদি[১০]-প্রসঙ্গে চিঠিপত্র এই অধ্যায়ে এবং বিষয়ানুসারে গ্রন্থের অন্য অধ্যায়েও সংকলিত হইয়াছে।

১১৬০ সালে এক পিতামহীর শ্রাদ্ধ[১১]-খরচ ১ সিকায় সংকুলান হইয়াছিল। ছকী আহিরিণীর নিকট ঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধের দধির দফায় বাকী ছিল ৬০ পণ কড়ি[১১]। ১২৬৯ সালে মাতা-ঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধের জায়[১২] খরচ হইয়াছিল ৭||০ টাকা। আমাইপুরে শ্রাদ্ধে বিদায়ী গ[া]ড়ু[১৩] ১টা পাইয়াছিলেন বোধ হয় অধ্যাপক ভট্টাচার্য মহাশয়। বল্লভপুরে বিরাটপর্ব পাঠ[১৪] করিয়া পাঠক মহাশয়ের নিত্যানন্দ কুমারের ঘরে ১ জোড়, কালু নাগের ঘরে ৪ জোড়, নিতাই নাগ দরুণ ১ জোড়, ফকির নাগ দরুণ ২ জোড়, প্রসাদ দাশ দরু[ণ] ১ জোড় কাপড় পাওনা হইয়াছিল। বিহুরিয়াতে সুকুদেব সরকার, কিঙ্কর কর্মকার, রাম বেন্যা ও কৃপারাম কর্মকারের 'পিতাকর্মে'[১৪] তাম্বুলদান ও জলদান বাবদ ৪টি ঝারি দান করা হইয়াছিল। রাইপুরের সুধাকৃষ্ণ সিংহের পিতার আদ্যশ্রাদ্ধে[১৫] 'পদ্মবন্ধ'-কবিতার ভাবার্থ লিখিতে এবং 'নৌকাবন্ধ' কিংবা আর 'ক্ষুদ্র প্রাকার বন্ধ' এক কবিতা করিয়া এবং তাহার অর্থ লিখিয়া অতি 'শীর্ঘ' পাঠাইতে নানুরের জগদ্দুর্লভ ন্যায়বাগীশকে জরুরী পত্র দিয়াছিলেন শিবনারায়ণ শর্মা। রাইপুরের সিংহবাবুদের বাড়ীতে তখন খানা[১৬] খাইবার পদ্ধতিও প্রচলিত হইয়াছিল। ঠাকুরের কৃত্যে 'মন্ধেনে জলপান'[১৭]-এর (চিড়া দই ইত্যাদি কাঁচা ফলারের) নিমন্ত্রণ এখনও চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে[১৭] প্রচলিত আছে। অন্যত্রও আছে।

[এই শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষ করিয়া ঘরোয়া ব্যবহারে ঝগড়া-বিবাদ জাঁকিয়া উঠিতেছে চিরকাল। ইহাতে যুগে যুগে বাঙ্গালী-চরিত্রের একই বৈশিষ্ট্য যেন উজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়।] ভবানীচরণ ভট্টাচার্যের মাতৃশ্রাদ্ধে কালী ভট্টাচার্য ব্যবহার করিতে আসেন নাই। সেই 'মনের দুষ্খে' ভট্টাচার্যের মাতৃশ্রাদ্ধে 'জায়া' হয় নাই, 'ঘাটে-তুলা' বস্ত্র[১৮] দেওয়া হয় নাই,

১ চি-প স ২, চি-সং ১১৫ ২ ঐ, ঐ ১১৬ ৩ ঐ, ঐ ১৯৩ ৪ ঐ, ঐ ১২১, ১২৩, ৫৮৪, ৫৮৫
৫ ঐ, ঐ ১১৮ ৬ ঐ, ঐ ১২১ ৭ ঐ, ঐ ১২০ ৮ ঐ, ঐ ১১৯, ৫০৯ ৯ ঐ, ঐ ৫৩১
১০ ঐ, ঐ ৫৬০ ১১ ঐ, ঐ ৪৯৭, ৪৯৮ ১২ ঐ, ঐ ১২২ ১৩ ঐ, ঐ ৫০৯, ১১৪
১৪ ঐ, ঐ ১৯২ ১৫ ঐ, ঐ ১২৮ ১৬ ঐ, ঐ ৫৫৬
১৭ ঐ, ঐ ৫৮৩। বঙ্গীয় শব্দকোষকার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবৃতি। ১৮ ঐ, ঐ ১২৪

সেই 'অনুরাগ'-প্রযুক্ত ভট্টাচার্যের মৃত্যু হলেও দেখা-শোনা বন্ধ। তবে এ-হেন পরিস্থিতিতেও সান্ত্বনা ও শান্তি আসে শেষ কথা ভাবিয়া—'আমার গ্রহ মন্দ'।

সাহেবদের 'কবরে কিস্তি'[১] শ্রাদ্ধেরই প্রকারভেদ বলা যাইতে পারে। মেদিনীপুর জেলায় কালেক্টরের কাজ করিয়া মিষ্টার জন পিয়ার্স সাহেবের মৃত্যু হইয়াছিল ১৭৮৮ সালের ২০এ মে তারিখে ৪৯ বৎসর বয়সে। এই ইংরাজ ভদ্রলোকটি দেশী কালা আদমীর সহিত ব্যবহারে উপকারী বন্ধু, স্নেহপ্রবণ ভ্রাতা ও পিতৃতুল্য ছিলেন। ফলতঃ, বাঙ্গালী-সমাজ তাঁহাকে ভুলিতে চাহে নাই। বিলাতী কায়দায় মৃতের প্রতি তাহারা শ্রদ্ধা দেখাইয়াছিল।

আলিবর্দি খানের শ্রাদ্ধ-উপলক্ষে[২] সিরাজউদ্দৌলা ব্রাহ্মণগণকে সংস্কৃত ভাষায় স্রগ্ধরা ছন্দে রচিত নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়। কথিত আছে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাণেশ্বর তর্কালঙ্কারকে দিয়া শ্লোক রচনা করাইয়াছিলেন। শ্লোকটি এই :

> খোদাপাদারবিন্দদ্বয় ভজন পরো মাতৃতাতো মদীয়
> আলীবর্দী নবাবো বিবিধগুণযুতোঽল্লামুখঃ পশ্চিমাস্যঃ।
> মর্ত্যং দেহং জহৌ স্বং মুনসর মুলুকঃ সীরাজদ্দৌলনামা
> যাচেঽয়ং মাং ভবন্তো গলধৃতবসনঃ শুদ্ধতাং সংনয়ন্তাম্ ॥

ধারাবাহিকতা : ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দুইটি সূক্তে,[৩] এবং অথর্ববেদের একটি কাণ্ডে[৪] বৈদিকযুগের শব-সৎকার-পদ্ধতির বিশেষ আলোচনা আছে। শবদেহকে ভূপ্রোথিত করা প্রাচীনতম প্রথা। গর্ত খুঁড়িয়া গুহা প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে মৃতদেহটিকে রাখিয়া চারিপার্শ্বে ও উপরে কাষ্ঠ স্থাপন করিতে হইত। মৃতদেহটির উপর মাটি-চাপা-পড়া অবিধেয়। প্রাচীনতম মুনি-ধারা অনুযায়ী মৃতদেহটিকে সম্ভবতঃ যোগাসনে উপবিষ্ট করাইয়া স্থাপন করা হইত। সাধারণ লোকে বোধ হয় স্থাপন করিত উত্তানশায়ীভাবে।

পক্ষান্তরে, মৃতদেহকে জলে ভাসাইয়া দেওয়া, উচ্চ উন্মুক্ত স্থানে পক্ষীদের আহারার্থ স্থাপন করা, এবং অন্তিম সংস্কৃত বিধি হইল অগ্নিতে দাহ করা,—

> যে নিখাতা যে পরোপ্তা যে দগ্ধা যে চোদ্ধিতাঃ।
> সর্বাংস্তানগ্নে আবহ পিতৄন্ হবিষেঽত্তবে ॥[৫]

হে অগ্নি, আমাদের পিতৃগণের মধ্যে যাঁহারা ভূপ্রোথিত, জলে নিমজ্জিত বা প্রবাহিত,

১ চি-প-স ২, চি-সং ৫৫১ ২ দ্র. প্রবাসী ১৩৫৭, চৈত্র ৩ ১০।১৫।১১, ১৪ ; ১০।১৮।৮-১৩
৪ ১৮ ৫ অথর্ব, ১৮।২।৩৪

অগ্নিদগ্ধ অথবা উন্নত স্থানে স্থাপিত, তাঁহাদের সকলকে আমাদের প্রদত্ত হবি ভক্ষণার্থ এখানে আনয়ন করুন।

অগ্নিদাহ করার বিধানটিকে অন্তিম সংস্কার বলা হয়; কারণ, পূর্বে বিদ্বাংসঃ অগ্নিহোত্রং ন জুহুবাংশ্চক্রুঃ[১]। পূর্বকালে জ্ঞানিগণ অগ্নিহোত্র যজ্ঞাদি করেন নাই। সমাজে প্রাচীন রীতিনীতির সংস্কার সাধিত হইলে সমাজের বেশীর ভাগ লোক সংস্কৃত রীতি গ্রহণ করেন না,—সনাতনীরা সর্বদাই নূতন সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া প্রাচীন রীতিনীতিকে আঁকড়াইয়া থাকেন। আর্য-ইরান গোষ্ঠীর লোকেরা অগ্নি-উপাসনা গ্রহণ করিলেন; কিন্তু, শব-সৎকার ব্যাপারে শবদেহকে পক্ষীর আহারার্থ উচ্চস্থানে রাখিয়া দেওয়ার রীতিটিকে অদ্যাবধি ধরিয়া রহিলেন। পার্শিগণের মৃতদেহ অদ্যাপি এইভাবেই সংকৃত হয়। মৃতদেহকে কাটিয়া টুকরা করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া, এবং নিকটে বড়ো নদী না-থাকিলে, মৃতদেহ পচিয়া গলিয়া যাওয়ার পরে, হাড়গুলি চূর্ণ করিয়া মাটীর ডেলা মিশাইয়া পিণ্ডগুলিকে কোনো নদীতে বিসর্জন দেওয়ার বিধি অদ্যাপি তিব্বতে প্রচলিত। এইভাবে ইন্দো-য়ুরোপীয় গোষ্ঠীর একদল লোক এবং সেমীয়-হামীয় গোষ্ঠীর কয়েকটি দলের লোক তাঁহাদের ধর্মবিশ্বাসের নানা পরিবর্তন ও সংস্কার-সাধন করিলেও, শবদেহটিকে ভূপ্রোথিত করার প্রাচীন প্রথাটিকে ধরিয়া আছেন।

মুনি-ধারার মতে, মানুষের চরম মৃত্যু নাই; সুতরাং, মৃতদেহকে ভস্মীভূত করার প্রশ্ন উঠে না। প্রাচীন মিশরদেশের বিশ্বাস, মানুষের দেহ হইতে প্রাণটি পক্ষিরূপে আকাশে উড়িয়া যাওয়ার পরে, তাহার দেহে প্রাণের প্রাথমিক উপাদান—'ক' বর্তমান থাকে; এবং সেইজন্যই দেহটি ফুলের পাপড়ির ন্যায় তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড হইয়া ঝরিয়া পড়ে না। সুতরাং, ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া প্রাণহীন দেহটিকে অম্লান অবস্থায় রাখিলে, স্বর্গত প্রাণপক্ষী মধ্যে মধ্যে আসিয়া ইহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিবে; এবং আত্মীয়-স্বজনের মঙ্গলার্থ অলৌকিক শক্তি-প্রয়োগপূর্বক সাহায্য করিবে।—মিশরদেশবাসীরা সেইজন্য রাজা-রাণী, পুরোহিত ও ধনাঢ্য লোকের মৃতদেহকে 'মমি' করিয়া প্রস্তর-মন্দির বা গুহার মধ্যে সযত্নে রক্ষা করিতেন। এই বিশ্বাসের মধ্যে আদি-বৈদিক যুগের মুনি-ধারার ধর্ম-বিশ্বাসের প্রভাব বিদ্যমান।

সেইজন্য হিন্দুসমাজের কোনো জাতির কেহ সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হইলে তাঁহার মৃত্যুর পরে, শবদেহটিকে আদি-বৈদিক বিধানানুসারে অদ্যাপি ভূপ্রোথিত বা জলে নিমজ্জিত করা হয়,—

---

১ কৌষী-উপ. ২।৫ক

সন্ন্যাসিনাং মৃতং কায়ং দাহয়েন্ন কদাচন।
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্নিখনেদ্বাপ্সু মজ্জয়েৎ ॥[১]

সন্ন্যাসীদের মৃতদেহ কখনও দাহ করিবে না; গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবে অথবা জলে ডুবাইয়া দিবে।

পরবর্তিকালীন অগ্নিহোত্রের প্রভাবটিও ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসী যোগীদের মধ্যেও প্রসারলাভ করে। সেইজন্য ভূপ্রোথিত বা জলে নিমজ্জিত করিবার পূর্বে, মৃতদেহের মুখমণ্ডলে ঘৃতের মশাল বা প্রদীপ দ্বারা সামান্য অগ্নি স্পর্শ করানো হয়। ইহার নাম মুখাগ্নি।০ বঙ্গদেশীয় নাথযোগীরা অবৈদিক যুগের মুনি-ধারার ধর্ম এবং সাধন-পদ্ধতির অনুসরণ করেন। ফলে, তাঁহারা পরবর্তিকালের অগ্নিসংস্কার-পদ্ধতির অনুসরণ না-করিয়া প্রাচীন ভূপ্রোথিত করার বিধানটি অনুসরণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মুখাগ্নি করিয়া মৃতদেহকে যোগাসনে উপবেশন করাইয়া 'সমাধিস্থ' করেন[২]। যোগসাধনায় নির্বিকল্প সমাধিতে নিস্পন্দ দেহের মধ্যে প্রাণ ফিরিয়া আসে। যোগীর বিশ্বাস, যাঁহাকে মৃত বলিয়া মনে করা হইতেছে, তিনি প্রকৃতপক্ষে নির্বিকল্প-সমাধিস্থ। সমাধি ভঙ্গ হইলে পুনরায় প্রাণক্রিয়া আরম্ভ হইতে পারে। সুতরাং, মৃতদেহকে অগ্নিযোগে ভস্ম করা অনুচিত।

নাথযোগিগণ মৃতদেহকে সমাধিস্থ করেন। খৃষ্টান ও মুসলমানেরা মুখাগ্নি করেন না, সমাধিস্থও করেন না,— 'ক'-বরস্থ করেন। প্রাচীন মিশরী ভাষার বংশজ কপ্টিক ভাষায়, আবৃত করিয়া রাখার ব্যবস্থার নাম 'কবর'।

বিগত শতাব্দীতে কাশীর ত্রৈলঙ্গস্বামীর দেহ তাঁহার নির্দেশমতে বাক্সে পুরিয়া গঙ্গায় নিমজ্জিত করা হইয়াছিল; রামদাস কাঠিয়াবাবা, দয়ানন্দ সরস্বতী, রামকৃষ্ণ-পরমহংস, বিবেকানন্দের মৃতদেহ দাহ করা হইয়াছে; বাবা গম্ভীরনাথ, নিগমানন্দ, পূর্ণানন্দ প্রমুখের মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হইয়াছে।

যীশুখৃষ্ট এবং মহম্মদের জন্মের বহু শত বৎসর পূর্বে তাঁহাদের বংশের আদিতম পুরুষ ছিলেন আব্রাহাম। তৎকালীন হত্তি বা হিত্তি (Heth, Hittites)-জাতির রাজ্য এশিয়া-মাইনর-অঞ্চলে (বর্তমান তুর্কীরাজ্য) প্রবাসকালে তাঁহার পত্নী সারার মৃত্যু হয়। তিনি তখন সেই দেশবাসী জনৈক ধনী ব্যক্তির নিকট হইতে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া তন্মধ্যস্থিত একটি পর্বতগহ্বরে পত্নীর মৃতদেহ সমাধিস্থ করিয়াছিলেন[৩]। সেই সময় এশিয়া-মাইনর, ব্যাবিলন, আদি-ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহে ইন্দ্র, চন্দ্র, মা প্রমুখ বহু দেবদেবী-পূজক এবং ইন্দো-য়ুরোপীয় মূলভাষাভাষী গোষ্ঠীর হত্তি, মিতান্নি, কাশী প্রভৃতি জাতির বাস ছিল। সেকালে মৃতদেহ সমাধিস্থ করা ছিল সার্বজনীন প্রথা। আব্রাহামের বংশধর ইহুদী এবং ইসলামধর্মীদের মধ্যে এই প্রথাটি অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

---

১ মহানি-তন্ত্র, ৮।২৮৩ ২ দ্র. গোর্খ-বিজয়, ভূ. পৃ ৭-৮ ৩ Bible, Ge. Ch. 23

প্রাচীন এশিয়া মাইনর হইতে অতি প্রাচীনকালে বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী ও বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতিযুক্ত বহু লোক ভারতবর্ষের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে আসিয়া বসবাস করেন। মহারাষ্ট্রদেশের সাত্ত্বিক চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের পূর্বপুরুষগণ এশিয়া-মাইনরের প্রাচীন মীন-জাতির বংশধর, এবং তাঁহারা সমুদ্রপথে আগমন করিয়া মহারাষ্ট্রদেশে বসবাস করিয়াছিলেন। তামিলনাদে কাল্লান নামক কৃষিজীবী হিন্দুজাতির মধ্যে অদ্যাপি সুন্নৎ ও মৃতদেহকে সমাধিস্থ করার প্রথা প্রচলিত আছে। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি সামাজিক রীতিনীতির সহিত প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহের কেন্নান (Cannan) প্রভৃতি জাতির রীতিনীতির সামঞ্জস্য আছে।[১]

তামিল প্রদেশে কম্মলন বা পঞ্চাল নামক হিন্দুজাতির একটি সম্প্রদায় আছে। জাতীয় ব্যবসায়ানুসারে ইহারা স্বর্ণকার, কাংস্যকার, সূত্রধর, কর্মকার এবং প্রস্তরশিল্পী বা রাজমিস্ত্রী—এই পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহারা নিজদিগকে বিশ্বকর্মার বংশজ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, বস্ত্রবয়নকারী নাথযোগীরা নিজদিগকে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ বলেন। ইহাদের ধনী ও পদস্থ লোকেরা মৃতদেহকে পাথরে-বাঁধানো পাকা কবরে সমাধিস্থ করেন। সাধারণ গরীব লোকেরা মাটীতে গর্ত খুঁড়িয়া মৃতদেহকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া পুঁতিয়া রাখে।[২]

অন্ধ্রদেশের ভিজাগাপট্টন জেলায় কোনো কোনো হিন্দুজাতির মধ্যে শবদাহ-প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু, যে-কোনো বয়সের অবিবাহিত মৃতব্যক্তির দেহ ভূপ্রোথিত করা হয়। পক্ষান্তরে, শবদাহী বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদিরা নাবালক শিশুর মৃতদেহ ভূপ্রোথিত করেন।[৩]

নীলগিরির অধিবাসী টোডাগণ[৪] মৃতদেহ দাহ করেন। গুরুজনের মৃত্যু হইলে পুরুষেরা মস্তকমুণ্ডন করিয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অবশ্য, এই প্রথাটি তাঁহাদের সকল দলের ভিতর প্রচলিত নাই। মৃত্যুর এক বৎসর পরে, মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে তাহার কুটিরখানি দগ্ধ করা হয়; এবং তাহার দুই-একটি মহিষ বধ করা হয়। টোডাদের বিশ্বাস, হত মহিষ পরলোকে মৃতব্যক্তির নিকট যায়। যাহাই হউক, মৃতদেহ দাহ করা, শ্রাদ্ধে ক্ষৌর ('খেউর') বা মস্তকমুণ্ডন, ও এক বৎসর কালাশৌচের কৃত্যগুলি বাঙ্গালীসমাজেও প্রচলিত রহিয়াছে।

বর্তমানে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের নিকটতম প্রতিবেশী ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী ওরাওঁ-মুণ্ডাদের অনেক সমাজনীতির সহিত বাঙ্গালী-সমাজনীতির সাদৃশ্য আছে। মুণ্ডাগণের[৫] সনাতন প্রথা হইল মৃতদেহ দাহ করা। অস্থি রাখিয়া, বৎসর পূর্ণ হইলে, তাহা ঘরোয়া

১ Caste in India, Hutton, pp. 11, 152, 283   ২ Ibid, pp. 118, 163, 170
৩ Ibid, p 109   ৪ প্রবাসী ১৩০৮, পৃ ৩৩১   ৫ The Mundas etc. pp. 460-467

'শশানে' সমাহিত করিতে হয়; বা, মাটীর ভাঁড়ে রাখিয়া গ্রাম-'শশানে'র (শ্মশানের) প্রস্তরস্তম্ভের নীচে রাখা হয়। অন্য কৃত্যগুলি এইরূপ—(১) 'রাপা'।—মৃতদেহ নব-বস্ত্রে সজ্জিত করা হয়; তেল-হলুদ মাখানো হয়; মুখের ভিতর এক বা একাধিক তামার বা রূপার মুদ্রা দিবার বিধি। (২) 'উম্বুল আদের'।—মৃত্যুর তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম বা নবম দিবসে 'ভায়াদ'গণ একত্র হইয়া দাড়ি ও নখ কাটে। তাহার পর, কাছাকাছি পুকুর বা নদীতে গিয়া তর্পণ করে। (৩) 'জাঙ্গটোপা'।—এক বৎসর পূর্ণ হইলে অস্থি সমাহিত করা হয়। চালগুঁড়ি আর সিঁদূর এই কৃত্যের প্রধান উপচার। রাঢ়ী সমাজেও এই সকল শ্রাদ্ধাচার বেমালুম প্রচলিত আছে।

এই বিষয়ে ওরাঁওগণের[১] অনুষ্ঠানাবলীর সঙ্গেও যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তাঁহারা মৃত্যুতে ঠিক্ বাঙ্গালীর মতো ক্রন্দনের রোল তুলিয়া থাকেন। সদর দরজা দিয়াই মৃতদেহ বাহির করা হয়। শবের মাথা দক্ষিণমুখে, আর পা উত্তরমুখে রাখার বিধান। মৃতদেহ বাহির করা মাত্র, তাঁহারা ঘরে পাঁশ[২] ছড়াইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া থাকেন। 'মশানের' যাত্রীরা না-ফেরা পর্যন্ত দরজা খোলা হয় না।

শবদেহ উঠানে বাহির করিয়া শীতল জলে স্নান করানো হয়। সধবা মরিলে কপালে বা সিঁথিতে তেল-সিঁদুর দেওয়া হয়। শবের পার্শ্বে একটি সাজি ও ছোট একটি মাটীর ভাঁড় দেওয়া হইয়া থাকে। ক্রন্দনের রোল শুনিয়া গাঁয়ের লোকেরা ধাইয়া আসে। পেতে বা কুলাতে ('সুপ'— সূর্প) করিয়া প্রত্যেকে কিছু ধান লইয়া আসে; এবং খালি সাজি ও কুলা সেই ধানে ভরিয়া দেয়।

শ্মশান-কৃত্য এইরূপ: 'সারহা' বা চৌদোল বাঁধা হয়। উত্তান ও উত্তরশায়ী শবদেহটিকে নূতন বস্ত্রে আচ্ছাদন করা হয়। কাঁধে করিয়া স্ত্রীলোকগণ শব বহন করিয়া থাকে। কিন্তু, গর্ভবতী স্ত্রীলোক ইহার ধারে কাছে যাইবে না। বুড়া মরিলে সংকীর্তন চলে শবযাত্রার সঙ্গে। ভাত, তেল ও তামার পয়সা শ্মশানে লইয়া যাইতে হয় মৃতের উদ্দেশ্যে। ধানের আটিও লইয়া যায়, মৃতব্যক্তি ধনী হইলে। ধানের উপরে শবের মাথা রাখার নিয়ম। আত্মীয়গণ মৃতের মাথায় তেল ঢালে। সিদ্ধ-চাউল ও তামার পয়সা মেয়েরা মৃতের মুখে দেয়, এবং আত্মীয়ের প্রত্যেকে মৃতের মুখে ধেনো-মদ দিয়া থাকে। মুখে চাউল দিবার সময় মেয়েরা বলে,—

ওন্দা, ওন্না, আখু, এমান আম্‌কায়ে। আখু নিঘায়ে দহ্‌রেন ইর্‌কায়া। হুর্‌মি রোগ পাপ হার্‌কি কালা।—অর্থাৎ লও, খাও। এখন তুমি ছেড়েছো আমাদের। এখন তুমি তোমার পথ দেখেছো। যাও, তোমার সঙ্গে আমাদের রোগ পাপ সব নিয়ে যাও॥

১ O. R. O., pp. 17?-189

২ প্রেতকে কানা করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথা এখনও প্রচলিত আছে

চিতায় আগুন ধরানোর পরে, মেয়েরা 'মশান' ছাড়িয়া আসিয়া কোনো পুকুরে বা নদীতে স্নান করে। ঝরণায় স্নান করা নিষেধ। স্নানের পরে তেল-হলুদ মাখিয়া বাড়ী ফেরে। গাঙ্গুইগণ মড়া-পোড়ানো শেষ করিয়া মৃতের ঘরে আসিয়া আবার হলুদ মাখে।

মৃতের বাড়ীর উঠানে নয় ইঞ্চি গভীর ও ছয় ইঞ্চি পরিমিত গোলাকার অথবা চতুষ্কোণ গর্ত কাটে। কিছু পোড়া তুলাবীজ বা ভাজা কলাই, ভাজা সরিষা, একটুক্‌রা লোহা আর কিছু মুড়ি একটি পাতার ঠোঙ্গায় রাখিয়া ইহার মধ্যে স্থাপন করে। পাতার ঠোঙ্গায় সামান্য হলুদ-জল এই গর্তের পাশে রাখিতে হয়। অতঃপর, 'পাহান' কিংবা কোনো গ্রামবৃদ্ধ গর্তের পশ্চিমদিকে বসেন পূর্বাস্য হইয়া। আদিম-আচারে তিনি একটি লাল মুরগী বা শূকর-ছানার ঘাড় মট্‌কাইয়া তাহার রক্ত এই গর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। উপস্থিত জনগণ হাতে হলুদ-জল লইয়া গর্তে ঢালিয়া দেয়। এই সময় মন্ত্র পড়িতে হয়,—

'ফলনা (নাম) গোত্র গাহি পাছছো পাছছগী খেখেল্‌কিয়া রাদর, ইসিনহু সঙ্গে নাংকে'—অর্থাৎ ও অমুকের পিতৃগণ, তোমরা এ জগতে নাই; তোমরা এই মৃতকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাও॥—অতঃপর, 'দোনা' বা পাতার ঠোঙ্গাগুলি গর্তে ফেলিয়া গর্তটি বুজাইয়া দেয়। ইহার পর চালের তিনটি পিঠা খাইবার অনুষ্ঠান।

অস্থিসংগ্রহ-কৃত্য এইরূপ: মেয়েরা মশানে গিয়া অস্থি সংগ্রহ করে। ঘাড়, হাত, পা, এবং বুকের হাড়, সংগ্রহ করিতে হয়, বাঁ হাত দিয়া। হাড়গুলি পিতল অথবা নূতন মৃৎপাত্রে রাখার নিয়ম। এবং সেগুলিকে নূতন কাপড় দিয়া মুছিয়া, হলুদ মাখাইয়া, একটি চিত্রিত নূতন মৃৎপাত্রে রাখিতে হয়। ঐ পাত্রে কিছু তাম্র-মুদ্রাও রাখার বিধান। অতঃপর, মেয়েরা ওষ্ঠস্পর্শ না-করিয়া হাড়গুলিকে চুম্বন করে। অস্থিপূর্ণ পাত্রটিকে 'নেটো' বা বিড়ার উপর রাখা হয়; এবং মৃতের একটি কুশের 'লিঙ্গ্' বা মূর্তি তৈয়ারী করিয়া সেই পাত্রে রাখা হয়, অস্থির সহিত। মশানের কাছে তিনটি পর্ণপাত্রে অর্ধ-সিদ্ধ চাউল রাখার বিধান। অতঃপর, মশানটি জল, এবং গোময় দ্বারা ধৌত করিতে হয়; সিন্দুয়া গাছের শাখা দিয়া মেয়েরা মশান পরিষ্কার করে।

ইহার পরে, এই সকল কৃত্য পর পর অনুষ্ঠিত হয়,—হাড়-সংগ্রহ, ছায়াপসারণ, বড়ো বিবাহ (কোহা বেঙ্গা) বা 'হাড়-বোড়া' অর্থাৎ অস্থি-নিক্ষেপ, গ্রাম-শান্তিকরণ, 'পুলথি' বা স্মৃতিস্তম্ভ-স্থাপন।—এই সকল আচার-অনুষ্ঠানে বিবিধ ধর্মবিশ্বাস নিহিত আছে। বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, রাঢ়ী সমাজে ব্রাহ্মণেতর, বিশেষতঃ, 'নবশাখ' নানা জাতির মধ্যে অদ্যাবধি এই বিষয়ে যে-সকল আচারানুষ্ঠান প্রচলিত আছে, তাহার সহিত উল্লিখিত আচারানুষ্ঠানের বিস্ময়াবহ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই—কিন্তু আমাদের মর্মরায়মান বেণুকুঞ্জে, আমাদের আম কাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথি-শালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণী-খনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভঙ্করী কসাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা বন্ধ হয় নাই, চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণ পাঠ হইতেছে এবং কীর্তনের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত।

১৩১১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ শিক্ষা ॥

(সন ১১৩৭-১২৮৯ : খৃ ১৭৩০-১৮৮২)

নবদ্বীপ[১]-বিদ্যাসমাজের ভারতবিখ্যাত বিভিন্ন সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অনুপ্রেরণায় রাঢ়ে-বঙ্গে বর্ধিষ্ণু প্রায় সকল গ্রামেই বিদ্যায়তন বা টোলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এক-একটি টোল পরিচালনা করিতেন এক-একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। টোল-পরিচালনায় স্থানীয় জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া বিত্তশালী ভূস্বামিগণের বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল।

সপ্তদশ শতকে বর্ধমান জেলার জউগ্রামে সুবিখ্যাত কলানিধি ভট্টাচার্যের বিদ্যাপীঠ ছিল। তখন নবদ্বীপ এবং শান্তিপুরের পূর্ণ গৌরবের যুগ। শান্তিপুরে ছিলেন দেশবিখ্যাত পণ্ডিত বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য। 'ভারতীর' পাঠ লইতে তাঁহার নিকট দিগ্‌দিগন্তর হইতে ছাত্র আসিত। কিন্তু, জউগ্রামের কলানিধির খ্যাতি ছিল শান্তিপুরের বিদ্যানিধি ভট্টাচার্যের খ্যাতি অপেক্ষা বেশী। এই সময় বর্ধমান জেলার কাইতি-শ্রীরামপুর গ্রামে ধর্মমঙ্গলকার রূপরাম চক্রবর্তীর পিতা শ্রীরাম চক্রবর্তীর একটি মস্ত বড়ো টোল ছিল। এই টোলে ছাত্রসংখ্যা ছিল এক শত কুড়ি জন। শ্রীরামপুরের সন্নিকটে পাষণ্ডা গ্রামে এবং আড়ুই গ্রামেও টোল-চৌপাড়ি ছিল। সেখানেও ছাত্রসংখ্যা এক শত কুড়ি বা ততোধিক[২]। রামবাটী গ্রামেও টোল ছিল। ঘনরাম সেখানে পড়িতেন[৩]।

বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পাদ পর্যন্ত সময়-সীমার তারিখহীন একখানি 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জায়' মুদ্রিত[৪] হইয়াছে। এই তালিকা-দৃষ্টে আমরা সেকালের রাঢ়-অঞ্চলে সংস্কৃত-শিক্ষা-প্রসারের একটি মূল্যবান্ চিত্র অঙ্কিত করিতে পারি। ইহাতে নবদ্বীপের শঙ্কর তর্কবাগীশ[৫] ও শিবনাথ ন্যায়-বাচস্পতির নাম দেখিতে পাই। ইহা ছাড়া, কুমারহট্টের পাই বলরাম তর্কভূষণ[৫] ও শিশুরাম তর্কপঞ্চাননকে,[৫] ত্রিবেণীর রামচাঁদ তর্কভূষণ, কানাই ন্যায়বাচস্পতি, বাঁশবেড়িয়ার ব্রজ বিদ্যাবাগীশ, রামকিশোর তর্কপঞ্চানন, ভৈরব তর্কবাচস্পতি, রাঘব তর্কভূষণ, শান্তিপুরের মোহন বিদ্যাবাচস্পতি, কলিকাতার চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন, অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ, শালিকার

১ দ্র. মদীয় নবদ্বীপ-ভাষণ 'সেকালের শিক্ষাব্যবস্থা ও বিদ্যাসাগর' ('সঞ্চয়ন', কার্ত্তিক ১৩৬৩, পৃ ৪-১৪)

২ রূ-ধ ১, ১ম সং, পৃ ১৮-১৯

৩ দ্র. মদীয় প্রবন্ধ : 'দামুদা-দাড়িকেশী-উপত্যকায় থানা রায়নার পুরাকথা' (শারদীয় 'দামোদর', ১৩৭৪)

৪ চি-প-স ২, চি-সং ৫৮৮

৫ দ্র. বা. সা. অ., ১ম ভাগ, পৃ ২০৪-২১৩, ২৮৯

জগমোহন তর্কসিদ্ধান্ত, জনাই-এর অভয়চরণ তর্কালঙ্কার, চাতরার রামহরি তর্কবাগীশ, গরলগাছার রামমোহন বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ বিদ্বমণ্ডলীকে।

এই তালিকাটি পাওয়া গিয়াছে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর অধস্তন বংশধরের বাড়িতে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ছিলেন দামোদরের পশ্চিম তীরের বর্তমান বর্ধমান-হুগলী সীমান্তের লোক। তাঁহার বংশধরদের সহিত শিক্ষা-দীক্ষায়, সামাজিক আদান-প্রদানে বিভিন্ন স্থানের যে-সকল খ্যাতনামা ভট্টাচার্যের যোগাযোগ ছিল, তাঁহাদের নামই এই তালিকায় স্থান পাইয়াছে। ইহাতে আমরা মোট ৬৮টি গ্রামের নাম পাইতেছি। তন্মধ্যে নদীয়া জেলায় তিনটি, চব্বিশ পরগণার একটি, হাওড়ার দুইটি, বর্ধমানের সতেরটি এবং হুগলীর পয়তাল্লিশটি। এই আটষট্টিটি গ্রামের সর্বসমেত ১৩৪জন ভট্টাচার্য পণ্ডিতের নাম পাওয়া যাইতেছে। ইহাদের অধিকাংশই ন্যায় ও স্মৃতির পণ্ডিত। এবং ইহারাই ছিলেন তৎকালীন রাঢ়ী হিন্দুর সমাজ-জীবনের নিয়ামক বা ব্যবস্থাপক। সামাজিক ও বৈষয়িক 'ভাষ'-প্রকরণে আমরা তাহার বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইব। এই তালিকায় উল্লিখিত প্রত্যেক ভট্টাচার্য মহাশয়ই টোল পরিচালনা করিতেন। এই সঙ্গে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের আবিষ্কৃত ও আলোচিত 'বঙ্গদেশে ন্যায়ের চতুষ্পাঠী'র বিবরণ[১] যোগ করিলে তালিকা সম্পূর্ণতর হইবে। তাঁহার উদ্ধৃত কয়েকজন খ্যাতনামা ভট্টাচার্যের পরিচিত নাম আমাদের তালিকাতেও উল্লিখিত হইয়াছে।

সংস্কৃত-শিক্ষা: মুদ্রিত দ্বিতীয় খণ্ডে যে-সকল দলিল-পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবম দশক পর্যন্ত প্রায় দেড় শত বৎসর যাবৎ এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার আলোচনা করিতে সক্ষম হইব[২]।

সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ-ছাত্রেরা টোলে শিক্ষালাভ করিতেন। সংস্কৃত-শিক্ষা হইত টোলে। টোলে সাধারণতঃ পাঠ্যক্রম কিরূপ ছিল, তাহা রূপরাম চক্রবর্তীর বাস্তব বর্ণনা হইতে এবং 'পুস্তক জায়' নামক দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত তালিকা[৩]-গুলির দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে। কাব্য, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, তিথি- উদ্বাহ-প্রায়শ্চিত্ত-দুর্গোৎসবাদি রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব—এই সকল গ্রন্থ আবশ্যিক পাঠ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। 'টোল ও গোয়ালি প্রস্তুত হইয়াছে ছাত্র ৮জনা হইয়াছেন পাঠ ব্যাপ্তিপঞ্চক পক্ষতা সামান্য নিরুক্তির ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি হইতেছে'—এই খবর পাওয়া গিয়াছে গুরুচরণ দেবশর্মার পত্র[৪] হইতে। ন্যায়শাস্ত্রের ছাত্রগণের নাম-তালিকা[৫] পাওয়া গিয়াছে। নামজাদা অধ্যাপকগণ 'স্বাধ্যায়াবকাসে··· চৌপাড়ী' পরিদর্শন করিয়া 'চক্ষুঃ সাফল্য'লাভ করিতেন[৬]।

১ দ্র. বা. সা. অ., ১ম ভাগ, পৃ ২৮৪-৩১৯ ২ দ্র. পূর্বে, পৃ ২৭-২৮ ৩ চি-প স ২, চি-সং ১২৫, ১৩৯, ১৪০, ১৫৮, ১৬০, ১৬১ ৪ ঐ, ঐ ৫৫৫ ৫ ঐ, ঐ ১৫২ ৬ ঐ, ঐ ১৫৬

ধনী জমিদারগণ চৌপাড়িতে বিশেষ সাহায্য দান করিতেন। গ্রামের জন-সাধারণের বাড়ী হইতে বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদিতে 'চৌপাড়ি আদায়' করা হইত। রাজস্ব বা শিক্ষাকরের মতো ইহা অবশ্যদেয় ছিল। এইভাবে আনুকূল্য পাওয়াতে সেকালের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক প্রতিষ্ঠা দৃঢ়মূল হইয়াছিল।

বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ রাজা প্রতাপচন্দ্র রায়[1] বাহাদুরের নিকট সন ১২৪৩ সালে অম্বিকা সাকিমের রামলোচন ন্যায়বাগীশ আরজ করিয়াছিলেন,—

মহারাজাধিরাজ রাজার কীর্ত্তী নব কৈলাষ নিকট টোল চৌপাড়ি করিয়া কতকগুলিন ব্রাহ্মর্ণ সন্তাণ দিগে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেছি কীন্তু ক্রিহাদিগে নির্ব্বাহ এবং আত্ম পরিবার নির্ব্বাহ অতিসয় ঘ্যর্থ হইতেছে মহারাজাধিরাজরাজা বাহাদুরের পূর্ব্ব পুরুশের দর্ত্ত ভূমি সকল কোম্পানিতে বাজেআপ্ত করিয়াছে ইহাতে পরম দুখী হইয়াছি অতএব কাহীত অনুগ্রহ দ্বারা আমি প্রতিপালিত হই।—অবশ্য এই আবেদনে সদ্য সদ্য ফল ফলিয়াছিল। 'বাদ মোলাহেজা হুকুম হইল জে—বর্ধমানের রাজধানি পৌছিয়া চৌপাড়ির তর্ত্তাবধানে মোনজোগ হইবেক[২]।

১৩৭, ১৯৪, ৫৮৮ সংখ্যক তালিকায় উল্লিখিত অধ্যাপক ভট্টাচার্য মহাশয়দের সকলেরই সম্ভবতঃ টোল ছিল; এবং তাঁহারা তাহাতে অধ্যাপনা করিতেন। পূর্ণ-বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে।

বীরভূমের নান্নুর গ্রামের জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালঙ্কার ছাত্রদিগের 'ব্যামোহ নিবারণার্থে' তাঁহার চতুষ্পাঠীর সম্মুখে একখানি টোলঘর করাইয়াছিলেন, তাহার জন্য ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় 'সলাতি পতিত বাস্ত কাঠা'সহজে পান নাই। 'গ্রহযজ্ঞ দক্ষিণান্তে নিবেদন বিস্তারিত' করায় তাহাতে তাঁহার 'অভীষ্ট পূরণে [রাজা] মহাশয়ের আজ্ঞা প্রমাণ রূপ আশ্বাষ ছিল'। 'ক্ষনিক জমা' সম্পর্কে মোকররী ব্যবস্থা দেওয়ান নরহরি মিত্রজা মহাশয়ই মনে হয় রাজা মহাশয়ের আজ্ঞায় ভূমিদানের সঙ্গে সঙ্গে করিয়া দিয়াছিলেন[৩]।

ছাত্রদের সহিত ব্যবহারে 'রাঢ়ী' বা 'বঙ্গীয়'—এইরূপ কোনো প্রভেদ বোধ হয় করা হইত না। তবে, এই বিভেদটি সুপরিজ্ঞাত ছিল। যথা,—'আমার এখানে দুইটী ছাত্র আছে একটী বঙ্গদেশীয়'—এই উল্লেখ[৩] হইতে ইহা বেশ বোঝা যায়।

নবদ্বীপ-বিদ্যাসমাজের অভ্যুদয়ের পূর্বে রাঢ়দেশ এবং বিশেষ করিয়া দক্ষিণরাঢ়ই ছিল বাঙ্গালার সারস্বত কেন্দ্র[৪]। বর্ধমান-রাজবংশের ইতিহাস আলোচনার সময়, পরে তাহার

১ চি-প. স ২, চি-সং ১৪৭। ইনি জাল প্রতাপচাঁদ কিনা, সে-বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ দেখা দেয়।

২ ঐ, ঐ ৪৯৬। বিস্তৃত আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য। ৩ ঐ, ঐ ১২৬

৪ বা. সা. অ., ১ম ভাগ, পৃ ২৯৫-৯৭

বিশদ পরিচয় দেওয়া যাইবে। ইংরাজ-শাসনের অবসানকালে পাশ্চাত্য প্রভাবে ম্রিয়মাণ আর্য-সভ্যতার প্রতীকরূপে ভারতবিখ্যাত নবদ্বীপ-বিদ্যাসমাজ নির্বাণলাভ করিয়াছে[১]। উত্তর ও দক্ষিণরাঢ়ের অবস্থাও তথৈবচ। পাকিস্তানে সংস্কৃতচর্চার কথা আর নাই তুলিলাম।

বাঙ্গালা-শিক্ষা ঃ পাঠশালায় বাঙ্গালা-শিক্ষা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেতর জাতির ছেলেরাই গ্রহণ করিত। মুসলমান ছেলেরাও এই পাঠশালায় পড়িতে পাইত।

সেকালের বিশিষ্ট ছাত্রেরা পাঠশালায় কিভাবে প্রবেশাধিকার পাইত তাহার দুইখানি দুর্লভ নিদর্শন-পত্র হুগলী জেলার আরামবাগ অঞ্চল হইতে সম্প্রতি আমাদের হাতে আসিয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, সেখ কালাচাঁদ সনাতন সরকারের পাঠশালায় নিজের দুই ছেলে সেখ ফজলু হোসেন ও তম্বরদখ হোসেনকে ভরতি করিবার উদ্দেশ্যে গুরুমহাশয়ের নিকট একরার-পত্র লিখিতেছেন। পাট্টা-কবুলতির মতো এই দলিল, পরস্পরে সম্পাদন করিয়াছেন।

মূল দলিল দুইখানি[২] এতৎসহ মুদ্রিত হইল।—

/৭শ্রীশ্রীহরি

সন ১২৬৬ সালি

মহামহিম শ্রীযুত সোনাতন সরকার বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীশেখ কালাচাঁদ সাং নওপাড়া পরগণে হাবিলী কস্য একরার পত্রমিদং কার্জ্যানাঞ্চ আগে আপনকার চৌপাড়ি আমাদের গ্রামে থাকায় আমার পুত্র শ্রীশেখ ফোজুলু হোসেন ও শ্রীতবুর্দ্দক হোসেন এই দুই লোককে আপনকার নিকট লেখাপড়া কোরিবার কারণ পাট কেলট্ট কট হরফ খাতাসোহী ও হিসাব নিকাস বাঙ্গালার হিসাবে ও হরফে ও ইস্তাহামে পুরা কোরিআ দিবেন আর বাঙ্গালার হিসাব ও সন্ধান স্বরআ আঁকজোঁকে তৈআর কোরিআ দিবেন ইস্তাহামে পুরা কোরিআ দিবেন সন ১২৬৬ সাল নাং সন ১২৬৭ সাল মাহ আশ্বীন তক তৈআর কোরিআ দিবেক আর আমার নিকট দরমাহা মাঘ মোট চুক্তী সর্ব্বসুদ্ধা কোং ২৫৲ পোচিষ টাকা দিবো টাকার করার ফি মাহাতে ৷৷০ আট আনা দিবো পরে এই কেলট্ট কট করারের পরে ইস্তাহামে পুরা করিআ ইস্তাম নিআ আপনকার মাহীনে হিসাব নিকাস করিআ দিবো আর এই করারের ভিতর তৈআর কোরিআ না দীতে পার তবে আমার টাকা ফেরত আপনকার ঠাই লৈইবো আর এই টাকা জখন দিবেন এই

১ বা. সা. অ., পৃ ২০৫ ২ শ্রীমান্ রামরতন রায় কর্তৃক সংগৃহীত ; মদীয় 'পল্লীশ্রী-লাইব্রেরী'তে সংরক্ষিত

একরারের পীষ্ঠে রোশীদ দিবো এইতদাথ্যা একরার পত্র লিখিআ দিলাম ইতি সন ১২৬৬ সাল তারিখ ১৩ শ্রাবণ—

ইসাদ— শ্রীসেখ কালাচাঁদ

সাং—নওয়াপাড়া

/৭শ্রীশ্রীদুর্গা

সন ১২৬৬ সাল

মহামহিম শ্রীযুত শেখ কালাচাঁদ মহাসয় বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীসোনাতন সরকার কাচগড়া পরগণে বায়ড়া কোস্য একরার পত্র মিদং কার্জ্জানক্কাগে আমার চৌপাড়ি পাঠাসা[লা]য় মৌজে নওপাড়া গ্রামে স্বরকারি কর্ম্মো করিতেছি এক্ষাণে মহাঁসএর পুত্র, শ্রীসেখ ফোজুলু ও শ্রীসেখ তোযুদ্দক এই দুই জোনাকে পাট কেলট্ট ক[টি] ইস্তক সন ১২৬৬ সাল নাগাইদ সন ১২৬৭ সালের মাহ শ্রাবণ তক পাট হরফ খাতাসোহী ও হিসাব নিকাশী কর্ম্মে তৈআর কোরিআ দিবো আমার মাহীনে মায় খোর পোষাক সূর্দ্ধা কোং ২৬ ছাব্বিস টাকা পাইবো মহাসএর পুত্রদীগরকে তৈআর করিআ দিবো উক্ত ছাত্রদির্গেক ত্বআর না করিআ দিতে পারি তবে আপনার টাকা ফিরৎ দিবো আপনার পুত্র দীগর সাভালি করিআ কামাঞী করে এবং অন্ন কোন উজর হয় তবে আমি মহাসয়কে মোং কোলকাতা তক্ চিটী লিখিআ জানাইবো টাকার উপর... আমার একরার ত্বক মাহীনে লৈইবো কিম্বে এই কর্ম্মে আমার গাফিলি হয় তবে আমি এই চুক্তীর টাকায় বাদ দীব এই তদাথ্যা একরার পত্র আপন খুশীতে লিখিআ দিলাম ইতি সন ১২৬৬ সাল তারিখ ১৩ই শ্রাবণ

ইসাদ

এই একরার-পত্রগুলি পাঠ করিলে প্রথমেই আমাদের পঞ্চতন্ত্রের অমরশক্তি-বিষ্ণুশর্মার চুক্তিপত্রের কথামুখ স্মরণ করায়। পঞ্চতন্ত্রের[১] কাহিনীগুলি এদেশে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যগত লোককথা একত্র গ্রথিত। ইহা অসম্ভব নয় যে, আমাদের সংগৃহীত বাঙ্গালা-পাঠশালার একরার-পত্র-লিখনের এই ধারাটি ভারতীয় প্রাচীন লৌকিক পরম্পরারই প্রকারভেদ।

যাহাই হউক, এই একরার-পত্রগুলিতে লক্ষণীয় বিষয় অনেক রহিয়াছে। প্রথমতঃ, 'সরকারী' অর্থাৎ সর্বসাধারণের জন্য অবারিত বাঙ্গালা-পাঠশালাকেও চৌপাড়ি অর্থাৎ চতুষ্পাঠী নামে অভিহিত করা হইতেছে—সংস্কৃত টোলের অনুকরণে। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু-

১ দ্র. পঞ্চতন্ত্রকম্ (চৌখম্বা)

মুসলমাননির্বিশেষে একজন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ-ঘরের ছেলেকে চৌকস হইতে গেলে কি কি বিষয় অধ্যয়ন করা তাহার পক্ষে আবশ্যিক ছিল তাহার পরিচয় জানা যাইতেছে।

এক শত বৎসর পূর্বে, ২৬টাকায় বেতন মায় খোরাক-পোষাকে উপযুক্ত শিক্ষক মিলিতেছে, ছেলেদের শিক্ষা পরীক্ষা পর্যন্ত সম্পূর্ণ করাইবার জন্য। এক বৎসরের মধ্যে এই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতেছে। অক্ষর-পরিচয়, খাতা-সহি, হিসাব-নিকাশ, সন্ধান-স্বরআ, আঁকিজোঁখ ইত্যাদি শিক্ষা এই সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হইত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, ছাত্র তাহার ব্যক্তিগত কারণ-ব্যতীত, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইলে গুরুমহাশয়ের নিস্তার ছিল না। তাঁহাকে একবারে লিখিত বেতনের সমূহ টাকা সুদসমেত এককালে ফেরৎ দিতে হইত। এবং এই লেনদেনের পাট্টা-কবুলতি অর্থাৎ পারস্পরিক চুক্তিপত্র যথারীতি সম্পাদিত হইত। প্রসঙ্গতঃ, মুসলমান 'কালাচাঁদ' ও হিন্দু 'সনাতনের' সামাজিক সম্প্রীতির সম্পর্কটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

ব্রাহ্মণেতর হিন্দু এবং মুসলমান ছাত্রেরা সাধারণতঃ বাঙ্গালা-পাঠশালার পাঠ গ্রহণ করিত। গণিতের প্রায় সমস্ত আর্যাই 'কায়স্থ বালা'কে সম্বোধন করিয়া লিখিত। গণিত ব্যতীত ছাত্র-সকলকে বিদ্যা অধ্যয়ন করাইবার নিমিত্ত ৯৮প্রকারের 'প্রস্ত' পাওয়া গিয়াছে[১] বীরভূম জেলার খুজুটীপাড়া গ্রাম হইতে। 'বহিদার' অর্থাৎ এই কড়চার মালিক ছিলেন ব্রজবাসী দাস সৌ. ১২৭১ সালে।

একটি সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের ছেলেকে ব্যবহারিক জ্ঞানের দিক্ হইতে পূর্ণ-পরিণত করিয়া দিতে এই প্রস্থ-ধৃত শিক্ষা-প্রণালী পর্যাপ্ত ছিল। ইহাতে প্রাচীন পরম্পরাগত হিন্দু-যুগের, মুসলমান আমলের এবং ইংরাজ রাজত্বের প্রায় সমস্ত ব্যবহারিক বিদ্যাই স্থানলাভ করিয়াছে দেখা যায়। এবং অনুমিত হয়, যুগের পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বাঙ্গালী হিন্দু যুগোপযোগী শিক্ষা-ধারাকে কালে কালে গ্রহণ ও তাহার সমীকরণ করিয়া আসিয়াছে। ইহাও স্থির যে, সার্বভৌম লোকধর্মাশ্রিত হিন্দু-সংস্কৃতির মূলে এই সমীকরণের সুফলবশতঃই জাতি হিসাবে হিন্দু বাঙ্গালী এখনও টিকিয়া আছে।

পাঠশালার পাঠ্য-তালিকায় যে ৯৮প্রস্থের[১] সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি বিচার করিলে আমরা দেখি, পাকা গৃহস্থ হইতে গেলে কোনো ছাত্রের যে যে বিষয় জানা আবশ্যক তাহা বিবৃত হইয়াছে। প্রস্থের প্রথম দিকেই অ-কারাদি অক্ষর-শিক্ষা, তাহার পর, যুক্তাক্ষর বানান শিখিয়া, কড়া কণ্ডা ইত্যাদি অঙ্কের ধারাগুলি মুখস্থ করিতে হইত। ইহার ফলে, চাষীর ছেলে ধান-বিক্রী, চাল-বিক্রী গুড়-বিক্রী ইত্যাদির হিসাবে পোক্ত হইত।

১ চি. প. স ২, চি-সং ১৪৬

কৃষক-মাহিন্দারের মাস-মাহিনা ও বৎসর-মাহিনার হিসাব-নিকাশ কিভাবে করিতে হয় তাহাও শিখাইয়া দেওয়া হইত। ইহা ছাড়া, সোনা, রূপা, পিতল ইত্যাদির খরিদ-বিক্রী সম্পর্কে হিসাব-নিকাশের পাঠ লইতে হইত স্ব স্ব পেশা বজায় রাখিবার প্রয়োজনে।

মহাজনি করিবার জন্য সুদকষা শেখা আবশ্যিক ছিল। ধান-চাউলের লেনদেনের উদ্দেশ্যে এবং মুদীয়ানা বৃত্তি গ্রহণের নিমিত্ত পড়ুয়াদের কেনাবেচার মুনফা-জমা-খরচ, 'পসরি জায়' ও মণকষা, বিশা খরিদ-বিক্রী ও ওজনের নিয়ম—এ-সব শিখিতেই হইত।

ইট-কালি, নৌকা-কালি, দেওয়াল-কালি, দধি-কালি, পুষ্করিণী-কালি শেখার প্রয়োজন হইত নিখুঁত মাপজোখের জন্য। জ্যোতিষও শেখানো হইত কিছু কিছু। তাহার হদিশ পাই 'সময় নিরুপন ও বার তিথির' নিয়ম এই গ্রন্থ হইতে। ঠিকাদারী কাজের জন্য 'পাকা রাস্তার মাপ'; কবিরাজী চিকিৎসায় অনুপানের যথাযথ পরিমাপ-জ্ঞানের নিমিত্ত 'চিকিচ্ছায় তোলার পরিমাণ' শেখানো হইত। সাধারণ পথের মাপ ও ভূমির মাপ জানার প্রয়োজন ছিল বিশিষ্ট চাষী গৃহস্থের পক্ষে।

ইহা ছাড়া, 'চিঠিপত্র লিখিবার ধারা', 'গ্রাম লিখিবার ধারা', 'নাম লিখিবার ধারা', সেয়া-খত লিখিবার পদ্ধতি পাঠশালাতেই শেখানো হইত। জমা গুজস্তার খাজানা, দাখিলা লিখিবার পদ্ধতি, খত-পাট্টা-কবুলতি, ইজারা-পাট্টা, খোস-কবালা, কট-কবালা, ইজারা-বন্ধক, নাম-ইস্তফার রসিদ, গোমস্তার কবুলতি, সম্বন্ধ হুকুমনামা, মহাল-ইজারা, পাট্টা-কবুলতি ইত্যাদি জমিদারি সংক্রান্ত যাবতীয় শিক্ষণীয় বিষয় ছিল পাঠশালার পাঠ্য।

উদকষ্টি, অষ্টকোটা, লবণকোটা, বৃদ্ধ-আউটি, অতিবৃদ্ধ-আউটি, এই সব অঙ্কের ধারার পাঠও দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত, আইনংআদালত-সংক্রান্ত অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি, যেমন, আদালতের আর্যা, মোক্তারনামা, জবাবল জমা (জবা), বন্ধক-জবাব, জমানবন্দী, রোবকারী, ফয়সালা, এত্তলানামা, এত্তার রসিদ, শমন-জারি, ইস্তাহার, ফরিয়াদী আদালতের এত্তেলা ও হিসাবাদি মামলা-মকদ্দমার যাবতীয় জ্ঞাতব্য পাঠশালার পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভূক্ত ছিল। আমাদের আবিষ্কৃত বাঙ্গালা-পাঠশালার এই পাঠ্যতালিকাটি সন ১২৭১ সালের অর্থাৎ এখন হইতে এক শতাধিক বৎসর পূর্বের। মনে হয়, রাঢ়ের সর্বত্র এই একই ধারায় পাঠশালার পাঠ পড়ানো হইত।

এক শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী-হিন্দুসমাজের প্রতিভাধর ব্যক্তিগণও এই ধারায় গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষা লাভ করিয়া, গ্রামের বাহিরে আধুনিক সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র শহরে আসিয়া সমবেত হইয়াছিলেন। এবং আশ্চর্য এই, জীবন-উষায় এই ধারা-সিঞ্চনে প্রথম পুষ্টিলাভ করিয়া বাঙ্গালী-প্রতিভা বাঙ্গালাদেশে শিক্ষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে রেনেসাঁস্ বা নব-জাগরণের সূত্রপাত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

গণিতের আর্যা এবং পাঠশালার ৯৮গ্রন্থ পাঠ্যতালিকা ছাড়া, আরও মূল্যবান্ দলিল-পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। দ্বিজ দুর্গারাম-ভণিতায় 'শিশুজ্ঞানচরিত্র'-এর একখানি পুঁথির পাঠ[১] আমাদের সংগৃহীত ও আলোচ্য এই গ্রন্থের পরিপূরক। ইহাতে দেখা যাইবে, পাঠশালের পাঠ্যতালিকায় শিশুদের উপযোগী জ্ঞানবৃদ্ধির শিক্ষণপদ্ধতি।

এই পুঁথিতে প্রথমে চৌত্রিশ-অক্ষর শিক্ষাদানের কথা অছে। বর্তমানে 'ক্ষ' ও 'ং' বাদে বাঙ্গালা-বর্ণমালায় স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ মোট ৪৬টি[২] রহিয়াছে; কিন্তু, পূর্বে বিদ্যা আরম্ভ হইত ৩৪ অক্ষরের বর্ণমালা সহযোগে। এই ৩৪ অক্ষরের ধারা আমরা বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের 'চৌতিশা'-স্তবের মধ্যে রক্ষিত দেখিতে পাই। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যাইতে পারে যে, কাশীতে প্রচলিত মহাজনী বর্ণমালা বত্রিশ অক্ষরে গ্রথিত। এই বত্রিশ অক্ষরের সহিত 'কায়থি'-লিপির[৩] এবং আলোচ্য ৩৪অক্ষরের বর্ণমালার সাদৃশ্য বর্ণনা করা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়।

অক্ষর-পরিচয়ের পরে, সরল ও যুক্ত বর্ণাদির বানানাদি শেখানো হইত। তাহার পরে, অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া শব্দ-প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা করিতে হইত। তখন বানান বিশেষভাবে শিখিতে হইত পুঁথি-লেখার পেশা যাঁহারা গ্রহণ করিবেন তাঁহাদিগকে।

বই হিসাবে পড়ানো হইত 'গুরুদক্ষিণা' ইত্যাদি। অতঃপর, খত-পাটা শেখানো হইত। তাহার পরে অঙ্কের পাঠ পূর্ববৎ।

পাঠশালে কতকগুলি পড়ুয়া বালকের নাম উল্লেখের ছলে ছাত্রদিগকে যুক্তবর্ণ শিখাইবার কৌশলটি বড়ো চমৎকার। যাহাই হউক, পাঠশালায় কেবল পাঠ-পড়ানোই হইত না; ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র-গঠনের দিকেও গুরুমহাশয়েরা প্রখর দৃষ্টি রাখিতেন এবং শীল-আচরণ শিখাইতেন। প্রথমতঃ, গৃহের গুরুজনের প্রতি আনুগত্য ও তাঁহাদের সেবা করা যে ছাত্রদের অবশ্যকর্তব্য তাহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইত। তাহা ছাড়া, তখনকার দিনের সামাজিক রীতি-অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ইত্যাদি উচ্চবর্ণের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ শিক্ষাবিধি ছিল। পরস্বাপহরণাদি কুপ্রবৃত্তিগুলি সম্পর্কেও শিক্ষক মহাশয় সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন।

আরও একটি বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহা এখনও আমাদের বিশেষভাবে শিক্ষণীয়। পুঁথির লেখক মহাশয় ছাত্রদের উপদেশ দিয়াছেন, সতীর্থদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব সর্বথা ও সর্বদা পালনীয়; এমন-কি, প্রত্যেক সতীর্থ যেন মনে করে, তাহারা গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় নহে; একটি গৃহ-নীড়ে আসিয়া সমবেত হইয়াছে।[৪] এবং যেন প্রত্যেক

১ পুঁ-প ২, পৃ ৩৬৩-৬৮ ২ বা. দে. ই., পৃ ২৫১-৫৪

৩ দ্র. মদীয় প্রবন্ধ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩ ফাল্গুন, ১৩৭৩

৪ 'পড়ুআ পড়ুআ দন্দ না করিহ কেহ, মনে করো সকলে হইবে একগ্রহ।'

ব্যক্তির সহিত বাক্যে ও আচরণে 'যত্ন' অর্থাৎ শিষ্টভাব প্রকাশ পায়। অবশেষে, শিক্ষক বা দীক্ষাদাতা গুরুকে যেন সযত্নে, এমন-কি কায়ক্লেশেও সেবা করা হয়। কঠোর জাতিভেদ সত্ত্বেও সেকালের সার্বলৌকিক বাঙ্গালা-পাঠশালায় শিশুদের মানস-ক্ষেত্রে এইভাবে শান্ত ও ভদ্র জীবন এবং মানবিকতাবোধের বীজটি গ্রাম্য গুরুমহাশয়ই বুনিয়া দিতেন। বলা বাহুল্য, মানব-জমিনে বিশ্বপ্রেমের এই বীজটি[১] হিন্দুসভ্যতার উন্মেষকালেই উপ্ত হইয়াছিল।

পুঁথিখানির অংশবিশেষ উদ্‌ধৃত হইল,—

প্রথমে আরম্ভ বিদ্যে চৌত্রিস অক্ষর ...কর কল লিখ তার পর।
...কনক মকিরি ১খ] কিল্লিআদি... আংক্কো আঙ্কো সিদ্ধি লিখ না করিহ হেলা।
সিখিলে বানান সর্ব্ব জানিবে...ন অক্ষরে অক্ষরে তবে করিবে প্রমাণ।
বানান শিখিলে কিছু নাই রগোচর অবোহেলে চালাইবে পুথির রক্ষ্যর।
গুরুদক্ষিণ্যা পড় জতো সিযুগণ খত পাটা আদি করি লিখন পড়ন।
অত্যোর্পর কড়ির অংঙ্ক সিখ জতো বালা কড়ানে গুণ্ডাকে লিখ না করিহ হেলা।
যটিকে বুড়িকে লিখ পুনকে আদি জতো চৌকে লিখিতে কেহ না করিহ ভ্রস্তো।
একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ তিনে নিত্র হয় চেরে বেদ পঞ্চ বান ছয়ে রিতু কয়ে।
সাতেতে সমুদ্র হয় আটে হয়ে বসু নয়েতে নবোগ্র হয়ে দসে দ্বিগ জান জতো সিযু।
সব্দ স্লেখত সিখ জায় হবে জ্ঞান মুখের জড়তা জাবে পড় রবিধান।
দ্বিজ দুর্গারাম বলে যুন সর্ব্বজোন সিযু বুঝাইতে আমি করিলাম রচন॥
দয়ারাম নন্দলাল আর সত্রুঘন রামহরি মাধব ভরথ গোবর্দ্ধন।
রামনাথ কিসুরাম আর রূপচরন মুক্তারাম রঘুনাথ মুকুন্দ মদন।
দ্বাদস বালকে যুন আমার বচন ভিন্ন ভাব কাহরে কেহ না কহিবে কুবচন।
মাতা পিত্যার বার্ক্য কেহ না করিবে হেলন পিত্যামাতা মহাগুরু জানি করিবে স্লেবন।
ব্রাহ্মণ দেখিলে সভে হবে দণ্ডবত ২ক] অবোহেলে এড়াইবে যমনের পত।
বৈষ্ণব দেখিলে সভে হবে দ্রঢ়ভক্তি বৈষ্ণব করিলে দআ হবে কৃষ্ণপ্রাপ্তী।
বৈষ্ণব বিষ্ণুর রংশ জানিহ নিদান বৈষ্ণবের আসির্বাদে সর্ব্বত্রে কল্যাণ।
পিত্যামাতা জেষ্ট ভাই করিআ মার্জ্জন বিস তুর্ল্য দেখিবে পরের অমূল্য ধন।
পড়ুআ পড়ুআ দন্দ না করিহ কেহ মনে করো সকলে হইবে একগ্রহ।
জত্ন করি সোভারে বলিবে জোনে জোন কায়েক্লেসে ভজ সভে শ্রীগুরুচরণ।
দ্বিজ দুর্গারাম বলে ভাবি চক্রধরে সিযুজ্ঞানচরিত্র সমাপ্ত হইল এতো দূরে॥

১ Kane, Vol. II, pt. I, pp. 869-70

এই পুঁথিখানির নকল হইয়াছিল চিন্তামণি মণ্ডলের বাড়ীর দরজায় অবস্থিত পাঠশালায়। সে হইতেছে ১২৬৪ সালের কথা। পুঁথির লিপিকরের নাম ষষ্ঠীচরণ মণ্ডল। ইনি বোধ হয় ছিলেন পাঠশালার গুরুমহাশয়। যাহাই হউক, 'শিশুজ্ঞানচরিত্রে'র এই পুঁথিখানির সহিত 'শিশুবোধক'-পর্যায়ের পুঁথিগুলিরও আলোচনা করা দরকার।

'জ্ঞানকৌমুদী'-গ্রন্থ[১] হইতে হিন্দু-ছাত্রদের 'লিখনের পাটা পাট' অর্থাৎ গুরুকে শিষ্যের, শিষ্যকে গুরুপত্নীর, পিতামহ, মাতামহ, পৌত্র, দৌহিত্র প্রভৃতিকে পত্র লিখিবার পদ্ধতি, আদব-কায়দা, গ্রাম লিখিবার ধারা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইত। হেঁয়ালিতে চিঠি[২] লেখার একটি খুব প্রাচীন রীতি ছিল। এই প্রহেলিকা-ধারার পত্রগুলি বিশেষ কৌতূহলজনক। এই পত্রগুলি আমাদিগকে মহাপ্রভু ও অদ্বৈতাচার্যের তর্জা-পদ্ধতিতে পত্র-লিখিবার প্রাচীনতর প্রসঙ্গ স্মরণ করায়।

পাঠশালায় যে-সব বাঙ্গালা পুঁথি ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে পড়ানো হইত, তাহার একটি তালিকা[৩] দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে মনে হয়, এই গ্রন্থগুলি পাঠশালায় উচ্চতর শ্রেণীতে পাঠ্য ছিল। বাঙ্গালা গ্রন্থের মধ্যে শঙ্করাচার্য-কৃত গঙ্গাস্তব, আশ্রয়নির্ণয়, রাধারসকারিকা, কুম্ভকর্ণের রায়বার, 'বাওয়া' অঙ্গদের রায়বার, খুল্লনা ও ফুল্লরার বারমাসী—এই গ্রন্থগুলি পড়ানো হইত। ইহা ছাড়া, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অন্য বৈষ্ণব নিবন্ধ এবং বিভিন্ন স্তোত্রাদিও পড়ানো এবং আবৃত্তি শেখানো হইত।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালা-পাঠশালায় মুসলমান ছাত্রদেরও অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। এবং এই অধিকার সম্ভবতঃ উভয় তরফেই ছিল অবারিত। হিন্দু ছাত্রদের যে-সব পাঠ পাঠশালায় পড়ানো হইত, মুসলমান পড়ুয়াগণও তাহাই শিখিত। তবে মনে হয়, আত্মীয়-স্বজন ও স্ব-সমাজে চিঠিপত্রাদি ব্যবহার করিবার নিমিত্ত বিশেষ ধরণের 'ধারা' তাহাদের শিক্ষা দেওয়া হইত। এইরূপ একটি শিক্ষণ-পদ্ধতি দ্বিতীয় খণ্ডে[৪] প্রকাশ করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, 'মোছলমানের প্রকরণ' অনুসারে, মুসলমান ছাত্রদের পীর মুরীদকে, দাদোকে, পোতাকে, দাদী-নানীকে, বড়ো শালা, বড়ো বোনাইকে, ছোট শালাকে, দোস্ত প্রভৃতিকে 'খত' লিখিবার স্বতন্ত্র 'সেরেস্তা' শেখানো হইতেছে।

সন ১১৯৮ সালে লিখিত[৫] কোনো এক পাঠশালার পড়ুয়াদের নাম-তালিকা, তাহাদের প্রদত্ত বেতনের হার ও তাহার জমা-খরচ এবং গুরুমহাশয়ের সাংসারিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পাওয়া যাইতেছে। পড়ুয়াদের তালিকায় দেখা যায়, ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ

---

১ চি-প-স ২, চি-সং ১৩৮, ১৫০ এবং মূল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ২ ঐ, ঐ ১৫৪, ৫২০ ৩ ঐ, ঐ ১৪২
৪ ঐ, ঐ ১৪৭ ৫ ঐ, ঐ ৫৮৬

উভয় শ্রেণীর ছাত্রই একত্র শিক্ষালাভ করিতেছে ; তবে, তুলনায় ব্রাহ্মণ-ছাত্রের সংখ্যা কম। তুঞ্জা, বণিক, নায়েক, ঘোষ, চং, বৈরাগী, সো—এই সকল পদবীধারী ছাত্রেরই সংখ্যাধিক্য। ছাত্রদের বেতনও এমন-কিছু বেশী ছিল না। এক আনা, দুই আনা ছিল সাধারণ মান। সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল বোধ হয় চার আনা। পাঠশালা পরিচালনা করিয়া গুরুমহাশয়ের যে-আয় হইত তাহাতে মনে হয়, সচ্ছল না-হইলেও কোনো প্রকারে সংসারের ভরণ-পোষণ নির্বাহ হইয়া যাইত।

তখনকার দিনের পাঠশালার একটি উজ্জ্বল চিত্র দেখা যায় এই কয়টি ছত্রে,[১]—

অষ্টাদশ ছাওাল পড়িছে নিরন্তর অষ্টশব্দী আদি করি পড়িল অমর।
বিবিধ প্রকারে অঙ্ক শিখিআছে সভে অষ্টকোঠা অষ্টপর শিক্ষা করে ইরে।
সরকার বেড়িয়া সভে বস্তে ডানি বাঁ অধ্যয়ন করাইছে সুখিরাম খাঁ।
তিলির নন্দন তার নারাঙ্গিতে বাস কঠিন কঠিন অঙ্ক করিছে প্রকাস।
শ্রীরামদুলাল দ্বিজ কবিছান্দে কয় অঙ্ক হল্যো অস্থির সুস্থির কর্যা লয়।

এই বর্ণনা হইতে দেখা যায়, টোলের মতো পাঠশালায় ছাত্রাধিক্য হইত না। টোল-প্রসঙ্গ আসিলেই পুরাতন দলিলপত্রে বা কাব্যাদিতে আমরা যেমন এক শত কুড়ি ('বিশাশয়') ছাত্রের কথা শুনি, সে-স্থলে পাঠশালার বর্ণনায় মাত্র আঠারোটি ছাত্রের উপস্থিতির উল্লেখ পাইতেছি ; এবং তাহারা নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়নে রত আছে। পাঠশালায় ব্যাকরণ এবং অমরকোষ শেখানো হইত। কিন্তু, বিশেষ লক্ষ্য ছিল, বিবিধ প্রকারের অঙ্ক শিখাইবার দিকে। মনে হয়, আমাদের পূর্ব-আলোচিত তালিকার অনুরূপ অষ্টকোটাদি অঙ্কসমূহ পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পাঠশালার গুরুমহাশয় এখানে আমরা দেখিতেছি, একজন তিলি-জাতীয় লোককে। তাঁহার আবার অঙ্কে খুব মাথা। বাঙ্গালা দেশের তিলিগণ সাধারণতঃ ব্যবসায়ীর বৃত্তি গ্রহণ করেন বলিয়া পুরুষানুক্রমে তাঁহাদের অঙ্কশাস্ত্রে পোক্ত হইতে হয়। এখানে দেখা যাইতেছে, তিলির ছেলে সুখীরাম খাঁয়ের বাম ও ডাহিনে বেষ্টন করিয়া ছাত্রেরা বসিয়া কঠিন কঠিন অঙ্কের পাঠ লইতেছে ; এবং যেমন কঠিন অঙ্কই হউক না কেন, খাঁ মহাশয় সেই 'অস্থির' অঙ্কসমূহকে 'সুস্থির' করিয়া দিতেছেন।

বিশ্বভারতী-সংগ্রহের ১৭সংখ্যক পুঁথিখানি[২] সেকালের গ্রাম্য পাঠশালার একখানি দুর্লভ কড়চা হিসাবে সবিশেষ মূল্যবান্। ইহাতে নারায়ণ দাস, শুভঙ্কর দাস, গোপাল, হরেকৃষ্ণ ঘোষ, রামনারায়ণ, দ্বিজ রামদুলাল রায়,[৩] শোভারাম, কিঙ্কর, নন্দরাম এবং কৃপারাম

১ পুঁ-প ১, পৃ ১০ ২ ঐ, ঐ পৃ ৯-১২ ৩ নিবাস বর্ধমান জেলার রায়না থানার 'খাঁসা' গ্রামে

দাসের ভণিতায় সেকালের পাঠশালার শিক্ষণ-পদ্ধতি সংকলিত ও লিপিকৃত হইয়াছে। মনে হয়, লিপিকার গোপীচরণ দাস স্বয়ং গুরুমহাশয় ছিলেন; এবং তিনি নিজ-প্রয়োজনে এই পুঁথিখানির লিপি করিয়াছিলেন। ইহাতে পত্র-লিখিবার নিয়ম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পদ্ধতিগুলি হেঁয়ালির আকারে রচিত। সেইজন্য অনেক স্থলে সমস্যাপূরণ-করা রীতিমতো দুরূহ ব্যাপার। তবে, এই ছড়াগুলিতে সেকালের সমাজের উজ্জ্বল চিত্র যেমন পাওয়া যায়, তেমনি সাহিত্যরসও রহিয়াছে পর্যাপ্ত পরিমাণে।

এই পুঁথিখানি হইতে সেকালের পাঠশালার চিত্র আমরা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। এখন কিছু সাহিত্যিক নিদর্শন দেওয়া যাইতেছে। নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটির প্রতি ইতোমধ্যেই সাহিত্য-সমালোচক ও রসিক-সুজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া ইহা 'গণিত পদাবলীর' অভিধায় অভিহিত হইয়াছে[১]। কৌতূহলী পাঠকদের অবগতির নিমিত্ত কবিতাটি উদ্ধৃত[২] করা গেল,—

> সত্য করি প্রবাস গেলেন প্রাণনাথ দিব্য করি গেলা দুটি শিরে দিয়া হাথ।
> বিরহে ব্যাকুল চিত না শুনে বারন নিঠুর হইয়া নাঞি আল্য প্রাণধন।
> তিলে শতবার মরি লেখা দিব কত দণ্ডকে সহস্রবার হই মূর্ছাগত।
> রাগ রস বাণ বসু একত্র করিয়া গরাসি তেজিব প্রাণ বাণ ঘুচাইয়া।
> শ্রীরামদুলাল দ্বিজ বলে শুন সখি জে কহিলে তাই দিব্যানিশি বুঝ্যা দেখি॥

এই কবিতাটির অন্তরালে আসলে একটি অঙ্কের সমস্যা নিহিত রহিয়াছে। এই কবিতাটি একদিকে যেমন উঁচুদরের একটি সাহিত্য-কৃতি, তেমনি পাঠশালার ছাত্রদের অঙ্ক শিখাইবারও একটি শর্করা-মাখানো পদ্ধতিবিশেষ। ফলে, ইহাতে বয়স্ক ছাত্রদের আহার ও ঔষধ দুই-ই যোগাইয়াছে। কবিতাটি সহজভাবে পাঠ করিলে, সহসা একজন বিশেষ পদকর্তার বৈষ্ণব-পদ বলিয়া মনে হয়। পক্ষান্তরে, অঙ্কটির পাতন করিলে এইরূপ দাঁড়ায়,— রাগ = ৬, রস = ৬, বাণ = ৫, বসু = ৮; সর্ব একুনে হয় ২৫;—ইহা হইতে বাণ ঘুচাইয়া, অর্থাৎ ৫ বাদ দিয়া, বাকি থাকে বিশ বা বিষ। এই গরল গ্রাস করিয়া নায়িকা প্রাণত্যাগ করিতে সংকল্প করিতেছেন, তাঁহার প্রাণনাথ শপথ মানিয়া যথাসময়ে তাঁহার নিকট প্রবাস হইতে ফিরিয়া না-আসিলে।

ইহা ছাড়া, ইরাকী টাঙ্গন, তাজী বা আরবী ঘোড়া উকিল-মারফৎ ক্রয় করিবার প্রসঙ্গে অঙ্ক শেখানো, মক্কা সহরে পীরের জায়গীরে ধান-ফলনের হিসাব, মোতি-মুক্তা রাণীর গলা হইতে চুরি যাওয়ার অছিলায় মোতি-মুক্তা-কথা, সেকালের গন্তে লিখিত শিব-ঠাকুরের নিকট

১ বা. সা. ই. ১খ, ২সং, পৃ ৮৭৪-৭৫ ২ পুঁ-প ১, পৃ ১০

চাকর মারফৎ সদাগরের কড়িদান, গোষ্ঠে গাভীর পরিচর্যা-প্রসঙ্গে অঙ্ক-পাতন ইত্যাদি রহিয়াছে আর্যাছন্দের কবিতায়।

শুভঙ্করী সম্পর্কে বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে বিস্তৃত আলোচনা[১] আছে। শুভঙ্করীর আর্যা বাঙ্গালাদেশকে অঙ্ক শিখাইবার গ্রন্থরূপে প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। ওড়িষ্যায়[২] 'লীলাবতী সূত্র' মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ছন্দও আর্যা। পড়িতে হয়, বা গীত হয় 'বঙ্গলা শ্রী' রাগে।

আসাম-অঞ্চলে গণিতের ছড়ার বিশিষ্ট নাম 'কায়থলি আর্যা'। দক্ষিণরাঢ়ের ও আসামের পুরানো ছড়াগুলির মধ্যে খুব মিল আছে। ওড়িষ্যার 'লীলাবতী'-সূত্রের সহিত এগুলির মিল দুর্লক্ষ্য নহে। ইহাদের প্রত্যেকটির মূল অপভ্রংশ বলিয়া এই মিল সম্ভবপর হইয়াছে।

প্রাকৃত কবিতার বিশিষ্ট ছন্দের নাম হইল 'আর্যা'। প্রাকৃতে এইরকম গণিতসূত্র গ্রথিত হইত আর্যাছন্দে। সংস্কৃত গণিতনিবন্ধেও আর্যা-ছন্দের ব্যবহার আছে। সেই সূত্রে বাঙ্গালা গণিতসূত্রের ছড়ার নাম আজও 'আর্যা'। বাঙ্গালা আর্যায় অপভ্রংশের চিহ্ন আছে প্রত্যক্ষভাবে। ফলে, বাঙ্গালার উপভাষা আসামী ও ওড়িয়াতেও ইহার স্বাভাবিক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এতৎসম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করিলে পাঠশালায় প্রচলিত লৌকিক সংস্কৃতির ধারায় বাঙ্গালা, ওড়িষ্যা ও আসামের ঐক্যসূত্রটি পরিস্ফুট হইবে।

বাঁকুড়ার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় শুভঙ্করের নামে স্থানীয় অঞ্চলে প্রচলিত ছড়া ও এই বিষয়ে তাঁহার সংগৃহীত পুঁথিগুলি সম্পাদন করিয়া ('শুভঙ্করী') আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। গ্রন্থখানি তুলনামূলক সম্পাদনের অপেক্ষায় আছে। গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইলে, সেকালের বাঙ্গালা-পাঠশালায় পঠন-পাঠন সম্পর্কে সঠিক্ ইতিহাস উদ্ঘাটিত হইবে।

পাঠশালার পাঠ্যক্রম শুভঙ্করের মতে এইরূপ,—আগে অক্ষর-পরিচয়, তাহার পর বানান-শিক্ষা, তাহার পর আর্যা। যুক্ত-অক্ষর দেখিয়া ধাঁধাঁ লাগিলে, প্রথম ও দ্বিতীয় অক্ষর উপর-নীচে সাজাইয়া পড়িলে তাহা সহজে বোধগম্য হইবে। অঙ্কের গণনা ছাড়া, ধান্যের সম্পর্কে যে-সব হিসাবাদি পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহাতে সেকালের সম্পন্ন পল্লী-গৃহস্থের জীবন-যাত্রা সম্পর্কেও কিছু কিছু আলোকপাত হয়। ধান্যের মাপ, মজুত তণ্ডুলের হিসাব শিখাইয়া ধান্য ভাচা দিবার পদ্ধতি শেখানো হইত। ধান্য খরিদ-বিক্রীর জন্য টাকার দরে, আনার দরে, ধান্যের হিসাব কষানো হইত। ধান, চাল, গুড়, সরিষা এই সকল প্রয়োজনীয় শস্যের লেনদেনের জন্য রীতিমত উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইত। শস্য ব্যতীত সোনা রূপা তামা কাঁসা

১ বা-সা-ই ১খ, ২সং, পৃ ৮৭৩-৭৬ ২ পুঁ-প ১, ভূ. পৃ *২১

য়াং বণিকরা নির্মিত তৈজসপত্র খরিদ করিবার পদ্ধতিও শিক্ষা দেওয়া হইত। পানের বরোজ-কালি শেখানো হইত; দেউল-কালি, নৌকা-কালিও শিখিতে হইত। পানের বরোজ মাপের একটি পুঁথিতে হেমন্ত দাসী[1] নামে একজন মহিলার ভণিতা আছে। ইহা ছাড়া, কাগজ কিনিবার আর্যা, মাস-মাহিনার আর্যা, বৎসর-মাহিনার আর্যা পাওয়া যাইতেছে। অঙ্কের সংখ্যার বিভিন্ন নামেও বৈচিত্র্য দেখা যায়।

পাঠশালে এইরূপ প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর, সেকালের ভদ্র-সন্তানেরা উচ্চতর মানে যে-আদর্শে শিক্ষা গ্রহণ করিত, তাহা একখানি পুঁথি হইতে উদ্ধৃত[2] করা যাইতেছে,—

অক্ষর চিনিঞা [হরি] পড়ে অভিধান সর্বশাস্ত্র পড়ি হরি হইলা বুদ্ধিমান।
রামায়ণ পড়ি হরি পাইল বড় দুখ রতিশাস্ত্র পড়িয়া হরি পাইলা বড় সুখ।
চৌষট্টী দিবসে বিদ্যা চৌসট্টি শিখিল বিদ্যা শিখিয়া হরি গুরুর ভাগ পাল।
কাব্য অলঙ্কার পড়ে নাটক নাটিকা পুরাণ ভারথ পড়ে আখড়াই মন্ত্র টীকা।
নানা রঙ্গ কলা হরি শিখিল নৃত্যগীত বহু বিদ্যা সিখিল হরি স্ত্রী চরিত।
শৃগাল চরিত্র পড়িয়া কাক চরিত্র পড়ি অক্ষি ভারত নাগরি বিদ্যা সিখিল ভারতী।
ক্ষেত্রবিদ্যা সিখিল হরি ছত্তিস বিধান গজবিদ্যা সিখিআ হরি হইলেন সিয়ান।

দেখা যাইতেছে, কায়স্থ-সন্তানদের লেখাপড়া শেখা সেকালে আবশ্যিক ছিল। প্রাচীন হিন্দুযুগের 'করণ-কায়স্থ'[3] মুসলমান-আমলে সম্ভবতঃ জাতির নামে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু, জমিদারি-তত্ত্বাবধানের কাজ তখনও তাঁহাদের একচেটিয়া ছিল। একখানি পুঁথিতে গৌড়-দরবারের বর্ণনায় পাওয়া গিয়াছে, 'কায়স্থ কারকুন জত করে লেখা পড়া'। সেইজন্যই বোধ হয়, ছড়ার প্রায়ই পড়ুয়া কায়স্থ-সন্তানকে উদ্দেশ করা হইয়াছে[4]। পেশাগত পদবিবাচক 'কায়স্থ'[5] শব্দের একটি নিদর্শন সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। 'বণিক', 'তিলি', 'কায়স্থ', 'উগ্র', 'কাঁসারি'—এইরূপ বিভিন্ন পেশা হইতে জাতিগত পদবীও আলোচ্য গ্রন্থে পাওয়া যাইবে।

পুঁথি-পরিচয়ে সংকলিত[6] কয়েকটি গণিত-কবিতার বর্ণনা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ও বাস্তবাশ্রিত। গুরু দুর্গারাম পাঠশালার ছাত্রদের উপদেশ দিতেছেন,[7]— একমন হইয়া লেখাপড়া করিলে সকল বিদ্যা সহজে অধিগত হইবে। এবং অনিবার্যকারণে— 'লিখিবার কালে কত কিল লাথি খাবে।' প্রভাতে উঠিয়া মুখ ধুইয়া 'দুয়াত্তি পাত পুথি লয়্যা বসিবে সারি সারি।' তাহার পরে,

---

১ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়ের অপ্রকাশিত 'শুভঙ্করী' গ্রন্থ হইতে। ২ পুঁ-প ২, পৃ ৭৮
৩ বা. দে. ই, পৃ ১৮৪-৮৫ ৪ পুঁ-প ২, পৃ ১৪ ৫ চি প-স ২, চি-সং ৫১২
৬ পুঁ-প ২, ভূ. পৃ ১১-১২ ৭ ঐ, পৃ ১২-১৩

দেব-দ্বিজ-গুরুর পদে প্রণাম করিয়া 'তাহার যেমন পাঠ পড়িবে বশ্য হয়ে।' অতঃপর, অক্ষর লিখিবার নির্দেশ এই,—'ঘাড় বাকা হইলে অক্ষর হয় বাকা, ইহা জানি লেখাপড়া সতে কর শিক্ষা।'

বানান-লেখার সম্পর্কে উপদেশ দিয়াছেন গুরু গোবিন্দ :

অক্ষর পরিচয় কহিয়া দি   বানান জানিলে কঠিন কি।
যুক্ত অক্ষর লাগে ধান্দি   পর্ব অক্ষর উপরে ছান্দি।
অপর অক্ষর তাহার তলে   ছাওালে গুরু গোবিন্দ বলে॥

একালের সেমিনার-পদ্ধতির মতো সেকালেও প্রশ্নোত্তরে মৌলিক গবেষণা আগ্রাইত; তবে, উপরন্তু ছিল, পুঁথি বাজি রাখার ব্যাপার। তখন পুঁথি 'ধরিয়া' অর্থাৎ বাজি রাখিয়া প্রশ্ন করা হইত। পুঁথি ছাড়াইয়া লইতে হইত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়া। অন্যথায়, ফেল হইলে, নিজ গুরুর স্থানে[1] অথবা প্রশ্নকর্তার 'ওস্তাদের' নিকট[2] পুনরায় পাঠ লইতে হইত। সর্ববিদ্যাবিশারদ হইতে চাহিলে হিন্দী-পাঠ ('নাগরি-বিদ্যা'[3]) সেকালে অবশ্যপাঠ্য ছিল।

ব্যবহারিক ও কারিগরি শিক্ষা—পদ্মবন্ধ,[4] নৌকাবন্ধ[5] ইত্যাদি চিত্র-কবিতা রচনা করা বা করানো সেকালের দস্তর ছিল। ইহা পুরাপুরি সংস্কৃত ব্যবহার-বিধির অনুকরণ। উচ্চশ্রেণীর বনেদী পরিবারে এইরূপ কবিতা বিশিষ্ট পণ্ডিতদের দ্বারা রচনা করাইয়া শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণ করা হইত। বর্তমান গ্রন্থের 'শ্রাদ্ধ'-প্রকরণে এই প্রসঙ্গ বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। জ্যোতিষ-সংকেতে অধ্যাপকদের নিমন্ত্রণ[5] করিয়া বিবাহ বা শ্রাদ্ধ বাসরে তাঁহাদের উপস্থিতি প্রার্থনা করা হইত। শকাঙ্ক-পাতনে পোক্ত হইলে তবে নিমন্ত্রিত ভট্টাচার্য মহাশয় নিমন্ত্রণ-গ্রহণের যোগ্য—এইরূপ ইঙ্গিত অনুমান করা হইয়া থাকে।

শ্রাদ্ধ-বিবাহাদি সংস্কারোপলক্ষে কর্মক্ষেত্রে সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে 'বাদ' অর্থাৎ তর্কযুদ্ধ করানো তখনকার দিনে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। 'দিগ্বিজয় বিচার' সাংস্কৃতিক রণবিশেষ। স্বকীয়া ও পরকীয়া ধর্ম লইয়া এইরূপ একটি 'অনেক মতে বিচার' ছয় মাস ধরিয়া হইয়াছিল ১১৩৭ বঙ্গাব্দে[6]। ইহাতে পরকীয়া মতের পরিপোষক গৌড়মণ্ডলের বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা, বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সিদ্ধান্তমতে জয়ী হইয়া 'সিরোপা' পাইয়াছিলেন। জয়নগর হইতে সেওয়ায় জয়সিংহ মহারাজার দরবারে স্বকীয়া ধর্মের পরোয়ানা লইয়া

১ পুঁ-প ২, পৃ ১০৫   ২ ঐ. পৃ ১৪   ৩ ঐ, পৃ ৭৮

৪ চি-প-স ২, চি-সং ১২৮   ৫ ঐ, ঐ ১১৫, ১১৬, ১৯৩ ইত্যাদি

৬ ঐ, ঐ ১৫১। এই পত্রখানি ১৯১৪ সালে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকাশ করেন (দ্র. V. S. P ২, পৃ ১৩৩৮-৪০)। আমরা প্রতিলিপি পাইয়াছি 'রতন-লাইব্রেরী' হইতে।

পাতশাহী মন্‌সবদার সমেত আসিয়া কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য দলবলে পরাজিত (মিতাক্ষরা মতে, 'শীর্ষক') হইয়াছিলেন। 'পরকীয় ধর্ম বেদ বেদান্ত ও ভক্তি শাস্ত্র সংস্থাপন হইল··· এবং সিষ্য হইলাম'—এই মর্মে পরাজিত ভট্টাচার্য মহাশয় জয়পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন, মালিয়াটি মোকামে মহারাজ নন্দকুমারের গুরু, তৎকালীন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অন্যতম মুখপাত্র 'পদামৃতসমুদ্র'কার রাধামোহন ঠাকুরের নিকট।

এই দলিলে সাক্ষীদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোকই ছিলেন, তাহা তাঁহাদের স্বাক্ষর দেখিয়া বোঝা যায়। জয়পত্রের এই দলিলখানি নানা দিক্ দিয়া গুরুত্বপূর্ণ। বিচারান্তে বিচারক জয়ী ব্যক্তিকে জয়পত্র দান করিতেন। ইহাতে ভাষা, উত্তর, ক্রিয়া ইত্যাদির সঙ্গে বিচারকের সিদ্ধান্তও লিখিত থাকিত—ইহাই হইল ব্যবহার-শাস্ত্রের নিয়ম।[১] ইহা বর্তমান কালের Judgement-এর অনুরূপ। (প্রসঙ্গতঃ দ্রষ্টব্য Civil Procedure Code, Order XX এবং Sec. 33.)।

হোমের কুণ্ড-নির্মাণে নদীয়ার কুমারদের হাত পোক্ত ছিল[২]। খিদিরপুরে শিবঠাকুর-নির্মাণ[৩] কোন্ সূত্রধর করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ নাই। কোটার সাজ[৪] তৈরী করায় মালাকারদের খ্যাতি ছিল।

কীর্তন-গান, পুরাণ, কথকতা : কথকতা[৫] বহুল-প্রচলিত ছিল। ইহাতে ধ্রুব, প্রহ্লাদ বলি প্রভৃতির চরিত্র, শিব ঠাকুরের ও শ্রীকৃষ্ণের জীবনের নানা পৌরাণিক কাহিনী লোকে শুনিয়া চরিত্র-গঠন করিত ও ভক্তিনম্রতা শিখিত। রামায়ণের কীর্তন পাঠ[৫] হইত। মহাভারতের গান এবং নানা মঙ্গল-গান প্রচলিত তো ছিলই। পুঁথি-পরিচয়-গ্রন্থে[৬] মহাভারত-গান শোনার প্রসঙ্গে একটি বাস্তব ঘটনাশ্রিত ছড়া মুদ্রিত হইয়াছে। বিরাট-পর্ব পাঠ[৭] হইত শ্রাদ্ধবাসরে। গোবিন্দদাসের কীর্তন[৮] জনপ্রিয় ছিল খুবই।

উত্তম দিবস দেখিয়া ভাগবতাদির কথা শুরু হইত। ভাগবত-পুরাণের কথকতা অনেক স্থানে মাসাধিক কাল পর্যন্ত চলিত। এই সম্পর্কে নিমন্ত্রণ-পত্রের পাঠও যৎপরোনাস্তি বিনয়ব্যঞ্জক।[৯] —'দয়া নিধান ঘনেস্যামপুরের বাটী শুভাগমন পূর্বক উক্ত পুরাণ আদি শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ করিতে আজ্ঞা হইবেক।'—

এই বৃত্তিতে কথকঠাকুরের আয়ও হইত প্রচুর, প্যালা ইত্যাদি প্রাপ্তিতে। কথকঠাকুর কড়ার মতো না-আসিলে, বা জানাইতে না-পারিলে, চুক্তি বাতিল করিয়া জবাব হইত, ও তাঁহার স্থলে দ্বিতীয় কথক আসিতেন। একটি পত্রে এই বিষয়ে 'দেহকৃৎ ঠাকুর'কে[১০] অর্থাৎ পিতাকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন ঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্মা।

১ স্মৃ-বা, পৃ ১৬৪ ২ চি-প-স ২, চি-সং ১৭৯ ৩ ঐ, ঐ ১৮২ ৪ ঐ, ঐ ১৬৩
৫ ঐ, ঐ ১২৯, ১৩৫ ৬ পুঁ-প ১, পৃ ১৮৬ ৭ চি-প-স ২, চি-সং ১৯২
৮ ঐ, ঐ ১৯২ ৯ ঐ, ঐ ২০৩ ১০ ঐ, ঐ ১৪৩

বরাদ্দ কীর্তনের জন্য বোধ হয় জমিদারীর মহলও পাট্টা দেওয়া হইত কীর্তনীয়াকে[১]। কথক-দলের হিসাব ও পালা-প্রতি দফাওয়ারি জমা-খরচ পাওয়া যাইবে বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে[২] প্রকাশিত বিভিন্ন ফর্দে।—'পুরাণ আরব্ধ বাবুদিগ্যের বাটিতে হইআছে জানিবেন লাভাদির কিছু হয় নাই কথকথা উত্তম হইতেছে সকলের মনছিৎ হইআছে আর উত্তর উত্তর ভাল হইতেছে'—এই সংবাদ[৩] রাইপুর হইতে নীলকণ্ঠ দেবশর্মা নাম্নুরে জানাইয়াছিলেন তাঁহার মেসো—সম্ভবতঃ জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালঙ্কারকে।

পুঁথি-লেখাঃ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয়বিধ পুঁথিরই নকল[৪] চলিত সমানভাবে। পৈতৃক পুঁথি ভাগ করিয়া লওয়া হইত মূল্য[৫] খতাইয়া। ভাগবতচূর্ণককথা, অর্জুনমিশ্রের চূর্ণক, ভাগবতের দশম স্কন্ধ, অলঙ্কার পুঁথি, ব্যাকরণাদির সঙ্গে সঙ্গেই ছড়া, বন-পর্ব, লঙ্কাকাণ্ড-পুস্তক, বাঙ্গালা অঙ্গদ-রায়বার (রামায়ণের জনপ্রিয় অংশ), ফুল্লরা-খুল্লনার বারমাস্যা (চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে দরিদ্র বাঙ্গালীর রুচিকর অংশ) ইত্যাদির অনুলিপি হইত। আদর্শ জীর্ণ পুঁথি হইতে নকল চলিত। ভাগবত, বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত ও চৈতন্যচরিতামৃতাদি বৈষ্ণব পুঁথির নকলই বোধ হয় হইত বেশি। ইহা লইয়া ঝগড়াও চলিত। পুঁথি ফেরৎ দিবার কড়ার খেলাপ করিলে একরার-পত্র লিখিতে হইত। মৃতজনের পুঁথি[৬] 'উত্তম সস্তা' হইলেও লোকে কিনিতে চাহিত না। কেহ কিনিলে, ক্রেতাকে 'তজ্জন্যই তোমার ব্যারাম হইয়াছে'—এইরূপ গঞ্জনা ভোগ করিতে হইত।

বরাহভূমের মহারাজা ব্রজকিশোর সিংহ দর্পশাহাদেও ১২৮৬ সালে বহু পুঁথির নকল[৭] করাইয়াছিলেন, জেলা বাকুণ্ডার ভূতসহর (ভূতেশ্বর) গ্রামের দিননাথ ভট্টাচার্য মহাশয়কে দিয়া। মৎস্যপুরাণ, হরিবংশ জীর্ণ ইত্যাদি অষ্ট খণ্ড পুস্তকের পুষ্পমূল্য ৩৩ তঙ্কা উল্লিখিত হইয়াছে দেখা যাইবে ১২৫ সংখ্যক ফর্দে। এই বিষয়ে পুঁথির পুষ্পিকা[৮]-অংশগুলিও বিশেষ আলোকপাত করে।

পুঁথির বানান সম্পর্কে দ্বিজ দুর্গারাম তাঁহার শিশুজ্ঞানচরিত্রের পুঁথিতে লিখিয়াছেন,—'বানান সিখিলে কিছু নাই য়গোচর, অবোহেলে চালাইবে পুথির অক্ষর ॥' পাঠশালার গুরুমহাশয়ের লিপিকৃত এই পুঁথিখানির বানানের দিকে লক্ষ্য[৯] করিলেই পাঠশালে ছাত্রদের বানান-শিক্ষা কিরূপ বিশুদ্ধ হইত, তাহা সহজে অনুমিত হইবে; এবং এই ধারায় রপ্ত হইয়া পুঁথির লিপিকর পুঁথিতে ব্যবহৃত শব্দের বানান লিখিতে যেরূপ 'অবহেলায়' লেখনী চালাইয়া

১ চি-প-স ২, চি-সং ৫৩৫ ২ ঐ, ঐ, ১২৯ই, ৩ ঐ, ঐ ১৩২ ৪ পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃ ২৭-২৮

৫ চি-প-স ২, চি-সং ১২৫ ৬ ঐ, ঐ ১৪৪ ৭ ঐ, ঐ ১৩৩ ৮ পরে দ্রষ্টব্য

৯ পূর্বে (পৃ ২৩৩) এবং সা-প্র ৪, ভূ. পৃ ৪-৬ দ্রষ্টব্য।

অক্ষর বসাইয়া যাইতেন, তাহা বাঙ্গালা পুঁথির পাঠক মাত্রেই হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তবে, অপভ্রংশ 'ভাষা'র জন্মকথা বিচার করিতে চাহিলে, বাঙ্গালা-বানানের এই নৈরাজ্য-যুগের বৈজ্ঞানিক মূল্য স্বীকার না-করিয়া উপায় নাই।

পুঁথি-লেখায় তৎকালে যে কালী ব্যবহার করা হইত তাহার দুইটি ফরমূলা[১] সম্প্রতি সংগৃহীত হইয়াছে। পুঁথি-নকল-বিষয়ে মৎসংকলিত পুঁথি-পরিচয় গ্রন্থের ভূমিকায়[২] বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছি বলিয়া এখানে পুনরুক্তি করিলাম না।

এই সময়ে বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে মৌলিক গ্রন্থাদির টীকা-টিপ্পনী প্রচুর পরিমাণে লেখা হইতেছিল দেখা যায়; এবং বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে কিছু কিছু মৌলিক গ্রন্থ রচিতও হইয়াছিল। এই ধারার সমাপ্তি ঘটিয়াছিল মনে হয়, সাধকেন্দ্র রামকিশোর শিরোমণি,[৩] পুরুষোত্তম বিদ্যালঙ্কার[৪] ও জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালঙ্কার[৪] প্রভৃতির রচনায় ও পাণ্ডিত্য-কৃতিতে।

ইংরাজি-শিক্ষা: কলিকাতায় ইংরাজি ও বাঙ্গালা লেখাপড়া তো হইতই[৫]; নিভৃত গ্রামাঞ্চলে এই সময়ে ইংরাজি-শিক্ষারও প্রসার ঘটিতেছিল তাহারও অনেক প্রমাণ আছে। সাতগাছিয়াতে নূতন স্কুল-ঘর[৬] তৈয়ারী হইয়াছিল কমপক্ষে দেড় শত বৎসর আগে। সে ঘর-তৈয়ারীর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। এক শত পঞ্চাশ বৎসর আগে এক সুদূর পল্লী-গ্রামের কোনও কায়স্থ-বাড়ীর 'প্রাণাধিক'-দের 'লেখাপড়ার তদবির ভাল করিয়া' হইতেছে কিনা সংবাদ লওয়া হইয়াছিল; এবং 'লিখাপড়ায়' অন্যথা হইলে বাড়ীর অভিভাবক মহাশয় 'বড় বেজার' হইবেন বলিয়া পত্র[৭] লিখিয়াছিলেন।

'আমার ভাগিনা শ্রীযুত সিতারাম বন্দোপাধ্যায় বাবাজিকে পাঠাইবার কারন বর্দ্ধমান মোকামে অনুমতি করিয়াছিলেন এ কারন পাঠাইতেছি কিছুদিন নিকটে রাখিয়া জ্ঞানি করিয়া দিবেন'[৮]—এইরূপ ভরসাও রাখা হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়,—তবে, অবশ্য সে বিত্তবান্ উপযুক্ত লোকের উপর।

১ পুঁ-প ১, পৃ ১৯০, ঐ ২, পৃ ৩৫ ২ প্রথম খণ্ড, ভূ. পৃ ৪৭-৪১১

৩ বি-ভা পত্রিকা, ১৩৫৪ কার্ত্তিক-পৌষ, মদীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ৪ পরে দ্রষ্টব্য

৫ চি-প-স ২, চি-সং ১৫৩ ৬ ঐ, ঐ ১৫৯ ৭ ঐ, ঐ ৩২৬, ৩২৮ ৮ ঐ, ঐ ৮৫

প্রাচ্য সভ্যতার কলেবর ধর্ম। ধর্ম বলিতে রিলিজন নহে, সামাজিক কর্তব্য তন্ত্র—তাহার মধ্যে যথাযোগ্যভাবে রিলিজন পলিটিক্স সমস্তই আছে। তাহাকে আঘাত করিলে সমস্ত দেশ ব্যথিত হইয়া উঠে, কারণ সমাজেই তাহার মর্মস্থান, তাহার জীবনীশক্তির অন্য কোনো আশ্রয় নাই।

১৩০৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* * *

আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মতো বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর মতো করিতে পারে নাই, সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই।

* * *

গৃহের এবং পল্লীর ক্ষুদ্র সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া প্রত্যেককে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত করিয়া অনুভব করিবার জন্য হিন্দুধর্ম পন্থা নির্দেশ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ, সমস্ত মনুষ্য ও পশুপক্ষীর সহিত আপনার মঙ্গলসম্বন্ধ স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। ইহা যথার্থরূপে পালিত হইলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের পক্ষে ও সাধারণভাবে বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়া উঠে।

১৩১১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ধর্ম ॥

(সন ১১৬১-১২৮৭ : খৃ ১৭৫৩-১৮৭৯)

'ধর্ম'-শীর্ষকে ব্রত ও পূজার সম্পর্কে চিঠিপত্র আমাদের অধিক সংগৃহীত হইয়াছে। আলোচ্য যুগের সমাজে 'ধর্ম' বলিতে সাধারণ লোকে ব্রত ও পূজাই বুঝিতেন। ফলতঃ, তাঁহাদের লিখিত এই সমস্ত ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে ব্রত ও পূজার কথাই মিলিতেছে। এই সকল চিঠিপত্র হইতে নিষ্কাশিত তথ্য আলোচনার পূর্বে, ভূমিকা-স্বরূপে বিভিন্ন ব্রত ও পূজার বিষয়ে বঙ্গীয় স্মার্তগণের বিধান পর্যালোচনা করা আবশ্যক।

ভূমিকা : বৈদিক যুগ হইতেই ভারতে ব্রত প্রচলিত। 'ব্রত' শব্দটির অর্থব্যত্যয় সে-যুগেই[১] ঘটিয়াছিল। পরবর্তী যুগের ব্রতসমূহকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়,—ভক্তিমূলক ও প্রায়শ্চিত্তমূলক। ভক্তিমূলক ব্রতগুলির মূলে ভক্তি, এবং উদ্দেশ্য ঐহিক সুখশান্তি ও পারত্রিক মঙ্গললাভ। সাবিত্রী-চতুর্দশী, আরোগ্য-সপ্তমী ইত্যাদি ভক্তিমূলক ব্রত। দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্রতসমূহের উদ্দেশ্য পাপক্ষয়। চান্দ্রায়ণ, প্রাজাপত্যাদি ব্রত প্রায়শ্চিত্তমূলক।

বাঙ্গালাদেশের স্মৃতিনিবন্ধগুলিতে বহু ব্রতের উল্লেখ ও বিবরণ দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি ব্রত আমরা প্রসঙ্গতঃ আলোচনা করিব। এই অধ্যায়ে ভক্তিমূলক ব্রত আলোচনা করা হইবে, এবং প্রায়শ্চিত্তমূলক ব্রত 'সামাজিক ভাষ'-প্রকরণে আলোচিত হইবে।

বাঙ্গালী স্মার্তগণ যে-সমস্ত নিবন্ধে ব্রত আলোচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য— জীমূতবাহনের 'কালবিবেক', শূলপাণির 'ব্রতকালবিবেক', রঘুনন্দনের 'ব্রততত্ত্ব', 'কৃত্যতত্ত্ব' এবং গোবিন্দানন্দের 'বর্ষক্রিয়াকৌমুদী'। এইগুলির মধ্যে, মাত্র জীমূতবাহনের গ্রন্থে ব্রতাদি ধর্মানুষ্ঠানের কালাকালের বিচার আছে। শূলপাণির গ্রন্থে ব্রতের উপযুক্ত কাল বিবেচিত হইয়াছে। ব্রতসংক্রান্ত বিধি-নিষেধের আলোচনা করিয়াছেন রঘুনন্দন তাঁহার 'ব্রততত্ত্বে'। বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্যন্ত পালনীয় সমস্ত কৃত্যের আলোচনা আছে 'কৃত্যতত্ত্বে'। প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি ব্রতও আলোচিত হইয়াছে।

শূলপাণি ব্রতের একটি সংজ্ঞা নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ব্রতের মূলে থাকিবে সঙ্কল্প এবং অনুষ্ঠানটি হইবে 'দীর্ঘকালানুপালনীয়'।

পুরাণের অনুসরণে জীমূতবাহন ব্রতপালনকারীর কর্তব্য নির্ধারণ করিয়াছেন,—ক্ষমা,

১ Vedic Index, 2 p. 341

সত্যবাদিতা, দয়া, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দেবপূজা, অগ্নিহবন, সন্তোষ, অস্তেয়। শূলপাণির মতে, অনসূয়া, বিশ্রাম, অস্পৃহা, অকৃপণতা, সৎকার্য। রঘুনন্দন মৎস্য-মাংস ভক্ষণও নিষেধ করিয়াছেন। ব্রতের প্রস্তুতির জন্য পূর্বরাত্রিতে উপবাস সর্ববাদিসম্মত। পূর্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ ব্রতের উপযোগী কাল। মধ্যাহ্নকে বলা হইয়াছে পিত্র্য-কাল অর্থাৎ পিতৃকার্যের জন্য প্রশস্ত।

ব্রতানুষ্ঠানে সর্বপ্রথমে করণীয় সূর্য, সোম প্রভৃতি দেবতার আবাহন, তৎপর সঙ্কল্প। সঙ্কল্পের পরে আদিত্যাদির পূজা কর্তব্য। কেহ কেহ, 'মৎস্যপুরাণে'র বচন অনুসারে, ব্রতারম্ভে গণেশের ও নবগ্রহ-পূজার বিধান দিয়াছেন; কিন্তু শূলপাণি এই মতের সমর্থন করেন নাই। ব্রতে বিভিন্ন কৃত্য সম্বন্ধে রঘুনন্দন নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্‌ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার মতে, সমস্ত দেবতার পূর্বে সূর্য-পূজাই কর্তব্য মনে হয়। ব্রতশেষে ব্রতিগণের ব্রতকথা শ্রবণের বিধানও আছে। ব্রতকথাগুলির বেশীর ভাগই প্রাচীনতর সামাজিক ইতিবৃত্তমূলক।

ব্রত গ্রহণ করিয়া মূর্খতা বা অজ্ঞতাবশতঃ অপ্রাপ্তকালে উহা পরিত্যাগ করিলে ইহকালে চণ্ডালতুল্য ও পরকালে পশুবৎ হয়। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত মস্তকমুণ্ডন ও উপবাসত্রয়। এই প্রায়শ্চিত্তের পরে পরিত্যক্ত ব্রতের পুনরনুষ্ঠান বিধেয়। 'প্রমাদ', রোগ ও আচার্যের আদেশাদি কারণে ব্রতাচরণে অক্ষমতা প্রায়শ্চিত্তযোগ্য নহে। কিন্তু, এই সকল কারণেও ব্রত পুনঃ পুনঃ পরিত্যাগ করিলে ব্রতীকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ব্রত-পরিত্যাগজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্তের অধিকাংশ ব্যবস্থা পুরাণসমূহ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

মনু বলেন, ব্রতারম্ভের পরে ব্রতীর মৃত্যু হইলে ব্রতের উদ্দেশ্য সফলই হয়। জ্ঞাতিগণের জন্ম ও মৃত্যু-জনিত অশৌচ ধর্মকার্যের প্রতিবন্ধক; কিন্তু, ব্রতের আরম্ভ হইলে বাধার সৃষ্টি হয় না। শূলপাণি বলেন, সঙ্কল্পই ব্রতের আরম্ভ। ব্রতে উপবাস অবশ্যকরণীয় হইলেও, অশক্তপক্ষে এই সমস্ত বস্তুভক্ষণে কোনো দোষ হয় না,—জল, ফল, মূল, ঘৃত, দুগ্ধ এবং আচার্যের অনুমতিক্রমে যে-কোনো খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধ। উপবাসে অক্ষম ব্যক্তি রাত্রিতে ভোজন করিলে কোনো পাপ হয় না। ঋতুমতী বা অন্তঃসত্ত্বা এবং অন্যপ্রকারে অশুদ্ধা নারী ব্রতের জন্য প্রতিনিধি দিতে পারেন। কিন্তু, ব্রতী উপবাসাদি কায়িক কৃত্য স্বয়ং পালন করিবেন।

ব্রতদিনে বর্জনীয় কর্মাবলী:—'পতিতপাষণ্ডিনাস্তিকসম্ভাষা', অসত্যকথন, অশ্লীল-বাক্যপ্রয়োগ, অন্ত্যজের, পতিতা নারীর ও রজস্বলা নারীর দর্শন স্পর্শন ও তাহাদের সহিত কথোপকথন, গাত্রে বা মস্তকে তৈলপ্রয়োগ, তাম্বূলভক্ষণ, দন্তধাবন, গাত্রানুলেপন, দিবানিদ্রা, অক্ষক্রীড়া এবং স্ত্রী-সম্ভোগ।

মনু যজ্ঞ ও ব্রতাদিতে স্ত্রীলোকের অধিকার অস্বীকার করিয়াছেন; একমাত্র পতি-

শুশ্রূষাই তাঁহার মতে, তাঁহাদের পরম কর্ম ও চরম গতির সহায়ক। বৈদিক যুগে ধর্মাচরণে স্ত্রীলোকের যে-অধিকার দেখা যায়, তাহা পুরুষশাসিত সমাজে ক্রমশঃ খর্ব হইয়া মনুস্মৃতির যুগে একেবারেই লুপ্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশের স্মৃতিনিবন্ধোক্ত ব্রতগুলি বহুলাংশে পুরাণ-প্রভাবিত। মূলতঃ অধিকাংশ ব্রতই পুরাণের যুগে সৃষ্ট। এই ব্রতসৃষ্টির মূলে বোধ হয় ছিল তাৎকালিক সামাজিক পরিস্থিতিজনিত ব্রাহ্মণগণের আর্থিক দুর্গতি। স্বীয় আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পেই মনে হয় ব্রাহ্মণগণ অসংখ্য ব্রতের ও ব্রতে নানা দ্রব্য দানের বিধান করিয়াছিলেন[১]।

পরবর্তী স্মৃতিকারগণ কিন্তু একটি অদ্ভুত অবস্থার সম্মুখীন হন। পুরাণ-প্রভাবিত সমাজে যে-ব্রতসমূহ বদ্ধমূল হইয়াছিল, সেগুলিকে তাঁহারা স্বীকার না-করিয়া পারেন নাই। পক্ষান্তরে, প্রাচীন স্মৃতি-শাস্ত্রের বিধি-নিষেধও তাঁহাদের কাছে ছিল অলঙ্ঘনীয়। এইরূপ অবস্থায়, সম্ভবতঃ পুরাণ ও স্মৃতির মধ্যে একটা আপোস করিবার জন্যই, বঙ্গীয় নিবন্ধকার মনু-বচনের একটি অভিনব অর্থ আবিষ্কার করিয়া বলিলেন, সাধারণতঃ যজ্ঞ ও ব্রতাদিতে নারীর অধিকার না-থাকিলেও, তিনি পতির অনুমতিক্রমে ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

বাঙ্গালাদেশের স্মৃতিগ্রন্থসমূহে যে-সমস্ত ব্রতের উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে এই ব্রতগুলি প্রধান :

(ক) জীমূতবাহন ও শূলপাণির গ্রন্থে—নক্তব্রত, জন্মাষ্টমী, বুধাষ্টমী, মনসা, একাদশী, অনন্তচতুর্দশী।

(খ) শুধু জীমূতবাহনের গ্রন্থে—চাতুর্মাস্য ও মনোরথদ্বিতীয়া। (১) তৃতীয়াতে কর্তব্য—অক্ষয়তৃতীয়া, মাঘতৃতীয়া ও চৈত্রতৃতীয়া। (২) পঞ্চমীতে করণীয়— নাগপঞ্চমী। (৩) সপ্তমীতে বিহিত—বিজয়া, জয়া, জয়ন্তী, অপরাজিতা, মহাজয়া, নন্দা, ভদ্রা, মহাপুণ্যা, রথ ও অনোদন। (৪) অষ্টমীতে কর্তব্য—মহারুদ্র ও জয়ন্তী। (৫) একাদশীতে করণীয়— বিজয়া ও পাপনাশিনী। (৬) দ্বাদশীতে বিহিত—শ্রবণা, বিজয়া, তিল ও গোবিন্দ। (৭) চতুর্দশীতে করণীয়—দমনভঞ্জী, পাষাণ ও দুর্গা।

(গ) কেবল শূলপাণির গ্রন্থে—রম্ভাতৃতীয়া, আরোগ্যসপ্তমী, বিধানসপ্তমী, ললিতাসপ্তমী, দুর্বাষ্টমী, রামনবমী, পিপীতকী, দ্বাদশী, সাবিত্রী-চতুর্দশী, শিবরাত্রি ও কার্ত্তিকেয়।

(ঘ) গোবিন্দানন্দের গ্রন্থে—অক্ষয়তৃতীয়া, অঙ্গারকচতুর্থী, অনন্ত, অশূন্যশয়নদ্বিতীয়া, আরোগ্যসপ্তমী, কুক্কুটিমর্কটি, পঞ্চমী, পিপীতকী, প্রেতচতুর্দশী, বারব্রত, বিনায়কচতুর্থী, শিবরাত্রি ও সাবিত্রী।

১ S. P. R., pp. 248-59

(ঙ) 'ব্রততত্ত্বে' রঘুনন্দন বিশেষ কোনো ব্রতের আলোচনা করেন নাই; সাধারণভাবে ব্রতানুষ্ঠানের বিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। 'কৃত্যতত্ত্বে' তিনি নিম্নলিখিত ব্রতগুলির আলোচনা করিয়াছেন,— একাদশী, চাতুর্মাস্য, অনন্ত, বিধানসপ্তমী, আরোগ্য-সপ্তমী, শিবরাত্রি, রামনবমী।

বাঙ্গালাদেশে অদ্যাবধি ব্যাপকভাবে প্রচলিত কয়েকটি ব্রতের স্মৃতিনিবন্ধোক্ত বিধিনিষেধ সংক্ষেপে দেওয়া গেল। বলা বাহুল্য, আমাদের আলোচ্য সমাজে এই সব ব্রত প্রচলিত ছিল বহুলপরিমাণে।

একাদশী। প্রত্যেক পক্ষের একাদশী তিথিতে উপবাস গৃহস্থের করণীয়। পুত্রবান্ গৃহী কৃষ্ণপক্ষে এই উপবাস করিবেন না; এই নিষেধ অবশ্য শয়ন-একাদশীতে প্রযোজ্য নহে। যে-গৃহীর পুত্র বৈষ্ণব, তিনি সকল কৃষ্ণপক্ষেই উপবাস করিতে পারেন। একাদশীর উপবাস সম্বন্ধে নিষেধ বিধবার পক্ষে প্রযোজ্য নহে। অষ্টম বর্ষের ঊর্ধ্বে ও অশীতিতম বর্ষের নিম্নে যাহাদের বয়স, তাহাদের উপবাস অবশ্যকরণীয়। দশমী ও একাদশী তিথি একই দিনে হইলে, এবং তাহার পরের দিন একাদশী ও দ্বাদশী তিথি থাকিলে, পরের দিনেই, একাদশী ছাড়িয়া গেলেও, উপবাস বিধেয়। একাদশীতে নিরম্বু উপবাসই কর্তব্য। কিন্তু, অশক্তপক্ষে রাত্রিতে এই দ্রব্যগুলির মধ্যে যে-কোনো একটি ভক্ষণীয়,—হবিষ্যান্ন, ফল, তিল, দুগ্ধ, জল, ঘৃত, পঞ্চগব্য। এই তালিকাধৃত দ্রব্যগুলি ক্রমান্বয়ে প্রশস্ততর।

চাতুর্মাস্যব্রত। আষাঢ়-মাসের পূর্ণিমা, শুক্লা একাদশী, দ্বাদশী বা কর্কটসংক্রান্তিতে এই ব্রতগ্রহণ কর্তব্য। এই ব্রতকালে বর্জনীয়—গাত্রে তৈলমর্দন, স্ত্রী-সম্ভোগ, মধুমাংসাহার, স্থালীপক-আহার্যভক্ষণ, নখ-কেশ ছেদন। এই ব্রতানুষ্ঠানকারীর কর্তব্য—নিত্য গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণভোজন, কার্ত্তিক মাসে গোদান।

শিবরাত্রি। মাঘ-মাসের অন্তে বা ফাল্গুনের আদিতে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে শিবরাত্রির উপবাস করণীয়। পরের দিন পারণ কর্তব্য।

দুর্গাপূজা। বাঙ্গালাদেশের স্মৃতিনিবন্ধসমূহে যে-সমস্ত পূজার আলোচনা আছে, তাহাদের মধ্যে দুর্গা-পূজাই প্রধান এবং অদ্যাবধি ইহাই বাঙ্গালাদেশের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় পূজা। এই পূজাসংক্রান্ত যে আচার-অনুষ্ঠানের আলোচনা বঙ্গীয় নিবন্ধগ্রন্থসমূহে আছে, তাহা মোটামুটি এই,—

বাঙ্গালাদেশ ভিন্ন, ভারতের কোনো কোনো স্থানে এই পূজাকে 'নবরাত্রব্রত' বলা হইয়া থাকে। এই পূজা বসন্তকালে হইলে ইহাকে বলা হয় বাসন্তীপূজা, আর শরৎকালে হইলে বলা হয় শারদীয়া পূজা। কিন্তু, সাধারণতঃ দুর্গোৎসব বলিতে শারদীয়া পূজাকেই বুঝায়।

ব্রত ও পূজা বিষয়ক গ্রন্থগুলির[১] প্রমাণ ও প্রয়োগভেদে দুইটি শ্রেণী। কোনো কোনো গ্রন্থে দুইটি বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। প্রমাণাংশে একটি বিষয় সম্বন্ধে নানা প্রামাণ্য রচনাদি উদ্ধৃত এবং লেখকের নিজস্ব সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হয়। প্রয়োগাংশে অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি বিষয় আলোচিত হয়। বর্তমান প্রসঙ্গে প্রমাণাংশেরই প্রধান প্রধান বিষয়গুলি আলোচনা করা আবশ্যক। বাসন্তীপূজার ব্যাপক প্রচলন অধুনা নাই; সেকালেও আমরা পাই নাই।

দুর্গাপূজাবিষয়ক প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে এইগুলি প্রধান,— (১) জীমূতবাহনের 'কালবিবেক', (২) শূলপাণির 'দুর্গোৎসববিবেক', (৩) শ্রীনাথ আচার্যচূড়ামণির 'দুর্গোৎসববিবেক', (৪) রঘুনন্দনের 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব', (৫) 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব'[২] এবং (৬) 'কৃত্যতত্ত্ব'।

'কালবিবেক' গ্রন্থে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপযোগী কালের আলোচনা প্রসঙ্গে দুর্গোৎসবও আলোচিত হইয়াছে।

'দুর্গাপূজাতত্ত্ব' গ্রন্থটির দুইটি ভাগ—(১) দুর্গাপূজা-প্রমাণতত্ত্ব ও (২) দুর্গাপূজা-প্রয়োগতত্ত্ব। দ্বিতীয় ভাগটি 'স্মৃতিতত্ত্বের' (২য় খণ্ড) অন্তর্ভুক্ত 'দুর্গার্চনপদ্ধতি'র সহিত অভিন্ন।

রঘুনন্দনের 'কৃত্যতত্ত্বে' দুর্গাপূজা সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই বলা হইয়াছে। দুর্গাপূজা নিত্যা অথবা কাম্যা কিনা, এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন লেখকের সিদ্ধান্ত প্রায় একরূপ। এই পূজা নিত্যা; কারণ, ইহা না-করিলে প্রত্যবায়ের উল্লেখ আছে। 'কালিকাপুরাণে' বলা হইয়াছে যে, দুর্গাপূজাদ্বারা নানা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। শূলপাণি ও রঘুনন্দন বলিয়াছেন, 'প্রসঙ্গ' দ্বারা নিত্যপূজা কাম্যপূজারই অন্তর্গত।

পূজার স্থান। শূলপাণির মতে, দুর্গাপূজার অযোগ্য স্থান—১। স্ব-গৃহ—ইহার অর্থ, বোধ হয়, নিজের বাসের ঘর, বাড়ী নহে; কারণ, দুর্গাপূজা নিজের বাড়ীতেই হইয়া থাকে। ২। জীর্ণ স্থান। ৩। ইষ্টকারচিত স্থান—শূলপাণির মতে, এইরূপ স্থানে মৃত্তিকাবেদীর উপরে পূজা হইতে পারে। ৪। দীপ-স্থিতিবিবর্জিত স্থান—বর্তমান কালেও পূজামণ্ডপে সর্বদাই একটি প্রজ্বলিত দীপ রাখা হয়।

দুর্গামূর্তির রূপ ও উপকরণ। শূলপাণির মতে, দুর্গার মূর্তি হইবে দশভুজা ও সিংহোপরি স্থাপিতা। মৃত্তিকা ছাড়া, অন্য উপকরণেও যে মূর্তি নির্মিত হইত, তাহা শূলপাণির নিম্নোদ্ধৃত উক্তি দুইটি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়,—

দর্পণ ইতি মৃন্ময়প্রতিমাপক্ষে।

দেবানাং প্রতিমা যত্র গৃহীতাভ্যঙ্গকমা।

১ স্মৃ-বা, পৃ ১০১ ২ এই গ্রন্থখানি 'তিথিতত্ত্বের' দুর্গোৎসব-অংশ হইতে পারে (দ্র. ঐ, পৃ ১০৩)।

অর্থাৎ প্রতিমা মৃন্ময়ী হইলে দেবীর স্নান দর্পণে করাইতে হইবে, আর মূর্তি স্নানযোগ্য হইলে, ঐ মূর্তিতেই স্নান হইবে।

শারদীয়া পূজা। শরৎকালে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া এই পূজার নামান্তর শারদীয়া পূজা। বসন্তকালই এই পূজার প্রশস্ত সময়, শরৎকাল নহে; কারণ, শরৎকাল পড়ে দক্ষিণায়নে। শাস্ত্রকারগণ বলেন, দক্ষিণায়নে দেব-দেবীগণ সুপ্ত থাকেন। এইজন্য শারদীয়া পূজাতে দেবীর বোধন, বা তাঁহাকে জাগরিত করিবার বিধান দেওয়া হইয়াছে। শরৎকালে দেবীকে জাগরিতা করা হয় বলিয়া তাঁহার এক নাম 'শারদা'। শূলপাণির মতে, 'সারদা' শব্দটি কাল্পনিকভাবে ব্যুৎপন্ন। কিংবদন্তী এই, দাশরথি রাম শত্রুনিধনের উদ্দেশ্যে দেবীর এই অকাল-পূজার প্রবর্তন করেন। কিন্তু, মূল-রামায়ণে ইহার কোনো ভিত্তি নাই; বাঙ্গালার স্মৃতিনিবন্ধসমূহেও ইহার সমর্থন দেখা যায় না।

দুর্গাপূজার সুফল। দুর্গাপূজার অনেক সুফলের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে প্রধান,—পূজাস্থানে দুর্ভিক্ষ ও অন্য প্রকার দুঃখ-দুর্দশার অভাব, অকালমৃত্যু-লোপ, দারপুত্র ও ধনসম্পত্তি বিষয়ে সুখ, ইহলোকে বহুসুখভোগ ও পরলোকে দুর্গালোকে বাস, সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফললাভ।

দুর্গাপূজার প্রকারভেদ। সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসীভেদে দুর্গাপূজা ত্রিবিধা। সাত্ত্বিকী পূজাতে থাকিবে জপ, যজ্ঞ এবং নিরামিষ পূজোপকরণ। রাজসী পূজাতে পশুবলি হইবে এবং পূজোপকরণ হইবে আমিষ। তামসী পূজার ব্যবস্থা কিরাতগণের জন্য। এইরূপ পূজায় জপ, যজ্ঞ বা মন্ত্র নাই; এবং পূজোপকরণ মদ্য, মাংসাদি।

'কালিকাপুরাণের' প্রমাণানুসারে শূলপাণি একটি সংক্ষিপ্ত-পূজার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহাতে মাত্র পাঁচটি দ্রব্যের দ্বারা পূজা করা যায়,— পুষ্প, চন্দন, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য। প্রতিকূল আর্থিক অবস্থাদিহেতু বহু দ্রব্যাদি সহযোগে পূজা করিতে অক্ষম হইলে, কেবল ফুল, জল অথবা কেবলমাত্র জলের দ্বারাই পূজার বিধান।

দুর্গাপূজার অধিকারী। চতুর্বর্ণেরই এই পূজায় অধিকার আছে। কিন্তু, বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই, সাধারণতঃ হিন্দুর পূজা-পার্বণে বর্ণাশ্রমবহির্ভূত ম্লেচ্ছগণের অধিকার না-থাকিলেও, দুর্গাপূজায় তাহাদিগকে বিশেষ অধিকার দেওয়া হইয়াছে। অশক্তপক্ষে, প্রতিনিধির সাহায্যে দুর্গাপূজা করাইবার বিধান শাস্ত্রসম্মত।

দুর্গাপূজাসংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান। এই পূজা-প্রসঙ্গে বহু আচার-অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে স্নপন, পূজন, বলিদান ও হোম—এই কৃত্যচতুষ্টয় প্রধান বলিয়া স্বীকৃত।

জ্ঞাতিগণের জন্ম অথবা মৃত্যুজনিত অশৌচ সাধারণতঃ ধর্মকার্যের প্রতিবন্ধক; কিন্তু দুর্গাপূজা একবার আরব্ধ হইলে, উহাতে কোনো বাধা হয় না। ব্রতের ন্যায় এই পূজারও

আরম্ভ হয় সঙ্কল্প-গ্রহণে। বহু দ্রব্যের দ্বারা দেবীর স্নান বিধেয়। প্রধান দ্রব্যগুলি এই,—দধি, মধু, তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ, পঞ্চগব্য, পঞ্চকষায়, ওষধি, ভৃঙ্গার, কলস, পুষ্প, পঞ্চরত্ন, চন্দনাদি সুগন্ধিদ্রব্য, উষ্ণজল এবং পঞ্চামৃত। অষ্টমী-পূজার দিনে নানা অলঙ্কারের দ্বারা কুমারী-পূজার ব্যবস্থা আছে। অষ্টমীর শেষ দণ্ড ও নবমীর প্রথম দণ্ডের মধ্যে সন্ধিপূজা কর্তব্য।

পশুপক্ষিবলি দুর্গাপূজার একটি প্রধান অঙ্গ। অষ্টমী-তিথিতে পশুবলির বিশেষ বিধান রহিয়াছে। 'দেবীপুরাণে' অষ্টমী-তিথিতে পশুবলির যে-নিষেধ আছে, বঙ্গীয় স্মার্তগণের মতে, তাহার তাৎপর্য এই যে, সন্ধিপূজার অষ্টমী-অংশে বলিদান নিষিদ্ধ। বলিদানের পরে, পশুর 'শীর্ষ' ও 'রুধির' দেবীকে দানের বিধান আছে। মহিষ-বলি হইলে মহিষের সমাংস রুধির দেবীকে দান করিতে শূলপাণি নিষেধ করিয়াছেন; তিনি কেবল রুধির-দানের ব্যবস্থা দিয়াছেন। দেবীর নিকট বলিদানের উদ্দেশ্যে এই পশু ও পক্ষী নিষিদ্ধ,—তিন মাসের ন্যূনবয়স্ক, তিন পক্ষের ন্যূনবয়স্ক পক্ষী, যে-সমস্ত পশুর লাঙ্গুল, কর্ণ ও শৃঙ্গাদি ভগ্ন, স্ত্রী-পশু, 'নানাবর্ণ' পশু, অতিবৃদ্ধ, রোগার্ত বা পূযস্রাবী ক্ষতযুক্ত পশু।

ছাগ, মেষ ও মহিষ বলির জন্য প্রশস্তরূপে নির্দিষ্ট। কোনো কোনো প্রকার হরিণ, শূকর, খড়্গী অর্থাৎ গণ্ডার, গোধিকা বা গোসাপ, হরি, ব্যাঘ্র, কচ্ছপ, মানুষ প্রভৃতিও বলিদানের জন্য বিহিত হইয়াছে। কুষ্মাণ্ড এবং ইক্ষুবলি ছাগবলির ন্যায় দেবীর প্রীতিকর।

নানা শাস্ত্রকারের, বিশেষতঃ মনুর প্রমাণ-অনুসারে বঙ্গীয় স্মার্তগণ প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, পশুবলি সাধারণতঃ গর্হিত; কিন্তু, দুর্গাপূজাদি উপলক্ষে ইহা পাপজনক নহে।

দশমীকৃত্য: শবরোৎসব। দশমী-তিথিতে 'শবরোৎসব' নামে একটি অনুষ্ঠানের বিধি বঙ্গদেশীয় স্মৃতিনিবন্ধসমূহে রহিয়াছে। ইহাতে 'ভগলিঙ্গাভিধান' দ্বারা একে অপরকে কটুকাটব্য করিবে; যে এইরূপে অপরকে 'ডোম-চাঁড়ালী' করে না, বা যাহাকে অপরে 'চোয়াড়ী-চণ্ডালী' করে না, তাহারা উভয়েই দেবীর বিরাগভাজন হইয়া থাকে। 'শবরোৎসব' শব্দটির তাৎপর্য বুঝাইতে গিয়া জীমূতবাহন বলিয়াছেন[১] যে, ইহাতে শবরের ন্যায় সমস্ত শরীর পত্রাদি দ্বারা আবৃত ও কর্দমাক্ত করিয়া নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি করিতে হয়, সেইজন্য এই উৎসবের এই নাম।

দেবীর বিসর্জনের পরে, স্থানবিশেষে খঞ্জন-পক্ষীর দর্শন অতীব শুভজনক বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

শত্রুবলি। বর্তমানে বাঙ্গালাদেশের দুর্গাপূজায় শত্রুবলির ব্যবস্থা দেখা যায়। সাধারণতঃ মানকচুর পত্রাবৃত একটি পুত্তলিকাকে বলি দেওয়া হয়। সাধারণ্যে প্রচলিত বিশ্বাস, ইহার

১ কালবিবেক, পৃ ৫১৪

ফলে, একবৎসর কালের জন্ত নিঃশঙ্ক থাকা যায়। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয়, 'কালিকাপুরাণ', 'দেবীপুরাণ', 'মহাভাগবত', 'সংবৎসরপ্রদীপ' ইত্যাদি গ্রন্থে এই প্রথার উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও, পূর্বোক্ত বঙ্গীয় নিবন্ধগুলিতে ইহার কোনো উল্লেখই নাই। মাত্র বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য নামক জনৈক অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির রচিত 'দুর্গাপূজাপদ্ধতি'-নামক নিবন্ধে এই প্রথার উল্লেখ হইতে মনে হয়, এদেশে ইহার প্রচলন কখনও বন্ধ হয় নাই।

দুর্গোৎসবে অনার্য-প্রভাব। অন্যান্য পূজায় ম্লেচ্ছদের অধিকার না-থাকিলেও, দুর্গোৎসবে তাহাদের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। শবরোৎসব দুর্গোৎসবের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ব্যাঘ্র, গণ্ডার প্রভৃতি হিংস্র ও বন্য পশুর বলিদানের বিধান এই পূজায় রহিয়াছে। এই সমস্ত লক্ষ্য করিলে দুর্গোৎসবে অনার্যপ্রভাব সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। অনার্য-অধ্যুষিত বঙ্গদেশের আর্যীকরণের পরে, অনার্যগণের পূজা-পদ্ধতি ও রীতি-নীতি আর্যসমাজে অংশতঃ গৃহীত হওয়া স্বাভাবিক। কেবল বাঙ্গালাদেশে নয়, সমগ্র উত্তরভারতে এককালে অনার্যগণের বাসস্থান ছিল। এই পূজার কতক অনুষ্ঠান তাঁহাদের নিকট হইতেই আর্যগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহার বিশিষ্ট একটি প্রমাণ, 'হরিবংশে' শবর, বর্বর ও পুলিন্দ প্রভৃতি আদিম অধিবাসিগণ কর্তৃক বিন্ধ্যপর্বতে কাত্যায়নী ও কৌশিকীর পূজার উল্লেখ আছে; কাত্যায়নী ও কৌশিকী দুর্গারই নামান্তর।[১]

সংগৃহীত তথ্যালোচনা: অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ পাদ পর্যন্ত সময়ের শাস্ত্রীয় ও লৌকিক এই দুই প্রকারের ব্রত ও পূজাচরণের চিঠি-পত্রই[২] পাওয়া গিয়াছে। আলোচ্য সময়ে দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা, শিবপূজা, ব্রহ্মার পূজা, দোলযাত্রা, রাসযাত্রাদি—এই সমস্ত শাস্ত্রীয় পূজাপদ্ধতি বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। এতৎ-সম্পর্কে প্রাপ্ত চিঠি-পত্রে প্রতিমার সাজসজ্জা, খরচ-পত্র, পূজায় মতদ্বৈধ ইত্যাদির খুঁটিনাটি বিচিত্র খবর অনেক মিলিবে। লৌকিক পূজা-পদ্ধতির মধ্যে সুরথেশ্বর-পূজা, কোপা-পূজা ও ধর্মঠাকুরের পূজার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। চৈত্র-গাজনের নিমন্ত্রণ-পত্রও আছে। সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পূজাও প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয়। দুর্গাপূজায় আমন্ত্রণ আনিত ভাটে; কীর্তন হইত বৈষ্ণব পদাবলী। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় চন্দন লইয়া যাইত নাপিতে।

ধর্মার্থে কৃত হইলেও, সাধারণের অর্থাৎ সমাজের উপকারক এইরূপ কৃত্যের মধ্যে—পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা, নবরত্ন-প্রতিষ্ঠা, মঠ-প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠাদি ধরা যাইতে পারে।

পাঠাদির মধ্যে পুরাণ-পাঠ, বিরাট-পাঠ, ভাগবতের কথকতা এবং গোবিন্দদাসের পদাবলী-কীর্তন প্রচলিত ছিল। ইহা শ্রবণ করিলে ইহলোকে শিক্ষা ও পরলোকে মোক্ষ লাভ হইবে বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত।

হিন্দুর বিশ্বাস, অদৃষ্ট ও পুরুষকার লইয়া মানব। অদৃষ্ট বা কর্মফলজনিত গ্রহাদি বিরুদ্ধ

---

১ স্ব-বা (পৃ ৯৪-১০৯) হইতে স্থূলতঃ সংকলিত ২ পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃ ২৮-৩০

হইয়া অমঙ্গল সংঘটনে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার মঙ্গলজন্য শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করা আবশ্যক।—এই উদ্যোগ ও কর্মকেই সেকালে পুরুষকার বলা হইত। যে ধর্মকার্যের অনুষ্ঠানে বিরুদ্ধ-গ্রহদোষ নিবারণ ও ভূতাদির উপদ্রব প্রশমন এবং রোগাদি ত্রিবিধ অনিষ্ট নিবারিত হয়, তাহার নাম শান্তি[1] এবং ভাবিমঙ্গলকামনায় যে ধর্মকার্য করা যায়, তাহার নাম স্বস্ত্যয়ন[1]।

বাঙ্গালাদেশে ব্রত ও শান্তি-স্বস্ত্যয়নের অসংখ্য রকমের বৈচিত্র্য আছে। বিগত শতাব্দীর জের বহুলাংশে সংকলিত হইয়াছে 'পুরোহিত-দর্পণ'-গ্রন্থে[2]। আমরা চিঠি-পত্রে পাইয়াছি,—ব্রতের মধ্যে বিষুব-সংক্রান্তি, বুধাষ্টমী আর অষ্টমী; শান্তি-স্বস্ত্যয়নের মধ্যে নবগ্রহ-হোম, পুষ্করা-শান্তি, দুর্গা-নাম ও মধুসূদন নামজপ, নানাপ্রকার স্তবাদি, পুটীত-চণ্ডীপাঠ, হোম, হাজার তুলসী-অর্পণ, বাস্তু-যাগ, গ্রহযজ্ঞ, শ্বেতহরিণ লইয়া যাজ্য, দৈবকর্ম, শান্তি-যাগ, পুরশ্চরণ এবং ব্রাহ্মণভোজন ('শ্রীশ্রীভোজন')।

মন্ত্রসিদ্ধির জন্য জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণভোজন,— এই পঞ্চাঙ্গ কর্মকে পুরশ্চরণ বলে[3]। হিন্দুর বিশ্বাস, পুরশ্চরণহীন মন্ত্র সিদ্ধি-প্রদানে অক্ষম। শাস্ত্রজ্ঞ গুরুর দ্বারা পুরশ্চরণ করাইতে হয়।

বিশেষ বিশেষ কামনা করিয়া ব্রতের আচরণ করা হইয়া থাকে। রোগনিরাময়, গ্রহবৈগুণ্য-নিবারণ ইত্যাদির জন্য করা হয় শান্তি-স্বস্ত্যয়ন। নিত্য ও কাম্যভেদে স্বস্ত্যয়ন দ্বিবিধ। আলোচ্য গ্রন্থ হইতে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের কয়েকটি নিদর্শন দেওয়া গেল।

বাঁকুড়ার পাতকুমে সম্ভবতঃ বারগীর হাঙ্গামার সময়[4] নিরাপত্তার নিমিত্ত পিশাচী কালামুখীর[5] প্রকরণ- মতে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করা হইয়াছিল। তাহাতে সমাচার-দ্রব্য সোনামুগ ৩ সের, এবং শঙ্খ, বস্ত্র, ঘৃত ১ সের, ধুপ-দীপ, আতব আর চাউল ইত্যাদি লাগিয়াছিল। অবশ্য, ফল অজ্ঞাত।

এক 'সেত হরিণ' পাইলেই শীঘ্র 'কর্ম' নিষ্পত্তি হইতে পারে,[6] সেইজন্য অনেক 'তল্যাষ' করা হইয়াছিল বর্ধমান ও সাতগেছে অঞ্চলে।—এই 'কর্ম' বোধ হয় কোনো অভিচার-ক্রিয়া।

ব্যবসায়ী গঙ্গাধর দাস দে-এর একদা 'ব্যাপার আদি কর্ম বড় অপ্রতুল' হইয়াছিল, সেইজন্য '৺রাধামদনগোপাল জিউর শ্রীচরনে এক হাজার তুলসি অর্পন' করিতে[7] তিনি নিবেদন করিয়াছিলেন তাঁহার গুরুদেবকে। নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার রাশি-নাম, গোত্র এবং আতব চাউল, সন্দেশ, রম্ভার দাম ॥০ অষ্ট আনা পাঠানো হইয়াছিল। তবে, 'জিবৎ মির্ত্তু' দে-মহাশয়ের পত্রেই প্রকাশ, গুরুকে তিনি দক্ষিণান্ত করিবেন 'পরে'—অর্থাৎ তাঁহার 'ব্যাবসা বানুষ্য ভালোরূপ' চলিলে।

১ পু-দ, পৃ ১২৫ ২ ১৩১১ বঙ্গাব্দে প্রথম সংকলিত ৩ পু-দ, পৃ ৫৪৫
৪ চি-প স ২, চি-সং ২১৮ ৫ সুপরিচিতা বৌদ্ধ দেবী ৬ চি-প স ২, চি-সং ২১১ ৭ ঐ, ঐ ১৮০

কাশীগতি দাস মিত্র আর ব্রজনাথ শর্মার যুক্ত চিঠিখানিও[1] খুব হিসাবী বুদ্ধির। 'সাক্ষাৎ শিবাবতার' তারাশঙ্কর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য মহাশয়কে তাঁহারা লিখিতেছেন,—'অগ্রে সর্ব্বোপদ্রব নাশ হয় ইহার নিমিত্তে কিঞ্চিত পুটিত চণ্ডী পাঠ—দ্বিতীয় মোক্ষ হয় ইহার নিমিত্তে পুটিত চণ্ডী পাঠ—তৃতীয় আমার ইষ্টদেবতার মন্ত্র সিদ্ধি হয় ইহার নিমিত্তে পুটিত চণ্ডী পাঠ—চতুর্থ বিষয়াদির মঙ্গল হয় ইহার নিমিত্তে পুটিত চণ্ডী পাঠ—পঞ্চম শরীরে রোগ শান্তি হয় ইহার নিমিত্তে পুটিত চণ্ডী পাঠ করিবেন'।

'দৈব কর্ম্মের অঙ্গভাঙ্গ [হইলে তাহার] ফল গত তারতম্য হয়' এবং আরও সব গুরুগম্ভীর উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে এক সন্দিগ্ধ শিষ্যকে যখন কর্মবিশেষে 'কালব্যাজে' ফল না-পাইয়া তিনি তাঁহার গুরুদেবকে পূজোপকরণ ও খরচপত্র পাঠাইতে বিলম্ব করিতেছিলেন[2]।

ধর্ম-সংস্কারের মধ্যে বৈদিক উপনয়ন ('জজ্ঞপবিত্র') ও তান্ত্রিক দীক্ষা সম্পর্কে সংবাদ আছে। 'দিক্ষার জায়' নামে গুরুমন্ত্র-গ্রহণের টোকৃচাগুলি[3] খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।—(১) 'সাং চাঁদা—কমলাকান্ত রায়স্য স্ত্রী— ব্রহ্মময়ী দাসী— হ্রীঁ দূঁ। ইষ্টং দুর্গা, (২) সাং জোতশ্রীরাম— তিনকড়ি মিত্র স্ত্রী—। ক্লীঁ কৃষ্ণায় নমঃ, (৩) সাং ঘরগোহালি—৺রাম-নারায়ণ ঘোষ। হূঁ দূ ফট, (৪) সাং খানকুল— গঙ্গানারায়ণ ঘোষস্য স্ত্রী—। ক্রী।, (৫) সাং রামনগর— হলধর বসোর্বিমাতা— ক্লীঁ দূ॥ তস্য খুড়ি অন্নপূর্ণা— তস্য স্ত্রী, (৬) সাং তোড়কোনা— গোপীনাথ ঘোষস্য স্ত্রী— গোপাল ঘোষস্য স্ত্রী'— ইত্যাদি।—

দীক্ষার জায়-এ দেখা যাইবে, গুরুঠাকুরের নিকট স্ত্রীলোক, বিশেষ করিয়া বিধবাগণই দীক্ষিত হইতেছেন অধিকসংখ্যায়।

অন্য একখানি পত্রে ভৈরবচন্দ্র দাশ রাহা[4] তাঁহার 'শ্রীমতি বড় ভাজু টাকুরানি এবং শ্রীমতি ছোট বহু ইহারা দুই জন ৺রামনবমীর মধ্যে মন্ত্র গ্রহন করিবেন' বলিয়া গুরুদেবকে জামালপুরের বাটীতে আসিয়া 'ক্রিতাত্ত' করিতে অনুরোধ-পত্র দিতেছেন।

আর একটি পত্রে[5] পত্রে ভেক লইয়া বৈষ্ণব হওয়ার একটি সংবাদ পাওয়া যাইবে। ১২৪৯ সালে করুণা বেওা ও রামজয় সূত্রধর ইলামবাজার মোকামে থাকিয়া ভেক লইয়া বৈষ্ণব হইয়াছিল। সেই কারণ, তাহাদের পূর্বেকার মন্ত্রগুরু মথুরানাথ ঠাকুর তাহাদিগকে তলব করিয়া তাঁহার গুরু-যাজন বাবদ বার্ষিক আয় যথাপূর্ব আদায় দিবার জন্য একরার-পত্র লিখাইয়া লইয়াছিলেন। করুণা বেওা হিন্দু বিধবা। বিধবা নোটনা বেওা এই পত্রের মূল সাক্ষী, অনুমান হয় তাহার মা।

ভিক্ষাদান, পোষ্যপুত্র-গ্রহণ, জমিদারী-পুণ্যাহ, দেবোত্তর জমিদান, শুভগৃহারম্ভ এই

১ চি-প-স ২, চি-সং ১৭৬ ২ ঐ, ঐ ২১৫ ৩ ঐ, ঐ ২০৫, ২০৯ ৪ ঐ, ঐ ২৯৪ ৫ ঐ, ঐ ১৮৯

সবের[১] শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকাণ্ডমূলক চলিত ধারা ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। জমিদারি-উচ্ছেদ-আইন প্রবর্তিত (১৯৫৩) হইবার পরে, পুণ্যাহে দধি মৎস্য খাদ্য প্রণামী এখন আর যায় না। অনেক চেষ্টা করিয়া তবে ভিক্ষা-মাতা বা ভিক্ষা-পিতা জোটে। ১২০০ সালের শুভ-গৃহারম্ভের ফর্দটির[২] ধর্মীয় মূল্যের চেয়ে অর্থনৈতিক মূল্যই বেশী।

দেবোত্তর জমির খতিয়ানটি[৩] খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১২২২ সালে সিদ্ধিপুরের রামচন্দ্রবাবু পিরোত্তরের দফায় মানিকপীর, মানিক সাহেব, বনবিবি, মাদার সাহেব ও বড়পীরকে এবং দেবোত্তরের দফায় কার্তিক ঠাকুর, লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ ও তারকনাথ ঠাকুরকে জমিদান করিয়াছিলেন। হিসাবে দেখা যায়, এই হিন্দু জমিদার মহাশয়ের দেবোত্তর অপেক্ষা পীরোত্তর ভূমি-দানের পরিমাণই অধিক।

একখানি[৪] ফর্দ হইল অর্ধেক-শরিক কৃষ্ণমোহন ঠাকুরের সম্ভবতঃ মূলুক গ্রামের রামকানাই প্রভুজির মন্দিরের ১২৭৭ সালের জমা-খরচ। সোনামুখী ও 'পাহার'[৫]-পলাশডাঙ্গার মুখোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা 'একজোগে সকলে' কলিকাতায় দুর্গাপূজা করাইতে যাইতেন[৬]। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জায়[৭] নামক স্মারকপত্রগুলিতে উল্লিখিত ব্রাহ্মণগণের ও তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সমস্ত তথ্য জানিতে পারিলে তখনকার দিনের হিন্দু-সমাজপতিদের বিষয়ে বহুলাংশে আলোকপাত করা যাইতে পারিবে।

ধর্মের দফায় জমা-খরচের হিসাব-পত্রগুলিকে দফাওয়ারি ও কালানুক্রমিক সাজাইলে এইরূপ দাঁড়ায়, এবং এইগুলির সমাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মূল্য অনেক।

১. শিষ্যবাড়ীর আদায় প্রণামী খাজানা ও বৃদ্ধি বাবদ (জঙ্গলমহল, কলিকাতা ও অন্যত্র):—১১৫৩ (২৯৩) ব্রহ্মোত্তর ভূমির ধান্য; ১১৫৬ (৫১৪) কলিকাতা প্রবাসের লভ্যি জমা; ১১৬২ (৩৭৫), ১১৬৬ (৩৭৬), ১১৭৪ (৩৭৪) পৈতৃক ঠাকুর-সেবা, সেবক ও বৃত্তির জন্য বিরোধ; ১১৯১ (৪৮২) উৎপন্ন জমা শিষ্যবাড়ী হইতে; ১২১৮ (৪১) প্রণামী আদায়; ১২৩২ (৪৮৭) শিষ্য-বাটির আদায়; ১২৬৪ (৩১৭) একজায় জঙ্গল মহালের শিষ্য; ১২৮২ (৭২) শ্রীশ্রীরামকানাই-এর বার্ষিক আদায় জমা; তারিখহীন (৬২৩) শিষ্য-বেড়ানো আদায়।

২. যাজনের দ্রব্য খরচ ১১৫৭ (৫২২)

৩. স্বস্ত্যয়ন ১১৬১ (১৭৫), ১১৯৩ (৫০০), ১১৯৩ (৫০২), তারিখহীন (১৮৫)

৪. নাম-জপ ১১৬০ (৫৯১), ১২০৩ (১৭২), (১৯৫)

---

১ পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃ ২৮-৩০ ২ চি-প-স ২, চি-সং ১৯০ ৩ ঐ, ঐ ২০৭ ৪ ঐ, ঐ ২০১

৫ পথর্ণা-পলাশডাঙ্গার এই 'পাহাড়'টি সম্ভবতঃ সিংহবর্মা ও চন্দ্রবর্মার প্রাচীন রাজধানী 'পুকরণে'র ধ্বংসাবশেষ (দ্র. বা-দে-ই, পৃ ২০) ৬ চি-প-স ২, চি-সং ২০০ ৭ ঐ, ঐ ১৯৪, ৫৮৮

৫. সভাপণ্ডিতির পাওনা ১২১০ (৬১৮)
৬. শ্রীশ্রীভোজন ১২৩৫ (৪৮৩)
৭. শিবপ্রতিষ্ঠা ১১৫৪ (৫৪৪)
৮. মঠপ্রতিষ্ঠা ১২২৬ (১৮১)
৯. কোপাপূজা ১২৮১ (৩২০)
১০. ধর্মঠাকুরপূজা ১২৭৬ (১৭৮) ; ঐ 'কুটুম্বিতার বিবরণ' (৫৫০)
১১. মন্দিরের আয়-ব্যয় ১২৭৭ (২০১)
১২. দুর্গাপূজা ১১৬০ (৫২৮) ; ১১৬০ (৫৮৯) ; ১১৬০ (৫৯০) ; ১১৬৩ (১৬৪)
১৩. নৌযোগে কাশীগমন ১২৪৪ (৪৮০)
১৪. পুষ্করিণী খাদ ও প্রতিষ্ঠা-বিষয়ক ১২০৩ (১৯৬), (১৯৭) ; ১২০৪ (১৯৮) ; ১২১৬ (১৯৯) ; ১২২৭ (২১০) ; তারিখহীন (১৬৫), (১৭১), (১৮৪)
১৫. গৃহারম্ভ ও প্রবেশ-বিষয়ক ১১৬০ (৪৯৭), ১২০০ (১৯০) ; ১২৭৮ (২০৪)

বিবিধ—(১৬৩) প্রতিমার জন্য 'কোটার সাজ' খরচ ১০ টাকা, মহিষ এক ৯ টাকা, পুরাতন বাতি আর বাতাবী নেবু ইত্যাদি খরচ ; (১৬৫) পূজার নিমিত্তে 'পকান্ন' করিতে হইবেক ; (১৭০) শিব স্থাপন হইবেক অন্য দিবসে গ্রহণ দেখিতে নাই একারণ দিবসে হইবেক ; (১৭৩) ব্রতকথা ও ভোগ আদি দিতে হইবেক ; (১৭৪) পুষ্করিণী খনন লইয়া গোলযোগ ; (১৭৭) শ্যামাপূজায় মতদ্বৈধ ; (১৭৮) ধর্মঠাকুরের পূজোপচার 'মদ' ইত্যাদি ; (১৮২) বাচক না আসাতে শিবঠাকুর নির্মাণ 'মহকুপ' হইয়াছে ; (৫২৯) পূজার নিমন্ত্রণ-পত্র আনিত 'ভট্ট' বা ভাট ; (৫৪১) ১২৭৫ সালে মহাপূজায় নগদ ১০০ টাকা খরচ ; (৫৪২) খরচের অনাটন—দুর্গাপ্রতিমা নির্মাণকারণ 'মিস্ত্রি' নিযুক্ত হইবেক ; (৬১৯) ১১৬৫ সালে 'অথ সেবক ভায়' ; (১৪৪) ১২৭২ সালে প্রতিমায় মৃত্তিকা প্রদান, ধর্মরাজের 'ওষধি' সেবন করায় 'উত্তম আরাম' ; (৩৪৫) গয়াতীর্থে পিতৃকার্য করিয়া পাণ্ডা কৃষ্ণরাম সেন কয়াল ঠাকুরেক দক্ষিণা দান সমেত ২০ কুড়ী টাকার খত লিখিয়া দিয়াছিলেন খুজটীপাড়ার গৌরমণি দেবী ১২০৭ সালে ; (২০৮) রাত্রে চৈইত্রী গাজন শ্রবণ।

সার্বভৌম মোগল-শাসনের ফলে, এবং কোম্পানী-আমলে প্রাদেশিক রাজ্য-সীমার বাধা লুপ্ত হওয়ায়, স্থলপথে ও জলপথে গয়া, কাশী, প্রয়াগ, আগরা, মথুরা, বৃন্দাবনাদি 'পশ্চিমে', এবং পুরী ও সেতুবন্ধাদি 'দক্ষিণে' গমন অনেক নিরাপদ হইয়াছিল। তীর্থযাত্রী বাঙ্গালীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এই প্রসঙ্গে কয়েকখানি চিঠি ও হিসাবের ফর্দ[১] বিভিন্ন প্রকরণে আলোচিত হইল।

নৌকাযোগে কাশী হইতে নবদ্বীপ আসিতে আঠারো দিনের মতো[২] লাগিত।

১ চি-প-স ২, চি-সং ২৬, ২৭, ৩১, ৩৬, ১৫১, ২৪৬, ৩৭১, ৩৭৯, ৪৮০ ২ ঐ, ঐ, ৩৭১

বাজপেয়ি রাজ শম্ভুচন্দ্র শর্মার 'শ্রীযুত চতুর্থ প্রাণাধিক তেরাই চৈত্রে ৺কাশী হইতে নৌযোগে রাহী হইয়া শ্রীচরণাশীর্বাদে নির্বিঘ্নে পহিলা বৈশাখে হরধামের রাজধানিতে' অর্থাৎ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শিবনিবাসে[১] পৌছিয়াছিলেন।

২৬সংখ্যক কবিতা-পত্রে ব্রজভূম, বৈদ্যনাথ,[২] গয়া, কাশী, অযোধ্যা, প্রয়াগ, গোকুল, মথুরা, বৃন্দাবন, জয়নগর ইত্যাদিকে 'নিত্যসিদ্ধ স্থান' বলা হইয়াছে। এ-সব স্থান-দর্শন মহা 'ভাগ্যোদয়ের' কথা। ২৭সংখ্যক পত্রের 'দক্ষিণ' নিশ্চয়ই শ্রীক্ষেত্র এবং ৫১৩সংখ্যক পত্রোল্লিখিত 'পশ্চিম' গয়া, কাশী, বৃন্দাবন ইত্যাদি। ৩১সংখ্যক পত্রে জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালঙ্কার 'শ্রীবৃন্দাবনের বনয়ারি বিলোকনে'র উল্লেখ করিয়াছেন।

৬৬সংখ্যক পত্রে বৃন্দাবনের 'কুঞ্জে' বাস করার প্রসঙ্গ আছে। সেখানে একটি বৈষ্ণবের ছেলে আবশ্যক চেলাগিরির জন্য। একটি ৮।৯ বৎসর বয়সের বৈষ্ণব-'সিস্থ' পাওয়া গেল। কিন্তু, তাহার 'গর্ব্বধারীনীও' ছেলের 'সস্তারে জাইতে চাহে'। তাহার বাসের জন্য অবশ্য 'য়ন্য কুঞ্জের' ব্যবস্থা।

১৫১সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে স্বকীয়া-পরকীয়াবাদের সুবিখ্যাত পত্রখানি। সেওয়ায় জয়সিংহ মহারাজার জয়নগর হইতে তাঁহার সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য আসিয়াছিলেন বাঙ্গালা সুবায়। এই পত্রখানির আলোচনা পূর্বে[৩] করা হইয়াছে।

অকালে গয়াধাম-গমনের প্রতিবন্ধক আছে কিনা, জানিতে চাহিয়া 'ভাশ'-পত্র ছাড়া হইয়াছিল দেখা যাইবে ২৪৬সংখ্যায় মুদ্রিত পত্রে।

১২২৮ সালে (৩১৯) জেলা জঙ্গল মহলের দেওয়ানী আদালতে একটি কৌতুককর মামলা হইয়াছিল। সেকালে ফিরিবার সম্ভাবনা ত্যাগ করিয়া দূর তীর্থযাত্রা করিতে হইত। জনৈক গুরুদেব পথনার লোকনাথ গোস্বামী আপনার যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়া শিষ্য-শিষ্যাদের নিকট ৫৬ টাকা জিম্মা রাখিয়া বৃন্দাবন-ধাম গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিলে, ঐ টাকা সুদ-সমেত ফেরৎ লইবেন, কথা ছিল। কিন্তু, গুরুদেব ফিরিয়া আসিয়া, শিষ্য-শিষ্যাদের নিকট হইতে চাহিয়া টাকা না-পাওয়ায়, এই নালিশ দায়ের করিয়াছিলেন।

৪৮০সংখ্যায় রহিয়াছে একটি হিসাবের ফর্দ। ইহা ১২৪৪ সালে ভায়া ভাগলপুর[৪] নৌযোগে কাশীগমনের প্রসঙ্গে জমা-খরচের হিসাব। সাধারণতঃ চৈত্র-বৈশাখ মাসেই বোধ হয় সেকালে জলপথে কাশীতীর্থে যাওয়া প্রশস্ত ও নিরাপদ ছিল।

১ পরে দ্রষ্টব্য

২ তুল. জৈন কবি নিহাল-কৃত সপ্তদশ শতকের বাঙ্গালার সীমান্ত-তীর্থের বর্ণনায় 'জিহাঁ সিখর-সমেত পর নাথ পারস প্রভু ঝাড়খণ্ডী মহাদেব চংগা' (বা-সা-ই ১খ, ২সং, পৃ ৬০৬)।

৩ পৃ ২৩৯-৪০ ৪ চি-প-স ২, চি সং ৪৮০

স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তাহাকে কোনো-
দিন মাথা ঘুরাইতে হইবে না—আমি
ঠিক্ করিয়া দিলাম কোন্ তিথিতে মুলা
খাইলে তাহার নরক এবং চিঁড়া
খাইলে তাহার অক্ষয় ফল। তোমার
মুলা ছাড়িয়া চিঁড়া খাইয়া তাহার কী
উপকার হইল তাহার কোনো প্রমাণ
নাই কিন্তু যাহা অপকার হইল ইতি-
হাসে তাহা উত্তরোত্তর পুঞ্জীকৃত হইয়া
উঠিতেছে।

১৩১৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাষ বা (ভাষা, Plaint)

(সন ১১২৯-১২৮৫ : খৃ ১৭২২-১৮৭৮)

॥ ভাষ : সামাজিক ॥

(সন ১১২৯-১২৮৫ : খৃ ১৭২২-১৮৭৮)

॥ ভূমিকা[১] ॥

ভাষ বা প্রায়শ্চিত্ত-প্রার্থনা : (প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুর জীবন আমরণ শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলে, এই সকল বিধি-নিষেধের লঙ্ঘনজনিত প্রায়শ্চিত্ত-বিধানও অপরিহার্য। মানব-চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যবশতঃ অপরাধেরও বৈচিত্র্য অসংখ্য। এই পরিস্থিতিতে, শাস্ত্রকারগণকে বিবিধ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও করিতে হইয়াছে আপেক্ষিকভাবে। মূলতঃ, প্রাচীন স্মৃতির অনুসরণে বঙ্গীয় নিবন্ধকগণ নানাবিধ পাপের উল্লেখ এবং তন্নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তের যথাযোগ্য বিধান দান করিয়াছেন। ইহার শেষ পরিণতি দেখা যায়, নানাবিধ ভুকতাকে।)

প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে এই তিনটি নিবন্ধ প্রধান,— ভবদেবের 'প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ' (বা, -'নিরূপণ'), শূলপাণির 'প্রায়শ্চিত্তবিবেক' এবং রঘুনন্দনের 'প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব'।

ভবদেব প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত এবং শূলপাণি বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। রঘুনন্দনের গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ। ইহাদের মধ্যে শূলপাণিই প্রথম 'প্রায়শ্চিত্ত'-শব্দের একটি স্পষ্ট অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন। অঙ্গিরসের প্রমাণ অনুসারে তিনি বলেন, 'প্রায়' শব্দের অর্থ—তপ, এবং 'চিত্ত' বলিতে বুঝায়—নিশ্চয়। সুতরাং, 'প্রায়শ্চিত্ত' শব্দের অর্থ—এমন তপশ্চর্যা যাহা দ্বারা নিশ্চিত পাপক্ষালন হইবে। শূলপাণি-ধৃত হারীতের মতে, যাহা সঞ্চিত অমঙ্গল ধ্বংস করে সেই কৃচ্ছ্রসাধনই প্রায়শ্চিত্ত। উল্লিখিত প্রমাণাদি হইতে শূলপাণি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রায়শ্চিত্ত 'পাপক্ষয়মাত্রসাধনম্'; অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত কেবল পাপক্ষয়েরই উপায়। 'প্রায়শ্চিত্তবিবেক'র টীকায়, গোবিন্দানন্দ বলেন, ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপক্ষয়-কামনায় অনুষ্ঠিত অশ্বমেধও প্রায়শ্চিত্ত। রঘুনন্দন বলেন, ক্ষার, উত্তাপ, প্রচণ্ড আঘাত এবং প্রক্ষালনের ফলে যেমন মলিন বস্ত্র পরিষ্কৃত হয়, তদ্রূপ তপশ্চর্যা, দান ও যজ্ঞের দ্বারা পাপী পাপমুক্ত হয়।

(পাপীর পাপমোচনই প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে, স্বভাবতঃই পাপের সংজ্ঞা-নিরূপণের প্রশ্ন উঠে। বিহিত কর্মের অকরণ এবং নিন্দিতকর্মের অনুষ্ঠানই পাপ।) শূলপাণির মতে,

১ স্মৃ-বা (পৃ ১১০-১৩৫) হইতে সারসংক্ষেপ

ইন্দ্রিয়ের অসংযমও পাপজনক। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ইন্দ্রিয়ের অসংযম নিন্দিত-কর্মের অনুষ্ঠানের পর্যায়ে পড়ে; কারণ, মনু[1] ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু, নানা যুক্তিবলে শূলপাণি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, 'দংশ' ও 'অভিশাপ' ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে-ব্যক্তি দষ্ট হয়, বা অভিশাপের ফলে শাস্তি পায়, সে পূর্বে ইন্দ্রিয়ের অসংযমবশতঃ সঞ্চিত পাপেরই ফলভোগ করে।

বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধে প্রধান প্রধান পাপের এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে,—অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক ও উপপাতক।

পাপক্ষয়ের কামনায় প্রায়শ্চিত্ত করা হয় বলিয়া প্রায়শ্চিত্তমাত্রই কাম্য। কিন্তু, শূলপাণি ও রঘুনন্দন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রায়শ্চিত্ত নৈমিত্তিকও বটে; কারণ, পাপরূপ নিমিত্ত না-থাকিলে কেহ প্রায়শ্চিত্ত করে না। সুতরাং, ইঁহাদের মতে, প্রায়শ্চিত্ত অংশতঃ কাম্য এবং অংশতঃ নৈমিত্তিক। আবার, অবশ্যকর্তব্য বলিয়া ইহাকে নিত্যও বলা হইয়াছে।

(আধুনিক কালে একই অপরাধে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্নরূপ শাস্তিবিধান হইয়া থাকে। কারণ, অপরাধীর মনোবৃত্তিগত পার্থক্য। কেহ স্বেচ্ছায় অপরকে হত্যা করিলে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হয়। কিন্তু, অনিচ্ছাকৃত হত্যার জন্য অপরাধের মাত্রার লাঘব হয়; এবং ফলে, শাস্তিও হয় লঘুতর। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের অনুসরণকারী বাঙ্গালার নিবন্ধকারগণও জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের তারতম্য করিয়াছেন। শূলপাণি এই বিষয়টির বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। কামকৃত বা জ্ঞানকৃত পাপের উদাহরণস্বরূপ গো-বধের প্রসঙ্গ অবতারিত হইয়াছে। কোনো ব্যক্তি জ্ঞাতসারে গো-বধ করিলে, সে জ্ঞানকৃত গো-বধের পাপভাজন হইবে। কিন্তু, কেহ যদি অপর জন্তুভ্রমে গো-হত্যা করিয়া থাকে, অথবা অপর কোনো জন্তুর প্রতি নিক্ষিপ্ত অস্ত্রের দ্বারা গো-হত্যা করে, তাহা হইলে সে জ্ঞানকৃত গো-বধের জন্য দায়ী হইবে না। প্রথম ক্ষেত্রে, নিহত জন্তুকে গো বলিয়া হত্যাকারী জানে না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, নিহত জন্তুটিকে গো বলিয়া জানিলেও, ইহাকে হত্যা করা হত্যাকারীর উদ্দেশ্য নহে।

মনু প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিকারের প্রমাণোল্লেখে শূলপাণি বলেন, (জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত লঘুতর।) এই উভয় প্রকার পাপের বলাবল তারতম্য বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির এই শ্লোকটি প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত,—

প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ।
কামতো ব্যবহার্যস্তু বচনাদিহ জায়তে ॥[2]

১ ৪।১৬ ২ ৩।৫।২২৬

শূলপাণির ব্যাখ্যানুসারে ইহার অর্থ, অজ্ঞানকৃত পাপই কেবল প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা অপগত হয়। কিন্তু, পাপ জ্ঞানকৃত হইলে, উহা অপগত হয় না; যদিও পাপী সমাজে ব্যবহার্য হয়। অথচ, প্রায়শ্চিত্তের পরেও পাপ থাকিলে, পাপী সামাজিক ব্যবহার্যতা লাভ করিতে পারে না। উত্তরে শূলপাণি বলিয়াছেন, 'বচনাৎ' অর্থাৎ এই বচন-বলেই ব্যবহার্যতা জন্মে। শূলপাণি বলেন, এরূপ ক্ষেত্রে ব্যবহার্যতার অর্থ, স্পর্শ ও দর্শনাদির যোগ্যতা। এইরূপ পাপীর সহিত ভোজন ও বিবাহাদি প্রধান সামাজিক ব্যবহার নিষিদ্ধ।

উল্লিখিত শ্লোকে 'ব্যবহার্য' শব্দটির পরিবর্তে 'অব্যবহার্য' পাঠ ধরিয়া শূলপাণি এই বচনটির অর্থ করিয়াছেন, অজ্ঞানকৃত পাপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা দূরীভূত হইবে; কিন্তু, জ্ঞানকৃত পাপ প্রায়শ্চিত্তের ফলে অপগত হইলেও, পাপাচারী সমাজে অব্যবহার্য হইবেন। সম্ভবতঃ, ইহাই শূলপাণির নিজস্ব মত[১]।

জিকন বলেন, পাপের ফল দুইটি — 'শরীরগতমপ্রায়ত্যম্' অর্থাৎ শারীরিক অপবিত্রতা এবং 'আত্মগত পাপ'। ফলতঃ, পাপী স্পর্শের যোগ্যতা ও বৈদিক অনুষ্ঠানাদির অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা জ্ঞানকৃত পাপের প্রথমোক্ত ফলই কেবল অপগত হয়, কিন্তু, আত্মগত পাপ ক্ষালিত হয় না, ভোগের দ্বারাই কেবল ইহার নাশ সম্ভবপর। জিকনের মত খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে, মনুর প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শূলপাণি বলেন, প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা জ্ঞানকৃত পাপ অপগত হয়, শ্রুতিতে ইহার সমর্থন আছে।

তন্ত্রতা। পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উঠিতে পারে, কোনো ব্যক্তি একই পাপ যদি বারংবার করে, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তও সে ততবার করিবে কিনা। এরূপ ক্ষেত্রে ধর্মশাস্ত্রকারগণ 'তন্ত্রতা'-ন্যায় অবলম্বন করেন। ইহার অর্থ, ক্ষেত্রবিশেষে একটি পাপ পুনঃপুনঃ করিলেও, ঐ পাপের বিহিত প্রায়শ্চিত্ত একবারমাত্র করিলেই সমস্ত পাপ ক্ষালিত হইবে। যেমন এক ব্যক্তি পর পর দুইবার ব্রহ্মবধ করিল। ব্রহ্মবধের পাপক্ষালনার্থ যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা, তাহা একবার করিলেই সমস্ত পাপ দূরীভূত হইবে[২]।

প্রসঙ্গ। প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে অপর একটি কূট প্রশ্ন এই,— কোনো ব্যক্তি একটি গুরুতর পাপ করিয়া আর একটি লঘুতর পাপ করিল। সেই ব্যক্তি উভয় পাপক্ষালনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রায়শ্চিত্ত করিবে কিনা। এইরূপ ব্যাপারে বঙ্গীয় নিবন্ধকগণ পূর্বসূরিগণের অনুসরণে 'প্রসঙ্গ' নামক ন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার অর্থ, একটি ব্যাপারের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কোনো কার্যদ্বারা অপর ব্যাপারের সিদ্ধি হয়।

১ স্মৃ-বা, পৃ ১১৪ ২ তুল. Concurrent Sentences

কোনো ব্যক্তি লাঠি দিয়া একজন ব্রাহ্মণকে প্রহার করিল। তৎপর সে যষ্টি উত্তোলন করিয়া অপর একজন ব্রাহ্মণকে ভয় দেখাইল। এ-ক্ষেত্রে প্রথম অপরাধ গুরুতর; সুতরাং, এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের দ্বারাই লঘুতর পাপটিও অপগত হইবে। কোনো ব্যক্তি ব্রহ্মবধ করিয়া ক্ষত্রিয়বধ করিল। এখানে ব্রহ্মবধ-জনিত পাপ গুরুতর; ইহার ক্ষালনার্থে যে-প্রায়শ্চিত্ত, তাহার দ্বারাই ক্ষত্রিয়বধজনিত লঘুতর পাপ ক্ষালিত হইবে।

প্রায়শ্চিত্তের লঘুত্ব বিধান। প্রায়শ্চিত্তপ্রসঙ্গে রঘুনন্দন লঘুত্ববিধায়ক নিয়মেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, পাপকারীর বয়স ও ক্ষমতা, গ্রীষ্মাদি কালে পাপানুষ্ঠান, বিবেচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। রঘুনন্দন কর্তৃক উদ্ধৃত বচন হইতে বুঝা যায়, পাপকারী পুরুষ অথবা স্ত্রী এবং কোন্ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত তাহাও এই ব্যাপারে বিবেচ্য। স্ত্রীলোক এবং শিশুর জন্য লঘুতর প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। শূদ্র কর্তৃক গো-বধের প্রায়শ্চিত্ত অপর বর্ণের লোকের অপেক্ষা লঘুতর।

পাপকারী শিশু ও স্ত্রী উভয়ই হইলে, প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ হওয়া উচিত। এ-ক্ষেত্রে শিশুর জন্য বিহিত অর্ধপ্রায়শ্চিত্ত। আবার স্ত্রীলোকের জন্যও অর্ধপ্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। সুতরাং, এইরূপ পাপকারী স্বকৃত পাপের বিহিত প্রায়শ্চিত্তের এক-চতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্তমাত্র করিবে। তবে, এইরূপ পাপাচারী শূদ্র হইলে প্রায়শ্চিত্ত আর লঘুতর হইতে পারে না, বিহিত প্রায়শ্চিত্তের এক চতুর্থাংশই লঘুতম।

নিষিদ্ধ খাদ্য ও পানীয়। বহু দ্রব্য বিভিন্ন বর্ণের পক্ষে অভক্ষ্য এবং অপেয় বলিয়া নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ বস্তুর ভক্ষণ এবং পানজনিত পাপের মাত্রা বর্ণভেদে বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। আবার কোনো কোনো দ্রব্য এক বর্ণের জন্য নিষিদ্ধ হইলেও অপর বর্ণের জন্য হয় না। প্রসঙ্গতঃ, শূলপাণি-উদ্ধৃত একটি বচনে অভক্ষ্য দ্রব্যগুলির এইরূপ শ্রেণী-বিভাগ করা হইয়াছে।—১) জাতিদুষ্ট— স্বভাবতঃ অপকারী; যেমন, রশুন, পেঁয়াজ ইত্যাদি। ২) ক্রিয়াদুষ্ট—কোনো কার্যের দ্বারা দূষিত; যেমন, পতিত ব্যক্তির স্পর্শদূষিত। ৩) কালদূষিত— পর্যুষিত। ৪) আশ্রয়দূষিত—ইহার অর্থ স্পষ্ট নহে। সম্ভবতঃ ইহা মন্দ-আশ্রয়ে বা নিষিদ্ধ পাত্রে রক্ষণহেতু দূষিত বস্তুকে বুঝায়। ৫) সংসর্গদুষ্ট—সুরা, রশুন ইত্যাদি নিষিদ্ধ বস্তুর সংসর্গে দূষিত। ৬) শহৃল্লেখ—বিষ্ঠাতুল্য; অর্থাৎ যে-বস্তুর দর্শনে মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়।

নিষিদ্ধ পানীয় দ্রব্যসমূহের মধ্যে প্রধান—সুরা। কিন্তু, প্রাচীন স্মৃতির প্রমাণ বলে, বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধকগণ ত্রিবিধ মদ্যকে 'সুরা' আখ্যা দিয়াছেন,— পৈষ্টী— অন্নজাত, গৌড়ী—গুড় হইতে উৎপন্ন, মাধ্বী—মধু হইতে জাত।

ভবদেব বলেন, সকল মদ্যই সুরা-শ্রেণীর নহে। নানা প্রকার প্রমাণবলে ভবদেব

'সুরা'-শব্দের মুখ্য ও গৌণভেদে দুইটি অর্থ প্রতিপন্ন করিয়াছেন। মুখ্য অর্থে, সুরা-শব্দে পৈষ্টী সুরাকে বুঝায়। গৌণ অর্থে, ইহা অপর প্রকার মদ্য।

মুখ্য সুরাপানে দ্বিজগণের মহাপাতক হয়। মনুর বচনে, ত্রিবিধ সুরাই দ্বিজগণের পক্ষে নিষিদ্ধ। বঙ্গীয় স্মৃতিকারেরা বলেন, পৈষ্টী-সুরা প্রথম ত্রিবর্ণের পক্ষেই নিষিদ্ধ। অপর দুই প্রকার সুরা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ; অপর দুই বর্ণের পক্ষে নহে। ভবদেব বলেন, দ্বিজগণের পক্ষে সুরাবিষয়ক নিষেধ তাঁহাদের স্ত্রীলোকদের পক্ষেও সমভাবে প্রযোজ্য। স্মার্ত বালকের মতে, সুরার সহিত ওষ্ঠ-সংযোগ হইলেও সুরাপান হয়। ভবদেব বা শূলপাণি কেহই এই মত সমর্থন করেন নাই। 'পান' শব্দে শূলপাণি 'কণ্ঠদেশাদধোনয়নম্' বা গলাধঃকরণ বুঝিয়াছেন।

সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত। স্থূলতঃ, সুরার বিভিন্নরূপ পানে বিভিন্ন মাত্রার পাপ হইয়া থাকে,—সজ্ঞানে পান, অজ্ঞানে পান, অপর কর্তৃক বলপ্রয়োগের ফলে পান, একবার পান, বারংবার পান, তক্র বা ঘোল-মিশ্রিত সুরাপান—মিশ্রণে সুরার গন্ধ অনুভূত হইবে না, এবং তক্র-মিশ্রিত সুরা—মিশ্রণে সুরার গন্ধ অনুভূত হইবে।

সুরাপানজনিত পাপের মাত্রানুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত নানারূপ; কঠোরতম প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু। দ্বাদশবার্ষিক ব্রত, ত্রিবার্ষিক ব্রত, একবার্ষিক ব্রত এবং পুনরুপনয়ন—এইরূপ নানা প্রকার প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে। সুরাপানজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে বিধি বহু। শূলপাণির মতে প্রধান নিয়মগুলি এই,—১) দ্বিজগণের সজ্ঞানে সুরাপানের জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মৃত্যুই বিধেয়; বৈকল্পিক বিধিস্বরূপ চতুর্বিংশতিবার্ষিক ব্রত অনুষ্ঠেয়। ২) ব্রাহ্মণ কর্তৃক অজ্ঞানে সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশবার্ষিক ব্রত; ইহা সম্ভবপর না-হইলে ১৮০টি দুগ্ধবতী গাভী-দান; ইহাও না-হইলে, ৫০০ চূর্ণী[১] ও ৪০ পুরাণ[২]-দান। সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে প্রধান নিয়মগুলি এই।—

দ্বাদশবার্ষিক ব্রত মৃত্যুর অর্ধেক বলিয়া পরিগণিত হয়। মুখের সহিত সুরার সংসর্গই সুরাপান নহে; সুতরাং মুখের সহিত সুরা-সংসর্গের প্রায়শ্চিত্ত সুরাপানের প্রায়শ্চিত্তের অর্ধেক। পৈষ্টী-সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত ব্রাহ্মণের পক্ষে সম্পূর্ণ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ¾ ভাগ, বৈশ্যের পক্ষে ½ এবং শূদ্রের পক্ষে ¼, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের যে-প্রায়শ্চিত্ত, নিম্নতর বর্ণের পক্ষে তাহা হইতে এক এক পাদ কম হইবে। ভবদেব বলেন, শূদ্র সম্পর্কে বিধি নিরর্থক।

সুরাপানের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে যে মৃত্যু ও পুনরুপনয়নের বিধান, তাহার হ্রাস সম্ভবপর নহে। কিন্তু অনুপনীত ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ-বর্ণের অবিবাহিতা কন্যার পক্ষে

১ ১ চূর্ণী—১০০ কড়ি ২ ১ পুরাণ—১৬ পণ কড়ি

মৃত্যুর পরিবর্তে দ্বাদশবার্ষিক ব্রতের ব্যবস্থা। অনুপনীত বালক অশক্ত হইলে, তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ তাহার ভ্রাতা বা এইরূপ অপর কোনো শাস্ত্রনির্দিষ্ট ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অথবা ঋত্বিক্[১] তৎকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। ভবদেব কর্তৃক উদ্ধৃত একটি প্রমাণ হইতে বুঝা যায়, পাঁচ হইতে এগারো বৎসর বয়স্ক বালকের প্রতিনিধি প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে। পাঁচ বৎসরের কম-বয়স্ক বালকদের কোনো পাপ হয় না। কিন্তু, অন্য প্রমাণবলে ভবদেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এইরূপ বালকেরও সুরাপানজনিত পাপ হইয়া থাকে; তবে তাহার পক্ষে বিধেয় অর্ধপ্রায়শ্চিত্তমাত্র। জিকনের মতানুযায়ী শূলপাণি মনে করেন, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যবর্ণের পাঁচ বৎসরের ন্যূনতর বয়স্ক বালকের পাপ হইবে না।

নিষিদ্ধ যৌন-সংসর্গ। যে-সকল স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌনসম্বন্ধ পাপজনক বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে গুর্বঙ্গনাই প্রধান। গুর্বঙ্গনা-গমন মহাপাতক বলিয়া গণ্য হইয়াছে। গুর্বঙ্গনা বলিতে মাতা এবং সমবর্ণা বা উচ্চবর্ণা বিমাতা বুঝায়। জননী-গমন অতিপাতক শ্রেণীর পাপ।

'অতিদেশে'র[২] সাহায্যে মাতার সপত্নী, ভগ্নী, আচার্যকন্যা, আচার্যানী এবং স্বীয় কন্যা—প্রভৃতির সহিত যৌনসম্বন্ধকেও গুর্বঙ্গনাগমনের তুল্য বিবেচনা করা হইয়াছে।

যে সকল স্ত্রীলোকের সহিত যৌনসম্পর্ক পাপজনক, কিন্তু, পাপ মহাপাতক অপেক্ষা লঘুতর,—নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তির স্ত্রী, নিম্নতর বর্ণের স্ত্রীলোক, রজক-পত্নী, রজস্বলা নারী, গর্ভবতী নারী এবং ব্রহ্মচারীর পক্ষে যে-কোনো নারী।

গো, গর্দভ, অশ্ব, ছাগাদি প্রাণীর সহিত যৌন-সম্পর্কও প্রায়শ্চিত্তার্হ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

নরহত্যা। প্রাণ-বিয়োগের হেতুভূত কর্মই হত্যা। বধ দ্বিবিধ—মুখ্য ও গৌণ। অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে হত্যার নাম মুখ্যবধ। অপরের সাহায্যে বধ গৌণ। হত্যার সহায়ক চতুর্বিধ,—

১) অনুমন্তা—(ক) যে-ব্যক্তি হত্যাকারীকে এই বলিয়া আশ্বাস দেয় যে, অপর যে-ব্যক্তি বাধা দিলে হত্যা সম্ভবপর হইবে না, তাহাকে সে বাধা দিবে, (খ) যে হত্যাকারীকে বিরত করিবার চেষ্টা করে না।

২) অনুগ্রাহক—(ক) যে 'বধ্যগত বৈমনস্য' জন্মায়; অর্থাৎ বধ্যব্যক্তিকে অন্যমনস্ক করিয়া দিয়া তাহার বধের সহায়ক হয়, (খ) বধ্যব্যক্তির সাহায্যার্থ আগমনকারী ব্যক্তিকে যে বাধা দেয়।

৩) নিমিত্তী—যাহার দ্বারা ক্রোধ-উৎপাদন হেতু কোনো ব্যক্তি স্বীয় প্রাণনাশে কৃত-সংকল্প হয়।

১ সাধারণতঃ কুলপুরোহিত ২ Extended application (M. Williams)

৪) প্রযোজক—(ক) অপ্রবৃত্তপ্রবর্তক—যে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে বধে প্রবৃত্ত করে, (খ) প্রবৃত্তোৎসাহজনক—বধে উদ্যোগী ব্যক্তিকে যে উৎসাহ দেয়।

ব্রহ্মহত্যা। নরহত্যামাত্রই পাপজনক। এতন্মধ্যে ব্রহ্মহত্যার পাপই সর্বাতিশায়ী; ইহা মহাপাতক। তবে, আততায়ী-ব্রাহ্মণকে বধ করিলে পাপ তত গুরুতর হয় না। এই ব্যক্তিগণ আততায়ী বলিয়া গণ্য হয়,—(১) অগ্নিদ—যে অপরের গৃহে অগ্নিসংযোগ করে, (২) গরদ—যে অপরকে বিষ প্রয়োগ করে, (৩) শস্ত্রপাণি—মারাত্মক অস্ত্রধারী ব্যক্তি, (৪) ধনাপহ—ধনের অর্থাৎ যথাসর্বস্বের অপহারক, (৫) ক্ষেত্রাপহারী—যে অপরের ক্ষেত্র আত্মসাৎ করে, (৬) দারাপহারী—যে অপরের স্ত্রীকে অপহরণ করে, (৭) পত্ন্যভিগামী—অপরের পত্নীর সহিত যাহার যৌন-সম্পর্ক ঘটে, (৮) অথর্বহন্তা বা অভিচারকারী—অভিচারক্রিয়া দ্বারা যে অপরের প্রাণনাশে যত্নবান্ হয়, (৯) রাজগামী পৈশুনযুক্ত—যে রাজা সম্বন্ধে এরূপ অপমানসূচক বাক্য অপরের উপর আরোপিত করে যে, উহা রাজার কর্ণগোচর হইলে শেষোক্ত ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড অবশ্যম্ভাবী, (১০) তেজোঘ্ন—যে মন্ত্রদানের দ্বারা অপরের ব্রাহ্মণ্যতেজ নষ্ট করে।

অজ্ঞানকৃত ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশবার্ষিক ব্রত। বিশদ বিবরণ অন্যত্র[১] দ্রষ্টব্য।

মূল প্রায়শ্চিত্ত হইতে এক পাদ, অর্থাৎ একচতুর্থাংশ হ্রাসের নিয়ম শূলপাণি গো-বধের প্রায়শ্চিত্ত-বিধি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

কামকৃত ব্রহ্মবধের প্রায়শ্চিত্ত মরণান্তিক হইলে, জাতিভ্রষ্ট ব্রাহ্মণকে ইচ্ছাসহকারে বধ করিলে দ্বাদশবার্ষিক প্রায়শ্চিত্তই বিধেয়। শুধু বধই নহে, বধের সংকল্পও প্রায়শ্চিত্তার্হ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, বধের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিতে গিয়া, নিবন্ধকগণ প্রহার, লঘু আঘাত ও গুরু আঘাতাদিরও প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়াছেন। বর্তমান Indian Penal Code-এ যেমন assault, hurt, grievous hurt ইত্যাদি অপরাধের সূক্ষ্ম ভাগ-বিভাগ দেখা যায়, প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রকার এবং বঙ্গীয় নিবন্ধকগণ সেইরূপ অপরাধের লঘু গুরু মাত্রা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। আত্মহত্যা বা আত্মহত্যার প্রয়াসও প্রায়শ্চিত্তযোগ্য।

গো-বধের প্রায়শ্চিত্ত। গো-বধের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে স্থূল নিয়মগুলি এইরূপ,—যে-গরুর স্বামী ব্রাহ্মণ তাহার বধে পাপ গুরুতর। নিম্নবর্ণের ব্যক্তি যে-গরুর মালিক তাহার বধে পাপের মাত্রা লঘুতর। গরুর নিম্নলিখিত অবস্থাগুলি তাহার বধজনিত পাপের গুরুত্ব ও লঘুত্বের নির্ণায়ক,—(১) সগর্ভতা, (২) অত্যন্ত পরিণত বয়স, (৩) অত্যন্ত কৃশতা,

---

১ স্মৃ-বা, পৃ ১২৬-২৭

(৪) রোগ, (৫) অন্ধত্ব, উন্মত্ততা, (৬) তৃণ বা অন্য-কিছু ভক্ষণকালে গরুকে বাধা দেওয়া, (৭) অসময়ে গরুর বন্ধন, (৮) গো-পালনে অবহেলা, (৯) গরুর কূপাদিতে পতন।

স্তেয়। ভবদেবের মতে, স্তেয় বা চৌর্য হইল একের যথেচ্ছ ব্যবহার্য দ্রব্যের উপরে, তাহার বিনা অনুমতিতে অপরের যথেচ্ছ ব্যবহারের যোগ্যতা-আরোপের কাজ। শূলপাণি এই সংজ্ঞা সমর্থন করিলেও ইহাতে তিনি একটি কথা যোগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এইরূপ ব্যাপারে অপরের স্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন যে, ঐ দ্রব্যটির স্বত্বাধিকারী অন্য-কোনো ব্যক্তি[১]। ভবদেব বলেন, প্রকৃত স্বত্বাধিকারী চোরের নিকট হইতে দ্রব্যটি ফিরাইয়া লইলে স্বত্বাধিকারীর চৌর্যের অপরাধ হইবে না। কোনো কোনো স্মার্তের মতে, অপরের দ্রব্য স্থানান্তরিত করিলেই চৌর্য হয়। শূলপাণি এই মত খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন, অপরের বস্তুর অপসারণ চৌর্য হইলে, কাহারও নিকট গচ্ছিত দ্রব্যও অপহৃত বস্তু বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। অপরের বস্তু বলিয়া নিশ্চিত জ্ঞান না-থাকিলে সেই বস্তুর অপসারণে চৌর্য হয় না।

মহাপাতকের তালিকায় 'স্তেয়' পদটি আছে। কিন্তু, নিবন্ধকগণের মতে, স্তেয়মাত্রেই মহাপাতক নহে; ব্রাহ্মণের সম্পত্তি-অপহরণই কেবল মহাপাতক। ভবদেব ও শূলপাণি নানা প্রমাণ-বলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বিশিষ্ট পরিমাণের ব্রাহ্মণ-স্বর্ণহরণই এই পর্যায়ে পড়ে, যে-কোনো পরিমাণের স্বর্ণ নহে।

ব্রাহ্মণ-স্বর্ণাপহরণের প্রায়শ্চিত্তসংক্রান্ত বিধিগুলি স্থূলতঃ এইরূপ,—জ্ঞানকৃত অপহরণের প্রায়শ্চিত্ত মরণান্তিক। অজ্ঞানকৃত অপহরণের প্রায়শ্চিত্ত দ্বাদশবার্ষিক ব্রত। শূলপাণি বলেন, প্রায়শ্চিত্তের পূর্বে অপহৃত স্বর্ণ বা তাহার মূল্য উহার স্বত্বাধিকারীকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

সংসর্গ। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয় ও গুর্বঙ্গনাগমন মহাপাতক। এইরূপ মহাপাতকীর সংসর্গ হইতেও মহাপাতক জন্মে। পাতকীর সহিত এইরূপ সংসর্গ পাপজনক,—এক শয্যায় শয়ন, একাসনে উপবেশন, এক পঙ্‌ক্তিতে অবস্থান, 'ভাণ্ড' ও 'পকান্নে'র মিশ্রণ, পাতকীর হিতার্থে যজ্ঞসম্পাদন, অধ্যাপন, সহভোজন, বৈবাহিক বা যৌন-সম্পর্ক, ভাষণ, স্পর্শন, সহযান ইত্যাদি।

কোনো কোনো রূপ সংসর্গ সদ্য-পাতিত্য জন্মায়; আবার কোনো কোনো সংসর্গ বিশিষ্ট কালসীমার পরে পাতিত্যজনক হইয়া থাকে। প্রথম প্রকারের অন্তর্গত সংসর্গ এইরূপ,—পাতকীর জন্য যজ্ঞসম্পাদন, পাতকীর সহিত বৈবাহিক বা যৌন সংসর্গ,

১ প্রায়শ্চিত্তবিবেক, পৃ ১১৫

পাতকীর উপনয়ন এবং পাতকীর সহভোজন। একবৎসর কালের জন্য হইলে পাতিত্যজনক হয়,—পাতকীর সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন, একাসনে উপবেশন, একশয্যায় শয়ন ও সহযান।

সংসর্গ-প্রায়শ্চিত্তের সাধারণ নিয়ম হইল,—যে-মহাপাতকীর সহিত সংসর্গ হইয়াছে, তাহার জন্য বিধেয় 'ব্রত', সংসর্গীরও অনুষ্ঠেয়। এখানে 'ব্রত'-পদে ভবদেব দ্বাদশবার্ষিক-ব্রতই বুঝিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, জ্ঞানকৃত মহাপাতকের জন্য মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্তের বিধান করা হইলেও, সংসর্গীর পাপ জ্ঞানকৃত হইলে দ্বাদশবার্ষিক ব্রতই তাঁহার করণীয়। অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য সংসর্গীর পক্ষে বিহিত অর্ধ-প্রায়শ্চিত্ত।

দ্রব্যশুদ্ধি। প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে নিবন্ধকগণের মধ্যে একমাত্র ভবদেব দ্রব্যশুদ্ধি সম্পর্কে পৃথক্ আলোচনা করিয়াছেন। দ্রব্যসমূহের অশুদ্ধির কারণ বহুবিধ; এবং তাহাদের শোধন-প্রণালীও অনেক। প্রসঙ্গতঃ, এই বিষয়ে স্থূল জ্ঞাতব্যগুলি এখানে উদ্‌ধৃত হইল। দ্রব্যের নাম,—

ভূমি। অশুদ্ধির কারণ—নারীর সন্তান-প্রসব, মানুষের মৃত্যু, শবদাহ, মলমূত্র, কুকুর, শূকর, গর্দভ ও উষ্ট্রের বাস। যথাক্রমে শুদ্ধির প্রণালী—খনন, দহন, লেপন, প্রক্ষালন, মেঘের বর্ষণ, মাটি-ভরাট, গোচারণ এবং কালাতিক্রম।

দ্বিজগৃহ। কুকুরের মৃত্যু, শূদ্রের মৃত্যু এবং দ্বিজের মৃত্যুতে যথাক্রমে দশরাত্রের অতিক্রম, এক মাসের অতিক্রম, ত্রিরাত্রাপগম অথবা বহির্ভূমির পক্ষে এক রাত্রির অপগম এবং ঐ স্থানের দহন, লেপন বা প্রক্ষালন।

এখানে উল্লেখযোগ্য, ভবদেবের মতে, এই কালসীমার অতিক্রমের পরেও মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক স্থানটিকে প্রক্ষালিত করা আবশ্যক।

গৃহাভ্যন্তরে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু[১] হইলে মৃদ্‌ভাণ্ড ও পক্বান্নের বর্জন, গোময়োপলেপন, ব্রাহ্মণ কর্তৃক কুশোদক বা স্বর্ণোদক সিঞ্চন।

জল। গন্ধদ্রব্য, বর্ণ ও রসের মিশ্রণ ঘটিলে সেই জলের শোধনোপায় নাই। কিন্তু, 'অক্ষোভ্য' 'প্রভূত' জল কোনো কারণেই অশুদ্ধ হয় না। বাসি-জল বর্জনীয়।

বিভিন্ন প্রকার পাত্র সম্পর্কে সাধারণ শুদ্ধিপ্রণালী এইরূপ। 'অব্জ' বা শঙ্খ, স্বর্ণ, মণি, মুক্তা, প্রবাল ও রৌপ্যনির্মিত পাত্র শুদ্ধ হয় জলের দ্বারা। কাংস্যপাত্র ও তাম্রভাণ্ডের শোধন হয় যথাক্রমে ভস্ম ও 'অম্লাম্ভ'[২] দ্বারা। 'সিদ্ধার্থকল্ক'[৩] দ্বারা শৃঙ্গ ও পশুদন্তনির্মিত পাত্র শুদ্ধ

১ প্রচলিত বিশ্বাস, গৃহাভ্যন্তরে মৃত ব্যক্তির আত্মা গৃহের চতুঃসীমায় আবদ্ধ হওয়ায় ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না। ২ টক জল ৩ শ্বেত সরিষার লেই (paste)

হয়। কাষ্ঠনির্মিত দ্রব্য অত্যন্ত অশুদ্ধ হইলে মৃত্তিকা, জল, ও 'তক্ষণ'[১] দ্বারা শুদ্ধ হয়। মৃদ্‌ভাণ্ড দহনের দ্বারা শোধিত হইতে পারে; কিন্তু মূত্রাদি দ্বারা অশুদ্ধ মৃদ্‌ভাণ্ড পরিত্যাজ্য।

বিভিন্ন ভাণ্ড সম্বন্ধে বিশেষ নিয়মগুলি এই,—

কাংস্যপাত্র। গাভীকর্তৃক আঘ্রাণ, শূদ্রের ভোজন, কুকুর ও কাকাদি কর্তৃক দূষণ। এ-ক্ষেত্রে, দশবিধ ক্ষারের প্রয়োগ বিধেয়। সুরা, মল ও মূত্রের সংস্পর্শ ঘটিলে অগ্নিতাপ ও 'লিখন'[২]।

'তৈজস'[৩] পাত্র। দীর্ঘকাল মল, মূত্র, শুক্র ও শোণিতের সংস্পর্শ হইলে অগ্নিতাপ। উক্ত দ্রব্যগুলির সহিত অল্পকালের সংস্পর্শ ঘটিলে, মার্জন অথবা সপ্তরাত্র গোমূত্রে রক্ষণ।

বস্ত্র। সাধারণ অশুদ্ধির কারণ বিশেষভাবে লিখিত হয় নাই। ইহার শুদ্ধিকল্পে প্রোক্ষণ, প্রক্ষালন এবং সূর্যালোকে স্থাপন বিধেয়।

বস্ত্র সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য, ক্ষৌম বা ঊর্ণনির্মিত মূল্যবান্ বস্ত্রের শোধন 'অল্পশৌচে'র দ্বারাই বিহিত হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশে মূল্যবান্ বস্ত্রের শোধন-প্রণালী সাধারণ বস্ত্রের তুলনায় সংক্ষিপ্ত। সম্ভবতঃ, বিস্তারিত শোধনোপায়ে বহুমূল্য বস্ত্রের নাশের আশঙ্কাই এই সংক্ষিপ্ত শোধনপদ্ধতির মূল কারণ।

বস্ত্রের সর্বাপেক্ষা অধিক অশুদ্ধির কারণ মল, মূত্র, শুক্র, শোণিত ইত্যাদির সংস্পর্শ। এইরূপ ক্ষেত্রে শোধক হইল মৃত্তিকা ও জল।

'আম-মাংস' ও ঘৃত অন্ত্যজ-স্পৃষ্ট হইলেও অশুদ্ধ হয় না। মানুষের নিকট নিজের শয্যা, ভার্যা, সন্তান, বস্ত্র, উপবীত, কমণ্ডলু সর্বদাই শুদ্ধ। কিন্তু অপরের নিকট এই সমস্ত দ্রব্য কারণবিশেষে অশুদ্ধ হইতে পারে। অশুদ্ধস্থানে-জাত বৃক্ষের পত্র, পুষ্প ও ফল অশুদ্ধ বলিয়া গণ্য হয় না।[৪]

প্রায়শ্চিত্তমূলক ব্রত। যে-সমস্ত ব্রতের উদ্দেশ্য প্রায়শ্চিত্ত বা পাপক্ষয়, তাহাদের সংখ্যা ও সংজ্ঞা গ্রন্থভেদে বিভিন্ন। প্রধান প্রায়শ্চিত্তমূলক ব্রতসমূহের স্থূল লক্ষণগুলি এই,—

অতিকৃচ্ছ্র। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, প্রাজাপত্যের অনুরূপ। প্রভেদ কেবল এই, ইহাতে হাতে যে-পরিমাণ অন্ন ধরে ততটুকু মাত্র ভক্ষণ করিতে হইবে। এইরূপ নয় দিন করিয়া, তিন দিন উপবাস। মনুর মতে, প্রাজাপত্যের ন্যায়। পার্থক্য মাত্র এই, ইহাতে প্রতিবার ভোজনকালে এক গ্রাস মাত্র ভোজ্য গ্রহণ করিতে হইবে;—এইরূপ নয় দিন, পরের তিন দিন উপবাস।

১ চাঁচা ২ মাজা ৩ ধাতুপাত্র ৪ ব্র-পু-দ, পৃ ৭৭৮-৮৪

কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র। বশিষ্ঠ-মতে, অঞ্জলিতে যে-পরিমাণ জল ধরে, মাত্র সেইটুকু একবার পান করিতে হইবে। নয় দিন এইরূপ করিয়া তাহার পর একাদিক্রমে তিন দিন উপবাস। যাজ্ঞবল্ক্য-মতে, একুশ দিন কেবল জল-পান।

চান্দ্রায়ণ। মনুর মতে, কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদে পঞ্চদশ গ্রাস আহার করিয়া, তাহার পর অমাবস্যা পর্যন্ত প্রতিদিন এক গ্রাস করিয়া খাদ্যহ্রাস, এবং শুক্লপক্ষের প্রতিপদে এক গ্রাস বৃদ্ধি করিয়া দুই গ্রাস, ও এইরূপে প্রতিদিন এক এক গ্রাস বৃদ্ধি করিয়া পূর্ণিমাতে উপবাস।

তপ্তকৃচ্ছ্র। যাজ্ঞবল্ক্য-মতে, তপ্তজল, তপ্তদুগ্ধ, তপ্তঘৃত, উত্তপ্ত দুগ্ধের বাষ্প—ইহাদের প্রত্যেকটি দ্রব্য তিন দিন করিয়া গ্রহণ।

দ্বাদশবার্ষিক ব্রত। মনু-মতে, বনে কুটীর-নির্মাণ করিয়া নরকপাল-গ্রহণপূর্বক ভিক্ষোপজীবী হইয়া দ্বাদশ বৎসর বাস।

পরাক। মনু-মতে, দশ দিন উপবাস।

প্রাজাপত্য। মনু-মতে, তিন দিন কেবল প্রাতে, পরের তিন দিন কেবল সন্ধ্যায়, তাহার পর তিন সম্পূর্ণ-দিন 'অযাচিতাশী' থাকা এবং তাহার পরের তিন দিন উপবাস।

বৃদ্ধকৃচ্ছ্র। ইহা কৃচ্ছ্রের প্রকারভেদ।

ব্রহ্মকূর্চব্রত। জাবাল-মতে, একদিন একরাত্রি, বিশেষতঃ পূর্ণিমা-তিথিতে উপবাস, এবং পরদিন প্রাতে পঞ্চগব্য-ভক্ষণ।

মহাসান্তপন। যাজ্ঞবল্ক্য-মতে, সান্তপনের ন্যায়। প্রভেদ কেবল, ইহাতে সান্তপনে বিহিত দ্রব্যগুলির এক-একটি ক্রমে, এক-এক দিনে গ্রহণ করিতে হইবে, এবং সপ্তম দিনে উপবাস।

শিশুকৃচ্ছ্র। মনু-মতে, পর পর এক-এক দিন এইরূপে খাদ্যগ্রহণ,—কেবল প্রাতে, কেবল সন্ধ্যায়, কেবল অযাচিত ভোজ্য, বায়ু।

সান্তপন। যাজ্ঞবল্ক্য-মতে, এই দ্রব্যগুলি একদিন ভক্ষণ করিয়া, পর-দিবসে উপবাস,—কুশোদক, গো-দুগ্ধ, দধি, গোময়, গোমূত্র এবং ঘৃত।

সৌম্যকৃচ্ছ্র। যাজ্ঞবল্ক্য-মতে, ক্রমশঃ এক-একদিন এই দ্রব্য-গ্রহণ, এবং তাহার পর একদিন উপবাস,—পিণ্যাক বা খৈল, ফেন, 'তক্র', জল, 'শক্তু'।

নানা কারণে উক্ত ব্রতগুলির অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয় না বলিয়া, নিবন্ধগুলিতে 'ধেনুসংকলন' অর্থাৎ ব্রতের পরিবর্তে ব্রাহ্মণকে ধেনুদানের ব্যবস্থা আছে। ব্রতভেদে দেয় ধেনুর সংখ্যাও বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। আমাদের আলোচ্য সময়ে চান্দ্রায়ণ-ব্রত ও ধেনু বা তাহার মূল্য-দানের বিধিই সমধিক প্রচলিত ছিল।

॥ ভাষ বা শাস্ত্র-সংকেত : সংগৃহীত তথ্যালোচনা ॥

সামাজিক অপরাধের ক্ষালন ও বৈষয়িক বিরোধের মীমাংসার উদ্দেশ্যে, শাস্ত্রের ভাষা বা বচন-অনুসারে ব্যবস্থা প্রার্থনা করিয়া লিখিত নিবেদন, হকিকত বা Plaint ; এবং প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত তদ্বিষয়ে পণ্ডিত ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রদত্ত শাস্ত্রবিহিত ব্যবস্থা-সংবলিত উত্তর-প্রদানের প্রচলিত নাম 'ভাষ্' বা 'ভাষ'।

গুরুতর পাপীর 'উদ্ধারে'র নিমিত্ত স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভাষ-পত্র নানাস্থানের চতুষ্পাঠীর প্রসিদ্ধ অধ্যাপকমণ্ডলীর নিকট প্রেরণ ও তাহাতে মতৈক্য করিয়া দণ্ড-ব্যবস্থা করিতেন। স্মার্ত ভট্টাচার্যগণ সাধারণের অবোধ্য শাস্ত্রের 'ভাষা' বা বচন উদ্ধার করিয়া সেগুলি মূল সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিয়া বা ব্যাখ্যা করিয়া, এক বা একাধিক স্বাক্ষরে প্রকাশ ও প্রচার করিতেন বলিয়া, এই ব্যবস্থার চলিত নাম হইয়াছিল 'ভাষ-চালানো'। দক্ষিণরাঢ়-অঞ্চলে সমাজ-প্রধান ও হিন্দু-প্রধান গণ্ডগ্রামে অদ্যাপি এই ধারা অব্যাহত আছে।

সাধারণতঃ একক বা পাঁচটি গ্রামের পাঁচজন ভট্টাচার্য একমত হইয়া 'ভাষ' দিতেন। সামাজিক ও বৈষয়িক ভেদে ভাষকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করা গেল। ব্রাহ্মণ-গুরু-পুরোহিত-সভাপণ্ডিত-শাসিত হিন্দু-সমাজে মনুষ্যমাত্রের অপরাধের ও বিরোধের যেমন সীমা নাই, প্রায়শ্চিত্ত-বিধানও তেমনি প্রায় অফুরন্ত।

খৃ ১৭২২-১৮৭৮ অর্থাৎ এই প্রায় দেড় শত বৎসরে সমাজে নিশ্চয়ই বহুবিধ ব্যাপারে ভাষ দেওয়া হইয়াছে। আমাদের হাতে যে-সমস্ত দলিল-দস্তাবেজ আসিয়াছে, তাহার মধ্যে সামাজিক ভাষগুলিকে আট প্রকারে ভাগ করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলির প্রচলন সমাজে এখনও অব্যাহত রহিয়াছে, এবং কতকগুলি অভিজ্ঞ ভট্টাচার্য মহাশয়দেরও জানা নাই। বিশ্বভারতী-সংগৃহীত সামাজিক ভাষগুলিকে[১] বিভাগ করিলে এইরূপ দাঁড়াইবে,—

(১) পুরুষ ও স্ত্রীলোকের অবৈধ প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে, কিংবা তাহার জনরবে, (২) বিশেষ স্থানে উক্ত বিশেষ কথা ভুলিয়া গেলে, (৩) ভৌতিক ব্যাপারে প্রমাদ-মৃত্যু ঘটিলে, (৪) ব্রাহ্মণেতর জাতি শব্দ-বিশেষ উচ্চারণ করিলে, (৫) বামুন মাতালে মদিরা খাইলে, (৬) তীর্থবিশেষ গমনে প্রতিবন্ধক হইলে, (৭) 'কর্মজ' ব্যাধি জন্মিলে, এবং (৮) গৃহস্থের গরুর অপঘাত-মৃত্যু ঘটিলে।

(১) অবৈধ প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে, কিংবা তাহার জনরবে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রায়শ্চিত্ত ও দণ্ড। ইহাতে মাতা কন্যা স্ত্রী ভগিনী ভ্রাতৃবধূ, এবং যে-কোনও সম্পর্কিত পুরুষ, কাহারও

১ পূর্বে দ্রষ্টব্য পৃ ৩১-৩২

নিস্তার ছিল না।— ১২৪৭ সালে নান্নুরের অটলবিহারী অধিকারীর 'আত্মবিবরণে' দেখা যায়, তাঁহার কন্যা 'আপন মাতার সঙ্গে কলহ করিয়া ক্রোধ করিয়া' অন্ত্যজ জাতির পুরুষের সহিত স্থানান্তরে যাইবার সময়, পথে আটক পড়াতে, তাহাকে বাড়ীতে আনাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করানো হইয়াছিল। কন্যা 'অল্প বয়স্কা' ও 'অতি অজ্ঞান' হইতে পারে, তবে বাড়ীর অন্ত্যজ কৃষাণের সঙ্গে যাওয়ার সময়, গন্তব্য যখন নির্দিষ্ট ছিল না, তখন পাপস্পর্শের সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষতঃ, নান্নুরের অভিযুক্তা গরবিনী দেবী ছিলেন ব্রাহ্মণ-কন্যা। গ্রামের ব্যবস্থাপক ভট্টাচার্য জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালঙ্কার এই অনাচারের প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা[1] করিয়াছিলেন।

শ্বশুরবাড়ী হইতে বিদূরিতা বধূ 'জবনান্ন স্বীকার' করার ফলে, গ্রামস্থ লোকে পিতাকে 'স্থকিত' করিয়াছিল।—পরীক্ষিৎ শৌ-এর অভিমানিনী কন্যা মুসলমান হইয়াছিল। এই ঘটনার আদিপর্বে অপ্রকাশ্য ব্যক্তিগত কোনো গূঢ় কারণ থাকিতে পারে; কিন্তু, সন ১২১১ সালে গ্রামীণ অদৃষ্টবাদী অনুন্নত শ্রেণীর একজন হিন্দুর হকিকতে এই যুক্তি-প্রবণতা অভাবিত—'কন্যা…জবনান্ন স্বীকার করিয়াছে ধিক্কারপ্রযুক্ত, প্রাক্তন বশতোই বা করিয়াছে কিম্বা কোন লিপ্সাতেই বা'।— এ-ক্ষেত্রে, সংসর্গ-শূন্য পিতাকে জাতে তুলিবার জন্য চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুকল্পে সাড়ে সাত ধেনু-মূল্য-প্রদানের বিধান ২২৭ সংখ্যক 'হকীকত সওয়াল বন্ধ পত্রে'ই মিলিবে। এই কাহিনীটিতে একখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস-রচনার উপাদান রহিয়াছে।

বিধবা ভ্রাতৃবধূর সহিত 'দুষ্ট জনরব'[2] তদারক করিয়া 'সাবুদ' না-হইলে, জনরব-দুষ্ট বাক্যের জন্য কর্তা হকিকত লিখিয়া প্রায়শ্চিত্ত-বিধি পাইল, এবং গ্রামস্থ লোক লইয়া দায় হইতে উদ্ধার হইল। কিন্তু, বিধবা বধূকে আপন ঘর হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার পরে, সে আর কোনোমতে রাইতাড়া-গ্রামের সে-ঘরে আশ্রয় পাইল না।

বিধবা কন্যা অন্য কোনো লোকের ঘরে থাকিয়া 'বেআন্দাজ আহার বেবহার' করিলে,[3] কন্যাকে ত্যাগ করিয়া পিতা প্রায়শ্চিত্ত করিতে উদ্যত হইয়া, সভাপণ্ডিতগণের নিকট শাস্ত্র-ব্যবস্থা চাহিতেন। সেহানা ওরফে হাজারাপাড়া গ্রামে নফর দে মদকের কন্যা জয়মুনির ঐ দশা ঘটিয়াছিল ১২৩১ সালে।

ভগ্নী 'জুগী-সংসর্গ হইয়া' ভ্রাতার আশ্রয় হইতে চলিয়া গিয়াছিল। ভ্রাতা খুজটীপাড়া-গ্রামের হারাধন পাণ হকিকত লিখিয়া 'বেবস্তাকর্তা' শ্রীকান্ত ঠাকুরের নিকট 'বেবস্তা' চাহিয়াছিল।[4]

কাহারও মাতার সম্পর্কে 'নীচ জনরব' ছড়াইলে গ্রামস্থ লোকে পুত্রকে 'স্থকিত' করিত। তাহাতে সন্তানের 'অত্যান্ত মনকষ্ঠ' হইত,[5] সে-কথা বলাই বাহুল্য, তবে শাস্ত্র-সম্মত ব্যবস্থা পাইয়া মাতা-পুত্রে সমাজে সচল হইত, ইহা নিশ্চিত। এ ঘটনা ১১৭৮ সালের।

১ চি-প-স ২, চি সং ২২৫ ২ ঐ, ঐ ২৪০ ৩ ঐ, ঐ ২৪১ ৪ ঐ, ঐ ২৪৭ ৫ ঐ, ঐ ৫৯৬

'পাগল' বা অনাচরণীয় কোনো ব্যক্তির স্ত্রী পুনঃপুনঃ 'বাহির হইয়া' গেলে,[১] স্বামী বাধ্য হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিত; এবং শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থাও পাইত। কিন্তু, প্রায়শ্চিত্তের জন্য এ-ক্ষেত্রে ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণের 'আজ্ঞা' প্রার্থনা করা হয় নাই। এই বিচারে শাস্ত্রব্যবস্থা চাওয়া হইয়াছে 'সোভাপণ্ডিত' পঞ্চ-'পরামাণিকে'র নিকট হইতে। হেতু, পরে বলিতেছি। স্ত্রী এক বা একাধিকবার বাহির হইয়া গেলেও স্বামীর ইচ্ছানুসারে স্ত্রীকে গ্রহণ করা হইত। কিন্তু, স্ত্রী পূর্ব-স্বামীর সহিত বসবাস করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া, প্রায়শ্চিত্ত করার পর স্বামী সমাজে সচল হইত। মেদিনীপুর জেলার দরি খিরপাই গ্রামের এই ভাষ-পত্রখানি নানা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

মেয়েদের শুদ্ধ করিয়া সমাজে গ্রহণ করা হইতেছে, এইরূপ মাত্র একখানি দলিল[২] আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই অবস্থায় ভেক লইয়া বৈষ্ণব হইয়া অনেক স্ত্রীলোক হিন্দুত্ব বজায় রাখিতেন। তবে, যে-কোনো জাতির পক্ষেই ভেক লওয়া সম্মানজনক বলিয়া মনে হইত না। 'ভেক' দেওয়ার ভয়ে 'ছামনের ঔশধি' প্রয়োগ করিয়া 'হামেল নষ্ট' করিতে গিয়া গর্ভবতী চন্দ্রা চাষানীর প্রাণান্ত ঘটিবার একটি করুণ কাহিনী[৩] জানা গিয়াছে।

তবে, শ্রীশ্রী৺ ভেক লইলে স্ত্রীলোক সমাজে স্বাধীনতা পাইত। 'বষ্ণবের পক্ষ দায় নাই'—এই কথা আমরা জানিয়াছি[৪] সাকী বেওার ব্যাপারে।

'হুস বহালে' 'সইচ্ছাপূর্বক' 'আপন খুসিতে' 'ছাড় ফারখতি পত্র' লিখিয়া 'গিরস্ত'-ত্যাগী স্ত্রীলোক একের 'পরদা পোস' হইতে 'অন্তকরনে' ইস্তবা দিয়া অপরের সহিত বৈধ 'আসনাই' করিতে পারিত। কিন্তু, কারণ দর্শাইতে হইত, 'ধর্ম্মস্ত কারন বৈরাগ্য আশ্রম লহিব'। অবশ্য, এই কারণ দেখাইলে লাভ হইত দ্বিবিধ। প্রথম, অবাঞ্ছিত প্রণয়ীর নিকট হইতে মুক্তি তো মিলিতই; উপরন্তু, প্রণয়িনীর 'ধর্ম্ম রক্ষার্ত্তে' ও 'বৈরার্গ্য হইবার কারন' মিলিত নগদ আর্থিক আনুকূল্য। তবে, ইহাই হইত তাহার, বা তাহার ওয়ারিসদের শেষ পাওনা।—বিদ্যাধরিপুর-গ্রামের লক্ষ্মী বেওার সম্পাদিত সন ১২৩১ সালের এমনি একখানি 'বেদায়া-পত্রে'[৫] 'ইসাদ'-রূপে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ বহুলোক জড়িত রহিয়াছেন। তাঁহাদের সাকিম ও মোকামসমূহ মুর্শিদাবাদ জেলার একটি বিশিষ্ট বৈষ্ণবপ্রভাবিত অঞ্চল।

এদিকে, ভেক লইলেও গ্রামের লোকে পিছু লাগিতে ছাড়িত না। গ্রামের বিধবাকে রামকুমার ঘোষের সঙ্গে 'খারু হস্তে এক অন্নে থাকিয়া ঘর দুয়ার করিতে' দেখা,[৬] নবস্তা গ্রামের লোকে বরদাস্ত করিতে পারে নাই।

এই অবস্থায়, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়াও নিষ্কৃতি ছিল না[৭]। সাবেক গুরু লাগিতেন পিছনে। গুরু-যাজন বাবদ তাঁহার বার্ষিকী তিনি ছাড়িবেন কেন।

১ চি-প-স ২, চি-সং ২২৯ ; দ্র. পৃ ১৮৭ ২ ঐ, ঐ ৫৯৭ ৩ ঐ, ঐ ৩৮০ ; পৃ ১৮৭
৪ ঐ, ঐ ২৪৮ ৫ ঐ, ঐ ৪৪২ ; পৃ ১৮১ ৬ ঐ ঐ ২৪৮ ৭ ঐ, ঐ ১৮৯ ; পৃ ২৫৩

তাই, রামগঞ্জের করুণা বেওা ও রামজয় সূত্রধর ইলামবাজার মোকামে থাকিয়া ভেক লইয়া বৈষ্ণব হইলেও, প্রথম মন্ত্রদাতা গুরু মথুরানাথ ঠাকুর তাহাদিগকে তলব করিয়া হাজির করাইয়া, প্রাপ্য বার্ষিক আয়-প্রদানের জন্য একরার লিখাইয়া লইয়াছিলেন। তবে, এ-সব ঘটনার অধিকাংশই ঘটিত হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে।

আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং লক্ষণীয় প্রথা দক্ষিণরাঢ়-অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। কন্যা ভিন্ন-জাতির পুরুষের সহিত প্রথম-সংসর্গী হইলে, অন্ন-পাপের প্রায়শ্চিত্ত[১] করাইয়া, অধিকারী দানকর্তা জুটিলে, কন্যার শাস্ত্রসম্মত বিবাহ হইত; নতুবা, স্বয়ংবরের প্রথায় সম্ভবতঃ জাত্যন্তরেই 'অশুদ্ধ স্বয়ংবরাকারে' বিবাহ হইত। কিন্তু, এই বিবাহে প্রয়োজন হইত 'আট মোজের এক বাক্যতা' অর্থাৎ আটটি গ্রামের এবং নিজ-গ্রামের সকলের সম্মতি, এবং বিধিকর্তাদের 'বিশিষ্ট মর্য্যাদা' করা। পূর্ববর্তী বিবাহ-প্রকরণে[২] এই পত্রখানির আলোচনা করিয়াছি। বর্ধমান জেলার ছোটবৈনান গ্রামে প্রাপ্ত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের অধস্তন বংশীয়দের প্রদত্ত, এই গোপন ভাষপত্রখানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জনরবে পতিত আত্মীয় খুদীরাম সৌকে টাকা আদায়ের জন্য চাষ-আবাদ করাইবার উদ্দেশ্যে বাটিতে বাস করাইয়া 'অন্নজল' দেওয়াতে, এবং তাহার 'উচ্ছিষ্ট' ঘুচানোতে এক পিসি ধনমনি বেওা তাহার মৃত্যুর পর, তাহার আত্মীয়-স্বজনকে বড়ো বেকায়দায় ফেলিয়াছিল। পিসি পৃথক্ থাকিলেও জ্ঞাতিরা তাহাকে 'স্বকিত' করিয়াছিল। মৃত্যুর পর পিসীর দাহন করিয়া গোপালনগরের আত্মীয়গণকে নান্নুরের জগদ্দুর্লভ ন্যায়ালঙ্কারের নিকট শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা চাহিতে দেখা যায়[৩]।

ব্রাহ্মণদের সমাজ-দুর্গেও অনেককাল হইতেই ফাটল ধরিয়াছিল। 'মুচানী অপবাদে' 'রহিত' বেণীমাধব মণ্ডলের ঘরে 'চাটুজ্যা'-'বানর্জা' মহাশয়গণ 'পঞ্চগ্রামি', 'সপ্তগ্রামি' ব্রাহ্মণঠাকুর ও স্বজাতির বিচার এবং 'বেদের অমাণ্য করিয়া' 'ফলাহার'-আদি করিয়াছিলেন। সুতরাং, তাঁহাদিগকে রহিত করিবার জন্য আর-এক ব্রাহ্মণমণ্ডলী কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যাইবে ২৪৫ সংখ্যক ভাষে। ২৪২সংখ্যক 'ফলাহার'-প্রসঙ্গের ভাষপত্রখানিতে কুলিনগ্রামের একজন ভট্টাচার্যের দর্শন মিলিবে।

পতিত উদ্ধার লইয়া কিরূপ গুরুতর 'মোষতন' হইত, এবং পাতিত্য-বিবাদে দশের মহিমার একটি বাস্তব উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যাইবে ২২১সংখ্যক ভাষে—বাঁকুড়া-বড়জোড়ার হারাধন দে-এর ব্যাপারে। দে মহাশয়কে পঞ্চগ্রামীর মান্য আট টাকা দিয়া, এবং এক দিবস সেবাযোগ করাইয়া, বিধিমতো প্রায়শ্চিত্তের পরে, পুরোহিতের 'হুকা' পাইতে হইয়াছিল। 'এক ঘটী জলে উদ্ধার' পাওয়া কোনোক্রমে মান্যবর দে মহাশয়ের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।

১১৬৫ সালের একটি 'ওয়াপোশ' বা ফেরত পাইবার পত্র-লিখনের বয়ান[৪] এইরূপ।—

১ চি-প-স ২, চি-সং ৫৯৭ ২ পৃ ১১৩, ১৮৬ ৩ চি-প-স ২, চি-সং ২২৩

৪ ব-সা-স, পুঁ-সং ১০১৮; দ্র. পৃ ১৮৬-৮৭

শ্রীশ্রীরামঃ।

সন ১১৬৫।—

৮ শ্রীকৃষ্ণরাম সর্দ্দার
শ্রী[illegible]তারাম কর্মকার

লিখিতং শ্রীকানাই কর্মকার—

ওয়াফশ পত্র মিদং লিখনং কার্য্যাঞ্চ আগে—

আমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার স্ত্রী আছিলেন তেহো এ বাটীকে মাথায় সৌতে আসীয়াছিলেন তাহার পর আইসেন নাই তেহোঁ বাপের বাটী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন এই মাত্র—

—এই দলিলখানির সামাজিক ব্যঞ্জনা ব্যতীত, ইহা প্রাক্-রামমোহন যুগের পুরাতন বাঙ্গালা গদ্যের নিদর্শনরূপে গুরুত্বপূর্ণ। প্রসঙ্গতঃ, ১১২৯ সালে (খৃ ১৭২২) লিখিত (চি-সং ২৩৪) ভাষপত্রের ভাষার গঠনপ্রণালীটিও সবিশেষ লক্ষণীয়।

(২) বিশেষ স্থানে উক্ত বিশেষ কথা ভুলিয়া গেলে। গঙ্গাতীরে পিতৃ-তর্পণের উদ্দেশ্যে পশ্চিম মুখে বসা হইয়াছে। এমন সময় পিতামাতার গুরুর জ্ঞাতি একজন আসিয়া উত্তরদিকে দাঁড়াইয়া 'দক্ষিণকর্ণের অদ্ধ´হস্তের তফাত হইতে' কি-এক কাজের কথা বলিয়াছিলেন।— তাহা স্মরণ নাই, শ্রীমতী মাতারও স্মরণ নাই। কিন্তু, এই বিস্মরণের ফলে, যদি কিছু পাপ অর্সাইয়া থাকে, এই আশঙ্কায় শাস্ত্রব্যবস্থা চাওয়া হইয়াছে ২২২ সংখ্যক ভাষ-পত্রে।

(৩) ভৌতিক ব্যাপারে প্রমাদ-মৃত্যু ঘটিলে।—অসুস্থ ভ্রাতৃবধূ। উত্থানশক্তি রহিত। 'তুলসী ক্ষেত্র কয়েক বার করা গ্যাছে এমত অচল।' এক সন্ধ্যায় ছয়-সাত দণ্ড[1] অতীত হইবার পরে, সহসা সেই অচল বধূকে শয্যায় দেখা গেল না। সকলেই বিস্ময়াপন্ন।—'অচল কিরূপে গ্যালেন'। তাহার পর পাড়াপড়শী মিলিয়া 'প্রদীপ ও মশাল লইয়া' সন্ধান শুরু হইল। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে বাটি হইতে '৪ কুড়া[2] কিম্বা ৫ কুড়া' দূরে 'একটি গড়্যা পুষ্কণী জলেতে পড়িয়াছিল' পাওয়া গেল। নিশ্চয় করা হইল, 'নিতান্ত ভৌতিক বিশয় নতুবা অচল বেক্তি কিমতে আইসে'। তাহার পর, 'প্রমাদ মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া' দাহাদি করা হইল। এখন ভট্টাচার্য মহাশয়েরা যেমত ব্যবস্থা আজ্ঞা করেন। তবে, ব্যবস্থায় আটকায় নাই। রামকানাই দেবশর্মার আলোচ্য 'নিবেদনপত্র'খানিতে[3] তাহার নজির পাওয়া যাইবে।

(৪) ব্রাহ্মণেতর জাতি শব্দ-বিশেষ উচ্চারণ করিলে। 'গো' পবিত্র শব্দ—প্রায় প্রণবের সগোত্রীয়। শূদ্রের ইহা উচ্চারণ করিতে নাই। স্ত্রীলোকদের তো নাই-ই। তবুও, এক সোনার বেনে অটলবিহারী সেনের বাড়ির এক দুঃসাহী, কিংবা অজ্ঞ মেয়ে এই পবিত্র 'গো'

১ দক্ষিণ-রাঢ়ে, 'হাঁড়ী-তোলার রাত' ২ বিঘা—বিশ কাঠা

৩ চি-প-স ২, চি-সং ২২৮, বিশ্বভারতী পত্রিকায় (১৩৫৩, শ্রাবণ-আশ্বিন) আলোচনা দ্রষ্টব্য

শব্দটী উচ্চারণ করিয়া ফেলিয়াছিল—১১৭২ সালে। স্বতরাং, প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা করিতেই হইবে। এই হকিকতের[১] উপর বুইনান-গ্রামের টীকারাম সিদ্ধান্তবাগীশের ভাষ-পত্রটি পাই নাই।

(৫) বামুন মাতালে মদিরা খাইলে। বৈন্তনাথ ও পার্বতী স্বর্ণকার তাহাদের গুরুর নিকট একরার-পত্র লিখিতেছে। গুরু বোধ হয় বর্ণের ব্রাহ্মণ।—একদা নবাই পাল তাহাদের বাড়ীতে মদিরা আনিয়া বামুন মাতালের সহিত এক-পাত্রেই খাইয়াছিল। সেই ব্যাপার এই স্বর্ণকারদের 'য়াপন নজরে' দেখা। শুধু তাহাই নহে। সেই 'বামুন মাতাল' স্বর্ণকারদের ঘরে ভাত খাইয়াছিল। ব্রাহ্মণ-ঘরের অন্ন আনিয়া দিবার প্রস্তাব মানে নাই। এই সমস্ত কথা গুরু শুনিয়া একরার লইয়াছিলেন,—'আমাদ্দির হইয়া জে এমন সামিগ্র খাইবেক কি খআবেক সে···মার রক্ত খাইবেক'। পুনশ্চ, ব্রাহ্মণের একরার, 'এমন কম্মকার ব্রাহ্মন সর্ব্ব দেবতার স্তানে পতিত হই এবং গুরুদণ্ডী, রাজডণ্ডী এবং গেআতডণ্ডী হইব'।—১২০৬ সালে সম্পাদিত এই দলিলে[২] সাক্ষী নওপাড়ার ভৈরবানন্দ দেবশর্ম্মা এবং চানকের গিরিধর পাল।

(৬) তীর্থবিশেষ-গমনে প্রতিবন্ধক হইলে। অকালে শ্রীশ্রী৺গয়াধাম-গমন শাস্ত্রসম্মত কিনা, তাহার ব্যবস্থা জানিতে চাহিয়াছিলেন পহলানপুরের রামকুমার চক্রবর্ত্তী— দুইজন চক্রবর্ত্তী ও রাজীব বারিককে সাক্ষী রাখিয়া। এই ২৪৬সংখ্যক দলিলখানিতেই 'ভাশ' বা 'ভাশ পত্র'— এই কথার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে।

(৭) 'কর্ম্মজ'-ব্যাধি জন্মিলে। আয়ুর্বেদ বলেন,— যথাশাস্ত্রঞ্চ নির্ণীতো যথাবিধি চিকিৎসিতঃ। ন শমং যাতি যো ব্যাধিঃ স জ্ঞেয় কর্ম্মজো বুধৈঃ॥—অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক ও উপপাতক ভেদে পাপ-কর্ম্মজ বা পাপজ ব্যাধি আবার চতুর্বিধ। অর্শ-ভগন্দরাদি অতিপাতকজ ব্যাধি। গ্রহণী যক্ষ্মাদি হইল মহাপাতকজাত ব্যাধি; এবং অম্ল, প্লীহা—এই সব হইল অনুপাতক বা উপপাতকের পীড়া। এইরূপ পাপজ দৈহিক পীড়ার মধ্যে আমাদের সংগ্রহে যে-গুলির হকিকত আছে, তাহাতে অনেক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাইবে; যেমন, ইন্দুর-কামড়ানো, কাস-ব্যামো, অম্বল-শূল, বাইসোত, গুহ্যদ্বারে ও নাভিস্থানে ঘা এবং 'শরীরে ধোব চিহ্ন' ইত্যাদি[৩]।

কাস-ব্যামর বিবরণ এইরূপ,—'মৌজে সিঙ্গারপুরের শ্রীরামকান্ত নন্দীর গলা খুষ খুষ করে কাষ বেয়ামহ গএর ওঠে এবং কাসে'।—স্বতরাং ইহাকে পাতক-ব্যাধি সিদ্ধান্ত করা হইল। এবং গ্রামের কর্মকার, কুণ্ডু ও মণ্ডল মহাশয়গণ পরামর্শ করিয়া, নন্দী মহাশয়ের আরোগ্যের নিমিত্ত সভাপণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্যের শ্রীচরণে নিবেদন জানাইলেন, প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা দিবার জন্য আজ্ঞা করিতে[৪]।

১ চি-প-স ২, চি-সং ৫১৫ ২ ঐ, ঐ ২৪৪ ৩ দ্র. পৃ ৩১-৩২ ৪ চি-প-স ২, চি-সং ২৫৫

মমরেজপুর গ্রামের পাঁচ জামাইয়ের এক শ্বাশুড়ীর অম্বল-শূলের বেদনা ছিল। তাহা 'সুস্থ' হইয়া আবার বাইসোত-ব্যাম উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার বড়ো জামাই অভয় মণ্ডল জামাইগণের মুখপাত্র হইয়া সভা-ভট্টাচার্য মহাশয়ের বরাবরে 'অর্জীগত' পেশ করিয়াছিল প্রায়শ্চিত্ত 'করিবার' জন্য। বেচারীরা ছিল 'অতি গরীব'। তাই 'দুখের মত' বিধান[১] চাওয়া হইয়াছে।

ছোটবৈনান গ্রামের পঞ্চারাম মান্নার 'সারিরিক গুহ্মীদারে ঘা হইয়া পুজ রক্ত নির্গত' হইতেছিল, এবং 'সরিরে উপর ধোব চিন্ন' আর 'নাভিস্থানে ঘা' হইয়াছিল। সুতরাং, সভাপণ্ডিত ভট্টাচার্য মহাশয় প্রায়শ্চিত্ত না-করিলে আর কোনও গতি ছিল না। তবে, ভট্টাচার্যদের ফর্দ যাহাতে লম্বা না-হয়, সেইজন্য গরীব মান্না মজকুর 'দারিদ্র মতে' ব্যবস্থা চাহিয়াছিল, সে-কথা পত্রেই[২] প্রকাশ।

(৮) গৃহস্থের গরুর অপঘাত মৃত্যু হইলে। এই মৃত্যু নানা প্রকারে হইতে পারে। যেমন, অপালনে, বজ্রপাতে, দণ্ডাঘাতে, ঠেঙ্গা মারায়, মুগুর ফেঁকায়, ডেলা মারায়, ঠেলিয়া দেওয়ায়, বন্ধন-দশায়, কুকুরের কামড়ে, মুসলমানে নষ্ট করিলে, জলে বা দঁকে পড়িলে ইত্যাদি। মুসলমানকে গরু বিক্রয় করিলে,[৩] হিন্দুকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত; ছুত্তি[৪] বাদ করিলেও অপরাধ হইত। আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এই হকিকত-পত্রগুলি যথাক্রমে ২৫৪, ২২৪, ২৩০, ২৩৪, ২৫৩, ৫৯৯, ৬০০, ২৩১, ২৩২, ২৫৬, ২৫৯, ৫৯৮, ২৩৩, ২৩৬, ২৫২, ২৩৭, ২৩৯, ২৩৫, ২৫১ সংখ্যক ভাষ-পত্রে এবং প্রচলিত 'প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা' পুরোহিত-দর্পণ-গ্রন্থে[৫] পাওয়া যাইবে।

এইগুলির মধ্যে মাত্র একটি ঘটনার[৬] বাস্তব করুণ চিত্র দেখানো যাইতেছে। সন ১২৩৬ সালের ২৩-এ চৈত্র বেলা আন্দাজ আড়াই প্রহর। অর্থাৎ প্রায় ১৷৷০ টা। মৌজে ছোট-বৈনানের হরপ্রসাদ নন্দী লাঙ্গল করিয়া মাঠ হইতে আসিয়া বাড়ীতে দেখে যে, গাভী-দোহন হয় নাই। কম্‌লে বাছুরটি রৌদ্রে বাঁধা আছে। এই দৃশ্য দেখিয়া রৌদ্রে-পোড়া এক কৃষকের 'বাটীতে' অর্থাৎ তাহার স্ত্রীর উপর রাগ-হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তবে, এই রাগ প্রকাশ পাইল স্ত্রীকে উত্তম-মধ্যমে নহে; বাছুরটির গলা হইতে দড়ি খুলিয়া দিয়া। তবে, গো-বৎসের গলার দড়ি খুলিয়াই নন্দী মহাশয়ের আপন বৎসটির মুখ বোধ হয় মনে পড়িয়া গিয়াছে। এতো বেলা অবধি তাহারও নিশ্চয়ই দুধ খাওয়া হয় নাই।

১ চি-প-স ২, চি-সং ২৫৭ ২ ঐ, ঐ ২১৮ ৩ ঐ, ঐ ২৩৬, ২৫২

৪ ঐ, ঐ ২৫১। দক্ষিণরাঢ়ে প্রচলিত 'ছুত্তি'-র নিয়ম এইরূপ: 'তোমার গরু আমার টাকা'—এই মন্ত্র তিন বার পড়িয়া, এক মুটি দূর্বা ঘাস গরুটিকে খাওয়াইতে হয়; এবং ক্রেতা একটি টাকা বা পাঁচ কড়া কড়ি এই সময় গরুর মালিক-বিক্রেতার হাতে দিয়া থাকেন। ৫ পৃ ৯৮০-৮১ ৬ চি-প-স ২, চি-সং ৬০০

তখন ধাবমান বাছুরটির পিছে পিছে ধাইয়া, তাহাকে দুগ্ধ পান করিতে না-দিয়া, রাগের ঝোঁকে হয়তো একটু জোরেই ঠেলিয়া দিয়াছিল। এই ধাক্কা আর্ত ও অক্ষম বাছুরটি সামলাইতে পারে নাই। দাওয়া হইতে নিচে পড়িয়া গেল। পড়িয়া 'ভিমির মতন' হইল। এই না দেখিয়া বিহ্বল চাষী তখন সাত-তাড়াতাড়ি তেল জল আনিয়া বাছুরটির মাথায় দিল। অল্প জল তাহার মুখেও ঢালিয়া দিল। কিছু পেটে গেল, কিছু গেল না। কিছুক্ষণ বাদে বাছুরটি মরিয়া গেল।

কিন্তু হায়, পরিশ্রান্ত অভুক্ত গরীবের শোক[১] করিবার অবসর ত নাই। সমাজ, পুরোহিত সবাই উদ্যত হইয়া আছে। তাহাকে হকিকত লিখাইয়া শাস্ত্র-অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। হইলই-বা সে দরিদ্র, আপন হস্তে গোহত্যা, সে-যে ভয়ানক ব্যাপার। তাই সিংহ, নন্দী, মণ্ডল, কর্মকার, চক্রবর্তী মহাশয়রা সকলে মিলিয়া তাহার উপকারে লাগিয়াছেন 'রাজ সভাপণ্ডিত মহাশয়ের' নিকট হইতে শাস্ত্র-ব্যবস্থা আনিয়া তাহাকে সমাজে তুলিবার জন্য।

এইগুলি ছাড়া, আরও কয়েকটি হকিকত আমাদের সংগ্রহে আছে। যেমন, (১) স্থানান্তরে থাকায় নীচ জনরব এবং তাহাতে 'ধর্ম-সমস্তা' অর্থাৎ ধর্মসংস্থা করিয়া জাতিতে ওঠা,[২] (২) পুত্র পিতার অজ্ঞাতসারে বাটী হইতে গিয়াছিল— এবং নীচ জনরব[৩] হইয়াছিল (৩) ২৫০ সংখ্যক ভাষপত্রে—'জের্জ্জরে কাবেল' বলিয়া[৪] অর্থাৎ উপযুক্ত বলিয়া গয়ারাম চট্টোপাধ্যায়কে জাতে তুলিয়া লওয়া হইল। বোধ হয় সে কোনও অপ্রকাশ্য কারণে পতিত হইয়াছিল (৪) অশৌচ সম্পর্কে প্রদত্ত ভাষ[৫]।

দণ্ডদাতা। শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম করিলে তাহাতে হিন্দুর হইত পাপ। তাহার দণ্ডদাতা ছিলেন ঋষি (অর্থাৎ শাস্ত্রধৃত ঋষিবচন) ও গুরু। আর সমাজবিরুদ্ধ কর্ম করিলে তাহাতে হইত অপরাধ। তাহার দণ্ডদান করিতেন রাজা, জাতি, গুরু ও গ্রাম-ষোল-আনা। তবে, মোটামুটি এই বিভাগ থাকিলেও সর্বত্র ইহা প্রতিপালিত হইত না।

আমাদের সংগৃহীত হকিকতগুলিতে দেখা যায়, বেশীর ভাগ প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা চাওয়া হইতেছে, স্থানীয় সভাকর, ব্যবস্থাপক, বিধিকর্তা, রাজ-সভাপণ্ডিত, ভট্টাচার্য মহাশয়গণের নিকট হইতে। কোথাও কোথাও পঞ্চগ্রামী ও সপ্তগ্রামী ভট্টাচার্য মহাশয়গণকে আহ্বান করা হইয়াছে। নবদ্বীপ হইতেও ব্যবস্থা বা ভাষ আনা হইত[৬]। গ্রামস্থ বা ভিন্ন গ্রামের মণ্ডল মুখ্য পরামাণিকদেরও বিধান লওয়া হইয়াছে, দেখা যাইবে। এই সমস্ত বিচারে 'ইসাদ' বা সাক্ষী দরকার হইত ঘটনা-প্রমাণের উদ্দেশ্যে।

১ প্রচলিত বিশ্বাস, গরু মরিলে কাঁদিতে নাই। ২ চি-প-স ২, চি-সং ২২৬
৩ ঐ, ঐ ২৪৩ ৪ ঐ, ঐ ২৫০ ৫ ঐ, ঐ ২৬০ ; দ্র. পু. প, পৃ ৩৭৬-৭৮ ৬ ঐ, ঐ ৩৫৭

প্রামাণিক। বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি প্রত্যেক সামাজিক-অনুষ্ঠানে ক্ষৌরকার্য অপরিহার্য। পেশাগত ক্ষৌরকার্যের জন্য হিন্দু-সমাজ নাপিত-জাতিকে নির্দিষ্ট করিয়াছে। প্রত্যেক সামাজিক অনুষ্ঠানে অত্যাবশ্যকভাবে নাপিতের প্রয়োজন হয়; সেইজন্য, প্রায় প্রত্যেক সামাজিক কার্যের প্রমাণস্বরূপ নাপিতকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। এই কারণেই নাপিত 'প্রামাণিক'। ইহাই হইল সাধারণ নিয়ম। এই নিয়ম মূলতঃ আদিবাসী-সমাজের অনুকরণে হিন্দুসমাজে প্রচলিত হইয়াছে।

বিভিন্ন জাতির সামাজিক কার্যের প্রমাণস্বরূপ সেই জাতির মধ্যেই নির্দিষ্ট ব্যক্তি থাকে। এবং তাহারাই সেই জাতির 'প্রামাণিক' বলিয়া গণ্য হয়। ইহারা জাতিতে নাপিত না-হইলেও কোথাও ক্ষৌরকর্ম করে, কোথাও করে না। জাতিবিশেষের প্রধান এবং ক্ষৌরকর্ম যুক্ত হইয়া পেশাগত নাপিতের উৎপত্তি।

পক্ষান্তরে, ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ হইতে পারে,—চূড়াকরণ-সংস্কারে ক্ষুরপাণি নাপিতকে সবিতাদেব, এবং ক্ষুরকে বিষ্ণুদংষ্ট্রা ভাবনা করিতে হয়[১]। অনুপনীত ব্রাহ্মণ-বটুকের মন্ত্রপূত দক্ষিণ ও বাম কপুষ্টিকাদ্বয় ও কপুচ্ছল ছেদনের অধিকার ব্রাহ্মণেরা নাপিতকেই দিয়া থাকেন। ফলে, প্রকারান্তরে নাপিতের প্রমাণ-পটুত্বও স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। এইজন্যই সমাজে নাপিত সাধারণভাবে 'প্রামাণিক' বা 'পরামাণিক' নামে প্রাধান্য পাইয়া আসিতেছে[১]।

দণ্ডবিধি। আলোচ্য সময়ে স্মার্ত ভট্টাচার্য মহাশয়দের ব্যবস্থা সাধারণতঃ চান্দ্রায়ণাদি ব্রত[২] এবং ইহার অনুকল্পে ব্রাহ্মণকে ধেনু অথবা ধেনুমূল্য, স্বর্ণ-দানাদি 'ঋষিদণ্ডে' অর্থাৎ শাস্ত্রবচন-অনুযায়ী অনুমতি-প্রদানেই সীমাবদ্ধ থাকিত। শিষ্য গুরুর অবাধ্য হইলে গুরুও তাহাকে গুরুতর দণ্ড দিতেন।

'গুরুদণ্ডী' ব্যক্তিকে সমাজে অচ্ছুতের মতো সাজা দিবার জন্য গুরু তদ্বির করিতেছেন দেখা যাইবে ৫২১সংখ্যক পত্রে।—'আপনকারদ্দের গ্রামের শ্রীকাসীনাথ মণ্ডল আমার সীস্য আমাকে মানেনা অনেক ক্রুটী করিয়াছে তাহা সাক্ষাতে নিবেদন করিব আমী ওহাকে নিগ্রহী পত্র আপনকারদ্দের নিকটকে পাঠাইয়াছীলাম তাহাতে যুণী জে গুরুদ্রহি লোককে লইয়া তোমাদ্দের গ্রামের লোকে বেবহার করেন আপনকারা বিজ্ঞ বটেন সকলকে কহিবেন জেন মণ্ডল মজকুরকে লইয়া লোক বেবহার না করে।'

'গেআতদণ্ডী' পতিতকে জ্ঞাতিরা বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি সামাজিক কর্মে বর্জন করিত।

'রাজদণ্ডী' অর্থাৎ জমিদার বা রাজার নিকট হইতে প্রাপ্ত দণ্ড। সম্ভবতঃ প্রচলিত রাজদণ্ড ছিল অপরাধীর আটক বা জরিমানা।

১ অভিজ্ঞ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন, সংসারের সর্বজীবের আরোগ্যদাতা হইলেন সূর্যদেব। এইজন্য নবজাত কুমারের চূড়াকরণের সময়ে, ক্ষতাদির ভয়ে মন্ত্রবক্তা আচার্য, নাপিতকে সূর্যের সহিত অভিন্নকল্পনা করিয়াছেন; এবং ক্ষুরকে বলিয়াছেন বিষ্ণুর দাঁত।—স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বিবৃতি। ২ দ্র. পু. দ, পৃ ৯৮২-৮৪

গ্রাম ষোল-আনার নিকট হইতে যে দণ্ড লইতে হইত তাহা বড়ো ভয়ানক। ধোপা নাপিত ও হুঁকা বন্ধ হইত। অর্থাৎ একঘ'রে হইয়া সেই গ্রামে বসবাস করা পতিতের পক্ষে অসম্ভব হইত। আবার দশের মাহাত্ম্যও অসীম। ইঁহারা প্রসন্ন হইলে পতিতকে এক ঘটি জল স্পর্শ করিবার অধিকার দান করিয়া উদ্ধার করিতে পারিতেন, এবং পুরোহিত দিতেন স্বজাতির বিভেদবিনাশক হুঁকা বাড়াইয়া। ইহা লইয়া আবার মতান্তর ও দলাদলিরও অন্ত ছিল না। এই সম্পর্কে বেলেতোড়-পথর্ণা-অঞ্চলের ২২১সংখ্যক বিবরণ-পত্রখানি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

ব্যয়। ভট্টাচার্য মহাশয়দের নিকট হকিকত পাঠাইয়া ভাষ চাহিতে গেলেই 'তৈলবট' বা দক্ষিণা দিতে হইত। তৈলবট[১] চার আনার মতো সাধারণতঃ দেওয়া হইত। অতিপাতক ব্যাধিতে ৩০ কাহন,[২] মহাপাতকে ১৫ কাহন,[৩] ও অন্য বা উপপাতকে ৭½ কাহন[৪] বরাটক ঋষিদণ্ড বাবদ দিতে হইত। এই সকল প্রায়শ্চিত্তে সাক্ষাৎ ধেনুদানই হইল বিধি। অসামর্থ্যে মূল্য বাবদ কড়ি দিতে হয় মোট ৩ কাহন[৫] করিয়া। অবশ্য ভাষ-প্রার্থীর অবস্থা বা সঙ্গতি অনুসারে ইহার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। পতিত দরিদ্র হইলে, 'দুঃখের মত' বা 'দারিদ্র্য মতে' ব্যবস্থা দিতে ভট্টাচার্য মহাশয়েরা অগত্যা বাধ্য হইয়া থাকেন।

ভাষের পরবর্তী পরিণতিতে আমরা দেখি, তকৃতাক্ ও মন্ত্রতন্ত্র; আবশ্যকীয় আচার-অনুষ্ঠানে গোপনীয়তা ও মন্ত্রের প্রয়োগ।—যেমন, আগের দিনের ছাড়া, বাসি-কাপড়ের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নয় বার ঝাড়িয়া, পরিধান করিবার বিধান[৬] আছে। এইরূপ ধোলাই বা প্রায়শ্চিত্তের ফলে, বাসি-কাপড় কাচা-কাপড়ের মতো শুদ্ধ হয়। অথবা, ভাত খাইবার সময় বসিবার আসন সকড়ি হইলে, বামহস্তদ্বারা তিন বার ঝাড়িয়া লইলে শুদ্ধ হয়।

এই সঙ্গে 'তুকের' তিনটি পুরাতন নিদর্শন[৭] উদ্ধার করা গেল,—(১) রবিবারে পুষ্যা নক্ষত্রে তুলিয়া আকন্দের মূল হস্তে থুইলে শস্ত্রে না বেন্দে। (২) বেঙ্গের তৈল মাখিয়া জোখের গুঁড়ি হাথে মাখিলে অগ্নিতে হাত পোড়ে না। (৩) উন্মত্ত কুকুরের দক্ষিণ পাঞ্জরের হাড় [দিয়া] শনি মঙ্গলবারে স্ব স্ত্রীর নাম আপন অঙ্গে লেখে সে শীঘ্র আইসে।)

---

১ চি-প-স ২, চি-সং ২৫৪। তৈল ও বট, তৈলক্রয়ার্থ বট—তৈলবাট; তলবাটক ভূমি বা তত্তুল্য বস্তুর মূল্যাদি। তল—ভূমি, বাট—বহনকারী। 'অদন্তাদ্বহ'—এই সূত্র-অনুসারে বহ্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় দ্বারা সাধিত 'বাট' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। এবং 'ভজ দীর্ঘশ্চ' এই সূত্র-অনুসারে বহ্ ধাতুর অ-কারের বৃদ্ধি হয়। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত ৪৭৮ খৃষ্টাব্দের অনুশাসনে এই 'তলবাট' কথাটি পাওয়া গিয়াছে।

২ দশটি ধেনু-মূল্যের সমান ৩ পঞ্চ-ধেনুমূল্যের সমান ৪ সার্ধত্রিধেনুমূল্য

৫ গাভী—১ কাহন বরাটক, বৎস—১ কাহন বরাটক, দুগ্ধ—১ কাহন বরাটক,—একুনে তিন কাহন।

৬ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের বংশজ স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বিবৃতি। এই প্রকরণের 'ন'-সংকেতের ভাষপত্রগুলি তাঁহার সংগ্রহ হইতে সংকলিত। ৭ পুঁ-প ২, পৃ ৭১০-৫১

পরিশিষ্ট ঃ

আদিবাসী-সমাজে অপরাধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে পঞ্চগ্রামী বিচারের বিশেষ প্রথা বর্তমান। সেখানেও জোরদার 'মীটিং' হইয়া থাকে। তাহাদের রায় ও দণ্ডবিধির নিদর্শনরূপে একটি লোকগীতি মদীয় সংগ্রহ হইতে উদ্ধার করিয়া দেওয়া গেল। বাঁকুড়ার মাহাতো-সমাজের কোনও নারীঘটিত কেলেঙ্কারির ব্যাপারে,—

মাঅত[১]দের মিটিন হ'ল ভারি,
বিষ্টু মাঅতর ছিল ভাণ্ডারী[২]।
লাচনী লাচা[৩] ঘর বন্ধ,
পাতা-লাচাটি[৪] বড় মন্দ,
দশ দিনে করিবে খাওয়া রে।
চার ছাগল ভখ্যান,
বোরাত[৫] যাবে সাত জন,
শাড়ী দিবে একটি করি ॥

আলোচ্য আদিবাসী-সমাজে তাঁহাদের মুলুকের পঞ্চায়েতগণ গণ্যমান্য ব্যক্তিরূপে মর্যাদা লাভ করিয়া থাকেন। এবং সেই সূত্রে তাঁহাদের পত্নীগণেরও আভিজাত্য-গর্বের সীমা নাই। এমন-কি, ঘোর কৃষ্ণবর্ণের স্ত্রীলোককেও, গাত্রবর্ণের টিট্‌কারি দিলে, তাহার দুই-কথা শোনাইবার অধিকার বর্তাইত। যেমন,—

কালো কালো বলো না ধনি,
আমরা পঞ্চাহিতের[৬] কামিনী ॥

আলোচ্য ভাষ-প্রকরণে যে-সকল তথ্য সমাহৃত ও আলোচিত হইল তাহা অতি নগণ্য। একটি বিশাল সমাজের সুদীর্ঘকালের পরম্পরা বিশ্লেষণ করিতে হইলে, নিঃশেষে সকল তথ্য সমাহরণ করিতে হয়। কিন্তু, তাহা আপাততঃ একক প্রচেষ্টায় সম্ভবপর নহে বলিয়া এইখানেই শেষ করা গেল। শেষ করার পূর্বে, সেকালের রাঢ়ী সমাজের এক প্রধান ব্যক্তি বর্ধমানাধিপতি মহ্‌তাবচন্দ্‌ বাহাদুরের এই বিষয়ে উদ্যম সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক।

বর্ধমান-রাজপ্রাসাদ হইতে আমরা এই বিষয়ে কিছু তথ্য[৭] সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

---

১ মাহাত ২ সমাজকর্মে ভাণ্ডাররক্ষক প্রামাণিক ৩ ঝুমুরওয়ালীর নৃত্য
৪ [কালি]পাতা নৃত্য। সাঁওতালগণ ইহাকে 'চড়ক'-নৃত্য বলে। ৫ কার্যভার [লইয়া] ৬ পঞ্চায়েতের
৭ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যোগাযোগে এই সংগ্রহ সম্ভবপর হইয়াছিল (২৫-১২-১৯৫৩)।

১৭৯৫ শকাব্দে মহ্‌তাবচন্দ্‌ এই বিষয়ে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন— 'প্রশ্নোত্তর মালা'। তাহার নামপত্র এইরূপ,— প্রশ্নোত্তরমালা। /বর্দ্ধমানাদি মহামহীশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাবচন্দ্‌ বাহাদুর/কর্তৃক/নানাদিগ্‌দেশীয় অধ্যাপকগণের ব্যবস্থা সঙ্কলন-পূর্ব্বক স্বীয় সভাসদ্‌ পণ্ডিতগণ দ্বারা/সংশোধনানন্তর নিজ মন্তব্য সহ প্রকাশিতা।/ বর্দ্ধমান/সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীপুরুষোত্তমদেব চট্টরাজ দ্বারা মুদ্রাঙ্কিতা। /শকাব্দা ১৭৯৫। অগ্রহায়ণ।

সেকালের হিন্দু-সমাজে পাশ্চাত্য আচার-ব্যবহারের প্রবর্তন হওয়ায়, তাহারি সহিত তুলনা করিয়া, দেশীয় রীতি-নীতির গুণাগুণ-বিচার ও তাহার প্রয়োগ সম্পর্কে, এই গ্রন্থে বিধি-বিধান প্রার্থনা করা হইয়াছে, সেকালের স্মার্ত ভট্টাচার্য পণ্ডিতগণের নিকট হইতে। ১ এবং ৩৯ সংখ্যক ভাষ দুইটি নিদর্শনস্বরূপে উদ্ধার করা গেল,—

১ প্রশ্ন। দেবতা, গুরু, গুরুপত্নী, পিতা, মাতা, শ্বশুর, শাশুড়ি, এবং স্বামী এক স্থানে থাকিলে স্ত্রীজাতি অগ্রে কাহাকে প্রণাম করিবে এবং ক্রমে ক্রমে কাহাকে কাহাকেই বা প্রণাম করা বিধেয় ?

অধ্যাপকগণের উত্তর।

বর্দ্ধমান, ভাটপাড়া, কাশীমবাজার, বৃন্দাবন, থাগড়া, মুরশিদাবাদ সৈদাবাদ কান্দাই, বিল্বপুষ্করিণী, সমুদ্রগোড়, সৈদাবাদ, পূর্ব্বস্থলী, গুপ্তিপাড়া, দিনাজপুরের মহারাণী শ্রীশ্রীমতী শ্যামমোহিনীর সভাপণ্ডিত···, নড়াইল, বহির্গাছি, অম্বিকা, নবদ্বীপ, কাশীধাম, জগন্নাথক্ষেত্র, ডিল্লি, কলিকাতা।

লল্লী মিশ্র পাধাজী [উপাধ্যায় জী]— সাং কাশীধাম··· দেবতা।— পশ্চিম দেশের স্ত্রীজাতি পিতা মাতাকে প্রণাম করে না এবং সকলের সাক্ষাতে লজ্জাবশত স্বামীকে প্রণাম করিতে পারে না তবে দেবতা প্রণামানন্তর পতিকে মনে মনে প্রণাম করিবে।

জগন্নাথক্ষেত্রের ছয় জন পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত উত্তর···ইঁহাদের মতে প্রশ্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট স্ত্রীজাতি আসিতে পারে না তবে কিরূপে প্রণাম করিবে।

হরিশ্চন্দ্র পণ্ডিত— সাং ডিল্লি···ইহার মত—সকলকে এককালীন প্রণাম করিয়া পশ্চাৎ পৃথক্ পৃথক্ প্রণাম করিবে॥

শিবচরণ প্রসাদ পণ্ডিত—সাং ঐ···ইনি কহেন দেবতা প্রণামের পর স্বামীকে প্রণাম করিবারও বিধি আছে।

প্রশ্নোত্তর লেখক পণ্ডিত মহাশয়গণের লিখিতানুসারে

শ্রীশ্রীমন্মহারাজাধিরাজ রাজেন্দ্র বাহাদুরের মন্তব্য।

১. প্রথম দেবতা ২…স্বামী ৩…গুরু ৪…শ্বশুর ৫…শাশুড়ি ৬…পিতা ৭…মাতা ৮…গুরুপত্নী

৩৯ প্রশ্ন। গুড় প্রভৃতি দ্রব্য-দ্বারা প্রস্তুত তামাকুর এবং অগুড় প্রস্তুত চুরুট নামে প্রসিদ্ধ বস্তুর ধূমপান যাহা সম্প্রদায় ভেদে স্ব স্ব প্রবৃত্তি অনুসারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহার মধ্যে কোন্‌টি দোষাবহ এবং কোন্‌টিই বা অদূষণীয় অথবা উভয়ই দূষণীয়?

[অধ্যাপকগণের উত্তর।]

বর্দ্ধমান—তাম্রকূট ভক্ষণে দোষ আছে, কিন্তু তাহার ধূম পানে দোষ নাই।

উভয়ই দূষণীয়।

ভাটপাড়া—শিষ্টগণের উভয়বিধ ধূম পানই দূষণীয়।

কাশীমবাজার—উভয়ই পবিত্র নয়, কিন্তু চুরট যদি অপবিত্র বস্তু-দ্বারা প্রস্তুত না হয়, তবে বকযন্ত্র নির্গত তামাকুর ধূম হইতে কিঞ্চিৎ ভদ্র।

বৃন্দাবন—উভয়ই দূষণীয়।

থাগড়া—ধূমপানই দোষাবহ।

উভয়ই দূষণীয়।

মুরশিদাবাদ সৈদাবাদ কান্দাই—উভয়বিধ ধূমপানই অকর্ত্তব্য, কিন্তু চুরট যদি অপবিত্র বস্তু-দ্বারা প্রস্তুত হয়, তবে বকযন্ত্র নির্গত তামাকুর ধূম হইতে কিঞ্চিৎ পবিত্র।

বিল্লপুষ্করিণী—উভয়ই দূষণীয়, কিন্তু তাম্রকূট ধূম পানে দোষ ব্যবহার নাই।

উভয়ই দূষণীয় নহে।

সমুদ্রগোড়—উভয়ই দূষণীয়।

(সৈদাবাদ, পূর্ব্বস্থলী, গুপ্তিপাড়া)

দিনাজপুর—উভয়ই দূষণীয়, কিন্তু গুড়যুক্ত তাম্রকূট ধূমপানে অধিক দোষ।

ঐ—উভয়ই দূষণীয়।

(নড়াইল)

বহির্গাছি—বৈদ্যক ধৃত বচনোক্ত-হেতু ব্যতিরেকে উভয়বিধ ধূমপানই দূষণীয়, অন্যমতে দূষণীয় নহে।

অম্বিকা—উভয়ই দূষণীয়।

নবদ্বীপ—উভয়ই বিশেষ দূষণীয় নহে, যেহেতু দন্তরোগ নাশক এবং মলসিদ্ধির কারণ।

কাশীধাম—সগুড় তাম্রকূট ধূমপান নিষিদ্ধ এবং অগুড় তাম্রকূটে যবনেরা স্বপক্ক অন্ন লেপন করিয়া থাকেন, সুতরাং নিষিদ্ধ।

জগন্নাথক্ষেত্র—উভয়ই দূষণীয় যে হেতু অশাস্ত্রীয়।

দিল্লী—উভয়ই দূষণীয়, কিন্তু চুরট অল্পদিন হইতে প্রসিদ্ধ এবং যন্ত্রনির্গত ধূম পান অপেক্ষায় চুরটের ধূমপানে ন্যূন দোষ, কিন্তু ঔষধার্থে দূষণীয় নহে।

উভয়ই দূষণীয়।

কলিকাতা—

ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন—ঐ।

শ্রীশ্রীমন্মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের মন্তব্য।

গুড়-প্রভৃতি দ্রব্য-দ্বারা প্রস্তুত তামাকু ব্যবহার করা দূষণীয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু অগুড় প্রস্তুত চুরট নামে প্রসিদ্ধ বস্তু যদি গোধূমচুর্ণাদির লেপন অর্থাৎ লেই না দিয়া কোন বৃক্ষনির্যাস দ্বারা প্রস্তুত হয়, তবে তদ্ধূম পানে কোন দোষ বোধ হয় না ইতি।[১]

বর্ধমানাধিপ মহ্‌তাবচন্দ্‌ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ বান্ধব ও শিষ্য ছিলেন। মহর্ষির প্রেরণায় তিনি বর্ধমান-প্রাসাদে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। শান্তিনিকেতন-আশ্রম প্রতিষ্ঠার আদিপর্বে সমাজ-সংস্কারক মহ্‌তাবচন্দের দান কম ছিল না। এই বিষয়ে অন্যত্র[২] বিশদ বলিয়াছি।

১ আলোচ্য 'প্রশ্নোত্তরমালা' গ্রন্থখানির দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮০১ শকাব্দে। মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাবচন্দ্‌ বাহাদুর তখন পরলোকে। গ্রন্থখানি ৪৩৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হয়। 'বিজ্ঞাপন' এইরূপ: বর্দ্ধমানাধি মহামহীশ্বর হিজ্‌ হাইনেস্‌ সুরপুর সংস্থিত মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাবচন্দ্‌ বাহাদুর একচত্বারিংশ প্রশ্ন প্রণয়ন পূর্ব্বক সদুত্তর প্রাপ্তি নিমিত্ত নানাদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর সন্নিধানে প্রেরণ করায় তদ্দর্শনে অনেকেই যে সকল উত্তর লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, মহারাজ বাহাদুরের মন্তব্যসহ তৎসমুদয় অবিকল এই পুস্তকে মুদ্রিত হইল, উত্তরদাতাদিগের সংস্কারবশতঃ অথবা লিপিকর প্রমাদ নিবন্ধন যাঁহার লেখায় যে যে দোষ আছে তাহা সংশোধন না করিয়া তদ্রূপই মুদ্রিত হইল। এই পুস্তকের অধিকাংশ মুদ্রিত হইলে মহারাজ বাহাদুর মর্ত্ত্যরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গরাজ্যে গমন করেন, পরিশেষে মহারাজাধিরাজ-মহিষী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী নারায়ণদেবী দেবীর আদেশানুসারে ইহার অবশিষ্ট কার্য্য সকল সম্পন্ন হইল ইতি।

বর্দ্ধমান রাজবাটী

মহাভারত কার্য্যালয় শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধি।

শকাব্দা ১৮০১। অগ্রহায়ণ

২ শারদীয় 'বর্ধমান', ১৩৭৩

পূর্বকালে সমাজবিদ্রোহী সমাজের কাছে দণ্ড পাইয়া অবশেষে সমাজের সঙ্গে রফা করিত। সেই রফা অনুসারে আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া যাইত। তাহার ফল হইত এই, সামাজিক কোনো প্রথার ব্যত্যয় যাহারা করিত, তাহারা স্বতন্ত্রসম্প্রদায়রূপে সমাজের বিশেষ একটা স্থানে আশ্রয় লইত। এ কথা কেহই বলিবেন না, হিন্দু-সমাজে আচার বিচারের কোন পার্থক্য নাই। পার্থক্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু সেই পার্থক্য সামাজিক ব্যবস্থার গুণে গণ্ডীবদ্ধ হইয়া পরস্পরকে আঘাত করে না।

১৩১১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ভাষ ॥

॥ বৈষয়িক ॥

(সন ১১৮৯-১২৭৩ : খৃ ১৭৮২-১৮৬৬)

॥ ভূমিকা ॥

দায়ভাগ ও উত্তরাধিকার[১]। এই বিষয়ে বাঙ্গালাদেশে জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ' একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ। দায়বিভাগ ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে সমগ্র ভারতে বিজ্ঞানেশ্বরের 'মিতাক্ষরা' প্রচলিত। কিন্তু, বাঙ্গালাদেশে অবিসংবাদে 'দায়ভাগে'র প্রচলন। বিজ্ঞানেশ্বর পূর্বপুরুষের সম্পত্তিতে জন্মগত অধিকার স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু, জীমূতবাহন সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন পিণ্ডদানের অধিকার ও যোগ্যতার উপর। বিজ্ঞানেশ্বর ও জীমূতবাহনের প্রধান পার্থক্য এই মূল নীতিতে।

ইংরাজ শাসকেরা হিন্দুদের দায়াধিকার প্রসঙ্গে স্মৃতিশাস্ত্রের প্রচলিত মূল নিয়মগুলির সাহায্যেই বৈষয়িক বিবাদের বিচার করিতেন। বাঙ্গালাদেশে তাঁহারা জীমূতবাহনের গ্রন্থকেই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ' ছাড়া, রঘুনন্দনের 'দায়তত্ত্ব' এবং শ্রীকৃষ্ণের 'দায়ক্রম-সংগ্রহ' এই বিষয় লইয়া রচিত। কিন্তু, এই গ্রন্থদ্বয়ে 'দায়ভাগের' তুলনায় বিশেষ-কিছু নূতন কথা নাই। 'দায়ভাগে' আলোচিত এই প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ স্থূলতঃ উপস্থাপিত করিয়া, আমাদের সংগৃহীত সামাজিক 'ভাষ'গুলিকে বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিব,— ১. স্বত্বের উৎপত্তি, ২. বিভাগের কাল, ৩. পৈতৃক সম্পত্তির বিভাগ, ৪. স্ত্রীধন, ৫. দায়াধিকারে বঞ্চিত ব্যক্তিগণ, ৬. অবিভাজ্য সম্পত্তি, ৭. অপুত্রক ব্যক্তির সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার, ৮. সংসৃষ্টী ব্যক্তিগণের সম্পত্তির বিভাগ, ৯. বিভাগের পরে আবিষ্কৃত প্রচ্ছন্ন সম্পত্তির বিভাগ, এবং ১০. বিভাগ সম্বন্ধে সন্দেহ-নিরসন।

১. স্বত্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রধান কথা হইল, পিতার জীবদ্দশায় পূর্বপুরুষের সম্পত্তিতে কাহারও স্বত্ব জন্মে না। পিতার মৃত্যু হইলে ঐ সম্পত্তিতে পুত্রের অধিকার হয়। 'মৃত্যু' শব্দটির দ্বারা পাতিত্য এবং প্রব্রজ্যাকেও বুঝানো হইয়াছে[২]। পিতার জীবদ্দশায় পুত্রগণ সম্পত্তির ভাগ করিয়া লইলেও পুত্রদের অধিকার জন্মিবে না। জীমূতবাহন বলেন, বিভাগই স্বত্বোৎপত্তির মূল হইলে, কোনো নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তির সম্পত্তি, অপর লোকে ভাগ করিয়াই তাহাতে স্বত্ব উৎপাদন করিতে পারিত।

১ স্মৃ-বা, পৃ ১৭১-১৭৫ হইতে প্রসঙ্গতঃ গৃহীত   ২ দা. ভা., ১।৩১

২. বিভাগের কাল[১]। পিতার পাতিত্য, বিষয়ে বৈরাগ্য বা মৃত্যু ইত্যাদির যে-কোনো একটি ঘটিলে, পুত্রগণ তাঁহার সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইতে পারে। পিতা বর্তমান থাকিলে তাঁহার ইচ্ছানুসারে তদীয় সম্পত্তি পুত্রগণ বাটোয়ারা করিতে পারে। মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে, এবং পিতার অনুমতি থাকিলে, পিতামহের সম্পত্তি তাঁহার পৌত্রগণ নিজেদের মধ্যে বিভাগ করিবার অধিকারী হইয়া থাকে।

৩. পৈতৃক-সম্পত্তির বিভাগ। এতৎসম্পর্কে প্রথম কথা এই, পিতার মৃত্যুর পরে তদীয় সম্পত্তিতে পুত্রদের স্বত্ব জন্মিলেও, মাতার জীবৎকালে তাহারা ধর্মসঙ্গতভাবে উহা ভাগ করিতে পারে না[২]। মাতার অনুমতিক্রমে ভাগ করা যায়।

পুত্রদের মধ্যে একজনও বিভাগ চাহিলে উহা অবশ্যকরণীয়।

বিভাগকালে কেহ নাবালক থাকিলে, বা প্রবাসী হইলে, নাবালক সাবালক না-হওয়া পর্যন্ত, এবং প্রবাসী ফিরিয়া না-আসা পর্যন্ত, তাহার অংশ বন্ধু বা মিত্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে।

পুত্রগণের মধ্যে বিভাগ পৌত্র এবং প্রপৌত্র পর্যন্ত প্রযোজ্য বুঝিতে হইবে; অবশ্য, পিতার জীবিত অবস্থায় তদীয় সম্পত্তিতে পুত্রের স্বত্ব উৎপন্ন হয় না। কাহারও এক পুত্র এবং অপর মৃত পুত্রের দুই পুত্র বর্তমান থাকিলে তদীয় সম্পত্তি প্রথমে দুই সমান ভাগে বিভক্ত হইবে। তাহার পর, মৃত পুত্রের অংশ সমান দুই ভাগে পৌত্রদ্বয়ের মধ্যে ভাগ করিতে হইবে। ফলে, দাঁড়াইবে এইরূপ— $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}$।— এই নীতিকে স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হইয়াছে— 'পিতৃতো ভাগকল্পনা'[৩]।

কোনো কোনো স্মৃতির বচনে আছে, কনিষ্ঠ ভ্রাতারা স্ব স্ব অংশ হইতে কিছু-কিছু করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দিবেন। পক্ষান্তরে, কোনো কোনো স্মৃতিকার ভ্রাতৃগণের মধ্যে সমবিভাগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে জীমূতবাহনের মত এই, সাধারণতঃ ভ্রাতৃগণের অংশ হইবে সমান; কিন্তু, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতারা তাঁহাকে নিজ নিজ অংশ হইতে কিছু কিছু দিতে পারেন; এই ব্যাপার তাঁহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, কোনো বাধ্যবাধকতা নাই।

কেহ তাহার প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইলে, তাহাকে 'কিঞ্চিৎ' দিয়া, বিভাগ করিয়া লইতে হইবে; ভবিষ্যতে যাহাতে কোনো গোলযোগ উপস্থিত না-হয়, সেইজন্য এই ব্যবস্থা আবশ্যক।

সহোদর ভ্রাতারা পিতৃসম্পত্তির বিভাগ করিলে, তাহারা মাতাকে এক পুত্রের সমান অংশ দিবে[৪]। এখানে 'মাতা' শব্দে জননীকে বুঝিতে হইবে; বিমাতাকে নহে[৫]। জননীকে পিতা

১ দা. ভা., ১।৪৪-৪৫ ২ ঐ, ঐ, ৩।১।১৩ ৩ বর্তমান আইনে Succession per stirpes
৪ দা. ভা., ৩।২।২৯ ৫ ঐ, ঐ, ৩।২।৩০

সম্পত্তির কোনো অংশ দান করিয়া থাকিলে, মাতা উক্ত অংশের মাত্র অর্ধেক পাইবেন। বিমাতা পুত্রহীনা হইলে, তিনি অংশ পাইবেন[১] জননীর সমান। বিভিন্ন বর্ণের মাতৃগণ সেই সেই বর্ণের পুত্রগণের সমান অংশ পাইবেন; যেমন, ব্রাহ্মণী-মাতা ব্রাহ্মণ-পুত্রের সমান অংশের অধিকারিণী হইবেন।

পিতৃসম্পত্তিতে কন্যাগণের অধিকার সম্বন্ধে নিয়ম হইল,— পুত্রগণ 'তুরীয়ক' অংশ কন্যাকে দিবে। 'তুরীয়ক' বা চতুর্থ ভাগের অর্থ, পুত্রের অংশের চতুর্থভাগ। ভ্রাতারা অবিবাহিতা ভগ্নীর বিবাহের ব্যয়ও বহন করিবে। ভ্রাতৃগণ কর্তৃক ভগ্নীকে নিজ নিজ অংশের চতুর্থভাগ দান সম্বন্ধে জীমূতবাহন বলেন,— ইহা প্রযোজ্য হইতে পারে, ভ্রাতার সংখ্যা ভগ্নীর সংখ্যার সমান হইলে। সংখ্যা সমান না-হইলে, সমস্যার সৃষ্টি হইয়া থাকে। যেমন, কোনো ভ্রাতার অপেক্ষা ভগ্নীর অংশ অধিকতর হইতে পারে। পক্ষান্তরে, কোনো ভ্রাতা পিতৃসম্পত্তি হইতে একেবারে বঞ্চিত হইতে পারে।

এই সকল সমস্যার সমাধানকল্পে জীমূতবাহন 'তুরীয়ক' শব্দের অর্থ করিয়াছেন,— 'বিবাহোচিত-ধনম্'[২]। কন্যা অপেক্ষা পুত্রের প্রাধান্য জীমূতবাহন স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন[৩]।

জীমূতবাহন পুত্রগণের এইরূপ প্রকারভেদ করেন; যেমন,— ১. বিভাগের পরে গর্ভস্থ এবং প্রসূত, ২. বিভাগের পূর্বে গর্ভস্থ হইলেও, অজ্ঞাত এবং পরে প্রসূত।

পূর্বোক্ত পুত্র পিতার অংশ পাইবে[৪]। তবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে, পিতা স্বীয় অংশ প্রাপ্ত হইয়া, এবং অপর পুত্রগণের সঙ্গে সংসৃষ্টী না-হইয়া পরলোকগমন করিলে। কিন্তু, পিতা কয়েকজন পুত্রের সহিত সংসৃষ্টী হইয়া মৃত হইলে, বিভাগানন্তর জাত পুত্র, পিতার সহিত সংসৃষ্টী পুত্রগণের নিকট হইতে নিজের অংশ লাভ করিবে[৫]। শেষোক্ত প্রকার পুত্র অপর পুত্রগণের নিকট হইতে ভাগ পাইবে। জীমূতবাহন বলেন, বিভাগের পূর্বে জাত পুত্রের, পিতার প্রাপ্য অংশে কোনো অধিকার নাই; এবং বিভাগানন্তর জাত পুত্রের ভ্রাতৃগণের অংশে কোনো অধিকার নাই[৬]।

বিভাগানন্তর জাত পুত্রের প্রাপ্য অংশ সম্বন্ধে 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি'র[৭] ব্যবস্থা, জীমূতবাহনের মতে,[৮] পৈতামহ সম্পত্তিতে প্রযোজ্য। নচেৎ, বিভাগের পরে জাত পুত্রের, অপর পুত্রগণের অংশে কোনো ভাগ থাকে না বলিয়া যে-বিধান, তাহার সহিত বর্তমান ব্যবস্থার বিরোধ উপস্থিত হয়।

১ দা. ভা., ৩।২।৩২ ২ ঐ, ঐ, ৩।২।৩৯ ৩ ঐ, ঐ, ৩।২।৪০ ৪ ঐ, ঐ, ৭।২
৫ ঐ, ঐ, ৭।২ ৬ ঐ, ঐ, ৭।৬ ৭ ২।৮।১২২ ৮ দা. ভা., ৭।১৩

প্রবাস যত দীর্ঘকালেরই হউক, কোনো পুত্র প্রত্যাগত হইলে, তাহার প্রাপ্য অংশ সে অবশ্যই পাইবে।

কোনো পুত্র কুল-পরিত্যাগ করিয়া প্রবাসে জীবন যাপন করিলে, তাহার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ পর্যন্ত তাহার প্রাপ্য অংশের অধিকারী হইবে, অবশ্য তাহাদিগকে নিজেদের জন্ম ও নাম সম্বন্ধে প্রমাণ দিতে হইবে!

প্রাচীন স্মার্তগণ নিম্নলিখিত দ্বাদশবিধ পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। এবং মনে হয়, জীমূত-বাহন সকল প্রকার পুত্রকেই স্বীকার করিয়াছেন।

শাস্ত্রসম্মত বিভিন্নপ্রকার পুত্র এইরূপ,— ১. ঔরস ২. পুত্রিকাসুত— অপুত্রক ব্যক্তি কর্তৃক পুত্রস্বরূপে মনোনীতা কন্যা, অথবা ঐ কন্যার পুত্র হইলে, সেই পুত্র তাহার পুত্ররূপে গণ্য হইবে বলিয়া মনোনীত। ৩. ক্ষেত্রজ— একের স্ত্রীতে অপর কর্তৃক নিয়োগপ্রথায় উৎপাদিত পুত্র। ৪. গূঢ়জ— কাহারও অনুপস্থিতিকালে তদীয় পত্নীতে অপর ব্যক্তি কর্তৃক উৎপাদিত পুত্র; এ-ক্ষেত্রে পুত্রের জনক অজ্ঞাত। ৫. কানীন— অবিবাহিতা কন্যার পুত্র। কন্যা যতদিন অবিবাহিতা থাকে ততদিন এই পুত্রের অধিকারী তাহার মাতামহ। কন্যা বিবাহিতা হইলে, এই পুত্র হইবে তাহার স্বামীর। ৬. পৌনর্ভব— পুনর্বিবাহিতা বিধবার পুত্র। ৭. দত্তক ৮. ক্রীত— পিতামাতার নিকট হইতে ক্রীত। ৯. কৃত্রিম— মাতাপিতৃহীন পুত্র কাহারও পুত্রস্বরূপে গৃহীত হইলে। ১০. দত্তাত্মা— মাতাপিতৃহীন বা মাতাপিতৃপরিত্যক্ত পুত্র নিজেকে অপরের পুত্রস্বরূপে প্রদান করিলে। ১১. সহোঢ়জ— বিবাহকালে অন্তঃসত্বা নারীর গর্ভজাত পুত্র। ১২. অপবিদ্ধ— কোনো ব্যক্তির গৃহীত মাতাপিতৃপরিত্যক্ত পুত্র।

পুত্রিকাপুত্র ও ঔরসপুত্রের মধ্যে বিভাগ।—উভয়েই সবর্ণ হইলে সমান অংশ পাইবে। ঔরস পুত্রের পূর্বে পুত্রিকার পুত্র জন্মিয়া থাকিলেও সে ঔরসপুত্র অপেক্ষা অধিকতর অংশ পাইতে পারে না; কারণ, পুত্রিকা পুত্রতুল্য বলিয়া, তৎপুত্র পৌত্রের ন্যায়। সুতরাং, পৌত্র পুত্র অপেক্ষা অধিকতর অংশ পাইতে পারে না। পুত্রিকা অপুত্রক অবস্থায় বিধবা হইলে, অথবা বন্ধ্যা হইলে, কোনো অংশ পাইবে না; কারণ, তাহাতে পুত্রলাভের সঙ্কল্প করিয়াই পুত্রিকা-পুত্রের ব্যবস্থা করা হয়; অথচ সে পুত্রহীনা হইলে, সাধারণ কন্যারই ন্যায়।

উক্ত দ্বাদশবিধ পুত্রের জীমূতবাহন, দেবলের প্রমাণবলে, এইরূপ শ্রেণীবিভাগ[১] করিয়াছেন,— (ক) আত্মজ— নিজের উৎপাদিত— ১. ঔরস, ২. পৌনর্ভব,

১ দা. ভা., পৃ ১৪৭ (শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের টীকা দ্রষ্টব্য)

৩. পুত্রিকা। (খ) পরজ—অপরের দ্বারা উৎপাদিত। (গ) লব্ধ— পুত্রস্বরূপে গৃহীত— ১. দত্তক, ২. ক্রীত, ৩. সহোঢ়জ, ৪. কানীন, ৫. কৃত্রিম। (ঘ) যাদৃচ্ছিক— যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত— ১. অপবিদ্ধ, ২. স্বয়মুপাগত, ৩. গূঢ়জ।— ইহাদের মধ্যে, ঔরসাদি ছয় প্রকার পুত্র কেবলমাত্র পৈতৃক সম্পত্তির নহে, সপিণ্ডাদি জ্ঞাতিদের সম্পত্তিরও উত্তরাধিকারী হয়; অন্যবিধ পুত্রগণ কেবলমাত্র পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারে।

স্ত্রীধন। জীমূতবাহনের মতে, যাহাতে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ স্বত্ব আছে তাহাই স্ত্রীধন; অর্থাৎ, যে সম্পত্তি সে পতির অনুমতি ব্যতিরেকেই দান, বিক্রয় বা ভোগ করিতে সমর্থ[১]। সাধারণতঃ, পিতামাতা এবং পতি ভিন্ন, অপর কাহারও নিকট হইতে অথবা মাতাপিতার বা পতির কোনো আত্মীয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত, অথবা, তাহার স্বোপার্জিত ধনে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধিকার থাকে না; তাহার স্বামীও এই ধন ব্যবহার করিতে পারেন। সুতরাং, এইরূপ ধন স্ত্রীধন নহে।

জীমূতবাহন কর্তৃক উদ্ধৃত নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ-বচন হইতে মনে হয়, তাঁহার মতে, স্ত্রীধন এইরূপ শ্রেণীতে বিভক্ত,— ১. অধ্যগ্ন্যুপাগত— বিবাহকালীন অগ্নির সমক্ষে যাহা স্ত্রীলোককে প্রদত্ত হইয়াছে, ২. আধিবেদনিক— দ্বিতীয়া স্ত্রীকে বিবাহ করিবার সময় পতি কর্তৃক প্রথমা পত্নীকে প্রদত্ত, ৩. অন্বাধেয়— বিবাহের পরে, স্ত্রীলোকের পতি ও পতির আত্মীয় কর্তৃক এবং পিতামাতা ও তাঁহাদের আত্মীয় কর্তৃক প্রদত্ত ৪. অধ্যাবাহনিক— স্ত্রীলোকের বিবাহের পরে, তাহাকে পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে লইয়া যাইবার সময় তাহাকে যাহা প্রদত্ত হয়, ৫. ভর্তৃদায়— পতিকর্তৃক দত্ত, ৬ শুল্ক—বিবাহকালে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্বামীকে যাহা দেওয়া হয়, ৭. সৌদায়িক—বিবাহের পূর্বে অথবা পরে পিতৃগৃহে এবং পতিগৃহে প্রাপ্ত, ৮. এই ধন ছাড়া, স্ত্রীলোকের পিতা, মাতা পতি বা ভ্রাতা কর্তৃক প্রদত্ত সর্বপ্রকার ধন।

স্ত্রীধনে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ স্বত্ব থাকিলেও, পতির নিকট হইতে প্রাপ্ত স্ত্রীধনরূপ স্থাবর সম্পত্তি, সে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে না। কিন্তু, অপর কাহারও নিকট হইতে স্ত্রীধনরূপে প্রাপ্ত এইরূপ সম্পত্তি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে[২]।

সাধারণতঃ, পতি, পুত্র, পিতা ও ভ্রাতা প্রভৃতি কাহারও স্ত্রীধনে কোনো স্বত্ব থাকে না। কিন্তু, দুর্ভিক্ষ, ধর্মকার্য, ব্যাধি, ও 'সম্প্রতিরোধক'[৩] অবস্থায় পতি পত্নীর স্ত্রীধন ব্যবহার করিতে পারে।

১ দা. ভা., ৪।১।১৮ ২ ঐ, ঐ, ৪।১।২৩

৩ ঋণ-পরিশোধের তাগাদায় উত্তমর্ণ অধমর্ণের স্নানভোজনাদিতে বাধা সৃষ্টি করিলে।

এই অবস্থায় স্ত্রীধনে পতির এইটুকু অধিকার থাকিলেও, স্ত্রীধন গ্রহণের পরে, পতি অপর স্ত্রীকে লইয়া বসবাস করিলে, এবং যাহার ধন লইয়াছে তাহাকে অবহেলা করিলে, গৃহীত স্ত্রীধন সে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য। স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারের নিয়মসমূহ এই কারণগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়,— ১. স্ত্রীলোকের সন্তান থাকা, বা না-থাকা, ২. যে-পদ্ধতিতে স্ত্রীলোকের বিবাহ হইয়াছিল তাহা অনুমোদিত কিনা, ৩. স্ত্রীধনের প্রকারভেদ।

স্ত্রীধনে ক্রমান্বয়ে এই ব্যক্তিগণের ক্রমিক দাবী অধিকতর। ১. পুত্র ও অবিবাহিতা কন্যা— সমান অংশের ভাগী[১]। ইহাদের মধ্যে একের অভাবে, অপরে সমস্ত সম্পত্তিই পাইবে[২]। ২. বিবাহিতা কন্যা—এইরূপ অনেক কন্যা থাকিলে পুত্রবতী এবং 'সম্ভাবিতপুত্রা' কন্যার দাবী অগ্রগণ্য; এইরূপ উভয়বিধা কন্যা তুল্যাংশে উত্তরাধিকারিণী হইবে[৩]। বিধবা এবং বন্ধ্যা-কন্যা, জীমূতবাহনের মতে, মাতার স্ত্রীধনের উত্তরাধিকার লাভ করে না। ইহাদের পরে ৩. পৌত্র, ৪. দৌহিত্র এবং ৫. বন্ধ্যা ও বিধবা-কন্যা।

'যৌতক' পদটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই,—'যু' ধাতুর অর্থ মিশ্রণ বা যোগ করা। সুতরাং, 'যুত' পদের অর্থ যুক্ত বা মিশ্রিত। স্ত্রী-পুরুষের মিশ্রণ অর্থে, তাহাদের একশরীরত্বলাভ। বিবাহের ফলে ইহা ঘটে বলিয়া, বিবাহকালে স্ত্রীলোককে যাহা প্রদত্ত হয় তাহা 'যৌতক'। পরিণয়কালে প্রদত্ত বলিয়া ইহা 'পরিণায্য' নামেও অভিহিত হয়[৪]। 'যৌতক' পূর্বলিখিত অধ্যগ্ন্যুপাগত শ্রেণী হইতে অভিন্ন।

কেবল কন্যাগণই মাতার স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারিণী হইবে—গৌতম নারদ প্রমুখের এই বিধান, জীমূতবাহনের মতে, একমাত্র 'যৌতক'শ্রেণীর স্ত্রীধনে প্রযোজ্য। তিনি বলেন,— বিবাহের পরেও পিতৃদত্ত স্ত্রীধনে অধিকার[৫] কেবল কন্যারই।

যৌতক-স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারে এই ব্যক্তিগণের ক্রমিক দাবী অগ্রগণ্য,— ১. অবিবাহিতা অ-বাগ্‌দত্তা কন্যা, ২. অবিবাহিতা বাগ্‌দত্তা কন্যা, ৩. বিবাহিতা কন্যা, এবং ৪. পুত্র।—এক্ষেত্রে, সর্বপ্রকার কন্যার অভাবে পুত্রের দাবী গ্রাহ্য[৬]।

স্ত্রীধনাধিকারিণী ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও প্রাজাপত্য— এই অনুমোদিত বিবাহপদ্ধতির কোনো-একটি পদ্ধতিমতে বিবাহিতা হইলে, উত্তরাধিকারের উল্লিখিত ক্রম প্রযোজ্য হইবে। রাক্ষস, আসুর, পৈশাচ, ও গান্ধর্ব— এই নিন্দিত পদ্ধতির কোনো-এক পদ্ধতিমতে বিবাহিতা হইলে স্ত্রীধন হইবে 'পিতৃগামী'।

১ দা. ভা., ৪।২।২ ২ ঐ, ঐ, ৪।২।৩ ৩ দৌহিত্র প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানের অধিকারী বলিয়া।
৪ দা. ভা., ৪।২।১৪ ৫ ঐ, ঐ, ৪।২।১৪-১৫ ৬ ঐ. ঐ, ৪।২।২৫

বিবাহের এবং স্ত্রীধনের প্রকারভেদ অনুসারে নারীর স্ত্রীধনের উত্তরাধিকার নির্ণীত হইয়া থাকে। জীমূতবাহনের মতে, সন্ততিহীনা নারীর স্ত্রীধনের উত্তরাধিকার-বিধি 'অতিগহন'[১] অর্থাৎ অত্যন্ত জটিল। স্থূল নিয়মগুলি এই,—

'অধ্যাধেয়'-শ্রেণীর স্ত্রীধনের উত্তরাধিকার হইবে এই ক্রমে,—সহোদর ভ্রাতা, মাতা, পিতা, পতি[২]। মতান্তরে, মাতা অপেক্ষা পিতার দাবী অগ্রগণ্য; কিন্তু, জীমূতবাহন এই মত সমর্থন করেন না। শুল্করূপ স্ত্রীধনের ক্ষেত্রেও এই ক্রম প্রযোজ্য। কিন্তু, আসুর বিবাহে যে-শুল্ক দেওয়া হয় তাহা জীমূতবাহনের মতে, এই নিয়মের বহির্ভূত; গান্ধর্ব-বিবাহকেও তিনি যোগ করিয়াছেন। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব বিবাহে, সন্তানহীনা নারীর স্ত্রীধন পাইবেন[৩] পতি। তাঁহার মতে, কেবল বিবাহকালে স্ত্রীলোকের প্রাপ্ত স্ত্রীধনের ক্ষেত্রেই এই বিধি প্রযোজ্য। রাক্ষস, আসুর এবং পৈশাচ—এই ত্রিবিধ বিবাহে, পতি জীবিত থাকিলেও, স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারিণী হইবেন মাতা, তদভাবে পিতা[৪]।

দায়াধিকারে বঞ্চিত এই ব্যক্তিগণ সম্পত্তির উত্তরাধিকারের অযোগ্য,—(ক) অপ-পাত্রিত— সমাজ হইতে যে বহিষ্কৃত হইয়াছে, এবং সেইহেতু যাহার সংসর্গে জলপান নিষিদ্ধ হইয়াছে। (খ) বেদজ্ঞ হইয়াও যে পিতৃপুরুষের পারলৌকিক কার্য করে না।—এই সম্বন্ধে জীমূতবাহন বলেন,—পিতার উদ্দেশ্যে পারলৌকিক কৃত্যের বেতন-স্বরূপই পুত্র তদীয় সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। যেখানে সেই কৃত্যের অনুষ্ঠানই নাই, সেখানে বেতনেরও প্রশ্ন উঠে না[৫]। (গ) শারীরিক ও মানসিক বিকারযুক্ত এইরূপ ব্যক্তিগণ,—ক্লীব, জন্মান্ধ, জন্ম-বধির, উন্মত্ত, জড়, মূক, 'নিরিন্দ্রিয়' বা বিকলেন্দ্রিয়, পতিত, পতিতের পুত্র, 'অচিকিৎস্যরোগার্ত', কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, 'লিঙ্গী' অর্থাৎ সংসারত্যাগী, 'প্রব্রজ্যাবসিত' বা সম্প্রদায়-ত্যাগী।

জীমূতবাহনের মতে, পতিত ব্যক্তি ও তৎপুত্র ব্যতীত, এইরূপ নিরংশক ব্যক্তিগণ গ্রাসাচ্ছাদনের দ্বারা পালনীয়। 'পিতৃদ্বিট' বা পিতৃদ্বেষী এবং উপপাতকীও সম্পত্তির উত্তরাধিকারে বঞ্চিত। (ঘ) 'অক্রম'-বিবাহে জাত পুত্র।

ক্লীবাদি দায়াধিকারবর্জিত ব্যক্তিগণের দোষরহিত পুত্র,[৬] পিতা স্বাভাবিক হইলে তিনি যে-অংশ পাইতেন, সেই অংশই পাইবে। ক্লীবাদির কন্যাগণ বিবাহকাল পর্যন্ত প্রতিপালনীয়া, এবং নিঃসন্তান পত্নীগণ যাবজ্জীবন পোষণীয়া।

অবিভাজ্য সম্পত্তি। সাধারণতঃ এইরূপ সম্পত্তি বিভাগের অযোগ্য,—(ক) বিদ্যালব্ধ[৭]—

---

১ দা. ভা, ৪।৩।৪২   ২ ঐ, ঐ, ৪।৩।৩১ ই.   ৩ ঐ, ঐ, ৪।৩।৩   ৪ ঐ, ঐ, ৪।৩।৬

৫ ঐ, ঐ, ৫।৬   ৬ এ-ক্ষেত্রে, ক্ষেত্রজ পুত্র

৭ তুল. Hindu Gains of Learning Act, 1930

কোনো সমস্যা-সমাধানের ফলে প্রাপ্ত পারিতোষিক, শিষ্যদত্ত দ্রব্য, পৌরোহিত্যের দক্ষিণা, বিদ্যা-প্রদর্শনের ফলে লব্ধ, চিত্রকর ও স্বর্ণকার প্রভৃতির দ্বারা শিল্পচাতুর্য-প্রদর্শনের ফলে প্রাপ্ত। জীমূতবাহন 'বিদ্যা' শব্দের অর্থে বলেন, যে-কোনো বিদ্যা বা কৌশল। 'বিদ্যালব্ধ' শব্দের অর্থ, অধ্যাপনা দ্বারা লব্ধ—এই মত জীমূতবাহন গ্রহণ করেন নাই[১]। প্রসঙ্গতঃ জীমূতবাহনের ব্যবস্থা,— কোনো ভ্রাতা পিতৃসম্পত্তির ব্যবহার করিয়া, বা না-করিয়া যে বিদ্যা অর্জন করিয়াছেন, তাহাদ্বারা লব্ধ ধন, তাহার অপর বিদ্যাসম্পন্ন ভ্রাতৃগণের মধ্যে ভাগ করিতে হইবে[২]; বিদ্যাহীন ভ্রাতৃগণের মধ্যে নহে। (খ) পিতৃসম্পত্তি বা যৌথ-সম্পত্তির ব্যবহার না-করিয়া এবং অপর ভ্রাতৃগণের সাহায্য ব্যতিরেকে অর্জিত, (গ) পিতা-মাতা, মিত্র অথবা কোনো স্নেহপরায়ণ আত্মীয়কর্তৃক প্রদত্ত এবং বিবাহকালে প্রাপ্ত, (ঘ) স্বীয় বীরত্বের দ্বারা লব্ধ, (ঙ) পৈতৃক বা পূর্বপুরুষের লুপ্ত যে-সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে, (চ) পিতার জীবিতকালে কোনো ভ্রাতা কর্তৃক বাসগৃহের সীমার মধ্যে নির্মিত গৃহ বা উদ্যান।

অপুত্রক ব্যক্তির সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার। এই বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। এই বিষয়ে নানাশাস্ত্রের অসংখ্য মতামত। বিবিধ বচনাদি আলোচনানন্তর জীমূতবাহনের সিদ্ধান্ত এই,—সাধারণ নিয়ম হইল, অপুত্রক ব্যক্তির অবর্তমানে তদীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবে তাহার স্ত্রী। কিন্তু, জীমূতবাহন 'পুত্র' শব্দের অর্থে বলেন,—পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র। এই নিয়মের মূলেও পারলৌকিক কার্যে অধিকার; প্রপৌত্র পর্যন্তই পিণ্ডদানের অধিকারী[৩]। সুতরাং, নিয়ম এই,— কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পরে, তাহার পুত্র, পৌত্র বা প্রপৌত্র না-থাকিলে, তদীয় স্ত্রী তৎসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবে। মতান্তরে, স্ত্রী কেবল স্বীয় পালনযোগ্য ধন পাইবে। জীমূতবাহন এই মত বর্জন করিয়া বলেন,—স্ত্রী সম্পূর্ণ সম্পত্তিই পাইবে[৪]।

কোনো কোনো মতে, স্ত্রীর এই অধিকার কেবল প্রযোজ্য, তাহার স্বামী যে-ক্ষেত্রে অপর ভ্রাতৃগণ হইতে পৃথক্ বা অসংসৃষ্টী হইয়া ছিল। স্বামী তাহার ভ্রাতৃগণের সহিত একান্নভুক্ত বা সংসৃষ্টী থাকিলে তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় তাহার ভ্রাতারা। জীমূতবাহন এই মত সমর্থন করেন নাই। তিনি বলেন,—স্বামী অপর ভ্রাতাদের সঙ্গে মিলিত থাকুক, বা না-থাকুক, তাহার সম্পত্তি তাহার স্ত্রীরই প্রাপ্য[৫]। স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর তখনই মাত্র উত্তরাধিকার থাকে, যখন সে বৈধব্যের পরে ব্রতাদির দ্বারা পতির পারলৌকিক সদ্গতি কামনা করে, অন্যথায় নহে।

১ দা. ভা. ৬।২।১৭ ২ ঐ. ঐ, ৬।১।১৭ ৩ ঐ. ঐ., ১১।১।৩৪ ৪ ঐ, ঐ., ১১।১।১৩
৫ ঐ, ঐ., ১১।১।৪৭

স্ত্রীকর্তৃক উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর সম্পূর্ণ স্বত্ব হয় না; নিম্নলিখিত শর্তাধীনে স্ত্রীর ভোগস্বত্ব মাত্র,—(১) তিনি উহার দান, বিক্রয় বা 'আধান'[১] করিতে পারেন না। (২) তিনি উহা যথেচ্ছ ভোগ করিতে পারেন না; স্বর্গীয় পতির হিতার্থে তিনি উহার ব্যবহার করিতে পারেন মাত্র। (৩) পতির পারলৌকিক কৃত্যের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইলে, তিনি ঐ সম্পত্তি হস্তান্তরিত করিতে পারেন[২]। জীবনধারণের অন্য উপায়ের অভাবেও তিনি উহার বিক্রয়াদি করিতে পারেন। (৪) কন্যার বিবাহের জন্য পতির সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ তাঁহাকে দিতে হইবে[৩]। (৫) পতির ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়ার নিমিত্ত 'ভর্তৃপিতৃব্যাদিকে' 'অর্থানুরূপ' উপহারাদি দান করিতে হইবে[৪]।

স্ত্রীর অভাবে অপুত্রক ব্যক্তির সম্পত্তি পাইবে তাহার কন্যা। কন্যাগণের মধ্যে অবিবাহিতা কন্যার দাবী অগ্রগণ্য। বিবাহিতা কন্যাগণের মধ্যে পুত্রহীনা অপেক্ষা পুত্রবতীর দাবী অধিকতর। সকল বিবাহিতা কন্যাই পুত্রহীনা হইলে, যাহার পুত্রলাভের সম্ভাবনা আছে তাহার দাবী অগ্রগণ্য[৫]। বন্ধ্যা বিধবা কন্যা, এবং যে-কন্যার পুত্রলাভের সম্ভাবনা নাই, সে এই ব্যাপারে বর্জনীয়া।

কন্যার উত্তরাধিকার সম্বন্ধে একটি উল্লেখযোগ্য বিধান এই, পিতার একমাত্র সবর্ণা কন্যাই তদীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে। বিবাহিতা কন্যা পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারের যোগ্যা হয়, পিতার সবর্ণ ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাহ হইলে। এই নিয়মটির যুক্তি এই, পিতার অসবর্ণা কন্যার পুত্র, অথবা অসবর্ণ ব্যক্তির সহিত বিবাহিতা কন্যার পুত্র, মাতামহের পারলৌকিক কৃত্য-সম্পাদনে অক্ষম; সুতরাং, সেইরূপ কন্যা উত্তরাধিকারে বর্জিতা[৬]।

উত্তরাধিকারের যোগ্যা কন্যার অভাবে, তৎপুত্র মাতামহ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। দৌহিত্রের অভাবে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি পাইবে তাহার পিতা[৭]। পিতা অপেক্ষা দৌহিত্রের দাবী অধিকতর হওয়ার কারণ, পারলৌকিক ক্রিয়াদিতে দৌহিত্রের অধিকতর যোগ্যতা।

পিতার পরেই মাতার স্থান। কোনো কোনো মতে, পিতা অপেক্ষা মাতা অধিকতর সম্মানার্হা; এই হেতু, এই ব্যাপারে পিতা অপেক্ষা মাতার দাবী অগ্রগণ্য। জীমূতবাহন এই মত স্বীকার করেন নাই[৮]।

উল্লিখিত উত্তরাধিকারিগণের অভাবে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি পাইবে তদীয় ভ্রাতা।

---

১ দা. ভা., ১১।১।৫৬ (রেহান, বন্ধক, mortgage) ২ ঐ, ঐ, ১১।১।৬১ ৩ ঐ, ঐ., ১১।১।৬৬
৪ ঐ, ঐ., ১১।১।৬৩-৬৪ ৫ ঐ, ঐ., ১১।২।১১ ৬ ঐ, ঐ., ১১।২।৯
৭ ঐ, ঐ., ১১।৩।১ ৮ ঐ, ঐ., ১১।৪।০

মতান্তরে, ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র তুল্যাংশে উক্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবে। জীমূতবাহন এই মত খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন, মৃতব্যক্তির বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পর্যন্ত কোনো উত্তরাধিকারী না-থাকিলে কেবল ভ্রাতুষ্পুত্রের দাবী গ্রাহ্য[1]। এ ব্যাপারেও প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে পারলৌকিক ক্রিয়ার যোগ্যতাই উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রিত করিবে; মৃতব্যক্তির ভ্রাতুষ্পুত্র অপেক্ষা ভ্রাতারই এই যোগ্যতা অধিকতর। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অপেক্ষা সহোদর ভ্রাতার দাবী অধিকতর।

সংসৃষ্ট ভ্রাতৃগণ সম্পর্কে জীমূতবাহন এই ক্রম নির্ধারণ করিয়াছেন,—১. সহোদর ভ্রাতৃগণের মধ্যে অসংসৃষ্ট অপেক্ষা সংসৃষ্ট ভ্রাতার দাবী অধিকতর। ২. অসংসৃষ্ট সহোদর ভ্রাতা ও সংসৃষ্ট বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তুল্যাংশে অধিকারী। ৩. বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে অসংসৃষ্ট অপেক্ষা সংসৃষ্টের দাবী অধিকতর।

বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্র অপেক্ষা সহোদর ভ্রাতার পুত্রের যোগ্যতা অধিকতর। জীমূতবাহনের মতে, মৃতব্যক্তির পারলৌকিক কৃত্যে তদীয় পিতৃব্য অপেক্ষা ভ্রাতুষ্পুত্রের যোগ্যতা অধিকতর। সেইজন্য ভ্রাতার অভাবে ভ্রাতুষ্পুত্রই তদীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে।

ভ্রাতুষ্পুত্রের অভাবে মৃতব্যক্তির সম্পত্তির দায়ক্রমও জীমূতবাহন নির্ধারণ করিয়াছেন। এই দায়ক্রমের মূলেও জীমূতবাহন মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে পারলৌকিক ক্রিয়াকেই মুখ্য কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ, পারলৌকিক ক্রিয়াদিতে যাহার যেমন যোগ্যতা, উত্তরাধিকারেও তাহার তেমন দাবী।

জীমূতবাহন কর্তৃক নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে যদি কেহই না-থাকে, তাহা হইলে সম্পত্তি রাজগামী হইবে। জীমূতবাহন বলেন,—ব্রাহ্মণের সম্পত্তিতে এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না। কিন্তু, উত্তরাধিকারী না-থাকিলে ব্রাহ্মণের সম্পত্তির গতি কি হইবে সেই সম্বন্ধে জীমূতবাহনের মত স্পষ্ট নহে[2]।

বানপ্রস্থ, যতি ও আজীবন ব্রহ্মচারীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার-ক্রম এইরূপ,—১. একাশ্রমী, ২. সতীর্থ, ৩. আচার্য, ৪. সৎশিষ্য, ৫. ধর্মভ্রাতা।— ইহাদের মধ্যে ক্রমিক দাবী অধিকতর। 'উপকুর্বাণ' ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকারী হইবেন পিত্রাদি।

৮. সংসৃষ্টী ব্যক্তিগণের সম্পত্তির বিভাগ। বিভাগের পরে যদি কেহ পিতা, ভ্রাতা বা পিতৃব্যের সহিত প্রীতিবশতঃ মিলিত হইয়া বাস করে, তাহা হইলে তাহাকে বলা হয় সংসৃষ্টী বা সংসৃষ্ট। জীমূতবাহন কর্তৃক উদ্ধৃত মনুর শ্লোকানুসারে,[3] সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে সম্পত্তির বিভাগ হইলে সকলেই তুল্যাংশে অধিকারী হইবে; জ্যেষ্ঠভ্রাতা অতিরিক্ত কিছু

১ দা. ভা., ১১।৫।৩   ২ ঐ, ঐ, ১১।৬।৩৪   ৩ মনু ৯।২১০

পাইবে না। জীমূতবাহন বিধান করিয়াছেন, এই নিয়ম সবর্ণ ভ্রাতৃগণের পক্ষে প্রযোজ্য। সবর্ণ ও অসবর্ণ ভ্রাতৃগণ সংসৃষ্ট হইয়া পুনরায় সম্পত্তির বিভাগ করিলে সাধারণ বিভাগের নিয়ম প্রযোজ্য হইবে[২]।

৯. বিভাগের পরে আবিষ্কৃত প্রচ্ছন্ন সম্পত্তির বিভাগ। বিভাগকালে কোন অংশীদার কর্তৃক প্রচ্ছন্ন সম্পত্তি, বিভাগের পরে আবিষ্কৃত হইলে, তাহা সকল অধিকারীই সবর্ণ অসবর্ণ নির্বিশেষে তুল্যাংশে পাইবে; জ্যেষ্ঠভ্রাতা অতিরিক্ত কিছু পাইবে না[৫]।

মতান্তরে, যে অংশভোগী সম্পত্তিটি প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিল, সে চৌর্যের অপরাধে কোনো অংশই পাইবে না; বা পাইলেও, অপরের অংশ অপেক্ষা কম পাইবে। কিন্তু, এই মত জীমূতবাহন গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার মতে, যে-সম্পত্তিতে নিজেরও অংশ আছে তাহা প্রচ্ছন্ন রাখিলে চৌর্য হইতে পারে না[৩]।

বন্ধু কর্তৃক কোনো সম্পত্তি অপহৃত হইয়া থাকিলে, সামাদি উপায়ের দ্বারা উহা ফিরিয়া পাওয়ার চেষ্টা করা কর্তব্য, বলপ্রয়োগে নহে। অবিভক্ত অবস্থায় কেহ স্বীয় অংশের অধিক ভোগ করিয়া থাকিলে, উহা তাহার নিকট হইতে নেওয়া হইবে না[৪]।

১০. বিভাগ সম্বন্ধে সন্দেহ-নিরসন। কোনো সম্পত্তির বিভাগের পরে, বিভাগ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ উপস্থিত হইলে, জীমূতবাহনের মতে, সাক্ষী, লিখিত ও অনুমানাদি দ্বারাই বিভাগ প্রমাণ করিতে হইবে। সাক্ষী অপেক্ষা লিখিতের এবং অনুমান অপেক্ষা সাক্ষীর প্রমাণের প্রাধান্য হইবে[৫]। সপিণ্ড, বন্ধু ও উদাসীন[৬] ব্যক্তিগণের মধ্যে ক্রমিক সাক্ষী অধিকতর প্রামাণ্য। উক্ত 'লিখিত' শব্দে বুঝায় 'ভাগলেখ্য'[৭] অর্থাৎ বিভাগের দলিল (Deed of partition)।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে অনুমানের আশ্রয়-গ্রহণ বিধেয়,— এক ভ্রাতা কর্তৃক অপর ভ্রাতাকে গৃহদান ও অপর ভ্রাতার গ্রহণ; ঋণাদি গ্রহণকালে এক ভ্রাতা কর্তৃক অপর ভ্রাতার প্রতিভূস্বরূপ নিয়োগ; ভ্রাতৃগণের মধ্যে পরস্পর ঋণদান, ঋণগ্রহণাদি[৮]।

আলোচ্য প্রকরণে আমাদের সংগৃহীত যে-সকল নিদর্শন উদ্ধার করা যাইতেছে, এই ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে তাহার অধিকাংশই ব্যাখ্যাত হইবে। আমাদের সংগ্রহের একখানি পত্রে (সং ২৮৪) 'দায়ভাগ' ব্যতীত 'দায়তত্ত্ব' এবং 'বিবাদভঙ্গার্ণব' নামক দুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ রহিয়াছে। এতন্মধ্যে 'দায়তত্ত্ব' গ্রন্থখানির রচয়িতা রঘুনন্দন[৯]। 'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব' গ্রন্থখানি গত শতাব্দীর শেষের দিকে জগন্নাথ পণ্ডিত কর্তৃক সংকলিত হইয়াছিল[১০]।

---

১ দা., ভা., ১২।২ ২ ঐ., ঐ, ১৩।২ ৩ ঐ., ঐ., ১৩শ অধ্যায় ৪ ঐ., ঐ., ১৩।৭

৫ ঐ., ঐ., ১৪।৩, ১১ ৬ নিঃসম্পর্কিত ব্যক্তি ৭ দা. ভা., ১৪।১। শ্রীকৃষ্ণের ব্যাখ্যায় ইহাকে 'ভোগলেখ্য'ও বলা হইয়াছে। ৮ ঐ., ঐ., ১৪।৯ ৯ দ্র. পৃ ২৮৪ ১০ Cat.-Cat., Vol. I, p 580

॥ বৈষয়িক ভাষ ॥

(সন ১১৮৯-১২৭৩ : খৃ ১৭৮২-১৮৬৬)

এই প্রকরণে বিষয়-সম্পত্তিতে অধিকারী-নির্ণয়-সম্পর্কে কতকগুলি হকীকত ও তাহার ভাষ আলোচিত হইল। বিশ্বভারতীর সংগৃহীত[১] বৈষয়িক ভাষ-পত্রগুলিকে সাতটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে,—

(১) পুত্র, ভাগিনেয়, পত্নী, বিধবা, ভ্রাতৃপুত্র, পতিত, দৌহিত্র, পৌত্র-দৌহিত্র, মৃতা-স্ত্রী, পৌত্রী-কন্যা-পুত্রবধূ, স্বেচ্ছাকৃত বিভক্তধনী পিতা, গুরু, মাতুল, ভগ্নী, জ্ঞাতি, কুমারী-কন্যা, ভ্রাতা, পিণ্ডাধিকারী— ইহাদের মধ্যে সম্পত্তি-বিভাগ ও স্বত্বনির্ণয়-বিষয়ে ব্যবস্থা,—এই বিরোধ-সমস্যার সমাধানকল্পে বিধি বা বচন দেওয়া হইয়াছে মুখ্যতঃ গৌড়দেশে প্রচলিত দায়ভাগ-মতে। বঙ্গদেশ, আসাম ও নেপালের কিয়দংশে প্রচলিত বৃটিশ আইন জীমূতবাহন, রঘুনন্দন ও শ্রীকৃষ্ণ—এই তিন জনের মতের মিশ্রণে রচিত হইয়াছিল[২]।

(২) যজমান ও বৃত্তি লইয়া বিরোধ ও তাহার মীমাংসা,

(৩) সম্পত্তি কৃতাংশ করাতে উদাস হওয়া ও তৎসম্পর্কে ব্যবস্থা,

(৪) জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লিখিত উকীল রমাপ্রসাদ রায়ের নিকট সম্পত্তি-বিভাগ-বিষয়ক আদর্শ পত্র,

(৫) ভদ্রাশন বাটীর বিভাগ ('ব্যালগ'),

(৬) ফিরাফিরি,

(৭) ছয় সেবার দরুণ জমির স্বত্ব ও বৃত্তি বিরোধের হকীকত-পত্র।

(১) ২৬১সংখ্যক হকীকত-পত্রে দেখা যায়, সন ১২৩৬ সালে নান্নুরের হাজরা-বংশের শ্যামানন্দময়ী দেবীর সম্পত্তিতে অধিকার লইয়া গোলমাল[৩] হইয়াছিল। তাহাতে সপ্তগ্রামী ভট্টাচার্যের এইরূপ ভাষ দেওয়া হইয়াছে,— পিতার অর্জিত বা তাঁহার পৈতৃক ধনে বা মাতামহ-ধনে পুত্রের অধিকার; সেই পুত্রের বা তাহার পিতার অভাবে সেই ধনে মাতার অধিকার; পিতার মাতামহ জ্ঞাতিদের নহে।

১ পূর্বে দ্রষ্টব্য পৃ ৩৩-৩৪ ২ মিতা, দায়বিভাগ, নিবেদন, পৃ. ক-খ

৩ এই ভাষ-পত্রে উল্লিখিত হাজরা-বংশ বর্তমানেও নান্নুরের বহুবিঘোষিত 'চণ্ডীদাস-বাশুলী'র সেবক। ইঁহাদের বিবৃত এই 'পৈতৃক ৺সেবা', বাশুলী ব্যতীত অন্য দেবতার হইবে। কারণ, বাশুলী হইলে, 'পৈতৃক ৺শ্রী সেবা'—এইরূপ বয়ান হইত। তবে, এই উদ্দিষ্ট 'পৈতৃক ৺' যদি বাশুলীই হন, ইনি 'চণ্ডীদাস-পূজিতা'— এইরূপ কোনো আভাসমাত্র নাই, ১৩৮ বৎসর পূর্বেও। সুতরাং মনে হয়, নান্নুরে চণ্ডীদাস-বাশুলীর ও রামী রজকিনীর উদ্দাম যোগাযোগ-কল্পনা আধুনিক উর্বর গবেষণাপ্রসূত মহাফল।

২৬২সংখ্যক পত্রে উক্ত শ্যামানন্দময়ীর স্বামী বিশ্বেশ্বর শর্মা ভট্টাচার্যের হকীকতের উত্তরে ভাষ দেওয়া হইয়াছে,—ভ্রাতৃপৌত্রান্ত স্থাবরাদি ধনে ভাগিনেয়ের অধিকার, ভগিনী প্রভৃতির নহে।

২৬৩. বীরভূমের ফতেশীংহ পরগণার মানিকাহার গ্রামনিবাসী কায়স্থ-কুলোদ্ভব ভৈরবনাথ সিংহের স্থাবর অস্থাবর ধনাদিতে অধিকার লইয়া রাজমুনি দাসীর বিরোধ ঘটিয়াছিল। তাহার ভাষ এই, —প্রপৌত্রহীন মৃতের স্থাবরাদি ধনে পত্নীর অধিকার ; তাহার ভ্রাতার বা তাহার পত্নীর বা ভ্রাতৃদুহিতার অধিকার নাই।—কোতলঘোষা গ্রামের কালীগুরু শর্মা এই ভাষ দিয়াছিলেন।

২৬৪. জাতাধিকারিণী পত্নী পতির উপকার-বিনা স্থাবরাদি ধন দান-বিক্রয় করিতে অনধিকারী ; করিলে, তাহা অসিদ্ধ।—এই উত্তর দেওয়া হইয়াছে দায়ভাগ, দায়তত্ত্ব এবং 'বিবাদভঙ্গার্ণব' ইত্যাদি গ্রন্থসম্মতভাবে।

২৬৫. ভ্রাতৃগণের অর্জিত স্থাবর-অস্থাবর সাধারণ ধন-ব্যাপারে একজনের মৃত্যু হইলে, মৃতের পুত্র পিতৃব্যদের সহিত সমান অংশ পাইবে। এই প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে 'গৌড়দেশ প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রানুসারে'।

২৬৬. প্রায়শ্চিত্তবিমুখ পতিত পৈতৃক ও মাতৃধনে অনধিকারী।— ১৭১৩ শকাব্দের এই হকীকত ও ভাষ-পত্রটি খুবই চিত্তাকর্ষক। 'রাজদ্বারে' মামলা-মকদ্দমা করিতে 'চেষ্টান্বিত', কটুবাক্য প্রয়োগ এবং আঘাতাদির পরে, ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট শেষ-মীমাংসার জন্য শরণাপন্ন হইয়াছিলেন এক ব্যক্তি। ঘরোয়া অশান্তির একটি উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যাইবে এই পত্রখানিতে।

২৬৭. পৈতৃক স্থাবরাদি ধনে মাতামহীর মৃত্যুতে প্রত্যেক দৌহিত্রের সমান অধিকার; পিতামহ-ধনে পিতৃক্রমে পৌত্রের অধিকারের মতো, মাতৃক্রমে দৌহিত্রের অধিকার নাই।—ইহা 'পণ্ডিতবর্গ মহাসয়'-কৃত 'বহিরগাছির কালিদাস বাড়ুর্য্যার বাটীর ব্যবস্থা'।

(২) ২৬৮. যজমান ও বৃত্তি বিরোধের হকীকত-পত্র। সমরসাহী পরগণার নজনপুর সাকিমের মানিকরাম দেবশর্মা তাঁহার গ্রামের যজমান ও বৃত্তিতে চল্লিশ বৎসর ভোগ-দখলিকার ছিলেন। সহসা তাঁহার এক জ্ঞাতিপুত্র গঙ্গাধর শর্মা দাবীদার আসিলেন। গঙ্গাধরের দাবীর কথা গ্রামস্থ ষোল-আনা কেহো জানে নাই। অবশ্য, গ্রামে মানিক ঠাকুরের বিপক্ষও ছিল। তাহাদের দুই তিন জনা 'মুর্ধাই' বা মোড়ল হইয়া গঙ্গাধরকে আমল দিতে চাহেন। ইহারই সনন্দ-পত্র বা শাস্ত্র-অনুসারে ব্যবস্থা-পত্র চাওয়া হইয়াছে।

(৩) ২৬৯. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের অধস্তনদের বৈইনান-বাটীতে দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য বৃত্তির ধান্য, টাকা এবং অধিকারের সামগ্রীর অংশ লইতেছেন। তাঁহাকে 'কিছু কৃতাংশ'

না-দিবার জন্য দামুন্যার রামতুলাল দেবশর্মা 'নিতান্ত উদাস' হইয়া 'বুজসুজ' করিতে পত্র লিখিয়াছিলেন [ছোট] বৈইনান গ্রামের শ্যামাচরণ বিদ্যালঙ্কারকে।

(৪) ২৭০. রমাপ্রসাদ রায় সদর উকীল মহাশয়কে লিখিত জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বিবরণ। ইহা সেকালের একখানি আদর্শ-পত্রের নকল। একান্নবর্তী পরিবারের দুই সহোদরের 'বিবনায় প্রযুক্ত' সম্পত্তি অর্ধাঅর্ধী করিয়া দখল চলিতেছিল। ইহা আইনানুগ করিবার নিমিত্ত এই বিবরণ। এখানে লক্ষণীয় যে, শাস্ত্র-ব্যবস্থার জন্য উকীল মহাশয়কে পত্র লেখা হইতেছে। উল্লিখিত উকীল ও মক্কেল উভয়েই সেকালের খ্যাতনামা ব্যক্তি।

২৭১. পিতৃব্যদের ও স্বামীর মধ্যে মৃতা কন্যার সম্পত্তি-ভাগপত্র। ১২৬৭ সালে কালীচরণ দেবশর্মার লিখিত এই 'ভাগপত্র'খানির সংশ্লিষ্ট কোনও ভাষ পাওয়া যায় নাই।

(৫) ২৭২. ভদ্রাসন বাটীর বিভাগ সম্পর্কিত একরার। সাকিম বোড়া-বেহালার কমলাচরণ, গঙ্গাধর, হারাধন ও যদুনাথ মুখোপাধ্যায়রা চারি শরিক। 'পতিত' হইবার আশঙ্কায় সদর বাটীর কুঠারি তাঁহারা আপসে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন এইভাবে,— গঙ্গাধরের ঘরের নাম 'সর্‌কার', কমলাচরণের ঘরের নাম 'আপীশের ঘর', হারাধনের ঘরের নাম 'বৈটকখানা ঘর', যদুনাথের ঘরের নাম 'অতিতের ঘর'। বাকী সম্পত্তি যেমন, ৺দালান, তাহার পার্শ্বের চারি কুঠারি আর 'মামুদর ভাঙ্গা' ছিল এজমালে। এই মীমাংসার শর্ত ছিল এই, কেহ নিজস্ব কুঠারি সরাইতে না-পারিলে তাহা হইতে বেদখল হইবে। এবং যে সরাইবে সেই মালিক হইবে। আর-একটি শর্ত ছিল, চারি শরিকের মধ্যে কাহারও 'বিরধ কার্য্য' অর্থাৎ ধুমধামে বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি বড়ো কাজের সময়ে ও ৺মহাপূজা অর্থাৎ দুর্গাপূজার সময় পরস্পর বিনা-ওজরে আবশ্যকমতে সেই কার্য সমাধা না-হওয়া পর্যন্ত কুঠারি ছাড়িয়া দিবে। যাহাই হউক, এইভাবের ঘরোয়া আপসে, ভট্টাচার্য মহাশয়ের ভাষের প্রয়োজন হইত না। এই একরার-পত্রের ইসাদ, তাহাও মাত্র একজন, বেহালার ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায়।

২৭৩. মূল ধনী রামমোহন ঠাকুরের দুই পত্নীর মধ্যে প্রথম পক্ষের পৌত্রী, দ্বিতীয় পক্ষের কন্যা, ও এক পুত্রবধূর বিষয়-বণ্টন।

(৬) ২৭৪. আপসে জিনিষ-বদলের চুক্তিপত্র। 'ফিরাফিরি' হইলে, আপসে 'জরিমানা'-ব্যবস্থা লক্ষণীয় ব্যাপার।

২৭৫. পুত্রদের মধ্যে স্বেচ্ছাকৃত বিভক্ত-ধনে নিজের স্বত্বাভাবহেতু পিতা পরে তাহার অন্যথা করিতে অসমর্থ।

(৭) ২৭৬ ছয় সেবার দরুন জমির শর্ত ও বৃত্তি-বিরোধের হকিকত-পত্র। বাসুদেব, গোপাল, ভুবনেশ্বর শিব আর শালগ্রাম—এই সব গৃহদেবতার সেবার জন্য 'ভাণ্ডর' গিরিধর রায়ের সহিত সখি দেবীর বিবাদের 'হকিকৎ জবানবন্দী'।

২৭৭. বর্ধমানের দেওয়ানী আদালতের ভট্টাচার্য দুর্গাদাস শর্মার রায়।—পতি হইতে প্রাপ্ত স্থাবরাদি সম্পত্তি পত্নী গুরুকে দান করিলে তাহাতে গুরুরই অধিকার। পত্নীর শাশুড়ী সে-দান প্রতিগ্রহ করিতে পারে না। আজমতসাহী পরগণার সামুক গ্রামের গুরুদেব গোবিন্দপ্রসাদ শর্মা ১২০৬ সালে 'হকীগত পত্র' পেশ করিয়া শিষ্য, সেনপাহাড়ী পরগণার অমরপুর গ্রামের গোলাম রায়ের প্রদত্ত সেনপাহাড়ী, সেরগড় ও গোপভূমি পরগণার ২২বিঘা 'ব্রহ্মত্তর জমি' হইতে শিষ্যের 'অবর্তমান' হওয়ার পরে বেদখল হওয়ায়, শিষ্যের ওয়ারিশানদের বিরুদ্ধে হকিকতের মামলা ঠুকিয়া 'সাস্ত্রানুসারে' উদ্ধার করিয়া লইয়াছিলেন।

২৭৮. ধনীর মাতুল, ভগ্নী কিংবা জ্ঞাতি ধনাধিকারী কে হইতে পারে, তাহারই হকিকত।

২৭৯. এক ব্যক্তির তিন কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিয়া পিতার মৃত্যু হয়। মধ্যম কন্যার বিবাহ দিয়া মাতার মৃত্যু হয়। এখন প্রশ্ন এই, মাতাপিতার মৃত্যুর পরে, অবিবাহিতা কন্যা সমস্ত ধনের অধিকারী হইবে কিনা ; অথবা, বিবাহের খরচ বাদে ঐ সম্পত্তি তিন অংশ হইবে। ইহার উত্তর-পত্রখানি এই সঙ্গে পাওয়া যায় নাই।

২৮০. রানিহাটী পরগণার সামিল বয়ড়া পরগণার বুজরুক বেলিয়া গ্রামের কমলাকান্ত গোস্বামীর হকিকতে প্রশ্ন এই, পিতামহের কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্বোপার্জিত বৃত্তি ইত্যাদির অংশে তাঁহার বর্তমানে ও অবর্তমানে, 'অবিবাদে দখলকার' দখল পাইবেন কিনা।

২৩৮. ঐশ্বর্যরহিত পিতার পুত্র কালীচরণ বসুর হকিকত। কালীচরণ বসুর স্বোপার্জিত দৌলতে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র সাবালক হইয়া অংশ দাবী করে। সে অংশী কি নিরংশী তাহার ব্যবস্থা চাওয়া হইয়াছে। ১২০০ সালের এই 'নিবেদনে' কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের বংশধর শ্যামসুন্দর বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য মহাশয়ের শাস্ত্রানুসারে 'বিধিমত বিচারে'র সিদ্ধান্তটি আমরা জানিতে পারি নাই।

৬০১. প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষের ভ্রাতৃগণের মধ্যে সম্পত্তি ও ব্যবসায় লইয়া বিরোধ ও তাহাতে শাস্ত্রমান্য। আজমতসাহী পরগণার ঘড়া গ্রামের এই বৈষয়িক বিরোধের নিষ্পত্তি-পত্রখানিও আমাদের হস্তগত হয় নাই।

বাণিজ্য সমাজরক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক কর্ম। সেই সামাজিক আবশ্যক-পালনকে এক সম্প্রদায় যদি আপন সাম্প্রদায়িক কর্ম, আপন কৌলিক গৌরব বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে বণিগ্‌বৃত্তি সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়া সমাজের অন্যান্য শক্তিকে গ্রাস করিয়া ফেলে না। তা ছাড়া কর্মের মধ্যে ধর্মের আদর্শ সর্বদাই জাগ্রত থাকে।

১৩০৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ব্যবসায়-বাণিজ্য ॥

(সন ১১০১-১২৮১ : খৃ. ১৬৯৪-১৮৭৪)

॥ ভূমিকা : বঙ্গীয় অর্থনীতির সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট ॥

প্রাচীন যুগ ॥ বাঙ্গালা আবহমানকাল কৃষিপ্রধান ভূভাগ। একালের মতো সেকালেও এদেশের বেশীর ভাগ লোকই গ্রামে বাস করিত। গ্রামের চারিদিকের জমি চাষ করিয়া নানা শস্য ও ফলাদি উৎপাদন করিত। ধান্যই ছিল প্রধান শস্য। চাষের প্রণালী ছিল বর্তমানকালের মামুলী পদ্ধতির অনুরূপ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই এখানে আখের চাষ হইত। ইক্ষুর রস হইতে প্রচুর পরিমাণে চিনি ও গুড় প্রস্তুত হইত এবং বিদেশে চালান যাইত। অনেকে অনুমান করেন, এই গুড় হইতেই 'গৌড়' নাম। বর্তমানে এই মতবাদ পরিত্যক্ত হইতেছে। দ্রবিড় গোণ্ড[১] বা গৌড়দের দেশ 'গৌড়', এই নামই সমীচীন মনে হয়। বীরভূমে এখনও গৌড়[২] জাতির বসবাস আছে। তাহারা কৃষিজীবী।

কার্পাস ও সরিষার চাষও এখানে হইত বহুল পরিমাণে। কার্পাসের নামে জমি[৩] ও সর্ষপের নামে গ্রাম[৪] এদেশে অনেক আছে। পানের বরজও ছিল প্রচুর। এই নামেও গ্রাম-নামের অভাব নাই। বহুফলবান্ বৃক্ষের রীতিমতো চাষ হইত। বড়ো বড়ো আম্র-বাগিচার উল্লেখ আলোচ্য চিঠিপত্রে[৫] আছে। ইহার মধ্যে নারিকেল, আম, কাঁঠাল, কলা, নেবু ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জমির স্বত্ব ॥ জমি যাহারা চাষ করিত জমিতে তাহাদের স্বত্ব কিরূপ ছিল, রাজা অথবা জমিদারকে কি হারে খাজানা দিতে হইত, ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক্ কোনও বিবরণ জানা যায় না। সম্ভবতঃ রাজাই দেশের সমস্ত জমির মালিক ছিলেন। যাহারা চাষ করিত বা অন্য প্রকারে জমি ভোগ করিত তাহাদিগকে কতকগুলি নির্দিষ্ট কর দিতে হইত। রাজা মন্দিরাদি ধর্ম-প্রতিষ্ঠানে এবং ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন করিবার জন্য ভূমি দান করিতেন। এই জমির জন্য কোনও কর দিতে হইত না। গ্রহীতা বংশানুক্রমে ইহা চিরকাল ভোগ করিতেন। অনেক সময় ধনীরা রাজদরবার হইতে পতিত জমি কিনিয়া লইয়া এইরূপ উদ্দেশ্যে দান করিতেন। তাহা নিষ্কর ও চিরস্থায়ী বলিয়া গণ্য হইত।[৬]

জমির মাপ ॥ তখন নল দিয়া জমি মাপ করা হইত। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন অঞ্চলে

১ বা. সা. ই. ১খ, পূ, পৃ ৪ ২ Cen. 1951, Bir, 1958 ৩ চি-প-স ২, চি-সং ৩২৫ ই.
৪ ঐ, ঐ ২৩ ৫ ঐ, ঐ ৩৫৯ ৬ পৃ. ৩৫-৩৮ ; বা. দে. ই, পৃ ১৯৬

নলের দৈর্ঘ্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের ছিল[১]। 'সমতটীয়-নল' এবং 'বৃষভশঙ্কর-নলে'র উল্লেখ আছে[২]। প্রথমটি সম্ভবতঃ সমতট প্রদেশের এবং দ্বিতীয়টি বিজয়সেনের উপাধিজাত নাম হইতে পারে। গুপ্তযুগে জমির পরিমাণসূচক কুল্যবাপ ও দ্রোণবাপ এই দুইটি নামের ব্যবহার হইত। কুল্য-বাপ শব্দটি সম্ভবতঃ[৩] কুল্য-শব্দজাত অর্থাৎ এক কুল্য বীজ দ্বারা যতখানি জমি বুনা যায়, তাহাই ছিল মনে হয় কুল্যবাপ মাপের অর্থ। পরে ইহার একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কুল্যবায় মাপ এখন কাছাড় জেলায় চলিত আছে। ইহা চৌদ্দ বিঘার সমান। পূর্বে এই পরিমাণ এক কাঠা ছিল কিনা বলা শক্ত। কেহ বলেন, তিন বিঘা; কেহ বলেন, আরো বড়ো। কুল্যবাপের আট ভাগের একভাগ দ্রোণবাপ[৪]। পরবর্তিকালে কুল্যবাপের বদলে পাটক অথবা ভূপাটক শব্দের ব্যবহার ছিল। এক পাটক চল্লিশ দ্রোণের সমান। ইহা ছাড়া, আঢ়[৫] অথবা আঢ়বাপ, উন্মান অথবা উদান,[৬] ছটাক, ধূল, গণ্ডা এবং কাক বা কাকিনিক ইত্যাদি শব্দ জমির পরিমাণ বুঝাইতে ব্যবহৃত হইত[৭]। কিন্তু, ইহাদের পরিমাপ বর্তমানে অপ্রচলিত হইয়া যাইতেছে।

শিল্প ॥ বাঙ্গালাদেশ কৃষিপ্রধান হইলেও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্যও এখানে প্রস্তুত হইত। বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রাচীনকালেই ইহার খ্যাতি ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ক্ষৌম, দুকূল, পত্রোর্ণ ও কার্পাসিক এই চারিপ্রকার বস্ত্রের উল্লেখ আছে। ক্ষৌম শণের সূতায় প্রস্তুত মোটা কাপড়। এক জাতীয় সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্রের নাম দুকূল। পত্রোর্ণ রেশমজাতীয় একপ্রকার কীটের লালায় তৈরী। কাপাস-তুলার কাপড় সুখ্যাত ছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে বাঙ্গালাদেশ হইতে বহু পরিমাণে উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম বস্ত্র বিদেশে চালান যাইত। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত জগদ্বিখ্যাত বঙ্গাল-মসলীন অতি প্রাচীন যুগেই এদেশে প্রস্তুত হইয়াছিল। বীরভূমের মোটা 'গড়া' কাপড়[৮] জাহাজের পাল তৈয়ারীর জন্য গত শতাব্দীতে বিদেশে চালান যাইত। 'ক্ষেরুয়া' ও 'ভুনি' কাপড়ও বিশেষ প্রচলিত ছিল[৮]। প্রস্তর ও ধাতুশিল্প বিশে উন্নত হইয়াছিল। মৃৎশিল্পের পরিচয় অষ্টম শতাব্দী হইতে পশ্চিমবঙ্গের অগণিত মন্দিরের পোড়া-মাটীর কাজে এবং তৈজসপত্রে পাওয়া যাইতেছে। স্বর্ণকার ও মণিকার শিল্পও উন্নতিলাভ করিয়াছিল। কর্মকার ও সূত্রধর গৃহ, নৌকা, শকট ইত্যাদি নির্মাণ করিত। কাষ্ঠশিল্পও প্রভূত উন্নত হইয়াছিল। হস্তিদন্তের কাজও উচ্চশ্রেণীর শিল্প ছিল।

শিল্পীদের সংঘবদ্ধ জীবনের পরিচয়ও পাওয়া যায়। নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম-সার্থবাহ, প্রথম-

১ চি-প-স ২, চি-সং ১৪৬, তুল. 'নলখড়ি' ২ বা. দে. ই., পৃ ১৯৬-৯৭

৩ তুল. 'কুড়া' বা 'কুড়বা' (চি-প-স ২, পৃ ১৬৯, ৪৯৭) ৪ 'দিনার' ? (ঐ, ঐ, পৃ ৩১৬)

৫ 'আড়া' (ঐ, ঐ, পৃ ২৪৩, ৪৮৮) ৬ 'দড়ি' ? ৭ দ্র. লীলাবতী, পূর্বার্ধ রূপঃ প্রথমো ভাগঃ, পৃ ৭ ই. ৮ চি-প-স ২, চি-সং ২৮৮, ১৬৫, ৬০

কুলিক ইত্যাদি এইরূপ সংঘের প্রধান ছিলেন। বিজয়সেনের লিপিতে উক্ত হইয়াছে, রাণক শূলপাণি[১] বারেন্দ্র-শিল্পিগোষ্ঠীর চূড়ামণি ছিলেন। এইরূপ সংঘবদ্ধ শিল্পিজীবনের ফলেই বাঙ্গালার বিভিন্ন শিল্পিগোষ্ঠী (guild) ক্রমশঃ বিভিন্ন বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হইয়াছে। 'রাণক' বা 'মণ্ডল' বোধহয় ছিল বিধিবদ্ধ শিল্পিসংঘপতির বিশেষ অভিধা। বর্তমানে ইহাদের বংশধর 'রাণা' পদবীধারী বিভিন্ন শিল্পিগোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গে বহু গ্রামে আছে।—তন্তুবায়, গন্ধবণিক, স্বর্ণকার, কর্মকার, কুম্ভকার, কাংসকার, শংখকার, মালাকার, তক্ষক, সূত্রধর, তৈলিক ইত্যাদি প্রথমে বিভিন্ন শিল্পিসংঘমাত্র ছিল; পরে, ক্রমে ক্রমে সমাজে এক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া এক একটি স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এই সমস্ত জাতিবিভাগ হইতে সেকালের বিভিন্ন শিল্প, বৃত্তি ও ব্যবসায়ের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

বাণিজ্য ॥ শিল্পের উন্নতির সঙ্গে বাণিজ্যের প্রসার হইয়াছিল। বহু নদনদী থাকায় শিল্পজাত দ্রব্যাদি দেশের নানা স্থানে প্রেরণের সুবিধা ছিল। নানা স্থানে 'বারাসত', 'গোলাহাট' ও 'গঞ্জ' এবং নূতন নূতন নগর অর্থাৎ বড়ো গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্থলপথে গমনাগমন হেতু বড়ো বড়ো রাস্তা ছিল; এবং প্রাচীন নগরগুলিও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। হট্টপতি, শৌল্কিক, তরিক ইত্যাদি[২] কর্মচারীদের নাম হইতে বুঝা যায়, শিল্প ও বাণিজ্য হইতে রাজ্যের প্রভূত আয় হইত। বাঙ্গালার বাণিজ্য ভারতের অন্য প্রদেশেও প্রসারিত ছিল; পণ্যদ্রব্য বিনিময় হইত। প্রাচীনকালে সমুদ্রপথেও বাঙ্গালার বাণিজ্য-ব্যবসায় চলিত। এখনও বাঙ্গালী বণিক্‌দের পদবী[৩] আছে 'রোম', 'চীন'। গঙ্গানদীর মোহানায় 'গঙ্গে' নামক বন্দর ছিল। বণিকেরা সেখান হইতে জাহাজ ছাড়িয়া দক্ষিণভারত, লঙ্কাদ্বীপ, অথবা ব্রহ্মদেশ, মালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা ইত্যাদি দেশে যাইত। এখনও মুণ্ডেশ্বরী, দামোদর, অজয় ইত্যাদি শুষ্ক নদীর ধারে ধারে 'বন্দর' নামক বহু গ্রাম আছে[৪]। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের একদাতন অধিবাসী দ্রবিড়-তামিলগণ, বর্তমানের বাঙ্গালী 'তামলি' জাতি পেশায় ছিল তাম্রলিপ্তের সমুদ্রযাত্রী বণিক্[৫]। ধীবরগণও দারকেশ্বর নদী বাহিয়া বিদেশে যাইত। তাহাদের আদিপুরুষ যখন প্রথম নৌকা ভাসাইয়া বাণিজ্যযাত্রা করেন, তখন নৌকাপূজা করিয়া যে-কাষ্ঠখণ্ডে দেবতার প্রসাদী নিদর্শন রাখিয়াছিলেন, তাহা এখন ধর্মঠাকুরের বেদীতে 'গঙ্গাদেবী' নামে কোথাও কোথাও পূজিত হইতেছেন[৬]। বর্তমানে এই 'গঙ্গাদেবী' ধর্মঠাকুরের পত্নী 'কামিনী' হইয়াছেন।

সূক্ষ্ম মসলিন কাপড়, মুক্তা ও নানাপ্রকার গাছ-গাছড়া এদেশ হইতে চালান যাইত।

---

১ বা. দে. ই., পৃ ১৯৮   ২ ঐ, পৃ ১৯৮-৯৯   ৩ শা. বা., ১৩৭৪, পৃ ১৮-১৯

৪ অ-বা, বৈশাখ ১৩৬৯, পৃ ৭   ৫ বা সা. ই., ১খ, পূ, পৃ ৮

৬ ব. সা. স.—মুখপত্র, ২য় বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩৬৮, পৃ ১০

তাম্রলিপ্ত পরে প্রধান বন্দর হইয়াছিল। বাঙ্গালীর পণ্য পৃথিবীর সুদূর প্রদেশে যাইত এবং তথা হইতে ধন, দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া ফিরিত। দ্বিতীয় খৃষ্টপূর্বাব্দের বহু পূর্ব হইতেই চীন ও আসাম দেশের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক সুদৃঢ় ছিল; নেপাল, ভূটান, তিব্বতের সঙ্গেও ছিল। শিল্প ও বাণিজ্যের ফলে বাঙ্গালার ধনসম্পদ্ ও ঐশ্বর্য প্রচুর বাড়িয়াছিল।

প্রাচীন মুদ্রা ॥ প্রাচীন ছাপ-কাটা punch-marked মুদ্রা চতুর্থ-পঞ্চম খৃষ্টপূর্বাব্দে ভারতে প্রচলিত ছিল[১]। মৌর্যযুগেও মুদ্রা ছিল। কুষাণ যুগের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। গুপ্তযুগে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা অনেক মিলিয়াছে। দীনার ও রূপক—এই দুই মুদ্রার নাম মিলে। দীনার স্বর্ণমুদ্রা। রূপক রৌপ্যমুদ্রা। ষোলো রূপক এক দীনারের সমান। পালযুগের তাম্রমুদ্রা মিলিয়াছে—প্রতীক একদিকে একটি বৃষ, অপরদিকে তিনটি মাছ। তামা ও রূপার মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। দ্রম্ম মুদ্রাও চলিত ছিল। সেনযুগে 'পুরাণ' ও 'কপর্দক-পুরাণ' নামে মুদ্রার উল্লেখ আছে। মনে হয়, একই মুদ্রা। তখন কৌড়ি অথবা কড়ির প্রচলন ছিল। কপর্দক-পুরাণ কড়ির আকারে নির্মিত রৌপ্যমুদ্রা হইতে পারে। অথবা, ইহা নির্দিষ্টসংখ্যক কড়ি। এই রৌপ্যমুদ্রার পরিমাণে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হইত, তদনুযায়ী কড়ি গুণিয়া দ্রব্যাদি কেনা-বেচা হইত। ভারতবর্ষে কড়ি-প্রচলনের কথা ফা-হিয়ান উল্লেখ করিয়াছেন। চর্যাপদেও উল্লেখ আছে। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কড়ির ব্যবহার ছিল[২]। আলোচ্য চিঠিপত্রের[৩] সময়েও কড়ি প্রচলিত ছিল।

সুলতানী আমল ॥ দেশের বাণিজ্যের উপর বাদশাহেরা হাত দিতেন না[৪]। কৃষিরও কোনো ধার ধারিতেন না। ধনশালী হিন্দুরাই তখন কৃষি-বাঙ্গালার মালিক। ব্যবসা-বাণিজ্যও তাঁহাদের হাতে। জায়গীরও তাঁহাদের। দেশ সমৃদ্ধ। সম্পন্ন গৃহস্থের সোনার রূপার তৈজসাদি ছিল। সেনযুগে এবং সুলতানী আমলে ছিল অকুণ্ঠ বিলাসিতা। নবাবগণের অনুগ্রহপুষ্ট তালুকদারদের নাম ছিল 'নিয়োগী', 'চৌধুরী'। এক কোটী 'দাম' রাজস্ব-আদায়কারীর নাম ছিল 'কড়োরি'[৫]। তাঁহাদের ক্ষুদ্র রাজরূপের নাম ছিল 'ভূঞা'[৬]। প্রাচীনকালে প্রজাগণ পুরুষপরম্পরায় একই স্থানে বসবাস করিয়া জমির দখলি-স্বত্ব অর্জন করিত। সুলতানী আমলে নানা শ্রেণীর মধ্যে স্বত্বাধিকারী ভূস্বামী-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রজার ভূস্বত্ব ক্রমে সঙ্কুচিত হইল। ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে[৭] জিনিষপত্রের মূল্য ছিল সুলভ। শস্যের মূল্য কম থাকায় চাষী-প্রজার অবস্থা সচ্ছল ছিল না। সাধারণ বাজার-দর অন্য দেশের তুলনায় কম ছিল।

১ The Statesman, 19-8-1967, p 8; শা. দী. ১৩৭৪, পৃ ১৪-১৫ ২ বা. দে. ই, পৃ ১৯৯-২০০
৩ চি-প-স ২, চি-সং ২৯৯ ই. ৪ বাং. ই., পৃ ১৯০ ৫ সা-প্র ৩, পৃ ১০, ১৪২, ১৭৪
৬ বাং. অ. ই, পৃ ৩৫ ৭ S. T. I. B, p. 267

এই সময়ের মুদ্রার নাম টঙ্ক-হ্বা। সামান্য মূল্যের জন্য কড়ির ব্যবহার হইত। নানা প্রকার ধান্য, গোধূম, যব, সর্ষপ ইত্যাদি উৎপন্ন হইত। নারিকেল, ধান্য, তাল, খেজুর ইত্যাদি হইতে মদ্য প্রস্তুত হইত; বিক্রয় হইত প্রকাশ্যে। কদলী, আম্র, দাড়িম্ব, ইক্ষু ইত্যাদি উৎপন্ন হইত। কার্পাস হইতে ছয় প্রকারের সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়ন হইত। বস্ত্র প্রস্থে দুই হস্ত ও দৈর্ঘ্যে উনিশ হাত। রেশমের কীট পালন করা হইত। রেশমী বস্ত্রের খুব প্রচলন ছিল। সিল্কের রুমাল ও টুপী হইত সোনার কারুকার্যখচিত। বন্দুক, ছুরি, কাঁচি, পেয়ালা সব-কিছু পাওয়া যাইত। গাছের ছাল হইতে কাগজ তৈয়ারী হইত। তাহা মৃগচর্মের মতো মসৃণ ও উজ্জ্বল। কার্পাসের চাষ প্রচুর হইত। প্রতি তিন বৎসর অন্তর এক বৎসর জমি পতিত রাখার ব্যবস্থা ছিল। ধান্য, গুড় ও তুলা-বিক্রয় কৃষকের ধনাগমের উপায় ছিল। কিন্তু সঞ্চিত বিত্ত সাধারণ কৃষকের হাতে থাকিত না। কারণ, শস্যের মূল্য অল্প, তাহার বদলে প্রয়োজনীয় অন্য দ্রব্য সংগ্রহ এবং রাজস্বের সংস্থান করিতে হইত।

আলাউদ্দিন শস্যাদির মূল্য নির্ধারণ করিয়াছিলেন। জিতাল-মুদ্রা প্রচলিত ছিল। ৫০ জিতাল এক তঙ্কার সমান[১]। তাঁহার অনুশাসন-পত্র মূল্য-নিয়ন্ত্রণের ঐতিহাসিক হস্তক্ষেপ। শেরশার আমলে কৃষক ও রাষ্ট্রের সম্পর্কে এক নবযুগের সূচনা হইয়াছিল। তিনি বিশ্বাস করিতেন, কৃষিই সম্পদের মূল। কৃষকের শ্রমই উৎপাদনের উৎস। কৃষকের উন্নতি ব্যতীত সমাজের ও রাষ্ট্রের উন্নতি অসম্ভব। সেইজন্য তাঁহার নীতিতে রাজস্ব-নির্ধারণে জুলুমবাজি ছিল না[২]; আদায়ে কঠোরতা ছিল। ফলে, অজন্মা না-হইলে রাজস্ব বাকি থাকিত না। ফসলের ভাগ দেওয়া-নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

শেরশাহ্ দেশকে কতকগুলি সরকার ও পরগণায় ভাগ করেন। আমিন দ্বারা প্রত্যেক রায়তের জমি আলাদা করাইয়া ফসলের এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব ধার্য করেন। রাজস্ব নগদ কিংবা ফসলের মাধ্যমে দেওয়া যাইত। সেকালে নগদ টাকার প্রচলন কম ছিল। রাজকোষে নগদ টাকার প্রয়োজন থাকায়, নগদ আদায় দেওয়াকেই প্রাধান্য দেওয়া হইত। প্রত্যেক রায়তকে তাহার ভূসম্পত্তির কবুলিয়ত দিতে হইত; রায়ত পাট্টা পাইত। 'মুকাদ্দাম' রাজস্ব আদায় করিতেন। সরাসরি আদায়ও দেওয়া যাইত। এইজন্য রাষ্ট্র ও রায়তের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। জমি জরিপের জন্য 'জরিমানা' ও রাজস্ব আদায় বাবদ 'মহশিলানা' নামক কর দিতে হইত। শেরশাহ্ জায়গীরদারি-প্রথা তুলিয়া দিয়াছিলেন। ফলে, রাজস্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সীমান্ত-মাশুল আদায় করা হইত। শেরশার সময়েও জিজিয়া কর সম্ভবতঃ প্রচলিত ছিল[৩]। রাজস্বের ২½% রাজকোষে বীমা-তহবিলে জমা দিতে হইত দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, অজন্মাদিতে সাহায্য লাভের জন্য। দীন-দরিদ্রকে খাওয়াইবার জন্য 'লঙ্গরখানা' ছিল।

১ ম-বা, পৃ ৩৩৬ ২ S. S., p. 16 ৩ P. C. M., pp. 279-80

১২০২ খৃষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খিলজি বাঙ্গালাদেশ দিল্লীশ্বরের অধীনে আনেন। ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তৎকালীন রাজধানী লক্ষ্মণাবতী হইতে নামেমাত্র স্বাধীন নবাবগণ দেশ-শাসন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ ছয় জন নিজেদের নামে মুদ্রাঙ্কন করিয়াছিলেন। ১৩৩৯ খৃষ্টাব্দে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্‌ সমগ্র বঙ্গ অধিকার করেন। তদবধি ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্গালাদেশ চারিটি রাজবংশ কর্তৃক শাসিত হয়: (১) ১৩৩৯—১৪০৬ এবং পরে পুনরায় ১৪৪২—১৪৮১ পর্যন্ত ইলিয়াস্‌ শাহ্‌ ও বংশধর; (২) ১৪০৬—১৪৪২ পর্যন্ত রাজা গণেশ ও বংশধর; (৩) ১৪৮৬—১৪৯০ পর্যন্ত হাবসী রাজন্যবর্গ; (৪) ১৪৯৩—১৫৩৮ পর্যন্ত আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্‌ ও বংশধর। অতঃপর, শেরশাহ্‌ ও তাঁহার বংশধরগণ কর্তৃক আকবরের পূর্ব পর্যন্ত।

সুলতানী আমলে বাঙ্গালার স্বর্ণমুদ্রা অতি বিরল। গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরের সময়ের (১৩১০-১৩২৩) একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে[১]। তাম্রমুদ্রার বদলে কড়ির প্রচলন ছিল সমধিক। বাঙ্গালার সেকালের ৫৬জন নবাব ও শাসকের মধ্যে ২৯জন কর্তৃক রজতমুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল। সেকালের টাঁকশালের মধ্যে লক্ষ্মণাবতী, ফিরোজাবাদ, সাতগাঁও, ফতেহাবাদ, হুসেনাবাদ, নস্‌রতাবাদ এবং পাণ্ড্রা[২] উল্লেখযোগ্য। টাঁকশাল ও রাজকোষ উভয় স্থানেই মুদ্রাঙ্কন হইত।

শেরশাহ্‌ খাঁটি সুবর্ণ ও রজত মুদ্রা এবং নূতন ধরণের তাম্রমুদ্রা প্রচলন করেন। তাহা অর্ধেক, এক-চতুর্থাংশ, এক-অষ্টমাংশ এবং এক-ষোড়শাংশে বিভক্ত করা হইয়াছিল। সাতগাঁও ছিল বাঙ্গালার টাঁকশাল। শেরশাহের মুদ্রালিপি ছিল দেবনাগরী ও ফারসী উভয় ভাষায়—হিন্দু ও মুসলমান প্রজাপুঞ্জের ব্যবহারের সুবিধার জন্য।

সুলতানগণ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য উৎসুক ছিলেন না। অথচ, হাটে-ঘাটে শুল্কের সীমা-পরিসীমা ছিল না। বাঙ্গালী বণিক্‌গণ 'ডিঙ্গা' সাজাইয়া সমুদ্রোপকূল ধরিয়া দূরদেশে বাণিজ্যে যাইতেন। নৌকা নানাপ্রকারের হইত[৩]। দৈর্ঘ্য হিসাবে নাম—'বিশা', 'বাইশা', 'পঁচিশা' ইত্যাদি। গলুইয়ে খোদিত জন্তুর নামে নাম—'সিংহমুখী', 'ব্যাঘ্রমুখী', 'শঙ্খচূড়' ইত্যাদি। যুদ্ধের নৌকা—'দুর্গাবর', 'রণজয়', 'নরভীমা' ইত্যাদি। বিলাসতরণী—'চন্দ্রপান', 'হীরামুখী', 'চন্দ্রকরা', 'নাটশালা' ইত্যাদি। সওদাগরী নৌকার বা নৌবহরের নাম ছিল 'মধুকর'। সমুদ্রগামী বড়ো নৌকা—'বুহিত' বা 'বহিত্র'। বুহিতে থাকিত নিজিয়াগণক বা দিশারু, তারাবিদ্‌, কর্ণধার, বাহক, পবনবেত্তা, গাবর, যানশিল্পী

১ C. I., pp. 73-81

২ বর্তমান খয়রাসোল থানার 'বড়রা' গ্রামটিকে W. S. Sherwill সাহেবের মানচিত্রে 'পাণ্ড্রা' বলিয়া দেখানো হইয়াছে। স্থানীয় অনুসন্ধানে জানা যায়, এই গ্রামটির পুরাতন নাম ছিল 'পুণ্ড্রা'।

৩ ম. বাং. বা., পৃ ৪৭

ইত্যাদি। ১৪০৮-৯ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শার সঙ্গে চীনরাজের পত্র ও উপঢৌকন বিনিময়[১] হইয়াছিল। সপ্তগ্রাম ছিল শ্রেষ্ঠ বন্দর। পোর্তুগীজ আগমনের পূর্ব হইতেই সাতগাঁওএর অবস্থা উন্নত ছিল। তাহারা ইহাকে বলিত ছোট বন্দর[২]। একাধিক পর্যটক 'বাঙ্গেলা' বন্দরে আসেন ১৫০৫ ও ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে[৩]। তুলা ও রেশমজাত বস্ত্রাদি রপ্তানি হইত। পোর্তুগীজ-জলদস্যুদের দৌরাত্ম্যে সমুদ্র-বাণিজ্য নির্ভয়ের ছিল না। চরকায়[৪] সুতা-কাটা প্রচলিত ছিল। মামুনা, দোগজা, চৌতার, তোপান, সোনাবাসো নামক কাপড় হইতে টেকসই জামা তৈয়ারী হইত[৫]। চামড়ার বস্তায় গুঁড়া-চিনি বা খাঁড় বিদেশে রপ্তানি হইত। পাটের চাষ হইত। পাটের পাছড়া বা উত্তরীয়কে বলিত পাটের 'খুনি'।

কৃষি ও মুদ্রানীতির ন্যায় শেরশার ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নূতন দৃষ্টি পড়ে। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হয় অবাধ। শুল্ক[৬] দিতে হইত সীমান্তে—শিকৃরিগলিতে। শেরশাহ্ সাতগাঁওএ সম্ভবতঃ শুল্ক প্রত্যাহার করেন নাই। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে শেরশাহ্ বাঙ্গালার অধীশ্বর হইয়াছিলেন। পোর্তুগীজদের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল না। ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে পোর্তুগীজগণ এদেশে বাণিজ্যে কর্তৃত্বলাভ করেন। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে সাতগাঁও ছিল তাঁহাদের অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র। শেরশাহ্ রাস্তাঘাট-নির্মাণে বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছিলেন। সেই রাস্তায় প্রহরীসমেত সরাইখানা, বার্তাবহ ডাকচৌকি বসাইয়াছিলেন। ফলে, বাণিজ্য-দ্রব্য নিরাপদে চলাচলের সুব্যবস্থা হইয়াছিল।

প্রধান শিল্প ছিল মসলীন[৭]। ইহা ছিল বংশপরম্পরায় প্রাণবন্ত শিল্প। আর ছিল মলমল। মলমলের ছিল নানা নাম—ঝুনা, তঞ্জের, সরবন্দ, সরবতি, কুমিস্, সব-নম্, তুরন্দাম ইত্যাদি। নানা সুগন্ধি প্রস্তুত হইত। জাহাজ নির্মাণ হইত। লবণ তৈয়ারী হইত। লবণ, চিনি ও রেশম বিদেশে চালান যাইত। তবু জনসাধারণ ছিল দরিদ্র। তবে, সেকালে প্রয়োজনও ছিল সামান্য। ফলে, শ্রেণী-সংগ্রাম সুলতানী আমলে দেখা দেয় নাই[৮]।

বাদশাহী আমল॥ আকবর হইতে আলিবর্দী পর্যন্ত দেড়শতাধিক বৎসর। শেরশার অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভিত্তি করিয়া মোগল বাদশাহগণ 'ফারমান্' বা নির্দেশ জারি করেন। শেরশার আদর্শ ছিল জনকল্যাণ। আকবর ছাড়া এই আদর্শ আর কাহারও ছিল না। জাহাঙ্গীর, শাজাহান ও ঔরংজেবের আমলে সুবে-বাঙ্গালার শাসনপদ্ধতির

---

১ ম. বা, পৃ ৩৪৩ ২ H. P. B., p 91 ৩ ম. বা., পৃ ১৪১ ৪ চি-প-স ২, চি-সং ৫৩৮

৫ ম. বা., পৃ ১৪৪-৪৫ ৬ S. S., p. 887 ৭ ম. বা, পৃ ৩১২-১৮ ৮ বাং. অ. ই., পৃ ৪৭

ক্রমপরিণতিতে দেখা গেল, বিলাসবৈভবে সমৃদ্ধ রাজন্যবর্গ এবং নিতান্ত অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে অভ্যস্ত জনসাধারণের মধ্যে বৈষম্যের প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছে।

আকবরের সময়[১] সাতগাঁ হইতে ব্রজধাম এক রাজার দেশ, এক রকম রাজ্যশাসন, এক মুদ্রা, এক সরকারী ভাষা। রাজধানীতে সুবাদার, দেশের ক্ষুদ্রতর ভাগে ফৌজদার বা শান্তিরক্ষক, কাজী বা বিচারক, বড় শহরে কোটওয়াল পুলিশ। জুড়ী হরকরা, গরুর গাড়ী, টাট্টু ঘোড়া ও বলদের পিঠে গমনাগমন ব্যবস্থা ছিল। চাষবাস, কেনাবেচা, শিল্পদ্রব্য তৈয়ারী, পড়াশুনা চলিত বিনা বাধায়। সুন্দর মসজিদ, সমাধি ছিল সুবহু। অরাজকতা বিদূরিত হওয়ায় লোকের হাতে অনেক টাকা। ধন, সুখ, সভ্যতা বৃদ্ধি পাইল কল্পনাতীতরূপে। কিন্তু জনশিক্ষা, ছাপাখানা বা সংবাদপত্র তাঁহার পরে দুই শত বৎসরেও হইল না। ফলে, সহজেই পরাধীন হইল দেশ।

সেকালের অর্থনৈতিক কাঠামোতে আন্তর্জাতিক শক্তির ক্রমবিকাশ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। বিদেশী বণিক্‌দের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তারে সেই শক্তির প্রতিষ্ঠা। পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজ ইংরাজের পূর্বেই আসিয়াছিল। তাহাদের বাণিজ্য ইংরাজদের তুলনায় নগণ্য ছিল না। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর নির্দেশ দিলেন, নূতন সুবেদার নিযুক্তকালে সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞীকে দশ লক্ষ টাকা সেলামী দিতে হইবে। পূর্বে তাঁহারা পাইতেন হাতী, ঘোড়া, মসলীন, শীতলপাটী, ইত্যাদি। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সুবে-বাঙ্গালার উদ্বৃত্ত রাজস্বই হইল সম্রাট্ ও তাঁহার রাজন্যবর্গের প্রতিপালনের মূল অবলম্বন। ঔরঙ্গজেবকে খুশি করিবার জন্য শায়েস্তা খাঁ প্রচুর অর্থ পাঠাইতেন। ঋণ দিয়াছিলেন, কিন্তু ফেরৎ লন নাই। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে বহু উপহার বা নজরানা দিয়াছিলেন। এই সমস্ত উপহার রাজস্বের উপরি-প্রদত্ত।

তোডরমলের সময়ে ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে সুবে-বাঙ্গালার বাৎসরিক রাজস্ব নির্দিষ্ট হয়। তন্মধ্যে খালসা ভূমির রাজস্ব ও জায়গীর ভূমির রাজস্ব ছিল স্বতন্ত্র। জায়গীর-জমা রাজকর্মচারীদের ব্যয়নির্বাহার্থ এবং খালসা-জমা রাজকোষের জন্য। তোডরমলের রাজস্ব-বন্দোবস্ত অনুযায়ী সুবে-বাঙ্গালা ১৯টি সরকারে এবং ৬৮২টি পরগণায় বিভক্ত হয়। শাজাহানের সময়ে শুজার সুবেদারীকালে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে শাহ্ শুজা তোডরমলের ব্যবস্থা সংশোধন করেন। বাঙ্গালাদেশ অতিরিক্ত ১৫টি সরকার ও ৩৬৮টি পরগণায় বিভক্ত হওয়ায় জমা অনেক বৃদ্ধি পায়। ওড়িষ্যা হইতে কতক ভূভাগ খারিজ করিয়া বাঙ্গালার সহিত জুড়িয়া দেওয়া হয়। ইহার ৬৪ বৎসর পরে ১৭২২ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ জমা আরও বৃদ্ধি করেন। তিনি জায়গীর

১ প্র, ১৩৫১ চৈত্র, পৃ ২৮৯-৯১

ভূমির এক-চতুর্থাংশ কমাইয়া খালসা ভূমির সহিত জুড়িয়াছিলেন, এবং ব্যাপকভাবে ইজারাদারী-প্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন। আকবরের আমলে রাজস্ব-বিধি ছিল জমির উৎপাদন-ক্ষমতাভিত্তিক। এখন হইল হস্তবুধ বা জমা কামিল অর্থাৎ জমিদার রায়তের নিকট হইতে বাস্তবিক যে রাজস্ব পাইতেছেন তৎভিত্তিক।

উপরন্তু, বাঙ্গালার স্থবেদারগণের তহবিলে বিরাট্ সঞ্চয় করা হইত। শায়েস্তা খাঁ, খানজাহান বাহাদুর খান, আজিম বহু অর্থ সঞ্চয় করেন। ফলতঃ, দেশের বহু অর্থ বাঙ্গালার লোকায়ত্তের বাহিরে (out of circulation) চলিয়া যাইত[১]। সেইজন্য দ্রব্যমূল্য হইল কম, আর বিদেশী বণিক্দের স্থবিধা হইল ক্রয়ের। জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় নাই। বিদেশী বণিক্গণ এদেশে নানাপ্রকার দ্রব্য খরিদ করিয়া রপ্তানির জন্য সর্বদাই অর্থ লইয়া প্রস্তুত থাকিত। উৎপাদনের স্থবিধার জন্য টাকা দাদন দিত। স্থানে স্থানে কুঠি স্থাপন করিয়া স্বদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনাইত। চুঁচুড়া (১৬৫০), কলিকাতা (১৬৯০), চন্দননগর (১৬৯০) ইত্যাদি স্থানে তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল।

ধান প্রচুর হইত এবং চালান যাইত। গরু ভেড়া প্রচুর, গব্য ও মাংস প্রচুর। কার্পেট তৈয়ারী হয়। সুস্বাদু নানা ফল এবং ইক্ষু প্রচুর জন্মে, প্রচুর তুলা বিদেশে রপ্তানি হয়; কার্পাস ও রেশম বস্ত্র খুব সূক্ষ্ম[২]। বার্ণিয়ারের মতে[৩] (১৬৫৮-৬৮), বাঙ্গালা মিশর অপেক্ষাও ফলন্ত দেশ। প্রচুর ধান, চিনি ভারতের বাহিরে যায়। মিষ্টদ্রব্য বিখ্যাত; ভাত, ঘি, তিন-চার প্রকারের শাক-সব্জী বাঙ্গালীর খাদ্য। জিনিষ-পত্রের দর খুব সস্তা। মোরগ, শূকর প্রচুর; নানা প্রকারের মাছও প্রচুর।

ঔরঙ্গজেব (১৬৫৯-১৭০৭) হইতে আলিবর্দী পর্যন্ত (১৭৪০) বিশিষ্ট স্থবেদার ও নবাব যাঁহারা বাঙ্গালা শাসন করেন— (১) মীরজুম্লা (১৬৫৯-৬৩) (২) শায়েস্তা খাঁ (১৬৬৪-৬৫, ১৬৭৯-৮৮) (৩) মুর্শীদকুলী খাঁ (১৬৯৭-১৭২৭) এবং (৪) সুজাউদ্দীন (১৭২৮-৩৯)।

মীরজুম্লার আমলে তাঁহার একটি একচেটিয়া কারবার ছিল। তিনি আবশ্যকীয় দ্রব্য-সামগ্রী সমস্ত নিজে কিনিয়া, পরে অধিকমূল্যে বিক্রয় করিতেন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরাজের গোলা-বারুদের উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত সোরা বা salt petre-এর সমস্ত চাহিদার যোগান দিতে পারিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তাঁহার আসাম-অভিযানের সময়ে এদেশে দুর্ভিক্ষ হয়। খাদ্য-শস্যের মূল্য খুব বৃদ্ধি পায়। হেতু, উচ্চহারে 'জাকাত' বা বণিক্দের উপর আয়কর এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার অভাবে লেনদেনে মন্দা, শুল্ক ও মাশুল-আদায়কারীর জুলুম ইত্যাদি।

১ বাং. অ. ই., পৃ ৫১ ২ V. P. D. I., Vol. I, pp. 327-29 ৩ T. M. E, pp. 437-43

শায়েস্তা খাঁ মীরজুম্লার নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন[১]। খুচরা ব্যবসা ব্যাহত হইল। ক্রেতাকে জিনিষ কিনিতে হইত বেশী দামে। কিন্তু, শায়েস্তা খাঁর সময়ে চাউলের দাম কম ছিল। টাকায় আট মণ। চাউলের এইরূপ সস্তা দামকে চিরস্মরণীয় করিবার ইচ্ছা ছিল শায়েস্তা খাঁয়ের।

মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে রাজস্ব আদায়ে বেআইনী জুলুম মোটামুটি বন্ধ হইয়াছিল। তিনি নির্দিষ্ট রাজস্ব আদায় করাইতেন অতি কঠোরভাবে। কিন্তু জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয় নাই। রাজস্বের হার ছিল উচ্চ। প্রজাপুঞ্জের দারিদ্র্যের উপশম হয় নাই, অজস্র উদ্বৃত্ত অর্থ-সম্পদ্ ভূগর্ভস্থ রাজকোষে জমা হইত। চাউলের দাম টাকায় চার মণ হইলেও দিল্লীতে অজস্র মুদ্রা-প্রেরণ, নবাবদের বিলাসিতা ও বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণহেতু, বহুমূল্যবান্ ধাতুর আমদানী সত্ত্বেও জনসাধারণের অসচ্ছলতা ঘোচে নাই। ইহা বণ্টন-পর্যায়ে সেকালের বিশেষ ত্রুটী[১]।

ঔরঙ্গজেবের দুইটি ফারমান্[২] হইতে জানা যায়,—দেওয়ানী শাসন এইরূপ হওয়া উচিত যাহাতে কর্ষণ বৃদ্ধি পায়, কৃষক ও জনসমাজের অধিকতর কল্যাণ হয়। এবং রায়তকে ঋণ, সেচ-পদ্ধতির উন্নয়ন ইত্যাদিতে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা হয়, রায়ত যাহাতে রাজন্যবর্গের বেআইনী জুলুমে উৎপীড়িত না হয়। নিম্নপদস্থ কর্মচারীর কাজকর্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করা, যে-সমস্ত রায়তের খাজনা বাকী রাখার স্বভাব তাহাদের চাবুক মারা, এবং দেওয়ানের অধীন ন্যায়পরায়ণ কর্মচারীকে পারিতোষিক-প্রদান প্রথা ছিল। প্রত্যেক সরকারের একজন করিয়া আমিল থাকিত। তিনি সেই এলাকার প্রধান রাজস্ব কর্মচারী, এ যুগের Collector। আমিলের পরেই বিটিকিচি অর্থাৎ Record kepeer। রাজস্ব-সম্পর্কে কাগজ-পত্র তৈয়ারী এবং আয়-ব্যয় সম্পর্কে হিসাব-নিকাশ তাহার কাজ। খাজাঞ্চী হইল Treasurer; বিটিকিচির সমকক্ষ না-হইলেও উচ্চপদস্থ কর্মচারী; আদায়ীকৃত রাজস্ব-রক্ষণ ও কেন্দ্রীয় সরকারের রাজকোষে প্রেরণ তাহার কর্তব্য; শিকদার ও কারকুনের নির্দেশে অর্থ দিলে দেওয়ানকে তাহা জানাইতে হইত। কারকুন ছিল সরকার-আমিল ও পরগণা-আমিলের রাজস্ব-নির্ধারক প্রধান সহকারী। খাজনাদারের কর্তব্য কারকুনকে হিসাব-দেখানো। কারকুন ও শিকদার (পরগণার ফৌজদারী কর্মচারী) জরুরী কারণে খাজনা হইতে খরচ অনুমোদন করিতে পারিতেন। কাননগো পরগণার আচার-ব্যবহার, ফসল, আবাদী-জমি ইত্যাদি বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। পাটওয়ারীর কাজ ছিল গ্রামের অনুরূপ তথ্য রাখা। কাননগোর মাসিক বেতন ছিল। পাটওয়ারীতে কমিশন দেওয়া হইত।

১ বাং. অ. ই., পৃ ৫৪-৫৬ ২ ঐ, পৃ ৫৮

লেনদেনে কড়ির প্রচলন[১] ছিল। মালদ্বীপ হইতে কড়ির আমদানী হইত— এ-কথা সপ্তদশ শতাব্দীতে মানুচির বর্ণনা হইতে জানা যায়। মুদ্রানীতিতে সাম্যের অভাব ছিল। মুদ্রাঙ্কনের সময়-অনুযায়ী মূল্য নির্দিষ্ট হইত। ব্যবহারে মুদ্রার ওজন কমে। সেইজন্য পুরাতন মুদ্রা হইতে নূতন, নবতর, নবতম মুদ্রার দাম বেশী করা হইত। এইহেতু বাট্টা-রীতির প্রচলন ছিল। ফলে, যাহারা মুদ্রার সন তারিখ পাঠ করিতে জানিত না তাহাদের অত্যন্ত অসুবিধা হইত। কারণ, বাট্টা-খোরদের লাভের ব্যবসায়ে ইহাদের লোকসান হইত। জাহাঙ্গীর মুদ্রার ওজন ও মান বৃদ্ধি করেন। আকবরের আমলের ও জাহাঙ্গীরের মুদ্রা পাশাপাশি চলে। আকবরের আমলের মুদ্রা চলে বাট্টা-সহযোগে। জাহাঙ্গীরের আমলে বিদেশী মুদ্রা[২] প্রচলিত ছিল সর্বভারতে। পাশাপাশি চলার জন্য অধিকতর মূল্যবান্ ধাতুর মুদ্রা ব্যক্তিগত সঞ্চয়ে চলিয়া যায়, কম-মূল্যবান্ মুদ্রা প্রচলিত থাকে (Gresham's law)।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে বাঙ্গালায় আর মাদ্রাজী টাকার প্রয়োজন রহিল না। এদেশে মাদ্রাজী 'আর্কটী' টাকার দাম কমিয়া গেল। আর্কটে তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর টাঁকশাল ছিল। কোম্পানী ফোর্ট উইলিয়মে টাঁকশাল স্থাপনের পরিকল্পনা করিলেন। ফারুকশিয়র অনুমতি দিলেন।[৩] কিন্তু মুর্শিদকুলী অস্বীকার করিলেন। যে-পরিমাণ রজত এদেশে আমদানী হইত জগৎশেঠ সমস্ত ক্রয় করিতেন। 'জগৎশেঠ' একটা ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ী পরিবারের উপাধি, ফারুকশিয়রের প্রদত্ত। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মাণিকচাঁদ তাহার প্রতিষ্ঠাতা। নবাব আলিবর্দী তাঁহাদের সম্মান করিতেন।[৪]

উৎপাদনে দাদন-প্রথা[৫] তখন প্রচলিত হয় নাই। ব্যবসা-বাণিজ্য-কেন্দ্রে কুঠি স্থাপিত হয়। হুণ্ডি কেনাবেচা শুরু হয়। হুণ্ডি চার প্রকার (১) সা-যোগ (কোনও সম্ভ্রান্ত লোককে ইহাতে টাকা দেওয়ার নির্দেশ থাকিত), (২) জখমি (বীমার ন্যায়), (৩) দর্শনী (দর্শনমাত্র টাকা দেওয়ার বিধি), (৪) মিতি (কোনও নির্দিষ্ট তারিখের পরে ইহার পরিবর্তে টাকা দিতে হয়)।

কৃষি ॥ কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে[৬] নদীয়া ধান্য, বীরভূম কার্পাস ও ধান্য, বাঁকুড়া কার্পাস, বর্ধমান কার্পাস ও ধান্যের জন্য প্রসিদ্ধ। গরু ও মহিষ দুই-ই চাষে ব্যবহৃত হয়। গোবর ছিল জমির সার। জমির সচ্ছল মালিকগণ অর্থাৎ যাহারা জন খাটাইয়া চাষ-আবাদ করিতে পারিত তাহারা নিজেরা কৃষিশ্রমের তত্ত্বাবধান করিত। সেচ-প্রণালীর জন্য জল জমা-রাখার ব্যবস্থা ছিল। তাহার জন্য কর দিতে হইত[৬]। পুকুরে জল-সঞ্চয়ের বিধি ছিল। কৃষির

১ বাং. অ. ই., পৃ ৬২ ২ C. P. M., p 197 ৩ বাং. অ. ই., পৃ ৬৪-৬৫ ৪ ঐ, ঐ, ৬৫
৫ ঐ, ঐ, ৬৭ ৬ H. B. S., vol. I, p. 449 etc.

যন্ত্রপাতি : লাঙ্গল, জোয়াল, ফাল, কোদাল, কাস্তে, মই ইত্যাদি। খাদ্যশস্য প্রচুর হইত। কার্পাস প্রচুর হইত। সুলতানী আমলে কার্পাস আমদানী করিতে হইত না। বাদশাহী আমলে সুরাট, বোম্বাই হইতে আমদানী হইত। ঢাকাই মসলীন, রেশম বস্ত্রের জন্য কাশিম-বাজার বিখ্যাত ছিল। রেশম সস্তা ছিল। পাটের চাষ তখনও প্রসারলাভ করে নাই। কিন্তু ছালার চট্, পট্টবস্ত্রাদি তৈয়ারী হইত। শর্করা-প্রস্তুতপ্রণালী জানা ছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শর্করা-শিল্প প্রসারলাভ করিয়াছিল। লৌহশিল্পও প্রসারিত ছিল। কামান, বন্দুক এদেশেই তৈয়ারী হইত। বীরভূমে লোহার কারখানা ছিল। শিউড়ী হইতে ১৬ মাইল দূরে লোহার খনি ছিল।[১] নৌ-শিল্প, বিদরির কাজ এবং বিভিন্ন কারুশিল্পে এ-দেশের সুনাম ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ বাদশাহী বাঙ্গালায় বাণিজ্যে উল্লেখ্য ঘটনা (১) স্বদেশী সমুদ্র-বাণিজ্যের ক্রমবিলুপ্তি, (২) বিদেশী বণিক্‌দের সম্প্রসারণবৃত্তি। বিদেশী বণিকৃতন্ত্র যতই প্রসারলাভ করিতে লাগিল ততই দেশের লোকের বৈদেশিক বাণিজ্য অসম্ভব হইয়া উঠিল। সুলতানী আমলের শেষে পোর্তুগীজদের প্রাধান্যলাভের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার বৈদেশিক বাণিজ্য বিদেশীর হাতে চলিয়া যাইতে শুরু করিল। যথেচ্ছ শুল্ক ও মাশুলাদি এবং পোর্তুগীজ জলদস্যুতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের নিকট সমুদ্রযাত্রা যেন নিষিদ্ধ হইল। ঘরে বসিয়া বাণিজ্য করার আত্মপ্রসাদে বাঙ্গালী খুশী হইতে লাগিল। অথচ, অতিপ্রাচীনকাল হইতেই বাঙ্গালা তাহার আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নিজেই চালাইয়া আসিয়াছে।[২]

ইংরাজ বণিক্-পর্ব ॥ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীযুদ্ধের পর নবাব নামেমাত্র।[৩] কর্তৃত্ব ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে। দিল্লীর সম্রাট্ শাহ্ আলম দুর্বল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভ্ পাইলেন দেওয়ানী। নবাব ও কোম্পানীর দ্বৈত শাসন চলিল। দেওয়ান ও ফৌজদারের নির্মমতায় জনগণের দুর্দশা চরমে পৌছিল। ১৭৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাঙ্গালার এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা গেল। তখন বাঙ্গালার আয়তন বাঙ্গালা ও বিহার-ওড়িষ্যার বেশ বড়ো রকমের অংশসমেত—সুবে-বাঙ্গালা।

পলাশীর যুদ্ধের পরে রায়তের অবস্থা আরও খারাপ হইল। হেতু, (১) আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে কোম্পানীর গোমস্তাদের জুলুম, (২) মীরকাশিমের অত্যধিক রাজস্ব-দাবী, (৩) বয়ন-শিল্পে মন্দা। ফলে, কৃষিজীবীর উপরি-আয় হ্রাস। উপরন্তু, কোম্পানীর দাবী-দাওয়া মেটানো। আমিল নিযুক্ত করিয়া রাজস্ব-আদায় ইজারা-বন্দোবস্তের অন্তর্গত হওয়ায় বহু জমিদার উৎখাত হইল। রায়তের অবস্থার অত্যন্ত অবনতি ঘটিল। এদেশী সৈন্য-সামন্ত বরখাস্ত হইল। বহু জমিদার কিস্তি-মাফিক রাজস্ব দিতে না-পারায় তাহাদের পাইক-পেয়াদাও বরখাস্ত

১ Ibid, p 448 ২ বাং. অ. ই, পৃ ৭৫-৭৮ ৩ ঐ, পৃ ৮১

হইল। নবাবের ভাতা কমানোতে নবাব ব্যয় কমাইলেন। এই সকল কারণে বেকার-সমস্যা দেখা দিল অনিবার্যরূপে। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে অনাবৃষ্টির ফলে ফসল নষ্ট হয়। ফলে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। বাঙ্গালার অর্ধেক কৃষক মরিল। বহু তন্তুবায় মরিল।

কম খাজানায় পতিত জমি আবাদের জন্ম জমিদার রায়তকে ডাকিল; কিন্তু, কিছু দিন মাত্র। বাঁচিয়া থাকাই যে বাঁচা নহে, মৃত্যুরও স্বাভাবিক রীতি আছে, ইংরাজ তাহা বুঝে নাই। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ক্লাইভ্ হাতে রাখিয়াছিলেন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ দিল্লী-সম্রাট্‌কে সেলামী দেওয়া বন্ধ করিলেন। রাজা-প্রজা সম্পর্ক হইল ইংলণ্ড ও বাঙ্গালার মধ্যে। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে পিটের ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট্ অনুসারে কোম্পানীর কার্য-কলাপ ইংলণ্ডের রাজার নিয়ন্ত্রণে যায়। লর্ড্ কর্ণওয়ালিস (১৭৮৫-৯৩) দশসালা-বন্দোবস্তের মাধ্যমে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত করেন। নির্দিষ্ট দেনা-পাওনার বিনিময়ে স্থায়ী ভোগস্বত্ব প্রচলিত হইল; ইহার ফলে অসুবিধা হইল এই, সময়মত রাজস্ব আদায় না-দিলে জমিদার ও রায়তের উৎখাত হইবার আশঙ্কা রহিয়া গেল। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে চার্টার এ্যাক্ট্ প্রবর্তন এবং ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স-প্রতিষ্ঠা হইল বিদেশী বণিক্‌দেরই অনুকূলে।

বয়নশিল্প ধ্বংসোন্মুখ[১]। ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের ধাক্কা সে সামলাইতে পারিল না। বহু বাড়তি শ্রমিক জমিকে শেষ অবলম্বন করিল। জমিতে মাথাপিছু চাপ পড়িল। বিদেশী বণিক্ ব্যবসায়ীর, এমন-কি বাগিচা-ব্যবসায়েও আর শ্রমিকাভাব রহিল না। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে 'কুলি' চালান চলিতে লাগিল গোমস্তাদের মাধ্যমে। প্রিন্স্ দ্বারকানাথ এই প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-সমাজ ও বিত্তশালী জমিদার-সমাজ সৃষ্টি হইল ইঙ্গ-বঙ্গদর্শনের অন্যতম সুচতুর অভিব্যক্তি। চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের দৌলতে জমিদারী কায়েম হইল। তদুপরি বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমাত্রই যে জমিদার, এ-কথা তাহারা উচ্চাভিলাষীদের বুঝাইয়া দিল। উদ্দেশ্য হইল, আচার-ব্যবহারে সম্মান দেখাইয়া ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে তাহাদের দূরে রাখা। রেশম-ব্যবসায়ী কান্তবাবু খুশী হইলেন কাশিমবাজারের জমিদার হইয়া। মহারাজ নবকৃষ্ণ হেষ্টিংসের নিকট হইতে মুন্সীয়ানার পরিবর্তে জমিদারী পাইয়া ব্যবসায়ে ঝুঁকিলেন না। শিল্পপতি ও বিখ্যাত ব্যবসায়ী দ্বারকানাথ ব্যবসা-মুক্ত হইয়া হইলেন প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুর নামক সেকালের এক বিরাট্ জমিদার।

সামান্য ইংরাজী শিখিয়া ইংরাজ-শাসনের সেরেস্তায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যে চাকুরী লইয়া

---

১ ব্যা. অ. ই., পৃ ৮৫-৮৭

ঢুকিতে আরম্ভ করিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের একদল ব্যক্তি। তাঁহারা 'করণিক' বা 'কেরাণী'। 'বাবু' বনিলেন যৎসামান্য ইংরাজী-জানা এদেশী ভদ্রবৃন্দ। রাজা রামমোহন এই প্রথার প্রতিবাদ জানাইলেন। ইংরাজ প্রতিশ্রুতি দিলেন, শিক্ষিত ও উপযুক্ত লোককে শাসন-ক্ষমতা দেওয়া হইবে। তখন বার্ক-বেন্থামের চিন্তাধারায় বুদ্ধিবৃত্তির নবজাগরণের সূত্রপাত। কিন্তু বাঙ্গালী ইংরাজ-রাজনীতির দাবার ছকের হাতী ঘোড়া হইল। 'রাজা', 'উজীর', 'বাহাদুর', 'সাহেব' খেতাব মিলিতে লাগিল। বাঙ্গালী শিক্ষিত-সমাজ ব্যবসা-বাণিজ্য ভুলিল; ক্রমে ক্রমে সকল বাঙ্গালীই ভুলিতে বসিল। ইংরাজ-অর্থনীতির বুনিয়াদ গড়িয়া উঠিল। গণ্ড-গ্রাম সুতানুটি, গোবিন্দপুর হইল নগর; নগর হইতে মহানগরী কলিকাতা। মুর্শিদাবাদ জীর্ণ শীর্ণ ও স্তিমিত, ক্লাইভ্ ইহাকেই লণ্ডনের অপেক্ষা সমৃদ্ধ দেখিয়াছিলেন। পলাশী-যুদ্ধের পর হইতে ইংরাজ তাহার ঘরের টাকা খাটাইয়া এদেশ হইতে মাল-রপ্তানি করে নাই; এখান হইতে লাভের টাকার বিনিময়ে ধনসম্পদ্ এবং দ্রব্যসামগ্রী বাহিরে চালান দিতেছিল। ফলে, এ-দেশের স্বাচ্ছন্দ্য না-বাড়িয়া, সুখ-সুবিধার সম্ভাবনা উবিয়া গেল।

দস্তখৎ বা স্বীকৃতির বিধি প্রবর্তিত হইল দ্রব্য-সামগ্রীতে কোম্পানীর নিজস্বতার প্রমাণ-স্বরূপে। এই বিধিমতে, ছলে বলে কৌশলে ব্যক্তিগত ব্যবসায় কোম্পানীর কর্মচারীদের দখলে আসিল। এক-চতুর্থাংশ মূল্যে রায়ত ও সওদাগরদের নিকট জিনিষ কিনিয়া তাহারা পাঁচগুণ দামে ক্রেতাকে কিনিতে বাধ্য করিত। কোম্পানী শুল্ক-প্রবর্তনের নির্দেশ জারি করিল; মীরকাশিম নারাজ হইলেন। ফলে, যুদ্ধ ও তাঁহার অপসারণ ঘটিল। আন্তর্বাণিজ্যে শুল্কপ্রথা প্রবর্তিত হইল পুনরায়। আদায়ে জুলুম চলিল। ফলে, সুবিধা পাইলেন কোম্পানীর কর্মচারীরা। কর্ণওয়ালিস এই জুলুমবাজি বন্ধ করিয়া আন্তর্বাণিজ্যে স্বাধীনতা প্রদান করেন।[১]

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রীতি হইল,— (১) এদেশ হইতে যথাসাধ্য কাঁচা মাল রপ্তানি করা, (২) এদেশ হইতে শিল্পদ্রব্য রপ্তানি না-করা, (৩) ইংলণ্ড হইতে শিল্পজাত দ্রব্য অধিক পরিমাণে এদেশে আমদানী করা। বাঙ্গালাদেশ হইল তাহাদের কাঁচামাল-ক্রয়কেন্দ্র। লুপ্ত হইল এদেশের সুপ্রসিদ্ধ বয়নশিল্প। কার্পাস, রেশম, সোরা ও নীল তখনও রপ্তানি হইত প্রচুর। লাভও হইত প্রচুর। জবরদস্তি করিয়া শ্রমিক খাটাইয়া নীল উৎপাদন করানো হইত।[২]

ভূমিব্যবস্থা[৩]॥ ১৭৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে পাঁচ বৎসরান্তর নিলাম ডাকিয়া জমিদারী বন্দোবস্ত দিবার প্রথা ছিল। ফলে দেখা গেল,—(১) জমিদারী রাখিতে গিয়া জমিদার নিলাম ডাকিয়া ডাকিয়া রাজস্ব দেওয়ার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে। এবং (২) নিলামে না-ডাকিতে পারিলে উৎখাত হয়। এই অস্থায়ী 'পঞ্চক'-ব্যবস্থা ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চলিল। ইহার পরে চিরস্থায়ী

১ বাং. অ. ই, পৃ ৮৭-৯২ ২ E. H. I. vol. I, p 279 ৩ বাং. অ. ই, পৃ ৯২-৯৬

বন্দোবস্ত প্রচলিত হইল লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে। এই বন্দোবস্তে বন্যা কিংবা অনাবৃষ্টির অজুহাতে জমিদার খাজনা বাকি রাখিতে পারিতেন না। উপরন্তু, জমিদার স্থায়ী হইলে অঞ্চলের উন্নতি বিধানে মনোযোগ দিতে পারিতেন। রাজস্ব-পরিমাণ পূর্বের পাঠান-মোগল-আমল হইতে অনেক বেশী হইল। তবে কুফল ফলিল, রায়তের আর্থিক মন্দায় রাজস্ব অনাদায়ে জমিদারী-বিক্রয়। বাইশ বৎসরের মধ্যে অর্ধেক জমিদারী বিক্রয় হইল। জমিদার তালুকদার দিয়া তালুকদার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বহু পুরাতন[১] অনেক জমিদার উৎখাত হইলেন।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের রেগুলেশনে রায়ত উৎখাত হইত জমিদারদের দ্বারা। 'আব্‌ওয়াব' নিষিদ্ধ; কিন্তু, ইহার আদায় বন্ধ হয় নাই। সুফল দেখা গেল এই,— কর্ষিত ভূমির পরিমাণ বাড়াইবার জন্য জঙ্গল ও পতিত জমি সামান্য খাজনায় ব্যবস্থা লইতে আগ্রহ বৃদ্ধি পাইল। ইহার কুফল সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের রেণ্ট্ এ্যাক্ট্ এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের বেঙ্গল টেন্যান্সি এ্যাক্ট্ প্রণয়ন করিতে হইল।

মুদ্রানীতি[২] ॥ আলোচ্য সময়ে নানা ধরণের টাকার প্রচলন ছিল। তাহাতে নিত্য-নূতন সমস্যা। একই জেলার বিভিন্ন অংশে জিনিষ কিনিতে বিভিন্ন টাকার প্রয়োজন হইত। তখন বাঙ্গালা ও বিহারে চারিটি টাঁকশাল ছিল— কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ও পাটনা। এই সমস্ত টাকার মূল্য ছিল বিভিন্ন। সেইজন্য বাট্টা প্রচলিত ছিল সর্বত্র। সমমূল্যে বিনিময় না হওয়ার কারণ হইল, (১) মুদ্রার অঙ্কনে বা ছাপে বিভিন্নতা, (২) আসল রজতের পরিমাণে অনৈক্য, (৩) ওজনে বৈষম্য। পোদ্দার বাট্টা-রীতির সুযোগ লইয়া টাকার ওজন ক্ষয় হউক-না-হউক, নির্বিচারে, পুরাতন হইলেই বদলী-বাট্টা লইত। সদ্য-অঙ্কিত সিক্কা-টাকা বৎসরান্তে বাট্টায় নামিয়া আসিলে, নাম হইত 'সনওয়াৎ' অর্থাৎ সন-মোতাবেক বা বাৎসরিকী। ক্রমাগত আর্থিক নিষ্কাশন ও রজত-আমদানী বন্ধ হওয়ায় চলতি টাকার অনটন হইল। ক্লাইভ্ ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে দ্বি-ধাতুবাদ প্রচলন করিলেন। হুকুম হইল,—

১. মুর্শিদাবাদ-সিক্কা টাকার অনুরূপ ছাপে মোহর মুদ্রিত হইবে।
২. নূতন মুদ্রা কুড়ি ক্যারেট মানের হইবে।
৩. সিক্কা-টাকা পনেরো আনা ওজন হইতে ষোল আনা ওজনের হইবে।
৪. মোহর ও সিক্কা টাকার অনুপাত হইবে ১ : ১৪।
৫. সিক্কা-টাকারও মোহরের ন্যায় ⅙ অংশের অধিক খাদ থাকিবে না।
৬. স্বর্ণ ও রজত উভয়ের মাধ্যমেই সরকারী ও বেসরকারী সর্বপ্রকার লেনদেন চলিবে।

১ তুল. "উইচারা খাই পশু নামেতে ভালুক। নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক।"— ক. চ., বঙ্গ, ৩য় সং, পৃ ৫৪ ২ বাং. অ. ই., পৃ ৯৫-১০০

ফলে, রজত-টাকা বাজার হইতে অন্তর্ধান করিল। সামান্য পাওয়া যাইত বাট্টায় বিনিময়ে। মোহরও বাট্টায় নামিয়া আসিল। ফলে, দ্বি-ধাতুবাদ অচল হইয়া গেল। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে নূতন স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত হয়। হেষ্টিংস 'উনবিংশ সান সিক্কা' প্রচলন করেন। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি তাম্রমুদ্রা প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ট্রেজারী নোট বা কাগজের টাকা প্রচলিত করার পরিকল্পনাও করেন তিনি ;[১] কিন্তু, প্রচলিত হয় নাই। কর্ণওয়ালিসও চেষ্টা করেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে দ্বি-ধাতুবাদ পুনরায় প্রচলিত হয়। বাট্টার হার বাড়তি-কমতির মাধ্যমে স্বর্ণও রজত মুদ্রা পাশাপাশি চলিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে দ্বি-ধাতুবাদ বাতিল করিয়া সর্বভারতীয় ভিত্তিতে রজতমান প্রবর্তন করা হইল।

ইংরাজরাজ-পর্ব ॥ ভূমিব্যবস্থা ও কৃষক-সম্পর্কে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের পরে, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে রেণ্ট্ অ্যাক্ট্ প্রবর্তিত হইল রায়তের স্বার্থরক্ষার্থে। 'প্রজা' হইল তিন ভাগে বিভক্ত— (১) চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের পর হইতে যাহাদের দেয় রাজস্ব ঠিক্ আছে, (২) যাহারা অন্ততঃ বারো বৎসর ভূস্বামী আছে, (৩) যাহারা বারো বৎসরের কম ভূস্বামী আছে, তাহারা নিয়মিত খাজানা দিতে থাকিলে তাহাদিগকে উচ্ছেদ করা যাইবে না। কিন্তু, জমিদারগণ এই আইন বানচাল করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল টেন্যান্সি অ্যাক্টে সংশোধিত নিয়ম হইল,—কোনও প্রজা গ্রামের এক বা একাধিক স্থানে সর্বসমেত বারো বৎসর বসবাস করিলে তাহাকে জমিদার উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।— আমাদের আলোচ্য প্রেক্ষাপটের এইখানেই যবনিকা।

উপসংহার ॥ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশী-যুদ্ধের পরিণামে এদেশে বৃটীশ সাম্রাজ্যের গোড়া-পত্তন হয়। প্রথম দিকে যদৃচ্ছ লুঠতরাজ, অতঃপর নানাভাবে নিষ্কাশন চলিয়াছিল। বৃটীশ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ-গঠনে সপ্তদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী প্রায় শেষ হইয়া যায়। এই ভাঙ্গা-গড়ার সময়ে বাঙ্গালী-সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা যথাযথ বুঝিবার উদ্দেশ্যে আমাদের সংকলিত অনেকগুলি দলিল বিশেষ কাজে লাগিবে। পলাশী-যুদ্ধের পূর্বে বাঙ্গালাদেশ সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু, রাজনৈতিক ও সামাজিক অব্যবস্থা তখন পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। সে-সময় অসৎ-প্রকৃতির লোকদেরই শ্রীবৃদ্ধি হইতেছিল। মুর্শিদকুলী মুসলমান জায়গীরদারদের সরাইয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য হিন্দু-কর্মচারী[২] নিয়োগ করিয়াছিলেন। তখন জমিদার এবং তালুকদারদের এক-তৃতীয়াংশই ছিল হিন্দু। সরকারী আমলাগণের মধ্যেও হিন্দু নিয়োগ করা হইত। জগৎশেঠদের হাতে লগ্নী, হুণ্ডী, বাট্টা-ব্যবসায় একচেটিয়া হয় মুর্শিদকুলীর সময় হইতেই। বাঙ্গালী হিন্দুদের প্রধান উপজীবিকা হইল চাকরী ও জমিদারী।

১ বাং. অ. ই., পৃ ১১৮ ২ যেমন, ধর্মমঙ্গলকার নরসিংহ বসু মুর্শিদকুলীর উকিল ছিলেন।

বাঙালী মধ্যবিত্ত-শ্রেণী গড়িয়া উঠে এই সময়েই। বৃটীশ আমলে ইহা নানাশাখায় পল্লবিত হইয়াছে মাত্র।

সরকারী হিসাব মতে, ১৭৪২ সাল হইতে বাঙ্গালাদেশে বারগীর আক্রমণ শুরু হয়। ইহা চলিয়াছিল সম্ভবতঃ ১৭৫১ সাল পর্যন্ত। বারগীর আক্রমণে এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ১৭৫১ সালের পরেও সীমান্ত-সংঘর্ষ চলিয়াছিল। সেকালের বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী ইত্যাদি অঞ্চল পর্যুদস্ত হইয়াছিল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মীরকাশিম বর্ধমান ও মেদিনীপুর ইংরাজদের সমর্পণ করেন। ইংরাজরা ফরাসীদের সহিত যুদ্ধের ব্যয় এতদঞ্চল হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বারগীর হাঙ্গামার ফলে এই অঞ্চলের তাঁতিকুল ধ্বংস হয় নাই। বরং লবণ, সুতা ও রেশম-শিল্পের কারবারের একদেশতা ঘটিয়াছিল। আলিবর্দীর সময়ে দেশ ছিল যথেষ্ট সমৃদ্ধ। তখন কৃষকদের অবস্থা ছিল সহজ, কারিগরদের দেওয়া হইত উৎসাহ, বণিকেরা ছিল ধনী এবং রাজা ছিলেন সুখী। মুর্শিদকুলীর সময়ে বাঙ্গালাদেশ হইতে দিল্লীতে টাকা যাইতে পারে নাই। মুর্শিদকুলীর আমীর-ওমরাহ্‌গণ বাঙ্গালাদেশেই থাকিতেন। ১৭২৮ হইতে বাঙ্গালার সোনারূপা রপ্তানি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। জগৎশেঠের হুণ্ডীতে কাজ-কারবার মধ্যএশিয়াতেও চলিত। তাঁহাদের ব্যাঙ্ক-ব্যবসায়ের কেন্দ্র ছিল মুর্শিদাবাদে। সেইজন্ত টাকা বাহিরে যাইত না। সার্কুলেশনে তখন অর্থ ঢালা হয় নাই। ফলতঃ, জিনিষ-পত্রের দাম ছিল খুবই সস্তা। মুর্শিদকুলী হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত ষাট বৎসর যাবৎ মুর্শিদাবাদ-রাজকোষের সঞ্চিত সম্পৎ, পলাশীর যুদ্ধের পরে, দশ বৎসরের মধ্যেই বাঙ্গালাদেশ হইতে ঝাঁটাইয়া বিলাতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। আমাদের আলোচ্য সমাজের ইতিহাস সেই শোষিত সমাজের স্তিমিত কাহিনীতে পরিপূর্ণ।

অর্থনৈতিক ইতিহাস-রচনার জন্য পুরাতন তথ্যাবলী ব্যতীত, বর্তমানে এদেশে তথ্য-পরিসংখ্যান বা মালমশলা অনেক সংগৃহীত হইয়াছে। বিগত দুই শত বৎসরের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার বহু উপকরণ আমাদের দেশে বর্তমানে আহৃত হইয়াছে ও হইতেছে। তবে, আমাদের সংগৃহীত তথ্যচিত্রগুলি অপ্রত্যাশিত ব্যক্তিগত সূত্র হইতে আবিষ্কৃত বলিয়া অদ্বিতীয়। ইতিহাস-রচনার উপকরণ হিসাবে সংগৃহীত যে-কোনও তথ্যেরই গুরুত্ব আছে। সমাজ-ইতিহাস-রচনায় সামান্ত খুঁটিনাটিও গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে। স্বদেশী ও বিদেশী সমাজতাত্ত্বিকদের সেকালের সামাজিক রীতিনীতি-বর্ণনার সঙ্গে ভ্রমণকাহিনী, মামলা-খরচ, সেকালের হিসাব, জমিদারী খাতাপত্র, ব্যক্তিগত চিঠিপত্রাদি সমস্তই উপকরণের উৎসরূপে কাজে লাগিবে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই খণ্ড 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'-গ্রন্থে ১৮১৮-১৮৪০ খৃষ্টাব্দের অনেক মূল্যবান্ তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। বিনয় ঘোষ-সংকলিত 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র প্রথম খণ্ড'-গ্রন্থে ১৮৪০-১৯০৫ খৃষ্টাব্দের

মুদ্রিত অনেক তথ্য পাওয়া যাইবে। আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিশ্বভারতী ১৬৯৪ হইতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের অর্থনৈতিক অসংখ্য মূল্যবান্ তথ্য সংকলিত করিয়াছেন। তারিখহীন হিসাব-পত্রগুলি এই সময়ের পূর্বের বা পরের হইতে পারে, অন্তর্বর্তী কালেরও হওয়া সম্ভব।

সপ্তদশ শতাব্দীর (১৬৯৪) শেষ দশক হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবম দশক (১৮৮৮) পর্যন্ত সময়ের সামাজিক-অর্থনৈতিক ইতিহাস-রচনার বিচিত্র উপকরণ আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সঞ্চিত অথচ অনালোচিত রহিয়াছে। এই তথ্যসম্ভার হইতে বিজ্ঞানসম্মত এবং সর্বাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এদেশের একটি ভালো অর্থনৈতিক ইতিহাস রচিত হইতে পারে। অর্থনীতি আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে; সেইকারণ আমরা ইহার জটিল মহলায় প্রবেশ করিবার অধিকারী না-হওয়ায়, আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে দেশের সেকালের ঘরোয়া আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে যে-সকল মূল্যবান্ তথ্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে সেইগুলি একত্র করিয়া কালানুক্রমে বিন্যাস করিয়া আলোচ্য শীর্ষকে সাজাইয়া দিয়াছি। এই তথ্যাবলী হইতে দেশের আর্থিক পটভূমির বিবর্তন প্রদর্শন করা সম্ভব। এই কালন্তর-বিভাগে মধ্যে মধ্যে কালের ব্যবধান বড়ো হইয়া চোখে পড়িবে। ভবিষ্যতের অনুসন্ধানী গবেষকের উপর এই ফাঁক-পূরণের ভার দেওয়া ছাড়া বর্তমানে আমাদের গত্যন্তর নাই। এই আলোচনায় মোটামুটি একটি কাঠামো রচনা করিয়া সমকালীন যোগসূত্র আবিষ্কার করিয়া দিবার চেষ্টা করা গেল। কোনো সিদ্ধান্ত-গ্রহণ হইতে বিরত থাকাই সমীচীন মনে করি।

॥ ব্যবসায়-বাণিজ্য ॥

সুপ্রাচীন প্রেক্ষাপট ॥ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে 'পণ্যাধ্যক্ষ' নামক প্রকরণে[১] সেকালের ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে বিস্তৃত বিধি-বিধান বিধৃত হইয়াছে। পণ্যাধ্যক্ষের কর্মবিভাগ হইতে আমরা অনেক সংবাদ অবগত হইতে পারি। জলে ও স্থলে উৎপন্ন এবং জলপথ ও স্থলপথ দিয়া আগত পণ্যসমূহের মধ্যে সার-দ্রব্যের এবং ফল্গু-দ্রব্যের মূল্যতারতম্য এবং কোন্ পণ্য লোকের অধিক প্রিয় ও কোন্‌টি অপ্রিয় সেই বিষয় অর্থাৎ পণ্যের চাহিদা ইত্যাদি বিষয় জানিয়া রাখা আবশ্যক। সেইরূপে পণ্যসমূহের 'বিক্ষেপ' অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত দ্রব্যসমূহের বিস্তার, 'সংক্ষেপ' অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত দ্রব্যসমূহের একত্রীকরণ, ক্রয় ও বিক্রয়-প্রয়োগের অর্থাৎ এতৎসম্পর্কে অনুষ্ঠান বা অননুষ্ঠানের উপযুক্ত কালসম্বন্ধেও সমস্ত বিষয় জ্ঞাত থাকা প্রয়োজন।

যে-পণ্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইবে তাহা একত্র করিয়া তাহার মূল্য চড়াইয়া দিতে

১ কৌ. অ, ১, পৃ ১১৯-২২

হইবে। তাহার সমুচিত মূল্য পাওয়া গেলে, পরে ইহার মূল্যভেদ অর্থাৎ আরোপিত মূল্য হইতে ন্যূনতা ঘটাইতে হইবে।

স্বদেশে উৎপন্ন রাজপণ্যসমূহের 'একমুখ ব্যবহার' অর্থাৎ এক স্থান বা ব্যক্তির মাধ্যমে একচেটিয়া ক্রয়-বিক্রয় নির্ধারিত করা আবশ্যক। পরদেশে উৎপন্ন পণ্যসমূহের 'অনেকমুখ ব্যবহার' অর্থাৎ অনেক স্থান হইতে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। স্বদেশী ও বিদেশী এই উভয়বিধ পণ্য প্রজাবর্গের প্রতি পীড়ন না-করিয়া বিক্রয় করাইবার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। মোটা লাভের আশা থাকিলেও যদি তাহা প্রজাপীড়নের কারণ হয়, সেই লাভ বারণ করিতে হয়। অজস্র ও সহজে প্রাপ্য পণ্যসমূহের যথাসময়ে বিক্রয়ের উপরোধ বা বিক্রয়-নিবারণ কিংবা অধিক পরিমাণে জমা করা অনুচিত।

বহু লোক দ্বারা বিক্রেতব্য রাজপণ্য বণিগ্‌গণ নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করিবেন। যদি তাঁহারা সেইসব দ্রব্য নির্দিষ্ট মূল্য হইতে কম দরে বিক্রয় করিয়া ক্ষতি ঘটান তাহা হইলে তাঁহারা মূল্যহানির জন্য অর্থপূরণ করিয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন।

'বৈদেহক' বা বাণিজকগণের দেয় রাজকীয় অংশ এইরূপ : মানদণ্ডাদির দ্বারা পরিমাপ-করা দ্রব্যের ১/১৬ ভাগ; তৌল-করা দ্রব্যের ১/২০ ভাগ; এবং গণিয়া বিক্রয়-করা দ্রব্যের ১/১১ ভাগ।

বিদেশী বণিক্‌দের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া বিদেশী পণ্যসমূহ অন্তপালাদির উপদ্রব-নিবারণ ও ব্যাজীমোক্ষ মঞ্জুর করিয়া আনাইতে হয়। যাহারা জলপথের সার্থবাহ বা বণিক্ তাহাদের প্রতি উত্তরকালের করমোক্ষণ বিধান করা উচিত। বিদেশী ব্যাপারীদের ঋণবিষয়ে কেহ রাজদ্বারে অভিযোগ আনিতে পারিবেন না; কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদের কার্য-সহযোগী বা তাঁহাদের ব্যাপারে অংশীদার হইয়া উপকারক তাঁহারা রাজদ্বারে তাঁহাদের প্রাপ্য অর্থের জন্য অভিযোগ আনিতে পারিবেন।

রাজপণ্যের বিক্রেতারা বিক্রীত পণ্যের মূল্য একটিমাত্র ছিদ্রদ্বারা আচ্ছাদিত কাঠের দ্রোণী বা পেটিকাতে নিহিত করিবে। দিনের অষ্টম ভাগে বিক্রয়ের অবসানে সেই মূল্য পণ্যাধ্যক্ষের নিকট অর্পণ করিবে; এবং বিক্রীত-অবিক্রীত মালের হিসাব দিবে। তাহারা তুলাভাণ্ড বা তুলাদণ্ড ও বাটখারা বা পড়িয়ানও তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবে।—ইহাই হইল রাজার নিজদেশে উৎপন্ন পণ্যসমূহের বিক্রয়াদির বিধি।

বিদেশী পণ্যাদি বিক্রয় সম্পর্কে বিধির আলোচনা করা যাইতেছে। পণ্যাধ্যক্ষ প্রথমতঃ স্বদেশী ও বিদেশী পণ্যের মূল্য তারতম্যসহকারে বিচার করিয়া বুঝিবেন এবং অতঃপর তিনি দেখিবেন যে, বিদেশে স্বদেশী পণ্যসমূহ ব্যবসায়ের জন্য লইয়া গেলে, সেখানে 'শুল্ক', 'বর্তনী' বা সেই দেশের অন্তপালকে দেয় কর, 'আতিবাহিক' বা সেই দেশের পথ-চলার জন্য পুলিশকে

দেয় কর, 'গুল্মদেয়' বা সেনানিবাসে দেয় কর, 'তরদেয়' বা নদী ইত্যাদি পার হওয়ার জন্য নাবিককে দেয় কর, 'ভক্ত' অর্থাৎ কর্মকর বলীবর্দাদির ভোজন জন্য খরচ এবং 'ভাটকের' বা ভাড়ার জন্য কত ব্যয় হইবে; অতঃপর সেই সমস্ত খরচ বাদে, পণ্যবিক্রয়দ্বারা শুদ্ধ লাভ কত টিকিতে পারে। যদি কোনও 'উদয়' বা লাভ দেখা না-যায়, তাহা হইলে তিনি বিবেচনা করিবেন, নিজ পণ্যদ্রব্য লাভের প্রতীক্ষায় সেখানে লইয়া গিয়া জমা রাখা যায় কি না, এবং নিজপণ্যের বদলে পরপণ্য লইয়া তাহার দ্বারা লাভ করা যায় কি না। যদি লাভ হইবে বোঝা যায়, তাহা হইলে তিনি সমীক্ষিত লাভের ¼ অংশ দ্বারা ক্ষেমমার্গ দিয়া অর্থাৎ চৌরাদির উপদ্রবরহিত পথ ধরিয়া স্থলপথদ্বারা কৃত বিক্রয়াদিব্যাপার প্রয়োগ করিতে পারেন। সেইসঙ্গে তিনি তাহাদের আনুকূল্যলাভের আশায় সে-দেশের 'অটবীপাল,' 'অন্তপাল', 'পুরমুখ্য' ও 'রাষ্ট্রমুখ্য'দিগের সহিত সংগতি ও পরিচয় স্থাপন করিবেন।

পণ্যাধ্যক্ষের অধীন কোনও স্বদেশী বণিক্ বিদেশে ব্যবসায় করিতে গিয়া যদি কোনও বিপদে পড়ে, তাহা হইলে তাহাকে নিজের রত্নাদি সার-দ্রব্য ও নিজের শরীর রক্ষা করিতে হইবে। অথবা, বিদেশ হইতে স্বদেশে না-আসা পর্যন্ত, তাহাকে সে-দেশের রাজার প্রাপ্য সর্বপ্রকার নিজদেয় করাদি শোধ করিয়া বাণিজ্য-ব্যবহার করিতে হইবে।

সেইরূপ কোনও বণিক্ জলপথে গিয়া বিদেশে বাণিজ্য করিবার আগে, 'যানভাটক' অর্থাৎ নৌকাদির ভাড়া, 'পথ্যদন' বা পথে খাই-খরচ, নিজপণ্য ও পরপণ্যের মূল্য সম্পর্কে তারতম্যবিচার, যাত্রাকাল বা বিদেশ-গমনের উপযুক্ত সময়-নিরূপণ, ভয়-প্রতিকার বা পথে চৌরাদি-ভয়ের প্রতিবিধান ও 'পণ্যপত্তনচারিত্র' বা নিজপণ্য বিক্রয়ের জন্য যে পরপত্তনে যাইতে হইবে সে-দেশের আচার-ব্যবহার—এই সকল বিষয় উত্তমরূপে জানিয়া লইবেন।

নদীপথে গেলে, সেই সমস্ত দেশের চরিত্র বা আচার-ব্যবহার অনুসরণ করিয়া বাণিজ্য-বিষয় জানিয়া, যে-পথে গেলে লাভ বেশী হইবে, সেই পথে যাইতে হইবে। এবং যে-পথে অর্থাৎ জলপথাদিতে গেলে অল্প লাভ বা অলাভ হইবে, সে-পথ বর্জন করিতে হইবে।

॥ ব্যবসায়-বাণিজ্য ॥

(সন ১১০১-১২৮১ : খৃ ১৬৯৪-১৮৭৪)

সাধারণ ভূমিকা ॥ এই শীর্ষকের চারিটি বিভাগ,— ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষি, খাজানা এবং কর্জ-দাদন। আলোচ্য চিঠিপত্রে আমরা যে-সকল তথ্য পাইতেছি সেগুলি নিষ্কাশন করিলে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশক হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্যন্ত রাঢ়ী বাঙ্গালী-সমাজের অর্থনৈতিক অন্তস্তল বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিতে পারা যাইবে। ইহা

হইতে এতৎসম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ অর্থনৈতিক নানা বিধি-বিধানের প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইবেন। এদেশের সেকালের ব্যবসায়-বাণিজ্য, কারিগরি-শিল্প, ধন-সম্পৎ, মুদ্রা-নীতি, পরিসংখ্যান, জীবনযাত্রার মান, ভূমি-সমস্যা, প্রভু ও মালিক-সম্পর্ক, চাষী ও মজদুর, দাসত্ব, রাজা ও প্রজা, উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয়ের নানা তথ্য এই চারিটি প্রকরণে সমাহরণ করিয়া দেওয়া হইতেছে। এই সকল তথ্য হইতে বিশেষ পর্যালোচনায় নানা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হইবে।

॥ ব্যবসায়-বাণিজ্য ॥

(সন ১১০১-১২৬০ : খৃ ১৬৯৪-১৮৫৩)

সংগৃহীত তথ্যাবলী ॥ আলোচ্য সময়ের মধ্যে[১] কাঠ, তাস, গড়া ও অন্যান্য কাপড়, পিতল-কাঁসার তৈজস, আতস, তালগাছের 'কাঁড়ি', নীল, চিনি, খাঁড়, গালা, শণ, সর্ষপাদির উৎপাদন বা ব্যবসায় চলিতে দেখা যায়।

বর্তমান শান্তিনিকেতনের সন্নিহিত সম্ভবতঃ তালতড়-গ্রামে পুরাতন-কালের তাস-ব্যবসায়ের একখানি 'পারমিট' পাওয়া গিয়াছে[২]। গড়া ও অন্যান্য কাপড় (ছিট, মলিন্দর, মলমল, রেশম, তসর) ইত্যাদির জন্য দেশী তাঁতিদের খাটাইয়া সাহেবদের ফলাও ব্যবসায় ছিল।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যেমন, বর্তমান হুগলী জেলার দেওয়ানগঞ্জ, বর্ধমান জেলার কাইতি, দামুন্যা, পহলানপুর ইত্যাদি গ্রামে পিতল-কাঁসার বাসন তৈয়ারী হইত। ইহার উৎপাদন ও ব্যবসায় ছিল দেশী কারিগরদের গোষ্ঠীগত বৃত্তিমূলক।

আতসের জন্য বারুদ আসিত বিহার হইতে। তাল-কাঁড়ি কাঠের অভাবে এবং সুলভতার নিমিত্ত মধ্যবিত্তেরা ব্যবহার করিতেন ঘরের কাঠামোয়। নীল, চিনি, খাঁড়, গালা, শণ-এর ব্যবসায়ে বীরভূমের কমার্শ্যল্ রেসিডেন্ট্ চীপ সাহেবের[৩] একাধিপত্য ছিল অনেক দিন যাবৎ।

লণ্ডন এডিনবরার সাহেব ইংরাজেরা[৪] পুরুষানুক্রমে দক্ষিণ-বীরভূমে দোর্দণ্ডপ্রতাপে জমিদারি করিয়াছিলেন। এদেশী জমিদারদের নিকট হইতে তাঁহারা মফস্বলী লাট পত্তনি লইতেন। পরে, বহু টাকার জমিদারি এদেশী লোকেদের নিকট বিক্রয় করিয়া[৫] কলিকাতা ও ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে চা-পানের প্রচলন ছিল[৬]। মুসলমান-সমাজেই সম্ভবতঃ চা-এর এদেশে প্রথম প্রচলন হয়।

১ পূর্বে দ্রষ্টব্য পৃ ৩৪-৩৫ ; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৪৮৫-৫৮৪   ২ ঐ, চি-সং ২৮২   ৩ ঐ, ঐ ২৮৮
৪ ঐ, ঐ ৩০৪, ৩২০   ৫ ঐ, ঐ ৩৩০   ৬ ঐ, ঐ ৩০৫

প্রাচীর-তৈয়ারীর জন্য ঠিকা দেওয়ার প্রসঙ্গ (৫৩১) আছে। সাহেবের রাস্তা তৈয়ারীর উল্লেখ আছে (৫৪০)। 'শিস্তবাটীর আদায়'-জমা-খরচের হিসাবে দেখা যাইবে, আলোচ্য সময়ে গুরুগিরিও ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছিল। দাসীগিরির উদ্দেশ্যে আপন কন্যা-বিক্রয়ের ঘটনাও পাওয়া যাইতেছে[১]। এতদ্ব্যতীত মিলিবে,—

॥ বস্ত্রাদি ॥

১. গড়া (৬০২) খৃ.১৭৪৮, (৫১২) ১৭৯৫
২. ভুনি (৩৬৬) ১৭৮৭, (৫৪৮) ১৮২৮
৩. কাচা (৩৬৬) ১৭৮৭
৪. নারাজি পট্টু (৩৭৪) ১৭৬৭
৫. সুতালী (৪৯৮) ১৭৫৩, (৫০৩) ১৭৫৩
৬. নিজ পরিধান বস্ত্র (৫৩৩) ১৮২৩
৭. ধুতি (৫১৭) ১৭৬৪, (৫৪৮) ১৮২৮
৮. তুলা (৮৩) ১৮৫০
৯. কাপড় কড়ার পত্র (২৮৫) তারিখহীন
১০. বিলাতী (৩২০) ১৮৭৪
১১. মুগা (৫১৪) ১৭৪৯
১২. দেশী কাপড়ের উপর দাদন (৫২৯) ১৮৪১

॥ বাসনপত্র ॥

১. পিতলের (৮৮) ১৮০৯, (৮২) ১৮৪০
২. মাটীর (৩৩৩) ১৭৫২, (৫৯০) ১৭৫৩
৩. পাপোষ (৬২৪) তারিখহীন

॥ বিবিধ ॥

১. নীলের পাত্তির উপর দাদন (৫২৯) ১৮৪১
২. চিনি (২৮৯)
৩. তৈল (৩৬৬) ১৭৮৭
৪. গালা (৫৪৬) ১৮৬৩ মেনিয়ার কুঠির উল্লেখ
৫. আতস (২৮৬), ১৭৯৩ (৫১০) ১৮৬৮
৬. শিস্তবাটীর আদায় (২৯৬, ৩৫৪, ৪৮২, ৪৮৭, ৪৯৪, ৫১২, ৫১৪, ৫১৯, ৫২৫, ৬১৯ ইত্যাদি)
৭. হরজাই হিসাব (৪৮৪) ১৮৫৩, (৪৮৫) ১৮১৬

১১৯৮ সালে (খৃ. ১৭৯১) জনৈক পাকা ব্যবসায়ীর উক্তি,[২]— "তাগাদা শেখানকার কাজ নিকাষ হইলে বড় ভাল হয় এখানে বিক্রী হইলে ফের সে টাকা পাঠান জায় লাভালাভও বুঝা জায় লাভ না বুঝিলে কাজ করিতে ইঃছা হয় না।" পক্ষান্তরে, এই মনোভাবও[৩] সক্রিয়,—"লাভাদৃষ্ট থাকিলে অল্প প্রয়াসেই হইতে পারে"।

১ পু-প. ৩, পৃ ৪১১-১২ ২ চি. প. স ২, চি-সং ২৮৩ ৩ ঐ, ঐ ৫৫৫

কৃষিবিদ্যাকে সেদিন আর্যসমাজ কত বড়ো মূল্যবান্ ব'লে জেনেছিল তার আভাস পাই রামায়ণে। হলকর্ষণ রেখাতেই সীতা পেয়েছিলেন রূপ, অহল্যা ভূমিকে হলযোগ্য করেছিলেন রাম। এই হলকর্ষণই একদিন অরণ্য পর্বত ভেদ ক'রে ভারতের উত্তরকে দক্ষিণকে এক করেছিল।

১৩৪৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জোৎদার ও চাষা রায়ৎ যতদিন প্রত্যেকে স্বতন্ত্র থাকিয়া চাষবাস করিবে ততদিন তাহাদের অসচ্ছল অবস্থা কিছুতেই ঘুচিবে না। পৃথিবীতে চারিদিকে সকলেই জোট বাঁধিয়া প্রবল হইয়া উঠিতেছে; এমন অবস্থায় যাহারাই বিচ্ছিন্ন এককভাবে থাকিবে তাহাদিগকে চিরদিনই অন্যের গোলামী ও মজুরী করিয়া মরিতেই হইবে।

১৩১৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ কৃষি ॥

কৃষি-কথার আদর্শ প্রেক্ষাপট ॥ কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রের একচত্বারিংশৎ প্রকরণে[1] সীতাধ্যক্ষ বা কৃষিকর্মাধ্যক্ষের কর্তব্য নির্ধারণ করিয়াছেন। তাহাতে সেকালের প্রেক্ষাপটে একালের কৃষিবিষয়ক বিধি-নিষেধের চিরায়ত পরম্পরার চিত্রটি ফুটিয়া উঠিতেছে। এই বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা পরে করা যাইবে। বর্তমানে অর্থশাস্ত্র-ধৃত কৃষি-প্রকরণটি সংকলন করিয়া দেওয়া গেল।

কৃষিশাস্ত্র, ভূমির সিরাশাস্ত্র ও বৃক্ষায়ুর্বেদ-শাস্ত্র উত্তমরূপে জানিয়া কিংবা অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সহায়তা লইয়া, 'সীতাধ্যক্ষ' বা রাজকীয় কৃষিকর্মাধ্যক্ষ সর্বপ্রকার ধান্য, পুষ্প, ফল, শাক, কন্দ, মূল, বল্লীজাত ফল, ক্ষৌম ও কার্পাসের বীজ যথাসময়ে সংগ্রহ করিবেন। তিনি বহুবার হল চালনা করাইয়া কর্ষিত নিজ বা সরকারী ভূমিতে বা বীজের উপযোগী ভূমিতে উক্ত বীজ দাস বা ক্রীতদাসাদি, কর্মকর বা বেতনভোগী কর্মচারী বা দিনমজুর দ্বারা বপন করাইবেন। এই দাসগণকে ভূমিকর্ষণের হলাদি যন্ত্রপাতি, রজ্জু ইত্যাদি উপকরণ ও বলীবর্দাদির রক্ষাভার দেওয়া উচিত নহে। ইহাদিগকে কারুশিল্পী, লৌহকার, 'কুট্টাক' বা তক্ষা, ভেদক, রজ্জুনির্মাণকারী ও সর্পগ্রহণকারীদের সহিতও সংসৃষ্ট রাখা উচিত নহে। কারু ইত্যাদির দোষে কৃষিকর্মের ফলহানি ঘটিলে, সেই শস্যক্ষতির পরিমাণানুসারে তাহাদের প্রতি অর্থদণ্ড বিহিত হইবে।

শস্য উঠিবার উপযোগী বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নিরূপিত হইতেছে।—জাঙ্গল[২] বা মরুভূমির মতো উচ্চ দেশসমূহে[২] ষোড়শ দ্রোণপরিমিত বর্ষণ-জল জমা হইলে, তাহা শস্য-উৎপাদনে পর্যাপ্ত বর্ষণের সূচনা বলিয়া গণ্য হইবে। অনূপ[৩] বা জলা দেশে[৩] ইহার দেড়গুণ অর্থাৎ চব্বিশ দ্রোণ বর্ষা পর্যাপ্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। অতঃপর, কোন্ কোন্ দেশে কি পরিমাণ বর্ষা হইলে ফসল পর্যাপ্ত হইবে তাহা বলা হইয়াছে। মহারাষ্ট্র, অবন্তী, কঙ্কণ ও হিমবৎ প্রদেশের কথা বলিবার পরে বলা হইয়াছে,—যে-সব দেশে কুল্যা[৪] বা খাল[৪] কাটিয়া আনীত জলদ্বারা কৃষিকর্ম সাধিত হয় সে-সব দেশে স্ব স্ব কালের উচিত বর্ষণদ্বারা শস্য-নিষ্পত্তি ঘটে।

১ কৌ-অ, ১, পৃ ১৪৩-৪৭

২ দক্ষিণ রাঢ়ে এখনও এই নামে এই শব্দ প্রযুক্ত হয়।—তু. রূ-থ, ১খ, ১৩৫১, পৃ ১৯ 'পুরান জাঙ্গালে নাঞী জীবনের আশা।'

৩ অনুরূপ প্রয়োগ তু. ক-চ 'রত্নানূ নদের কূলে অবতার করিলা শঙ্কর'। রত্নানূ=রত্ন+অনূপ অর্থাৎ জলা-দেশের রত্নস্বরূপ। দামিন্যা অঞ্চলকে এখনও 'জলা'-দেশ বলা হয়। রত্নাকর বাল্মীকির বিচরণভূমিরূপেও দামিন্যা-চণ্ডীবাটী গ্রামে বর্তমান 'দেউলে পোতার' প্রসিদ্ধি আছে। 'রত্নানূ' শব্দটির পাঠান্তর পাওয়া যাইতেছে,—'রত্না'। এই প্রসিদ্ধির সহিত এই পাঠের যোগাযোগ অনুমান করা যাইতে পারে।

৪ দক্ষিণ রাঢ়ে এখনও 'কুলি খাল'—এই অর্থেই প্রযুক্ত হয়।

বর্ষণের চারি মাস অর্থাৎ শ্রাবণ ভাদ্র আশ্বিন ও কার্ত্তিকের মধ্যে প্রথম মাস অর্থাৎ শ্রাবণ ও শেষ মাস অর্থাৎ কার্ত্তিক এই উভয় মাসে, উক্ত দেশসমূহের পক্ষে বর্ণিত পর্যাপ্ত বর্ষণ-পরিমাণের ১/৩ অংশ ও মধ্যম দুই মাসে অর্থাৎ ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ২/৩ অংশ পাওয়া গেলেই, বৎসরের আশানুরূপ বৃষ্টি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

বৎসরের ভালো বৃষ্টি বোঝা যায়, বৃহস্পতি-গ্রহের স্থান, গমন ও গর্ভাধান হইতে, শুক্রগ্রহের উদয়, অস্ত ও চার[১] হইতে এবং সূর্যের প্রকৃতি বা বিকৃতি হইতে। সূর্য হইতে শস্যের বীজ-নিষ্পত্তি, বৃহস্পতি হইতে শস্যের ঝাড় বা কাণ্ড বৃদ্ধি এবং শুক্র হইতে বৃষ্টি অনুমিত হইতে পারে। যদি বর্ষা-বাদল এক সপ্তাহকাল অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ষণ করে অর্থাৎ এক সপ্তাহে যদি তিনবার বর্ষণ হয়, এবং যদি আশী বার মেঘ সান্দ্রবিন্দুবর্ষী হয়, এবং ষাট-বার আতপযুক্ত মেঘ বর্ষণ করে, তাহা হইলে এইরূপ বৃষ্টিই সমবৃষ্টি বলিয়া লোকহিতকর হইবে। যে-স্থানে মেঘ বায়ু ও রৌদ্র পর্যায়ক্রমে এবং ভূমিতে তিনবার কর্ষণের উপযোগী বর্ষণ করে, সেইস্থানে শস্যাগম নিশ্চিত। অতঃপর, বর্ষণপ্রমাণ অবগত হইয়া সীতাধ্যক্ষ প্রচুর ও অল্প জলধারা নিষ্পাদ্য শস্য বপন করাইবেন।

শালি, ব্রীহি ধান্যাদি, কোদ্রব, তিল, প্রিয়ঙ্গু, দারক ও বরক—এই সাত প্রকার শস্যের বীজ বর্ষার পূর্বভাগে বপন করিতে হয়। মুদ্গ, মাষ ও শৈম্ব—এই তিন প্রকার শস্যের বীজ বর্ষার মধ্যভাগে বপন করিতে হয়। আর কুসুম্ভ, মসূর, কুলুত্থ, যব, গোধূম, কলায়, অতসী ও সর্ষপ—এই আট প্রকার শস্যের বীজ বর্ষার শেষভাগে বপন করিতে হয়। অথবা, উক্ত শস্যাদির বীজ-বপন সেই সেই বীজের সম্যক্ নিষ্পত্তির উপযোগী ঋতু-অনুসারেও করা যাইতে পারে।

সীতাধ্যক্ষ কৃষিকর্মে প্রয়োজনীয় জলের প্রাচুর্য-অপ্রাচুর্য অনুসারে কেদার[২] ক্ষেত্রে বাপ্য, হেমন্তকালে বাপ্য, কিংবা গ্রীষ্মকালে বাপ্য শস্য বাপিত করিবেন।

সর্বপ্রকার ফসলের মধ্যে শালি-ধান্যাদির ফসল উত্তম। ইহাতে অল্প আয়াস ও অল্প ব্যয় হয়, অথচ ফল অধিক। কদলী ইত্যাদি ফসল মধ্যম। ইক্ষুর ফসল অধম। কারণ, ইহার বপনাদিতে নানাপ্রকার বিঘ্ন—মনুষ্য ও মূষিকাদির উপদ্রব আছে এবং ইহা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কুষ্মাণ্ডাদি বল্লী-ফলের উত্তম বাপদেশ হইতেছে জলের পর্যন্তদেশ অর্থাৎ যাহাতে জলের ফেন আঘাত করে। পিপ্পলী, আঙ্গুর ও ইক্ষুর উত্তম রোপণস্থান হইল জলের পরীবাহ বা উচ্ছ্বাসের পরিসর-প্রদেশ। শাক ও মূলের উত্তম বাপস্থান কূপপার্শ্বস্থ ভূমিভাগ।

১ অর্থাৎ আষাঢ় মাসের পঞ্চমী ইত্যাদি নয়টি তিথিতে ইহার সঞ্চার।

২ দক্ষিণরাঢ়ে বর্ধমান-হুগলী সীমান্তে পুরাতন বাদশাহী সড়কের পার্শ্বে এই নামে এখনও মাঠ ('কোদালের মাঠ') আছে। এবং 'আহার' নামে অতি প্রাচীন সেচ-ব্যবস্থার নিদর্শন উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ের সর্বত্র পরিদৃষ্ট হয়।

হরিতক বা সবজী ফসলের উত্তম স্থান হইল হরণি বা কুল্যাদির পর্বতপ্রদেশ বা তড়াগাদির রিক্তভূত আর্দ্রপ্রদেশ বা গর্তআল[১]। পালি বা ক্ষেত্রমধ্যস্থিত সেতু বা জলবদ্ধ হইল ছেদনযোগ্য গন্ধ, ভৈষজ্য, উশীর, হ্রীবের[২] ও পিণ্ডালুক বা কচালু ইত্যাদি রোমকন্দের উত্তম বপনস্থান। সীতাধ্যক্ষ স্ব স্ব যোগ্যভূমিতে স্থল ও জলা প্রদেশে ওষধী স্থাপিত বা বাপিত করিবেন।

ক্ষেত্রে বপনযোগ্য বীজসমূহের সংস্কার-প্রথা এইরূপ: ধান্যবীজসমূহের সাত দিন পর্যন্ত 'তুষার-পায়ন' বা রাত্রিতে তুষার পানের জন্য রক্ষণ, এবং 'উষ্ণশোষণ' অর্থাৎ দিবাভাগে রৌদ্রে রক্ষণ করিতে হইবে। কোশীধান্যসমূহেরও অর্থাৎ মুদ্গ-মাষাদির বীজেরও তিন দিন বা পাঁচ দিন পর্যন্ত এই কার্য করিতে হইবে। ইক্ষু ইত্যাদি কাণ্ডবীজের অর্থাৎ যাহাদের টুকরাগুলি রোপণ করিতে হয়, তাহাদের ছিন্ন-স্থানগুলিতে মধু, ঘৃত ও শূকরের চর্বী গোবরে মাখাইয়া লেপিয়া দিতে হয়। কেবল মধু ও ঘৃতদ্বারা কন্দগুলির ছেদলেপ করিতে হয়। কার্পাসাদি অস্থিবীজসমূহে গোময়দ্বারা লেপ দিতে হয়। আম্র-পনসাদি বৃক্ষের বীজনিবেশ গর্তে তৃণাদিদ্বারা দাহ বা উষ্ণতা দিতে হয়; এবং যথাসময়ে অর্থাৎ পুষ্পফলাদির প্রসব-সময়ে গরুর অস্থি ও গোবরদ্বারা দোহদ দিতে হয়।

উক্ত সর্বপ্রকার বীজ অঙ্কুরিত হইলে, সেগুলিকে স্নুহিনামক ওষধির ক্ষীরের সহিত মিশাইয়া আর্দ্র ক্ষুদ্র মৎস্যদ্বারা সেচন করিতে হয়। কার্পাসবীজের স্যার ও সাপের খোলস একত্র করিয়া ধূপিত করিতে হইবে। এই মিলিত উভয়বিধ দ্রব্যের ধূপনজনিত ধূম যেখানে থাকিবে সেখানে কোনও সর্প থাকিতে পারে না।

সর্বপ্রকার বীজেরই প্রথম বপনসময়ে, ইহার প্রথম বীজমুষ্টি স্বর্ণসংযুক্ত জলদ্বারা সিক্ত করিয়া বপন করিতে হয়। এই মন্ত্রও সেই সঙ্গে পাঠ করিতে হয়,—প্রজাপতি, কাশ্যপ বা সূর্যপুত্র ও পর্জন্যদেবকে সর্বদা নমস্কার জানাইতেছি। 'সীতাদেবী' অর্থাৎ কৃষির অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমার বীজ ও ধনসমূহের বৃদ্ধি বিধান করুন।

সীতাধ্যক্ষ ষণ্ডবাট-পালক, গো-পালক, দাস ও অন্যান্য কর্মকরের জন্য প্রত্যেক পুরুষের পরিশ্রমের অনুরূপ ভক্ত বা ভাত দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। এবং তিনি তাহাদের বেতন জন্য প্রত্যেককে প্রতি মাসে ১¼ পণ দিবেন। তিনি প্রত্যেকের কর্মানুসারে কারু বা তক্ষাদিকে ভক্ত বা ভোজন ও বেতন বা মাসিক নগদ মাহিনা দিবার ব্যবস্থা করিবেন।

দেবকার্যের জন্য বৃক্ষ হইতে স্বয়ং-পতিত পুষ্প ও ফল, এবং 'নবশস্য' নামক ইষ্টির অর্থাৎ নবান্ন-ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে স্বয়ং-পতিত ব্রীহি ও যব শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ও তপস্বিগণ আহরণ করিতে পারিবেন। এবং যাঁহারা উঞ্ছবৃত্তি করিয়া জীবিকানির্বাহ করেন তাঁহারা খলনিবেশিত ধান্যসমূহের সমীপগত কণিশাদি সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

---

১ প্রাদেশিক 'গাবাল' বা 'গাবা' ২ গন্ধদ্রব্যবিশেষ

চতুর অর্থাৎ অর্থসঞ্চয়বিধানজ্ঞ ব্যক্তি যথাসময়ে সমুৎপন্ন সর্বপ্রকার শস্যাদি রক্ষণস্থানে প্রবেশ করাইবেন, এবং বিশেষ চতুর ব্যক্তি কখনই পলাল বা তুষ পর্যন্ত ক্ষেত্রে রাখিবেন না।

প্রকর বা ধান্যনিবেশস্থান অর্থাৎ গোলা সমুচ্ছ্রিত বা উচ্চ করিয়া তৈয়ার করাইতে হইবে। এই গৃহগুলির শিরোদেশ যেন পরস্পর সংশ্লিষ্ট না-হয়, এবং তুচ্ছ্যাকার অর্থাৎ শূন্যাকার বা গোলাকার হয়। গোলা যাহাতে প্রচণ্ড ঝড়ে পড়িয়া বা উড়িয়া না-যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

মণ্ডলের সমীপে অর্থাৎ যেস্থানে বলীবর্দ মণ্ডলভ্রমণ করিয়া কুটি মাড়াই করে, তাহার নিকটেই খল-প্রকর অর্থাৎ ধান্য মাড়িবার খামারসমূহ নির্মাণ করিতে হইবে। যাহারা খলে কর্মকর তাহাদের নিকট অগ্নি থাকিবে না; বরং তাহারা সঙ্গে সঙ্গে জল রাখিবে, যেন অগ্নিদাহ উপস্থিত হইলে অগ্নিপ্রশমনার্থ তাহারা সেই জল ব্যবহার করিতে পারে।

॥ কৃষি ॥

(সন ১১৫৩-১২৬৯ : খৃ ১৭৪৬-১৮৬২)

সংগৃহীত[১] তথ্যচিত্র ॥ বাঙ্গালাদেশে ধান-চাষ চিরকালীন বৃত্তি। ধান্যের প্রকারভেদ বাঙ্গালাদেশে যত, এইরূপ বোধহয় আর কোথায়ও নাই। হরমঙ্গল, ধর্মপুরাণ, লক্ষ্মীমঙ্গল ইত্যাদি বাঙ্গালা পুঁথিগুলিতে হরেক রকমের ধানের নাম আছে। রামশালাদি নানা প্রকার সৌখিন ধানের চাষ পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত ছিল, এবং এই ধারা এখনও অব্যাহত। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ভূমি-পোঁতা, আশ্বিন-কার্তিক মাসে ধান-বাড়ীতে মাছধরা, খামারে ধান-আছড়ানো, কুলার বাতাসে আগরা-উড়ানো, দুর্যোগে পালই-ছাদন পশ্চিমবঙ্গের পরম্পরাগত সুপরিচিত পল্লীচিত্র। শুঁয়া ইত্যাদির উৎপাতের জন্য ফসল ভালো না-হওয়া, বা তাহাতে ধানের বাজার-দর বর্ধিত-হওয়া, এই সব দুঃসংবাদের কিছু কিছু বিবরণ আলোচ্য চিঠিপত্রে মিলিবে। আবার "ধান্যাদি বেদামি হইতেই ক্লেশ। নতুবা অচল নহে।"— পশ্চিমবঙ্গের চাষী-গৃহস্থের ইহাই যেন চিরন্তন অর্থনৈতিক সমস্যা।

দক্ষিণ রাঢ়ে কাপাসের চাষ বহুল-প্রচলিত ছিল। এখনও সেখানে দো-ফসলের জমিকে 'কাবাসে'-জমি, ও সেকালে দো-ফসলকে 'কর্পা ফসল' বলা হইত। কার্পাসের বাজারও ছিল প্রসারিত।

১ পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃ ৩৫-৩৬ ইত্যাদি

নীল-চাষের বাহুল্য হেতু অনেক স্থলে পল্লী-অঞ্চলের অবস্থাপন্ন গৃহস্থকেও চাউল খরিদ করিয়া সংসার চালাইতে হইত।

ধানের মতো আখের চাষও এদেশে সুপ্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আখবাড়ীর দেবতা 'পড়াসুর', বা আখমাড়াই-শালের কৃত্য, ও সাজ-সরঞ্জামের নাম ও বিবরণ হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়, আখ-চাষ বহু পুরাতন কাল হইতে আদিম বাঙ্গালীর যেন সর্বপ্রাচীন বৃত্তিরূপে আদৃত হইয়া আসিতেছে। আখ-বাড়িতে 'গরন'-সারের ব্যবহার, 'ইক্ষুখোচা', বা 'শাল জোড়াঞা ইক্ষু পীড়ন' এখনও সমভাবে প্রচলিত রহিয়াছে।

আনাজের মধ্যে মূলা, পটল, কচু, কাঁচকলা, বার্তাকু, ধুরুলি, ছিঙ্গ ইত্যাদির নাম অনেক কাল হইতেই পরিচিত। কলা, বাঁশ ও হলুদের চাষও হইত ব্যাপকভাবে। তিল-কলাই বুনিবার জন্য ডাঙ্গা থাকিত স্বতন্ত্র।

চাষ চালাইবার জন্য হালসাহানা, কারকীত, মজুর, মাহিন্দার ইত্যাদির নানা পরিচয় আমাদের এই আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যাইবে।

ধান-সম্পর্কে ক্রমিক সংবাদ এইরূপ মিলিবে,—

॥ ধান ॥

১. ধান (৪৯৭) খৃ ১৭৫৩

২. খড় (৫০৩) ১৭৫৩

৩. পোয়াল (৫১৪) ১৭৪৯

৪. ধান ও হল (৩৩৬) ১৮২৬

৫. তণ্ডুল (৫৬) ১৮৩৬

৬. বাজার দর (৭২) ১৮৭৫

৭. ধান বিক্রয় (৩৫৩) ১৮২৭

॥ মজুরাদির বেতন ॥

১. চাকরীর মাহিনা (৫২৩) ১৭৭৭

২, খাটুনীর হিসাব (২৯২) ১৮৬৩

৩. মজুর, ছুতার (৫০৩) ১৭৫৩

॥ কৃষি-সরঞ্জাম ॥

পালান, কাপা, সিনী, কোদাল, কুড়ালি, গুন, আলান— এই সকল কৃষিসরঞ্জামের নাম পাওয়া যায়। গরুর পিঠে পালান চড়াইয়া, কাপায় বাঁধিয়া ধানের ছালা বাহিবার যে মনোরম দৃশ্য পৌষের পল্লীতে কিছুকাল পূর্বেও পরিদৃষ্ট হইত, গরুর গাড়ীর এবং ট্রক্‌-টেম্পোর বহুল-প্রচলন এখন তাহা প্রায় বিদূরিত করিয়াছে। 'তামী' পাতিয়া, সিউনী দোলাইয়া, ফসলের ক্ষেতে ছন্দে ছন্দে জল সেঁচার দৃশ্যও আর প্রায় দেখা যায় না।

বর্তমান বাঁকুড়া জেলার আদিবাসী-সমাজের লোকসঙ্গীতে বিধৃত কৃষিকর্মের একটি উজ্জ্বল চিত্র উপস্থাপিত করিয়া আলোচ্য প্রকরণ শেষ করা যাইতেছে।—

আমার বঁধু নাগল[১] ধরে
নীল কানালির[২] মাঠে।
গোড়া[৩] গায়ে[৪] ঘাম পড়ে,
দেখে হিয়া কাঁপে।
ছোট ননদ গো,
আমি নিজে যাব জলখাবার[৫] দিতে॥

মুকুন্দরামের ছয় সাত পূর্ব-পুরুষ বর্তমান বর্ধমান-হুগলী জেলার সীমান্তে বর্ধিষ্ণু দামিন্যা গ্রামে চাষ চষিয়া বসবাস করিতেছিলেন। চারি শত বৎসর পরে, তাঁহার উত্তরপুরুষগণেরও বর্তমানে অনুরূপ জীবিকা। ধর্মমঙ্গলকার রামকান্ত রায় বর্ধমান জেলার সেহারা গ্রামে তাঁহার নিজস্ব কৃষিকর্মের আর-একটি বাস্তব বর্ণাঢ্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বাঙ্গালীর কৃষিকর্মের পূর্ণ-আদর্শ বিধৃত হইয়াছে হরমঙ্গল-সাহিত্যে, শিবঠাকুরের ধান-চাষের পরিকল্পনায়।

১ লাঙল ২ কানালী/কানা আলী—কাটা খাল (Anicut—যুল তামিল 'আণাই কাট্')। 'নীল-কানালি'—চড়কডাঙ্গার কাটাখালের (মাঠে) ৩ গোটা ৪ গোটা গায়ে অর্থাৎ সর্বাঙ্গে
৫ দুপুরের আগের খাবার—মুড়ি বা পান্তা ভাত